২০০৬ সালে সাহিত্যে
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তুর্কি লেখক

ওরহান পামুক

ইস্তাম্বুল

একটি শহরের স্মৃতিচারণ

অনুবাদ সৌরীন নাগ

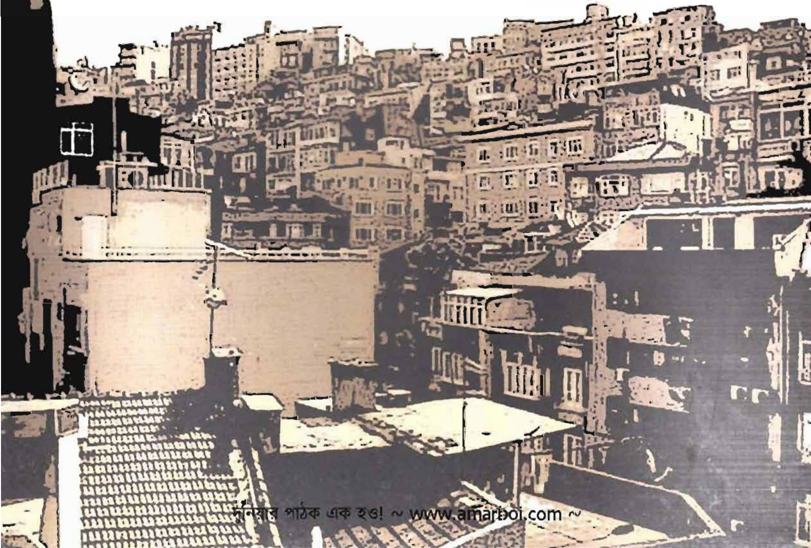

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইটি একটি ছেলেবেলার নেশা ধরানো স্মৃতিচারণ, একটি শহরের, যার মস্তিষ্কে পাশ্চাত্য, কিন্তু আত্মায় প্রাচ্য, গদ্যে যাদুঘর এবং একটি স্থান ও একটি ব্যক্তির মধ্যে যে রসায়ন, তারই সমীক্ষা।

–ডেভিড মিচে, গার্ডিয়ান

ফিরে পাওয়া ছেলেবেলা এবং ইস্তাম্বুলের প্রতি এই নিঃশব্দ নির্দেশপূর্ণ এবং মনোমুগ্ধকর শোক সংগীত পৃথিবীকে (পামুকের) পায়ের তলায় এনে দেবে। বইটি একবার নয়, বার বার পড়তে হয়, শুধু আনন্দ পাবার জন্য

–অবজারভার

এই ছোট বইটিতে পামুক আমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছেন শহরের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস এবং তাদেরও ইতিহাস, যারা তার আগে এই শহরটি সম্বন্ধে লিখেছেন, এর ছবি এঁকেছেন, ফটো তুলেছেন। ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে এই যে গবেষণা, এটি অত্যন্ত সতর্কতায়, নিখুঁতভাবে করা হয়েছে– নির্দেশ এবং উল্লেখগুলোর সঙ্গে পামুকের শহর সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা কত স্বচ্ছন্দ বহমানতায় সামঞ্জস্য হয়েছে... কঠোর পরিশ্রমে এবং সাহিত্যিক উদ্ভাসে তিনি একটি সৎ ও প্রিয় গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে লেখা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির মধ্যে গণ্য হবে। বইটি পড়ে তবে শহরটিতে পর্যটনে যাওয়া উচিত।

–আইরিশ টাইমস

একটি অসাধারণ, সুন্দর বই। অনেক দিন পরে আমি এমন একটি বই পড়লাম, যেটি নিজস্বতার গুণ-সমৃদ্ধ এবং আমার সত্ত্বাকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

–কেটি হিকম্যান

ISBN 984 70209 0029 0

9 847020 900290

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুরস্কের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত ঔপন্যাসিক আমাদের নিয়ে যান ইস্তাম্বুলের স্মৃতিস্তম্ভ এবং হৃত স্বর্গের মধ্যে দিয়ে, ধ্বংসপ্রাপ্ত অটোমান প্রাসাদ, পিছনের রাস্তাগুলো এবং জলপথের মধ্যে দিয়ে– যে শহরে তাঁর জন্ম, যে শহর তাঁর কল্পনার পীঠস্থান।

এই নাড়া-দেওয়া বইটি তার দুটি উদ্দেশ্যই সফল করেছে। এটি একটি অসামান্য শিশু বয়সের স্মৃতিচারণ যা হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়– অনেক দিন বাদে এ রকম একটি বই পড়লাম এবং এটি আমার মধ্যে কোনো মন ভোলানো পর্যটন বিজ্ঞাপনের চাইতে অনেক বেশি– আরেকবার ইস্তাম্বুলে যাবার আকাঙ্খা জাগায়।

একটি অদম্য মন-কাড়া বই এবং এর আকর্ষণ লেখকের নিজের প্রতিকৃতিতে নয়, তাঁর ইস্তাম্বুলের সঙ্গে কাব্যিক একাত্মতায়... তাঁর উপন্যাসগুলো ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে তাঁকে একজন বিশিষ্ট লেখকের পরিচিতি এনে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসার শহরের এই স্মৃতিচারণের জন্য তিনি বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরহান পামুক, ২০০৬ সালের নোবেল পুরস্কার বিজেতা, বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন, তার মধ্যে **দ্য হোয়াইট কাস্‌ল, দ্য ব্ল্যাক বুক** এবং **দ্য নিউ লাইফ** উল্লেখযোগ্য। ২০০৩ সালে তিনি তাঁর **মাই নেম ইজ রেড** বইটির জন্য আন্তর্জাতিক **ইম্প্যাক** পুরস্কার জয় করেন এবং ২০০৪ সালে ফেবার তাঁর স্নো উপন্যাসটির অনুবাদ প্রকাশ করে, যেটির সম্বন্ধে দ্য টাইমস পত্রিকায় বলা হয়, **বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক উপন্যাস**। ওরহান পামুক ইস্তাম্বুলে বাস করেন।

অনুবাদক : সৌরীন নাগ জন্ম ১৯৩৬ সালে, টাঙ্গাইলে। পিতার সরকারি বদলির চাকরির সূত্রে ১৯৪০-এ টাঙ্গাইল ত্যাগ। পেশায় কলকাতা পুলিশ, সিবিআই দিল্লী, দুর্নীতি দমন, নেশায় কবি, গল্পকার, গীতিকার, অনুবাদক। এখন পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন, দ্য ওল্ড ম্যান এণ্ড দ্য সী, পিনোক্কিও, ক্ষুধা, টলস্টয়ের ছোটদের গল্প, ইন্‌ আ ফ্রি স্টেট, সব পেয়েছির বই, দ্য বাইবেল। কাব্যগ্রন্থ একটু আলোর জন্যে প্রভূত প্রশংসিত, আলোড়ন জাগানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্তাম্বুল : একটি শহরের স্মৃতিচারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

İstanbul : Hatiralar ve Şehir

(Istanbul : Memories and the City)

ORHAN PAMUK

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তুর্কী লেখক

ওরহান পামুক

ইস্তাম্বুল

একটি শহরের স্মৃতিচারণ

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

সন্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেশ
ISBN-978-984-8088-50-0

ইস্তাম্বুল : একটি শহরের স্মৃতিচারণ
মূল : ওরহান পামুক
অনুবাদ : সৌরীন নাগ

İstanbul : Hatiralar ve Şehir by Orhan Pamuk
First Published in Turkey by Yapi Kredi Yayinlari, İstanbul, in 2003
Copyright © 2003 Yapi Kredi Kültür Sanat Yayincilik Ticaret ve Sanayi A. S.

অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১০

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১২

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, দোতলা, ঢাকা-১১০০ ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত । কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না ।

৪৫৬.০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের উৎসর্গ

এই বইটি অনুবাদ করতে বসে আমার মন চলে গেছে
তিয়াত্তর বছর আগের সুদূর অতীতের টাঙ্গাইলে,
আমার জন্মস্থানে, আর নিজের সেই স্বপ্নময় ছেলেবেলার স্মৃতির নেশায়
বুঁদ হয়ে পামুকের ইস্তাম্বুল অনুবাদ করে গেছি একটানা, দেশকে ভালোবেসে,
দেশের মানুষকে ভালোবেসে।
আমার এই দেশের মানুষ, আমার সমস্ত বাঙালি ভাইবোনদের হাতে আজ এই অনুবাদ
গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আমি গর্বিত, আনন্দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের আরো বইঃ

- ক্ষুধা / ন্যুট হ্যামসুন
- বাইবেল / কারেন আর্মস্ট্রং
- ইন আ ফ্রি স্টেট / ভি. এস. নাইপল
- এক বুড়ো আর সমুদ্র / আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
- সব পেয়েছির বই / গুস কুজার
- পিনোকিও / কার্লোস কলোদি
- টলস্টয়ের ছোটদের গল্প / লিও টলস্টয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

১. আর এক ওরহান # ১১
২. অন্ধকার মিউজিয়ামের ভেতরের ফটোগ্রাফগুলো # ১৭
৩. আমি # ২৬
৪. পাশার প্রাসাদগুলির ধ্বংস : একটি দুঃখজনক পথ-পরিক্রমা # ৩৩
৫. কালো এবং সাদা # ৪১
৬. বসফোরাস আবিষ্কারের ভ্রমণ # ৫৩
৭. মেলিং-এর বসফোরাস # ৬৮
৮. আমার মা, আমার বাবা এবং বহুবার গৃহত্যাগ # ৮১
৯. আরেকটা বাড়ি : সিহাঙ্গির # ৮৭
১০. হুজুন # ৯৪
১১. চারজন নিঃসঙ্গ বিষাদগ্রস্ত লেখক # ১১২
১২. আমার দাদীমা # ১২০
১৩. স্কুল জীবনের আনন্দ ও একঘেয়েমি # ১২৫
১৪. এসাল্‌প্‌ নিটিপ্‌স্‌ অন # ১৩২
১৫. আহমেদ রাসিম এবং শহরের অন্যান্য সংবাদপত্রের কলাম লেখক # ১৩৬
১৬. মুখ হাঁ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেও না # ১৪২
১৭. আঁকার আনন্দ # ১৪৯
১৮. ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়া : রেসাত এক্রেম কোকু'র কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা সংগ্রহ # ১৫৩
১৯. বিজয়, না, পতন? কনস্তান্তিনোপলের তুর্কীকরণ # ১৭২
২০. ধর্ম # ১৭৮
২১. ধনবান ব্যক্তিরা # ১৮৯
২২. বসফোরাসের জাহাজগুলো, বিখ্যাত যত অগ্নিকাণ্ড, বাড়ি বদল এবং অন্যান্য বিপর্যয় # ২০০
২৩. ইস্তাম্বুলে নার্ভাল: বিওগলুতে হাঁটা # ২১৯
২৪. শহরের দরিদ্র পাড়াগুলোর মধ্যে দিয়ে গোটের বিষন্ন পথ হাঁটা # ২২৪
২৫. পাশ্চাত্যের নজরে # ২৩৪
২৬. ধ্বংসাবশেষের 'হুজুন' : শহরের দরিদ্র পাড়ায় তানপিনার এবং ইয়াহিয়া কামাল # ২৪৫
২৭. ছবির মতো সুন্দর বাইরে ছড়িয়ে থাকা পাড়াগুলো # ২৫৪
২৮. ইস্তাম্বুলকে আঁকা # ২৬৪
২৯. ছবি আঁকা ও পারিবারিক সুখ # ২৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০. বসফোরাসের ওপর জাহাজ থেকে বেরোনো ধোঁয়া # ২৭৭
৩১. ইস্তাম্বুলে ফ্লবার্ট : প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য এবং সিফিলিস # ২৮৪
৩২. দাদার সঙ্গে লড়াই # ২৯২
৩৩. একটি বিদেশী স্কুলে একজন বিদেশী # ৩০০
৩৪. অসুখী হওয়ার অর্থ নিজেকে এবং নিজের শহরকে ঘৃণা করা # ৩১৫
৩৫. প্রথম প্রেম # ৩২৩
৩৬. গোল্ডেন হর্নে জাহাজ # ৩৪০
৩৭. মায়ের সঙ্গে কথোপকথন : ধৈর্য, সাবধানতা এবং শিল্প # ৩৫৩

ফটোগ্রাফগুলো সম্পর্কে # ৩৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্তাম্বুল : একটি শহরের স্মৃতিচারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১.
আর এক ওরহান

খুব ছোটবেলা থেকেই ভাবতাম যে, আমার এই পৃথিবীতে যা দেখতে পাই, তার চেয়েও বেশি কিছু আছে। ইস্তাম্বুলের রাস্তায় কোথাও আমাদের বাড়ির মতোই দেখতে অন্য কোনো বাড়িতে আর এক ওরহান থাকে যে কিনা হুবহু আমারই মতো দেখতে আর ওকে আমার যমজ ভাই কিংবা দ্বিতীয় আমি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। মনে নেই কোথা থেকে এবং কেমন করে আমার মাথায় এই ধারণাটা এসেছিল। মনে হয় কিছু গুজব, ভুল বোঝাবুঝি, কল্পনা এবং ভয় থেকেই এর উৎপত্তি। তবে আমার একদম প্রথম দিককার একটা স্মৃতি থেকে এটা পরিষ্কার যে, আমার ওই দ্বিতীয় ভৌতিক আমিটিকে কী চোখে দেখতাম।

যখন আমার পাঁচ বছর বয়স, তখন আমাকে অন্য একটা বাড়িতে অল্পদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার বাবা-মা অনেকবার আলাদা হয়ে থাকতেন। এই রকমই এক ঝোড়ো বিচ্ছিন্নতার শেষে যখন তাঁরা প্যারিসে দেখা করার ব্যবস্থা করেন, সেই সময় ঠিক করা হয় যে, আমার বড় ভাই আর আমি ইস্তাম্বুলেই থাকব, কিন্তু আলাদা আলাদা জায়গায়। দাদা থাকল নিশান্তাস-এ পামুক অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের দাদীমার সাথে পরিবারের কেন্দ্রে, কিন্তু আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সিহাঙ্গির-এ আমার মাসির সঙ্গে থাকবার জন্য। এই বাড়িতে আমাকে প্রচুর আদরে রাখা হয়েছিল আর এখানেই দেওয়ালে একটা ছোটো ছেলের ছবি ঝোলানো ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝেই আমার মাসি অথবা মেসো, ওই ছবিটা দেখিয়ে হাসিমুখে আমাকে বলত, 'দেখ! ওটা তুই।'

এটা সত্যি যে, ওই ছোট সাদা ফ্রেমের মধ্যেকার মিষ্টি, হরিণী-চোখো ছেলেটা খানিকটা আমার মতো দেখতে ছিল। এমন কি, আমি মাঝে মাঝে যে টুপিটা পরতাম, ওর মাথায়ও সেই টুপি ছিল। আমি অবশ্য জানতাম যে ছবির ওই ছেলেটা আমি নই (কেউ একজন ইউরোপ থেকে 'কিউট চাইল্ড' ছবিটার একটা কিটস প্রতিরূপ এনেছিল)। তা সত্ত্বেও আমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করতাম-এটা কি সেই ওরহান, যে অন্য একটা বাড়িতে বাস করে?

অবশ্য এখন আমিও অন্য একটা বাড়িতে বাস করি। মনে হতে পারে যে, আমার যমজ-এর সঙ্গে দেখা হবার আগেই আমি বাড়ি পাল্টেছি, কিন্তু যেহেতু আমি শুধু আমার আসল বাড়িতেই ফিরে আসতে চেয়েছিলাম, তাই ওর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারটায় আমি কোনো গা করিনি। যখনই আমার মাসি মেসো আমাকে ওই ছবির ছেলেটা বলে ঠাট্টা করত, আমার মনের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে, আমার বাড়ি, আমার ছবি আর আমার মতো দেখতে ওই ছবিটা, আমার মতো দেখতে যে ছেলেটা আর অন্য বাড়িটা, তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা, সব তালগোল পাকিয়ে যেত, এর ফলে আমার বাড়ির জন্য, আমার পরিবারের সবাই আমাকে ঘিরে থাকবে তার জন্য, মন কেমন করত।

শিগগিরই আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল। কিন্তু ইস্তাম্বুলে কোনো জায়গায় কোনো একটা বাড়িতে অন্য আর এক ওরহান-এর ভূতটা আমায় ছাড়লো না। আমার সারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈশব এবং বয়:সন্ধির অনেকটা সময় পর্যন্ত ওই ভূত আমাকে তাড়া করেছিল। শীতের সন্ধ্যায়, শহরের রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে যখন ফ্যাকাশে কমলারঙের আলোর মধ্যে দিয়ে অন্য লোকেদের বাড়ির ভেতরটা দেখতাম, তখন সুখী শান্ত পরিবারের আরামপ্রদ জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখতাম। আর তখনই এই রকম কোনো একটা বাড়িতে ওই অন্য ওরহান থাকতে পেরে ভেবে আমি শিউরে উঠতাম। যখন ধীরে ধীরে বড় হলাম, ভূতটা একটা কল্পনায় পরিবর্তিত হল আর সেই কল্পনা প্রায়শই রাত্রের দুঃস্বপ্ন নিয়ে আসত। কোনো কোনো স্বপ্নে, আমি অন্য একটা বাড়িতে ওই অন্য ওরহানকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠতাম; আবার কোনো স্বপ্নে আমরা দুজন ভূতুড়ে নির্দয় নৈ:শব্দের ভেতর চোখে চোখে চেয়ে একজন আরেকজনকে হারানোর চেষ্টা করতাম। পরে জাগরণ আর ঘুমের মধ্যে আমি আমার বালিশ, আমার বাড়ি, আমার রাস্তা আর এই পৃথিবীতে আমার নিজের জায়গাটুকু ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরতাম। যখনই আমার মনে দুঃখ হত, আমি কল্পনা করতাম যেন আমি অন্য বাড়িতে, যেখানে অন্য ওরহান থাকত, সেখানে অন্য জীবনে চলে গেছি আর সব কিছু সত্ত্বেও, আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতাম যে, আমিই সেই ওরহান, আর ও কত সুখী, তাই ভেবে আনন্দ পেতাম। এত আনন্দ পেতাম যে, কিছু সময়ের জন্যে সেই কল্পনার জগতের অন্য বাড়িটা খুঁজে বের করবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করতাম না।

এইবার বিষয়টির কেন্দ্রে আসা যাক। আমি কখনোই ইস্তাম্বুল ছেড়ে যাইনি, কখনোই আমার শৈশবের পাড়ার রাস্তা, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাইনি। যদিও আমি মাঝে মাঝে অন্য জেলায় বাস করেছি, পঞ্চাশ বছর পরে আমি নিজেকে আবার সেই পামুক অ্যাপার্টমেন্টেই দেখছি, যেখানে আমার প্রথম ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল এবং যেখানে আমার মা প্রথম আমাকে কোলে নিয়ে পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছিলেন। আমি জানি, আমার এই জায়গার প্রতি আসক্তি, আমার ওই কল্পনারাজ্যের বন্ধু এবং তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে আমার বন্ধনের মাঝে যে তৃপ্তি আমি পেয়েছি, তার থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু আমরা তো এখন এমন একটা সময়ের মধ্যে বাস করছি, যেটাকে গণ-দেশত্যাগ এবং সৃষ্টিশীল পরিযায়ী মানুষদের দিয়ে চিহ্নিত করা যায় এবং তাই আমাকে কখনো কখনো জোর জবরদস্তি করে বোঝাতে হয় যে, কেন আমি একই জায়গায় একই বাড়িতে বাস করেছি। আমার মার বিষণ্ন কণ্ঠস্বর ফিরে ফিরে আসে, 'কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে কেন যাস না, জায়গা বদল করতে চাস না কেন, কেন কোথাও বেড়াতে যাস না...?'

কনরাড, নভোকভ, নইপাল– এইসব লেখকেরা বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, দেশ, মহাদেশ, এমনকি সভ্যতার মধ্যেও পরিচলন করার জন্য বিখ্যাত। দেশত্যাগের দ্বারা এদের কল্পনা শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়েছে, মূল নয়, মূলহীনতার মধ্যে থেকে খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করেছে; আমার কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হল, আমার একই শহরে, একই রাস্তায় একই বাড়িতে থেকে একই দৃশ্য দেখে যাওয়া, ইস্তাম্বুলের ভাগ্যই হচ্ছে আমার ভাগ্য। আমি এই শহরের অঙ্গীভূত, কারণ এই শহরই আমাকে বর্তমান আমি তৈরি করেছে।

ফ্লবার্ট, যিনি আমার জন্মের একশ' দুবছর আগে ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন, এই শহরের জনাকীর্ণ রাস্তাগুলোয় জীবনের বৈচিত্র্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন; উনি একটা চিঠিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এক শতাব্দী পরে এই শহর পৃথিবীর রাজধানীতে পরিণত হবে। উল্টোটাই সত্যি হল; অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর, পৃথিবী ইস্তাম্বুলের অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। যে শহরে আমি জন্মালাম, সেই শহরটা তার দু'হাজার বছরের ইতিহাসে যেমন ছিল, তার থেকেও দরিদ্র, নোংরা এবং অন্যান্য জায়গার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। আমার কাছে এই শহর সর্বদাই একটা ধ্বংসস্তূপের শহর আর সাম্রাজ্য-পতনের বিষণ্নতার শহর। আমার সারা জীবন আমি হয় এই বিষণ্নতার সঙ্গে লড়াই করেছি, কিংবা (অন্যান্য ইস্তাম্বুলীয়দের মতো) এই বিষণ্নতাকে আপন করে নিয়েছি।

জীবনে অন্তত একবার আমরা আত্মঅবলোকনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জন্মের পরিমণ্ডলকে বোঝার চেষ্টা করি। একটা বিশেষ তারিখে, পৃথিবীর একটি বিশেষ কোণে আমাদের জন্ম হল কেন? এই যে পরিবারে আমি জন্ম নিয়েছি, এই দেশ, এই শহর যেখানে ভাগ্যের জুয়া আমাকে এনে ফেলেছে, তারা আমার কাছ থেকে ভালোবাসা প্রত্যাশা করে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসি– কিন্তু হয়তো আমাদের এর থেকেও ভালো কিছু পাওয়া উচিত ছিল? মাঝে মাঝে ভাবতাম যে, একটা বুড়িয়ে যাওয়া, হতদরিদ্র, ধ্বংসপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের ছাই-এর তলায় কবরস্থ একটি শহরে আমার জন্ম, এটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমার ভেতর থেকে কোনো কণ্ঠস্বর বলে উঠত, না, এটা তোমার সৌভাগ্য। যদি এটা ধন-সম্পদের ব্যাপার হয় তো আমি নিজেকে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান মনে করবো, কারণ আমার জন্ম হয়েছে একটা বিত্তবান পরিবারে এমন একটা সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন এই শহর তার সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে (যদিও কিছু লোক জোরালোভাবে বিপরীত মত পোষণ করেন)। আমার অভিযোগ করার মতো বিশেষ কিছু নেই; আমার যে শহরে জন্ম, তাকে আমি মেনে নিয়েছি, যেমন ভাবে আমার শরীরটাকেও আমি মেনে নিয়েছি (অবশ্য আরো একটু সুন্দর এবং সুঠাম শরীর হলে ভালো হত) এবং আমার লিঙ্গকে মেনে নিয়েছি (যদিও এখনো আমি কখনো কখনো ছেলেমানুষের মতো নিজেকে প্রশ্ন করি যে, মেয়ে হয়ে জন্মালে আরো ভালো হত কিনা)। এই আমার ভাগ্য আর এর সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। এই বইটি লেখা ভাগ্য নিয়ে....

১৯৫২ সালের ৭ই জুন মধ্য রাত্রে, মোদা-য় একটা ছোট বেসরকারি হাসপাতালে আমার জন্ম হয়। আমাকে বলা হয়েছে যে, এই হাসপাতালের অলিন্দ গুলি সেই রাত্রে শান্তিপূর্ণ ছিল, যেমনটি ছিল পৃথিবী। দু'দিন আগে স্ট্রম্‌বোলিনি আগ্নেয়গিরির হঠাৎ আগুন ও ছাই উদ্‌গীরণ করা শুরু হওয়া ছাড়া আমাদের এই গ্রহে আর বিশেষ কিছু ঘটছিল না। খবরের কাগজগুলো ছোট ছোট খবরে ভর্তি ছিল– তুর্কী সৈন্যদলের কোরিয়ায় লড়াই করার কিছু সংবাদ, কিছু আমেরিকানদের ছড়ানো গুজব, যাতে কিনা ভীতি সঞ্চার করা হচ্ছিল যে, উত্তর কোরীয়রা জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে চলেছে। আমার জন্মের আগে কয়েক ঘণ্টা আমার মা একটা স্থানীয় সংবাদ আগ্রহের সঙ্গে পড়ছিলেন যে, কোন্যা স্টুডেন্ট সেন্টারের তত্ত্বাবধায়করা আর 'বীর' আবাসিকরা একটি ভীষণ দর্শন মুখোশ-পরা লোককে লাঙ্গা-র একটি বাড়িতে বাথরুমের জানালা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করতে দেখেছিল; ওরা লোকটাকে তাড়া করে, লোকটা রাস্তা ধরে দৌড়ে গিয়ে একটা কাঠের গোলায় ঢুকে পড়ে, তারপর পুলিশকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে সেই দাগী অপরাধী আত্মহত্যা করে। একজন শুকনো-ফল বিক্রেতা মৃতদেহটা শনাক্ত করে বলে যে, এই লুটেরাই এক বছর আগে প্রকাশ্য দিনের বেলায় ওর দোকানে ঢুকে বন্দুক দেখিয়ে ওর দোকান লুট করে। মা যখন এই নাটকের শেষ পর্যায়ের ব্যাপারগুলো পড়ছিলেন তখন তিনি তাঁর ঘরে একাই ছিলেন, এই কথা মা আমাকে অনেক বছর পরে আক্ষেপ ও বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন। মা-কে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর, বাবা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এবং যখন মা'র প্রসব যন্ত্রণা বাড়ছিল না, বাবা তখন তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে যান। মাত্র একজন লোক প্রসূতির ঘরে মা'র সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার চাচী, যিনি মাঝরাতে হাসপাতালের বাগানের পাঁচিল টপকে ঢোকেন। মা যখন প্রসবের পর প্রথম আমাকে দেখেন, উনি আমাকে আমার দাদার চাইতে বেশি রোগা আর বেশি রুগ্ন দেখেছিলেন।

'আমাকে বলা হয়েছে' এই বাক্যটা বাধ্য হয়ে আমাকে লিখতে হচ্ছে। তুর্কী ভাষায় একটা বিশেষ 'কাল' আছে, যা ব্যবহার করলে 'আমরা নিজের চোখে যা দেখেছি', তার থেকে 'শোনা কথা'-কে আলাদা করে বোঝানো যায়; যখন আমরা স্বপ্নের কথা, রূপকথার গল্প বা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না এমন অতীত

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনার কথা বর্ণনা করি, তখন আমরা এই 'কাল' ব্যবহার করি। এটা দিয়ে বেশ উপযোগী পার্থক্য করা যায়, যখন আমরা 'স্মরণ করি' আমাদের জীবনের একদম প্রথম দিকের অভিজ্ঞতাগুলো, আমাদের দোলনা, বাচ্চা-গাড়ি, আমাদের প্রথম পা ফেলা, যেগুলো আমরা বাবা-মায়ের কাছ থেকে শুনেছি, সেই সব গল্প যেগুলো আমরা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনি, যেমন শুনি অন্য লোকেদের সম্বন্ধেও দারুণ দারুণ গল্প। আমাদের স্বপ্নে নিজেদের দেখার মতো এটা একটা মিষ্টি অনুভূতি, যার জন্য আমাদের বড় বেশি মূল্য দিতে হয়। একবার মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে গেলে, অন্য লোকেরা যখন বলে আমরা ছোটবেলায় কী করতাম, সেগুলো আমরা যা মনে করতে পারি, তার থেকেও বেশি প্রভাব ফেলে। এবং আমরা যেমন আমাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে অন্য লোকেদের কাছ থেকে জানতে পারি, তেমনি যে শহরে আমরা বাস করি, তার সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অন্য লোকেদের দ্বারা তৈরি হয়।

সময়ে সময়ে যখন আমি আমার শহর এবং আমার সম্বন্ধে শোনা গল্পগুলি নিজের বলে গ্রহণ করি, তখন বলার লোভ হয়, 'এক সময়ে আমি ছবি আঁকতাম। শুনেছি যে আমার জন্ম হয়েছে ইস্তাম্বুলে, এবং আমার মনে হয় যে আমি একটি মোটামুটি কৌতূহলী শিশু ছিলাম। তারপর, যখন আমার বাইশ বছর বয়স হল, আমি কেমন করে জানি না, উপন্যাস লিখতে শুরু করলাম।' আমার পুরো গল্পটাই এইভাবে লিখতে পারলে ভালো হত— যেন আমার জীবনটা এমন একটা কিছু যা অন্য লোকের জীবনে ঘটেছে, যেন এটা একটা স্বপ্ন, যার ভেতরে আমার গলার স্বর ক্ষীণ হতে থাকে এবং মন্ত্রের কাছে আমার ইচ্ছার মৃত্যু ঘটে। মহাকাব্যের ভাষা সুন্দর, কিন্তু আমার মনে হয় এই ভাষা বোধগম্য নয়, কেননা, আমাদের প্রথম জীবন সম্পর্কে যেসব পৌরাণিক কাহিনী আমরা বলি, সেগুলি আমাদের আরো উজ্জ্বল, আরো সত্য দ্বিতীয় জীবন যেটা আমরা জাগলে শুরু হয়, তার জন্যে তৈরি করে, এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমার মতো লোকের কাছে অন্তত ওই দ্বিতীয় জীবন আপনার হাতের এই বইটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতএব প্রিয় পাঠক, গভীর মনোযোগ দিন। আপনাদের কাছে আমাকে সোজাসুজি বলতে দিন, পরিবর্তে আমি আপনাদের কাছে সহানুভূতি চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.
অন্ধকার মিউজিয়ামের ভেতরের ফটোগ্রাফগুলো

আমার মা, আমার বাবা, আমার বড় ভাই, আমার দাদীমা, আমার চাচিরা আর চাচীরা– আমরা সবাই একই পাঁচতলা আবাসনব্লকের বিভিন্ন তলায় থাকতাম। আমার জন্মের এক বছর আগে পর্যন্ত পরিবারের বিভিন্ন শাখা (অন্য অনেক বৃহৎ অটোমান পরিবারের মতো) একটা মস্তবড় পাথরের প্রাসাদে একত্রে বাস করত; ১৯৫১ সালে ওরা সেই প্রাসাদটি একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভাড়া দেয় এবং পাশের খালি জমিতে একটি আধুনিক বাড়ি তৈরি করে, যেটিকে আমি আমাদের বাড়ি বলে জানি; বাড়িটির সদরে, সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী তারা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে একট ফলক বসান, যাতে লেখা ছিল, 'পামুক আবাসন'। আমরা পাঁচতলায় থাকতাম, কিন্তু আমি মায়ের কোল ছাড়ার পর থেকেই সারা বাড়িটাতেই দৌড়াদৌড়ি করতাম এবং মনে করতে পারি যে, প্রত্যেক তলাতেই অন্তত একখানা পিয়ানো ছিল। যখন আমার শেষ আইবুড়ো চাচা তার খবরের কাগজটা, কেবল বিয়ে করার জন্য একটু বেশি সময় ধরে নামিয়ে রাখলেন এবং তার নতুন বৌ দোতালার ঘরে ঢুকলেন, যেখান থেকে শুধু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তিনি পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী কাটিয়েছিলেন, তিনি তার পিয়ানোটি সঙ্গে এনেছিলেন। কেউই কখনোই এই পিয়ানোটি অথবা অন্য কোনো পিয়ানো বাজায়নি আর এই জন্যেই হয়তো ওই পিয়ানোগুলি আমাকে খুব দুঃখ দিত।

কিন্তু শুধু না-বাজানো পিয়ানোগুলোই নয়। প্রত্যেক অ্যাপার্টমেন্টে একটা করে তালা দেওয়া কাচের আলমারি ছিল, যার ভেতরে চিনা পোর্সেলিন, চায়ের কাপ, রূপোর সেট, চিনির বাটি, নস্যির ডিবে, ক্রিস্টাল গ্লাস, গোলাপজলের ঝারি, প্লেট ও সেম্পার সাজানো থাকত, যেগুলো কেউ কখনো স্পর্শ করেনি, যদিও ওগুলোর মধ্যে আমি কখনো কখনো ছোট খেলনা মোটর গাড়ি লুকিয়ে রাখতাম। কয়েকটি ঝিনুক-খচিত অব্যবহৃত ডেস্ক ছিল, পাগড়ি রাখার তাক ছিল যার ওপরে কোনো পাগড়ি থাকত না, আর ছিল জাপানি এবং আর্ট-নোভ্যু পর্দা যার পেছনে কিছুই লুকোনো ছিল না। লাইব্রেরিতে কাচের পেছনে ধূলি ধূসরিত ডাক্তারির বইগুলো ছিল আমার ডাক্তার চাচার; উনি আমেরিকায় চলে যাবার পর কুড়ি বছর হয়ে গেল, এর মধ্যে কোনো মানুষের হাত এই বইগুলো স্পর্শ করেনি। আমার শিশু মনে এই সাজানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরগুলো মনে হত জীবিতদের জন্য নয়, মৃতদের জন্য। (মাঝে মাঝেই কখনো একটা বসবার ঘর থেকে একটা কফি টেবিল বা একটা খোদাই করা বাক্স অদৃশ্য হয়ে যেত, আর অন্য কোনো তলায় অন্য কোনো বসবার ঘরে সেগুলো দেখা যেত।)

আমাদের দাদীমার যদি মনে হত যে, আমরা তাঁর রুপোর জরি লাগানো চেয়ারে ঠিক মতো বসিনি, তিনি আমাদের ধমক লাগাতেন, 'পিঠ সোজা করে বস!' বসার ঘরগুলি আরাম করে বসার ঘর ছিল না; ও গুলো ছিল ছোটখাটো মিউজিয়াম যেখানে কাল্পনিক অতিথিকে দেখানো হত যে, পরিবারটি পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন। যে লোকটি রমজান মাসে রোজা রাখে না, সে হয়তো এই কাচের আলমারি, প্রাণহীন পিয়ানোগুলোর মাঝে থাকলে সামান্যই বিবেকের দংশন বোধ করবে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি বিবেকের দংশন বোধ করবে সেই ঘরে হাঁটু মুড়ে বসে, যে ঘর কুশন এবং দেওয়ানে ভর্তি। যদিও সকলেই জানত যে, এটা হচ্ছে ইসলামি আইন থেকে মুক্তি, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা আর কী কী কারণে ভালো, সে সম্বন্ধে কেউই নিশ্চিত ছিল না। আর সেই জন্যে ইস্তাম্বুলের কেবলমাত্র অবস্থাপন্নদের ঘরেই বসার-ঘর-মিউজিয়াম দেখা যেত তাই নয়, পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে এই রকম অগোছালো, বিষণ্ন (কখনো বা সেটা কাব্যিক) পাশ্চাত্য প্রভাবের নিদর্শন-ধারী বসার ঘর সারা তুরস্ক জুড়েই দেখা যেত। কেবল যখন ১৯৭০ সালে টেলিভিশন এল, তখনই এই ধরনের বসার ঘরের ফ্যাশন উঠে গেল। যখন লোকে আবিষ্কার করল যে, সবাই এক সঙ্গে বসে সন্ধেবেলা টিভিতে খবর শোনাটা কী আরামদায়ক, তখন বসার ঘরগুলো ছোট ছোট মিউজিয়াম থেকে রূপবদল করে ছোট ছোট সিনেমা হল হয়ে গেল– যদিও এখনো কিছু প্রাচীন পরিবারের সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তারা মাঝখানের হল ঘরটায় টেলিভিশন রেখেছে আর তাদের মিউজিয়াম-বসার-ঘরগুলো তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, কেবল ছুটির দিনে অথবা বিশেষ অতিথি এলে ওই ঘরগুলো খোলা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অটোমান প্রাসাদে যেমন ছিল, তেমনই অবিরত ওঠানামা এই বাড়িতেও অব্যাহত ছিল এবং তাই আমাদের এই আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে দরজাগুলো প্রায়শই খোলা থাকত। আমার দাদা স্কুল শুরু করার পর থেকে আমার মা আমাকে একা একা ওপরে যেতে দিতেন, বা আমরা দুজনেই একসঙ্গে বিছানায় শোয়া দাদীমাকে দেখতে ওপরে যেতাম। দাদীমার বসার ঘরে পাতলা রেশমী পর্দাগুলো সমসময়েই ঝোলানো থাকত, তবে তাতে এমন কিছু একটা তফাত হত না, কারণ পাশের বাড়িটা এত ঘোঁষাঘেঁষি ছিল যে, ঘরটা অন্ধকার হয়ে থাকত, বিশেষ করে সকালবেলাটায়; আমি তাই বড় ভারী কার্পেটটার ওপর বসে নিজেই নতুন নতুন খেলা আবিষ্কার করে একা একাই খেলতাম। কেউ একজন ইউরোপ থেকে যে ছোট ছোট খেলনা মোটর গাড়িগুলো আমাকে এনে দিয়েছিলেন, সেগুলোকে নিখুঁত লাইন করে সাজিয়ে একটা একটা করে আমার গ্যারেজে ঢোকাতাম। তারপর কল্পনা করতাম, কার্পেটটা একটা সমুদ্র আর চেয়ার ও টেবিলগুলো দ্বীপ, আর আমি লাফিয়ে লাফিয়ে চেয়ার টেবিলগুলোর ওপরে উঠে যেতাম, যাতে পায়ে জল না লাগে (যেমন ক্যালভিনোর ব্যারন সারা জীবনই গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে, মাটিতে পাদস্পর্শ না করে কাটিয়েছিল)। যখন আর লাফানো ঝাঁপানো বা সোফার হাতলের ওপর ঘোড়ায় চড়ার মতো বসা (এই খেলাটা বোধহয় হেবেলিয়াডা-র ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলোর স্মৃতি থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল) ভালো লাগত না, তখন আর একটা খেলা খেলতাম, যেটা বড় হয়েও একঘেয়েমি কাটাতে খেলতাম; আমি কল্পনা করে নিতাম যে, যে জায়গাটায় আমি বসে আছি (এই শোয়ার ঘর, এই বসার ঘর, এই ক্লাশ ঘর, এই ব্যারাক, এই হাসপাতালের ঘর, এই সরকারি অফিস), সেটা আসলে অন্য একটা জায়গা; যখন দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে সব শক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়তাম, তখন প্রত্যেকটা টেবিলে, ডেস্কে, দেওয়ালে রাখা ফটোগ্রাফগুলোর মধ্যে আশ্রয় নিতাম।

পিয়ানোগুলোকে কখনো অন্য কোনোভাবে ব্যবহার হতে দেখিনি, তাই ভেবে নিয়েছিলাম যে, পিয়ানোগুলো হচ্ছে ফটোগ্রাফ সাজিয়ে রাখার জায়গা। আমার দাদীমার বসার ঘরে এমন একটিও জায়গা ছিল না, যেখানে সব রকম মাপের ফ্রেম না রাখা ছিল। সবচেয়ে কর্তৃত্বব্যঞ্জক ছিল দু'খানা বিশাল প্রতিকৃতি, যেগুলো অব্যবহৃত ফায়ারপ্লেসের ওপরে টাঙানো ছিল; একটা ছিল আমার দাদীমার রিটাচ-করা ফটোগ্রাফ, আর একটা ছিল আমার দাদাজীর, যিনি ১৯৩৪ সালে মারা যান। যেভাবে ছবি দুটো দেয়ালে জায়গা মতো টাঙানো ছিল আর যে ভঙ্গীতে আমার দাদাজী-দাদীমার ছবি তোলা হয়েছিল, (একজন আরেকজনের দিকে সামান্য ঘোরা যে ভঙ্গী ইউরোপের রাজা-রাণীদের ডাকটিকিটের ওপরে এখনো দেখা যায়), তাতে যে কোনো লোক এই মিউজিয়াম ঘরে ঢুকে তাদের মেজাজী দৃষ্টি দেখলেই বুঝতে পারবে যে, এঁদের সময় থেকেই এই পরিবারের কাহিনী শুরু হয়েছিল।

এঁরা দুজনেই মানিসা-র কাছে গর্দেশ নামে একটি শহরের বাসিন্দা ছিলেন। এঁদের পরিবার পামুক (সুতো) নামে পরিচিত ছিল, কারণ এঁদের চামড়ার রঙ ছিল ফ্যাকাশে আর চুলের রঙ ছিল সাদা। আমার দাদীমা ছিলেন একজন সির্কাশিয়ান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(সির্কাশিয়ান মেয়েরা দীর্ঘাঙ্গী এবং সুন্দরী হিসেবে বিখ্যাত ছিল এবং অটোমানদের বিবি মহলের জন্য খুব জনপ্রিয় ছিল)। দাদীমার বাবা রাশিয়ান অটোমান যুদ্ধের সময় (১৮৮৭-৮৮) দেশত্যাগ করে আনাতোলিয়ায় এসেছিলেন, প্রথমে বসতি করেছিলেন ইজমীর-এ (মাঝে মাঝেই ওখানকার একটা খালি বাড়ির কথা শোনা যেত) এবং পরে চলে আসেন ইস্তাম্বুলে, যেখানে আমার দাদাজী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন। ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিকে দাদাজী প্রচুর টাকা রোজগার করেন, যখন নতুন তুরস্ক প্রজাতন্ত্র রেলরোড নির্মাণে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ করে; তিনি একটা মস্ত বড় কারখানা নির্মাণ করেন যেখানে দড়ি থেকে, এক ধরনের সুতো থেকে, শুকনো তামাক পর্যন্ত সব তৈরি হত। কারখানাটা ছিল গোক্‌সুর তীরে, একটা ছোট স্রোতস্বিনী যেটা বসফোরাসে গিয়ে পড়েছে। যখন উনি ১৯৩৪ সালে ৫২ বছর বয়েসে মারা যান, উনি এত বিশাল ধন-সম্পদ রেখে যান যে, আমার বাবা আর আমার চাচা কখনোই এই সম্পদের শেষ দেখতে পাননি, যদিও তারা সমানে একটার পর একটা ব্যবসায়িক অভিযানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।

এখান থেকে লাইব্রেরিতে গেলে আমরা দেখব, নতুন প্রজন্মের বড় বড় প্রতিকৃতি, দেওয়ালে অতি যত্নে নিখুঁত লাইন করে সাজানো রয়েছে; ওই ছবিগুলোর প্যাস্টেল রঙ দেখলে বোঝা যায় যে ওগুলো একই ফটোগ্রাফার-এর হাতের কাজ। দূরের দেওয়ালে রয়েছেন আমার হৃষ্টপুষ্ট বিশাল বপু চাচা ওজহ্যান, যিনি প্রথমে তাঁর মিলিটারি-র চাকরি না করেই ডাক্তারি পড়তে আমেরিকায় চলে যান, যার ফলে আর কখনো তুরস্কে ফিরে আসতে পারেননি এবং তার পরিণতিতে আমার দাদীমা তার বাকি জীবন মূর্তিমতী শোক হয়ে কাটান। আর রয়েছেন চশমাধারী তার ছোট ভাই অয়দিন, যিনি একতলায় থাকেন। আমার বাবার মতোই তিনিও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন এবং তার সারা জীবন তিনি বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পে যুক্ত হয়ে কাটান, যেগুলো কখনোই সঠিকভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। চতুর্থ দেওয়ালে আমার বাবার বোন রয়েছেন, যিনি পিয়ানো শিখবার জন্য প্যারিস-এ কাটিয়েছেন। তার স্বামী আইন বিভাগে একজন সহকারী ছিলেন এবং তারা ছাদের ওপরের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন, অনেক বছর পরে যেটাতে আমি চলে আসি এবং এখন যেখানে বসে আমি এই বইটি লিখছি।

লাইব্রেরী থেকে আবার মিউজিয়ামের প্রধান ঘরটায় ফিরে এসে একটু দাঁড়ানো যাক ক্রিস্টাল-এর বাতিটার তলায়, যেটা ঘরের বিষণ্ণতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে; দেখব, ভিড় করে আছে একগাদা সাদা-কালো অস্পৃষ্ট ফটোগ্রাফ যেগুলো আমাদের বলে যে, জীবন এগিয়ে চলেছে। এখানে আমরা দেখি, পরিবারের সব ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন ভঙ্গিতে, তাদের বাগদানের সময়, তাদের বিয়ের সময় এবং তাদের জীবনের অন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়। প্রথম যে রঙিন ছবি আমার চাচা আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছিলেন, তার পাশেই রয়েছে, শহরের টাকসিম স্কোয়ারে আর বসফোরাসের তীরে, বিভিন্ন পার্কে, ক্রমবর্ধমান পরিবারের ছুটির দিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়া-দাওয়ার নানান ছবি; মা ও বাবার সঙ্গে আমার আর আমার দাদার কোনো একটা বিয়েতে তোলা ছবির পাশে রয়েছে আমার দাদাজীর একটা ছবি, পুরোনো বাড়ির বাগানে তাঁর নতুন কেনা মোটর গাড়ির পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় তোলা এবং আরেকটা ছবি, যাতে আমার চাচাজী পামুক অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশ পথের বাইরে তাঁর নতুন গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র অসাধারণ কোনো ঘটনা ছাড়া, যেমন যেদিন আমার দাদীমা আমার আমেরিকার চাচার প্রথমা স্ত্রীর ফটোটা সরিয়ে তার জায়গায় তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর ছবি রাখলেন, পুরোনো প্রথাই বজায় থাকত, অর্থাৎ মিউজিয়ামে কোনো ছবিকে একবার একটা জায়গা দিলে কোনো রকমেই আর সেটাকে সেই জায়গা থেকে সরানো যেত না। যদিও আমি প্রতিটি ছবিকে হাজার

বার দেখেছি, তবুও ওই জিনিসপত্রে ঠাসা ঘরটায় ঢুকলে আবারো আমি সব ছবিগুলোকে না দেখে পারতাম না।

এই যে এইসব ফটোগ্রাফগুলো দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি, এতে আমি উপলব্ধি করেছি যে, ভাবীকালের জন্য কিছু কিছু মুহূর্তকে ধরে রাখার গুরুত্ব আছে। এবং যতই সময় এগিয়ে চলেছে, আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই ফ্রেমের মধ্যে ধরে রাখা ছবিগুলো কী রকম শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছে। একটা ছবিতে দেখছি আমার চাচাজী আমার দাদাকে অঙ্ক করাচ্ছেন এবং একই সময়ে দেখছি আরেকটা ছবিতে বত্রিশ বছর আগের সেই চাচাজী; দেখছি আমার বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন, তাঁর মুখে এক টুকরো হাসি, ভীড় ঠাসা ঘরের মধ্যে কোনো আলোচিত রসিকতার শেষটুকু ধরার চেষ্টা করছেন, আবার একই সঙ্গে দেখছি তাঁর একটা পাঁচ বছর বয়সের ছবি– আমারই বয়েস– মাথার চুল মেয়েদের মতো লম্বা, এতে আমার মনে হয়েছে যে, আমার দাদীমা এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তগুলোকে ফ্রেমের মধ্যে আটকে রেখেছেন যাতে এগুলোকে আমরা বর্তমান কালের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে পারি। একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় সাধারণতঃ যে রকম কণ্ঠস্বরে কথা বলা হয়, সেইরকম কণ্ঠস্বরে যখন আমার দাদীমা আমার দাদাজীর, যিনি অল্প বয়েসে মারা গিয়েছিলেন, সম্বন্ধে কথা বলতেন এবং দেওয়ালে ঝোলানো ও টেবিলের ওপর রাখা ফটোগ্রাফগুলো দেখাতেন, তখন মনে হত, উনিও আমার মতো দুটি বিপরীত ধর্মী টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে গেছেন, একদিকে জীবন প্রবাহে এগিয়ে চলতে চাইছেন, অন্যদিকে অতীতের উৎকর্ষের মুহূর্তগুলো ধরে রাখতে চাইছেন, সাধারণ জীবন যাত্রা উপভোগ করছেন, কিন্তু তবুও আদর্শকে সম্মান দেখাতে চাইছেন। কিন্তু যদিও আমি এই উভয় সঙ্কটগুলো নিয়ে চিন্তা করি, আমি ভাবি যে, যদি জীবন থেকে কোনো বিশেষ মুহূর্তকে তুলে নিয়ে ফ্রেমের মধ্যে ধরে রাখা যায়, তাহলে কি সেটা মৃত্যু, ধ্বংস এবং সময়ের প্রবাহকে অস্বীকার করা হবে, নাকি এগুলোর প্রতি আত্মসমর্পণ করা হবে?– আমি এইসব নিয়ে বিরক্ত হয়ে যেতাম।

পরবর্তীকালে আমি এইসব লম্বা লম্বা সামাজিক উৎসবের ভোজ, অন্তহীন সান্ধ্য আমোদ প্রমোদ, সেইসব নববর্ষের ভোজ যেখানে পুরো পরিবার একত্রিত হয়ে ভোজনান্তে লোট্টো খেলত, এইগুলোকে ভয় পেতে লাগলাম। প্রত্যেক বছর আমি শপথ করতাম যে, এই শেষ, আর যাবো না, কিন্তু কোনোভাবেই আমি কখনোই এই অভ্যাসটা ছাড়তে পারলাম না। যদিও যখন ছোট ছিলাম, তখন এই খাওয়া-দাওয়াগুলো আমার ভালো লাগত। যখন আমি দেখতাম, রসিকতাগুলো ভীড়ে-ঠাসা টেবিল থেকে টেবিলে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আর আমার চাচারা হাসছেন (ভদকা অথবা রাকি-র নেশায়) এবং আমার দাদীমা মিটিমিটি হাসছেন (উনি নিজের জন্যে যে ছোট্ট গ্লাসে একটু বীয়ার নিতেন, তার নেশায়)– তখন বুঝতে পারতাম যে, এই ছবির ফ্রেমগুলোর বাইরে জীবন কেমন হাস্য– কৌতূকে ভরা। একটা বিশাল এবং সুখী পরিবারের অঙ্গ হিসেবে আমি নিজেকে নিরাপদ ভাবতাম এবং এই ভেবে আনন্দ পেতাম যে, পৃথিবীতে আমাদের পাঠানো হয়েছে আনন্দ পাবার জন্য, যদিও আমি দীর্ঘদিন থেকেই জানতাম যে, আমার এই আত্মীয়রা, যারা ছুটির দিনে এক সঙ্গে হাসি ঠাট্টা, খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন, তারাই আবার টাকা পয়সা এবং ধন-সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়ার সময় নিষ্ঠুর এবং ক্ষমাহীন হয়ে যেতে পারেন। আমাদের নিজেদের মধ্যেই, আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের একান্তে, আমার মা সব সময়েই আমাকে আর দাদাকে 'তোমাদের চাচি', 'তোমাদের চাচাজী,' 'তোমাদের দাদীমা'-র দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুরতা নিয়ে নালিশ করতেন। যদি কখনো কোনো জিনিসের মালিকানা নিয়ে মতান্তর হত, কিংবা দড়ির কারখানার শেয়ার ভাগাভাগি নিয়ে অথবা এই আবাসন ব্লকের কোন তলায় কে থাকবে তাই নিয়ে মতান্তর হত, তাহলে একটি নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকত যে, এর কোনো মীমাংসা কখনোই হবে না। সম্পর্কের এই চিড়গুলো হয়তো উৎসবের ভোজের সময় মিলিয়ে যেত, কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই সব আনন্দের পেছনে লুকিয়ে আছে ক্রমবর্ধমান অমীমাংসিত বিষয়গুলো এবং প্রচুর অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ।

আমাদের এই বড় পরিবারের প্রত্যেকটি শাখারই নিজস্ব পরিচারিকা থাকত এবং প্রত্যেকটি পরিচারিকাই এই পরিবার-যুদ্ধে নিজের মালিকের পক্ষ সমর্থন করাকে কর্তব্য মনে করত।

আমার মা'র পরিচারিকা এসমা হানিম, আমার চাচীর পরিচারিকা ইক্বালের সঙ্গে দেখা করতে যেত।

পরে সকালের জলখাবারের সময় আমার মা বলতেন, 'শুনেছ, আইদিন কী বলেছে?'

আমার বাবারও খুব জানার কৌতূহল, কিন্তু ঘটনাটা শোনার পর বাবা বলতেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না,' আর তার পরেই আবার খবরের কাগজ তুলে নিতেন।

যদিও আমি এই সব বিবাদের অন্তর্নিহিত কারণগুলো বুঝবার পক্ষে খুবই ছোট ছিলাম– যে আমাদের পরিবার অটোমান প্রাসাদে বসবাস করার দিনগুলোর মতোই এখনো তেমনিভাবেই বসবাস করছে, যদিও ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে– তবুও আমার বাবার দেউলিয়াপনা এবং তার প্রায়শই বাড়িতে অনুপস্থিতি, আমার নজর এড়াত না। আমার মা যখন আমাকে আর দাদাকে নিয়ে আমার নানীমার কাছে, তাঁর সিসলি শহরের তিনতলা ভূতুড়ে বাড়িতে দেখা করতে যেতেন, তখনই পুরো ব্যাপারটা শুনতে পেতাম যে, আমাদের পরিবারের অবস্থা ক্রমশ কেমন খারাপ হয়ে পড়েছে। যখন আমি আর দাদা খেলা করতাম, মা তখন নানীমার কাছে নালিশ জানাতেন আর নানী খালি মা-কে ধৈর্য ধরতে বলতেন। এই ধূলি ধূসরিত তিনতলা বাড়িটায় তিনি এখন একাই বাস করেন আর যদি মা এখানে ফিরে আসেন এই দুশ্চিন্তায় হয়তো তিনি এই বাড়িটার কী কী দোষ আছে, সেই ব্যাপারে অনবরত আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

মাঝে মাঝে রাগ দেখানো ছাড়া আমার বাবার জীবনের কাছে বিশেষ কিছু অভিযোগ ছিল না। তার সুন্দর চেহারা, তার বুদ্ধি আর তার সৌভাগ্য, এগুলোর জন্য বাবার একটা ছেলেমানুষি আনন্দ ছিল, যেটা তিনি লুকোনোর চেষ্টা করতেন না। বাড়ির মধ্যে তিনি সর্বক্ষণ শিস দিতেন, আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখতেন, আর একটা লেবুর টুকরো ব্রিলিয়ান্টাইন-এর মতো মাথার চুলে ঘষতেন। তিনি ভালোবাসতেন রসিকতা, কথার খেলা, হঠাৎ অবাক করে দেওয়া, কবিতা আবৃত্তি করা, নিজের চাতুর্য দেখানো, আর দূর দূর দেশে প্লেন-ভ্রমণ। তিনি এমন একজন বাবা-ছিলেন, যিনি কখনোই বকতেন না, নিষেধ করতেন না, শাস্তি দিতেন না। যখন উনি আমাদের নিয়ে বাইরে বেরোতেন, আমরা সারা শহর ঘুরতাম, যেখানেই যেতাম, সেখানেই বন্ধু বানাতাম এবং এই রকম ভ্রমণের জন্যই আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে, পৃথিবীটা কেবল আনন্দ করারই জায়গা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি কখনো খারাপ কিছু ঘটত বা একঘেয়েমির ক্লান্তি আসত, বাবা এই সব ব্যাপারে পেছন ফিরে চুপচাপ থাকতেন। আমার মা, যিনি পরিবারের নিয়মগুলো তৈরি করেছিলেন, ভুরু কুঁচকে জীবনের অন্ধকার দিকগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন করতেন। মার সঙ্গে সম্পর্কটা খুব একটা মজাদার ছিল না, তবুও তাঁর ভালোবাসা ও স্নেহ-র ওপর আমার খুব নির্ভরতা ছিল, কারণ তিনি বাবার চাইতে অনেক বেশি সময় আমাদের দিতেন, আর বাবা সুযোগ পেলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতেন। আমার জীবনের রূঢ়তম পাঠ যেটা আমি শিখেছিলাম সেটা এই যে মা'র স্নেহ ভালোবাসা পাবার জন্যে দাদার সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা।

মনে হয়, আমাদের ওপর বাবার কর্তৃত্ব খুব কম ছিল বলেই, আমার সঙ্গে দাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতটা গুরুত্ব পেয়েছিল। দাদা ছিল মা-র ভালোবাসা পাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা যদিও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, আমার দাদার সঙ্গে লড়াইটাকে আমরা একটা খেলার রূপ দিয়েছিলাম আর এই খেলায় আমরা দুজনই নিজেদের অন্য লোক বলে ভান করতাম। এটা ওরহান আর সেভ্‌কেট-এর মধ্যে লড়াই নয়, আমার প্রিয় নায়ক বা ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে দাদার প্রিয় নায়ক বা খেলোয়াড়ের। মনে করতাম যে, আমরা নিজেরাই সেই নায়ক হয়ে গেছি আর তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে খেলতাম, ফলে খেলা শেষ হত রক্ত আর চোখের জলের মধ্যে দিয়ে আর ক্রোধ ও ঈর্ষা আমাদের ভুলিয়ে দিত যে, আমরা দুই ভাই।

যখনই আমার মেজাজ খিঁচড়ে যেত, যখনই আমার মন খারাপ হত, কিংবা একঘেয়ে লাগত, আমি কাউকে কিছু না বলে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে নিচের তলায় গিয়ে আমার চাচীজী-র ছেলের সঙ্গে নিচেই খেলতাম, অথবা বেশির ভাগ সময়ই ওপরে দাদীমার ঘরে চলে যেতাম। যদিও সব অ্যাপার্টমেন্টগুলোই দেখতে এক রকম, চেয়ার, খাবার বাসনের সেট, চিনির বাটি ও ছাইদানি ইত্যাদি সব একই দোকান থেকে কেনা হত, তবুও প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টই আমার কাছে আলাদা দেশ, আলাদা বিশ্ব বলে মনে হত। আর দাদীমার বসার ঘরের জমাটবাঁধা জিনিসপত্রে ঠাসা বিষণ্ণতার মধ্যে, কফি টেবিল, কাচের আলমারি, ফুলদানি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রেমবাঁধানো ফটোগ্রাফগুলোর ছায়ায় বসে আমি স্বপ্ন দেখতাম যে, আমি অন্য কোনো জায়গায় আছি।

সন্ধেবেলায় যখন আমরা সবাই এই ঘরে একটা পরিবার হিসেবে জমায়েত হতাম, তখন প্রায়ই আমি একটা খেলা খেলতাম, যাতে দাদীমার এই অ্যাপার্টমেন্টটা একটা বড় জাহাজের ক্যাপ্টেনের স্টেশন হয়ে যেত। বসফোরাস প্রণালীতে যে জাহাজগুলো যাতায়াত করত, সেটা থেকেই আমার এই কল্পরাজ্যের উৎপত্তি; আমি যখন বিছানায় শুয়ে থাকতাম, ওই জাহাজগুলোর বিষণ্ন ভোঁ আমার স্বপ্নের মধ্যে পথ করে নিত। যখন আমি আমার কাল্পনিক জাহাজটাকে ঝড়ের মধ্যে চালাতাম, আমার নাবিকেরা আর জাহাজের যাত্রীরা বড় বড় উঁচু উঁচু ঢেউয়ের দোলায় কষ্ট পেত, তখন আমি একজন ক্যাপ্টেনের মতোই গর্ব করতাম যে, আমাদের জাহাজ, আমাদের পরিবার আর আমাদের ভাগ্য আমারই হাতে।

যদিও আমার দাদার অ্যাডভেঞ্চারের কমিক বইগুলোই হয়তো আমার স্বপ্নের প্রেরণা ছিল, তবুও ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধারণাও হয়তো তাই ছিল। আমি ভাবতাম, এই শহরের ভাগ্যের সঙ্গে ঈশ্বর আমাদের বাঁধবেন না, কারণ আমরা ছিলাম ধনী। কিন্তু যখন আমার বাবা এবং চাচাজী একটার পর একটা ব্যবসায় হোঁচট খেয়ে দেউলে হয়ে যেতে লাগলেন, যখন আমাদের সম্পদ কমে আসতে লাগল, আমাদের পরিবার ভাঙতে লাগল আর টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল, তখন আমার দাদীমার অ্যাপার্টমেন্টে যখনই যেতাম, তখনই কেবল দুঃখ পেতাম আর একটু একটু করে বুঝতে শিখতাম; এটা অনেক সময় ধরে আসছিল, ঘুরপথে আসছিল, কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের যে বিপদ ও ক্ষতির মেঘ, তা সারা ইস্তাম্বুলের ওপর ছড়িয়ে পড়ছিল এবং শেষমেষ আমাদের পরিবারকেও গ্রাস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩.
আমি

যখন আমার চার বছর বয়েস, আর আমার দাদার ছয় বছর বয়েস, তখন দাদা স্কুলে যেতে আরম্ভ করল আর পরবর্তী দু'বছরে, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে তীব্র টানাপোড়েনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা ফিকে হয়ে যেতে আরম্ভ করল। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর ওর, আমার চেয়ে বেশি শক্তির অত্যাচার থেকে আমি মুক্ত হলাম; আর এখন যেহেতু সারাটি দিন আমি পামুক অ্যাপার্টমেন্ট ও আমার মা-র অবিভক্ত মনোযোগ পাচ্ছিলাম, আমি নির্জনতার আনন্দ আবিষ্কার করে সুখী হয়ে উঠছিলাম।

আমার দাদা যখন স্কুলে থাকত, আমি সেই সময়টা ওর অ্যাডভেঞ্চার কমিকের বইগুলো নিয়ে ও আমাকে যা পড়ে শুনিয়েছিল, সেইগুলো মনে করে করে বইগুলো নিজের মনেই 'পড়তাম'। এক উষ্ণ মনোরম বিকেলে আমাকে ঘুমোনোর জন্য বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঘুম আসছিল না, আর তাই আমি 'টম মিক্স' পত্রিকাটা দেখছিলাম আর তখনই অনুভব করলাম যে, মা যেটাকে আমার 'বিবি' বলেন, সেটা শক্ত হয়ে উঠেছে।আমি একটা অর্ধনগ্ন 'রেডস্কিন'-এর ছবি দেখছিলাম, যার কোমরে খুব সরু সরু সুতো পরানো ছিল আর ওর দুই কুঁচকির মাঝখানে একটা সাদা কাপড়ের টুকরো পতাকার মতো ঝোলানো ছিল আর ওটার মাঝখানটায় একটা বৃত্ত আঁকা ছিল।

আরেকদিন বিকেলে আমি যখন পাজামা পরে বিছানায় চাদরের তলায় শুয়ে কয়েকদিন আগে পাওয়া একটা খেলনা ভালুকের সঙ্গে কথা বলছিলাম, আবার সেই রকম শক্ত হয়ে ওঠা টের পেলাম। মজার কথা, এই অদ্ভুত, জাদুবিদ্যার মতো ব্যাপারটা– যদিও বেশ আনন্দদায়ক, তবু আমি এটা লুকিয়ে রাখতে চাইছিলাম– ঘটছিল, আমি ভালুকটাকে 'এবার আমি তোকে খাব' এই কথাটা বলার পরপরই। তবে ভালুকটা আমার খুব প্রিয় ছিল, তার জন্যে এটা ঘটছিল না; আমি যখনই ইচ্ছা করতাম, তখনই ওই হুমকিটা উচ্চারণ করলেই এই ব্যাপারটা করতে পারতাম। মনে হয়, মা আমাকে যে সব গল্প বলতেন, তার ভেতর থেকে এই কথাগুলো আমার ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল : 'এবার আমি তোকে খাব', যার অর্থ আমি করেছিলাম, শুধু খাওয়া নয়, সম্পূর্ণ মেরে ফেলা। যেমন আমি পরে আবিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলাম যে, পারস্যের ধ্রুপদী সাহিত্যে বর্ণিত 'দিভ্‌স'– সেই ভয়ানক লেজওয়ালা দৈত্যগুলো, যারা শয়তান এবং জিনদের পর্যায়ের এবং ক্ষুদ্র প্রাণী হিসাবে যাদের ছবি আঁকা হত– সেগুলো ইস্তাম্বুলের তুর্কী ভাষায় বলা গল্পগুলোর মধ্যে বিশালকায় দৈত্য হিসেবে বর্ণিত হত। তুর্কী মহাকাব্য 'দেদে কোরকুত'-এর একটা সংক্ষেপিত সংকলনের মলাটে আঁকা একটা বিশালাকৃতি দৈত্যের ছবি থেকেই আমার দৈত্যের সম্বন্ধে ধারণা হয়। রেডস্কিন-এর মতোই এই বিশেষ দৈত্যটিও অর্ধনগ্ন ছিল এবং ওকে দেখে আমার মনে হত যেন ও পৃথিবী শাসন করছে।

এই রকম সময়ে আমার চাচাজী একটা ছোট ফিল্ম প্রজেক্টর কিনেছিলেন এবং ছুটির দিনে স্থানীয় ফটোগ্রাফির দোকানে গিয়ে ছোট ছোট ফিল্ম ভাড়া করে আনতেন; চার্লি চ্যাপলিন, ওয়াল্ট ডিজনে, লরেল অ্যান্ড হার্ডি। দাদাজী-দাদীমার ছবি বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে সরিয়ে ফায়ারপ্লেসের ওপরের সেই সাদা দেওয়ালে তিনি ফিল্মগুলো দেখাতেন। চাচাজীর নিজস্ব ফিল্মগুলোর মধ্যে একটা ডিজনে ফিল্ম ছিল, যেটা তিনি মাত্র দু'বার দেখিয়েছিলেন– তার কারণ অবশ্য আমি। এই ফিল্মে ছিল একটা বন্য, ভারী চেহারার অল্প বুদ্ধি দৈত্য, যেটা একটা ঘরের মতো বড় ছিল; যখন ওর তাড়া খেয়ে মিকি মাউস কুয়োর তলায় চলে যেত, সেই দৈত্য তখন একটানে কুয়োটাকে মাটি থেকে তুলে ফেলত, আর কাপ থেকে জল খাওযার মতো, সেই কুয়োটা উঁচু করে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিত আর যখন ওই জলের সঙ্গে মিকি মাউস ওর মুখের মধ্যে পড়ত, আমি সর্বশক্তি দিয়ে জোরে জোরে কান্না শুরু করতাম। একটা ছবি ছিল, নাম ছিল, 'শয়তান তার একটা ছেলেকে খাচ্ছে,' সেখানে আঁকা ছিল, একটা দৈত্য দু'হাতে একটা মানুষকে ধরে কামড় দিচ্ছে, আর ওই ছবিটা আজ পর্যন্ত আমার মনে ভয়ের সঞ্চার করে।

একদিন বিকেলে, যখন আমি যথারীতি আমার ভালুকটাকে বকা-ঝকা করছি, আবার ওর প্রতি করুণাও হচ্ছে, তখন দরজা খুলে আমার বাবা ঢুকলেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলেন যে, আমার প্যান্ট নামানো আর আমার 'বিবি' শক্ত হয়ে আছে। উনি দরজাটা যেমন ভাবে খুলেছিলেন, তার চেয়েও নরম হাতে বন্ধ করে দিলেন এবং (আমার মনে হল) বেশ সম্মানের সঙ্গে। এর আগে পর্যন্ত, বাবা যখনই বাড়ি ঢুকতেন দুপুরের খাবার সময় এবং বিশ্রামের জন্য, ওঁর অভ্যাসই ছিল কাজে যাবার আগে আমাকে চুমু খাওয়া। আমার চিন্তা হল যে, আমি বোধহয় কিছু অন্যায় করেছি, বা আরো খারাপ যে, আমি পুলকানন্দ পাওয়ার জন্য এটা করেছি। তখনই এই পুলক বা আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটা বিষাক্ত হয়ে গেল।

আমার সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হল, আমার বাবা-মার একটা দীর্ঘ ঝগড়ার পরে যখন মা বাড়ি ছেলে চলে গেলেন আর একজন আয়া এল আমাদের দেখাশুনো করার জন্যে। সেই আয়া যখন আমাকে স্নান করাচ্ছিল, তখন বেশ শক্ত গলায় ও আমাকে 'কুকুরের মতো' বলে বকুনি দিল।

আমার শরীরের প্রতিক্রিয়াগুলো আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না; কেবল যখন আমি সাত বছর পরে ছেলেদের জুনিয়র স্কুলে ঢুকলাম, তখনই জানতে পারলাম যে, এটা কোনো অদ্বিতীয় ব্যাপার নয়।

দীর্ঘদিন ধরে যখন আমি ভাবতাম যে, আমিই একমাত্র ব্যক্তি যার এই কলুষিত রহস্যময় ক্ষমতাটা আছে, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, আমি এটা আমার অন্য জগতে, কল্পনার জগতে লুকিয়ে রাখব, যেখানে আমার আনন্দ পাওয়া আর আমার ভেতরের শয়তানি, দুটোই স্বাধীনভাবে থাকবে। যখন একেবারে একঘেয়েমির ক্লান্তি আসত, আমি ভান করতাম যে, আমি অন্য একজন ব্যক্তি আর অন্য কোনো জায়গায় আছি, তখনই কেবল আমি আমার ওই অন্য জগতে ঢুকে যেতাম।আমার আশপাশের সকলের কাছ থেকেই আমার এই অতি সহজে পালিয়ে যাওয়া অন্য জগতটাকে লুকিয়ে রাখতাম। আমার দাদীমার বসার ঘরে আমি কল্পনা করতাম যে, আমি একটা ডুবোজাহাজের মধ্যে আছি। আমি তখন সবে আমার প্রথম সিনেমা, জুলে ভের্ন-এর 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লীগস আন্ডার দ্য সী' দেখেছি– যখন সেই ধুলো-ভরা প্যালেস সিনেমা হলে বসে ছবিটা দেখছিলাম, যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাইয়েছিল, তা হচ্ছে ফিল্মের নৈশব্দ। ফিল্মের ক্যামেরার কাজের মধ্যে যে ক্ষিপ্ততা, বদ্ধ জায়গার আতঙ্ক, এসব ছিল, তার সাথে সাবমেরিনের ভেতরের ছায়া ছায়া সাদা কালো ছবিগুলো আমাকে যেন আমাদের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিত। ফিল্মের নিচের লেখাগুলো পড়ার পক্ষে আমি খুব ছোট ছিলাম, কিন্তু কল্পনা দিয়ে শূন্যস্থানগুলো ভরিয়ে নিতাম। (এমনকি, পরেও যখন আমি খুব ভালোভাবেই বই পড়তে পারতাম, যেটা প্রয়োজনীয় ছিল, তা হচ্ছে শুধু অর্থ বুঝতে পারা নয়, আর সাথে অর্থের পরিপূরক হিসেবে সঠিক কল্পনার মিশেল দেওয়া।)

'এই রকম ভাবে পা দুলিও না, আমার ঝিমুনি আসছে,' আমার দাদীমা বলতেন, যখন আমি আমার কোনো সযত্নে তৈরি করা দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি পা দোলানো বন্ধ করতাম ঠিকই, কিন্তু আমার দিবাস্বপ্নে একটা এরোপ্লেন দাদীমার ঠোঁটের সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে এঁকেবেঁকে উড়ত এবং খুব শিগগিরই আমি পৌঁছে যেতাম একটা জঙ্গলে, যেখানে অনেক খরগোস, সাপ, সিংহ এবং পাতা থাকত, যেগুলো আমি আগেই ঘরের কার্পেটের জ্যামিতিক ডিজাইনের মধ্যে থেকে চিনে নিতাম; আমার একটা কমিক বই থেকে একটা অভিযানের মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসতাম, একটা ঘোড়ায় চড়তাম, আগুন জ্বালাতাম আর কয়েকটা লোককে মেরে ফেলতাম। ঘরের শব্দগুলোর দিকে একটা চোখ-কান খোলা রাখতাম, লিফটের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতাম আর নিজের কল্পনাকে অর্ধনগ্ন রেডস্কিন-দের মধ্যে ফিরিয়ে আনার আগে, লক্ষ করতাম যে, কেয়ার টেকার ইসমাইল আমাদের তলায় গেল। আমার কল্পনার রাজ্যে আমি ভালোবাসতাম, বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে, জ্বলন্ত বাড়িগুলোতে বুলেট মেরে ঝাঁঝরা করে দিতে, নিজের হাতে খোঁড়া সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে। জানালার শার্শি আর ঝুলন্ত পর্দাগুলোর, যেগুলো থেকে সিগারেটের গন্ধ বেরোত, মাঝখানে মাছিগুলোকে আটকে ধরে আস্তে আস্তে ওগুলোকে টিপে টিপে মারতাম আর যখন মরা মাছিগুলো রেডিয়েটার-এর ওপরের ফুটো ফুটো বোর্ড-এর ওপর পড়ত, তখন ভাবতাম ওগুলো হচ্ছে সেই গুন্ডাগুলো, যারা শেষ পর্যন্ত তাদের অপরাধের শাস্তি পাচ্ছে। আমার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হওয়া পর্যন্ত আমার অভ্যেসই ছিল, যখনই ঘুম আর জাগরণের মাঝখানের মিষ্টি মেঘের মধ্যে ভেসে যেতাম, তখন কল্পনা করে আনন্দ পেতাম যে, আমি মানুষদের মেরে ফেলছি। আমি আমার নিকট আত্মীয়দের কাছে ক্ষমা চাই– কিছু আত্মীয়, আমার দাদার মতো, নিকটতম– তাছাড়া নানান রাজনীতিবিদ নেতারা, বিখ্যাত সাহিত্যিকরা, ব্যবসায়ীরা এবং বেশির ভাগ কাল্পনিক চরিত্ররা, এরাই ছিল আমার শিকার। আরেকটা অপরাধ প্রায়ই করতাম; কোনো বিড়ালকে খুব আদর করতাম, তারপরই কোনো হতাশার মুহূর্তে ওটাকে নিষ্ঠুরের মতো আঘাত করতাম, তারপর খুব হাসতাম, আবার তারপরই এত লজ্জা পেতাম যে, বিড়ালটাকে আগের চেয়েও বেশি আদর করতাম। পঁচিশ বছর পরে কোনো এক বিকেলে যখন আমি আমার মিলিটারির চাকরি করছি, তখন আমাদের পুরো কোম্পানি দুপুরের খাওয়ার পর তখনো ক্যান্টিনে বসে গল্পগুজব করছে, ধূমপান করছে আর আমি দেখছি; আমি, এই ৭৫০ জন প্রায় এক রকম দেখতে সৈনিকদের দেখছি আর কল্পনা করছি যে তাদের মাথাগুলো শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে, ভাবছি তাদের রক্তাক্ত খাদ্যনালীগুলো, সিগারেটের ধোঁয়ায় গুহার মতো ক্যান্টিনটা একটা মিষ্টি, স্বচ্ছ, নীল কুয়াশায় ঢেকে আছে, আর সেই সময় আমার এক সৈনিক বন্ধু বলে উঠল, 'তোমার পা দোলানো বন্ধ কর বাপু, দেখতে দেখতে বড় ক্লান্ত লাগছে আর যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।'

কেবল একজনই মাত্র আমার এই গোপন উদ্ভট কল্পনার জগৎ সম্বন্ধে জানতেন, তিনি আমার বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

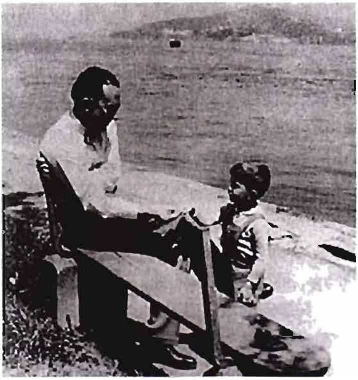

আমার ভালুকটার কথা ভাবতে থাকি, ওটার একটা চোখ আমি খুবলে বের করে নিয়েছিলাম একদিন রাগের চোটে। আর ভালুকটা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, কারণ ওটার ভেতরকার তুলোগুলো আমি ওর বুক থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বার করে ফেলেছি– অথবা আমি আমার আঙুলের মতো ছোট ফুটবল খেলোয়াড়টার কথা ভাবি, যেটার মাথায় একটা বোতাম টিপলেই ও লাথি মারতে থাকে– এটা আমার তিন নম্বর ফুটবল খেলোয়াড়। কারণ আগের দুটোকে আমি রাগের চোটে দু'টুকরো করে ভেঙে ফেলেছি; কিন্তু এখন এটাকেও আমি ভেঙে ফেলেছি এবং আমি ভাবতে থাকি যে, আমার এই আহত খেলনাটি তার লুকোনোর জায়গায় মরতে বসেছে। কিংবা আমাদের কাজের মেয়ে এসমা হানিম যে পাশের বাড়ির ছাদে ভামগুলো দেখেছে, তার কথা কল্পনা করে ভয় পেতে থাকি– ও যেভাবে ঈশ্বরের কথা বলে, সেই রকম কণ্ঠস্বরে ভয়ের কথা বলতে থাকে– এই রকম সময়েই হঠাৎ আমার বাবা বলে ওঠেন, 'তোমার মাথায় কী ঘুরছে বলো তো? যদি বল, তাহলে তোমায় পঁচিশ কুরু দেব।'

ঠিক করতে পারতাম না, বাবাকে সব সত্যি কথা বলব, না, খানিকটা বানিয়ে বানিয়ে বলব, কিংবা পুরোটাই মিথ্যে বলব, তাই চুপ করে থাকতাম; খানিকটা পরে বাবা একটু হেসে বলতেন, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে, আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা বলা উচিত ছিল।'

বাবাও কি অন্যজগতে সময় কাটিয়েছিলেন? অনেক বছর পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, যে অদ্ভুত খেলাটা আমি খেলতাম, তাকে বলা হয় 'দিবাস্বপ্ন' দেখা। কাজেই আমার বাবার প্রশ্ন করায় আমি ভয় পেতাম; কারণ গোলমেলে চিন্তাগুলো এড়িয়ে চলতে চাই বলে, বাবার প্রশ্নও এড়িয়ে যেতাম আর তারপর ভুলে যেতাম।

আমার এই দ্বিতীয় জগৎটাকে গোপন রাখবার ফলে আমার পক্ষে আসা-যাওয়াটা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন আমি দাদীমার উল্টোদিকে বসে থাকতাম, আর পর্দার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁক দিয়ে একচিলতে রোদ এসে পড়ত– ঠিক যেন রাত্তিরবেলা বসফোরাস-এর মধ্যে দিয়ে ভেসে যাওয়া জাহাজের সার্চলাইট– আমি যদি সোজা ওই রোদের আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে দেখতাম, তাহলে দেখতাম লাল রঙ এর জাহাজের শ্রেণী আমার সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তারপর আসল জগতে ফিরে এসেও যখন খুশি ইচ্ছা করলেই আমি ওই শ্রেণীবদ্ধ জাহাজগুলোকে চোখের সামনে আনতে পারতাম।

এই যে আমি অন্য বাড়িতে অন্য আর এক ওরহান-এর সঙ্গে জায়গা বদল করার স্বপ্ন দেখতাম, এই মিউজিয়ামের ঘরগুলো, অলিন্দ, কার্পেট (কার্পেটগুলোকে কি ঘেন্নাই না করতাম)-এর বাইরের অন্য একটা জীবন চাইতাম, এই যে সোজা মানুষগুলো, যারা অঙ্ক আর শব্দছক ভালোবাসে, তাদের সঙ্গ পছন্দ করতাম না; এই যে আমার মনে হত যে, এই বিষণ্ন, জিনিসপত্রে ঠাসা অগোছালো বাড়িটা পরিত্যাগ করেছে (যদিও আমাদের পরিবার পরে একথা অস্বীকার করে) সবরকম আধ্যাত্মিকতা, ভালোবাসা, শিল্প, সাহিত্য, এমনকি পৌরাণিক কাহিনীগুলো পর্যন্ত, আর আমাকে চতুর্দিক থেকে চেপে ধরেছে; এই যে আমার মনে হত যে, দ্বিতীয় জগতে আমি একজন আশ্রয় প্রার্থী মাত্র, তার মানে এই নয় যে আমি অসুখী ছিলাম। সেটা তো দূরের কথা, বরং আমার চার থেকে ছ বছর বয়েসের মধ্যের বছরগুলোতে, একটা উজ্জ্বল, ভদ্র কেতাদুরস্ত শিশু হিসেবে যাদের সঙ্গেই দেখা হত, তাদের ভালোবাসা, এন্তার চুমু খেতাম, কোল থেকে কোলে ঘুরতাম আর কোনো ভাল ছেলেই আপত্তি করতে পারবে না, এ রকম উপহার পেতাম, যেমন আপেল ('না ধুয়ে খেও না', মা বলতেন), কফির দোকানের লোকটার দেওয়া লজেন্স ('দুপুরের খাওয়ার পর ওগুলো খেও'), রাস্তায় দেখা হলে চাচীজির দেওয়া মিষ্টি ('বল, ধন্যবাদ') ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার যদি অভিযোগ করার মতো কিছু থাকত, তা হল আমি দেওয়ালের ভেতর দিয়ে কেন দেখতে পেতাম না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে পাশের বাড়ির কিছুই দেখতে পেতাম না, নিচের রাস্তার কিছুই দেখতে পেতাম না, কেবল এক ফালি সরু আকাশ দেখতে পেতাম। আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে বাজে গন্ধের কশাই-এর দোকানে (আমার গন্ধের কথা মনে থাকত না, কিন্তু ওই ঠান্ডা রাস্তাটায় পা দেবার মুহূর্তেই মনে পড়ত) আমার বিরক্তি হত কারণ আমি উচ্চতায় এত ছোট ছিলাম যে, কশাই যখন একটা ছুরি তুলে নিয়ে (এক একটা ছুরি আমার পায়ের সমান বড়) কাঠের গুঁড়ির ওপর মাংস কাটত, তা দেখতে পেতাম না; রাগ হত, কারণ কাউন্টারের ওপরটা, টেবিলের ওপরটা, অথবা আইসক্রিম রাখা ফ্রিজের ভেতরটা দেখতে পেতাম না। যখন রাস্তায় কোনো ছোটখাটো পথ-দুর্ঘটনা ঘটত, আর পুলিশের লোকেরা ঘোড়ায় চড়ে আসত, একটা বড় লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ত আর আমি কি হচ্ছে না হচ্ছে, পুরোটা দেখতে পেতাম না। আমার বাবা যখন আমায় ফুটবল ম্যাচ দেখতে নিয়ে যেতেন, খুব ছোটবেলা থেকেই আমায় অবশ্য নিয়ে যেতেন, তখন আমাদের টিমের কোনো বিপদের মুহূর্তে আমার সামনে বসা লোকেরা সব দাঁড়িয়ে যেত, আর আমি গোল করার দৃশ্যগুলো দেখতে পেতাম না। তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমার নজর অবশ্য কখনোই বলের ওপর থাকত না, আমার নজর থাকত চিজ ব্রেড, চিজ টোস্ট আর রাঙতা মোড়া চকোলেটগুলোর ওপরে, যেগুলো বাবা আমার আর দাদার জন্যে নিয়ে আসতেন। সবচেয়ে খারাপ ছিল, স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার সময়টা, যখন বেরোবার দরজার দিকে ঠেলাঠেলি করা মানুষগুলোর পাগুলোর ভেতরে, কুঁচকানো ফুলপ্যান্ট আর কাদামাখা জুতোর কালো বাতাসহীন জঙ্গলের ভেতরে আমি বন্দী হয়ে যেতাম। আমার মায়ের মতো সুন্দরী মহিলারা ছাড়া, আমি ইস্তাম্বুলে আর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে পছন্দ করতাম না, তাদের প্রধানত মনে হত, দেখতে বিশ্রী, সারা গায়ে লোম আর স্থূল প্রকৃতির। তারা ছিল অত্যন্ত জবুথুবু, অত্যন্ত ভারী এবং বেশি বাস্তব বোধসম্পন্ন। হতে পারে, তারাও কোনো এক সময়ে একটা গোপন দ্বিতীয় জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানত, কিন্তু মনে হয়েছিল ওরা আশ্চর্য আনন্দ পাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং কেমন করে স্বপ্ন দেখতে হয়, তাও ভুলে গিয়েছে আর ওদের এই যে অক্ষমতা, আমি ভাবতাম এটার সঙ্গে ওদের হাতের আঙুলের গাঁটে গাঁটে, ঘাড়ে, নাকের মধ্যে এবং কানের মধ্যে আপত্তিকর চুল গজানোর যোগাযোগ আছে। আর তাই আমি যখন তাদের স্নেহের হাসি আর তার চেয়েও বেশি, তাদের উপহারগুলো উপভোগ করতাম, তখন তাদের অনবরত চুমু খাওয়ার সময় তাদের খসখসে শক্ত দাড়ি এবং জুলফির ঘষা, তাদের গায়ে মাখা সুগন্ধীর গন্ধ আর তাদের ধূমপায়ীর নিঃশ্বাসের গন্ধ, সহ্য করতে হত। আমি ভাবতাম পুরুষ জাতটা হচ্ছে একটা নিচুশ্রেণীর এবং কদর্য জাত এবং তাই এই ভেবে ভালো লাগত যে, এদের বেশির ভাগই নিরাপদে বাইরে রাস্তায় থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

পাশার প্রাসাদগুলির ধ্বংস : একটি দুঃখজনক পথ-পরিক্রমা

নিশান্তাসিতে এক সময়ে যেটা পাশার প্রাসাদের বাগান ছিল, সেই বিরাট জমিটার এক প্রান্তে পামুক অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল। এই 'নিশান্তাসি' (পাথরের লক্ষ্যবস্তু) নামটা এসেছে সংস্কারপন্থী, পাশ্চাত্যপন্থী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ আর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সুলতানদের (সেলিম ৩ এবং মাহ্‌মুত ২) সময় থেকে, যারা শহরের ওপরের দিকে খালি পাহাড়ের নানান জায়গায় বন্দুকবাজী আর তীরন্দাজী অভ্যাস করত এবং পাথরের টুকরো বসিয়ে রাখত। পাথরের টুকরোগুলো নির্দেশ করত সেই সব জায়গা, যেখানে কোনো তীর পড়েছিল, অথবা যেখানে একটা খালি মাটির কলসী বন্দুকের গুলিতে ভাঙা হয়েছিল। পাথরের ফলকগুলিতে সাধারণত ঘটনাটা কী হয়েছিল, তা বর্ণনা করে দুচার লাইন লেখা থাকত। যখন অটোমান সুলতানেরা যক্ষ্মা রোগের ভয়ে এবং পাশ্চাত্য আরামদায়ক জীবনের লোভে এবং অবশ্যই জায়গা বদলের জন্যে টোপকাপি প্রাসাদ পরিত্যাগ করে ডোলমাব্যাক ও ইলডিজ-এ নতুন প্রাসাদে গেলেন, তখন তাদের উজির ও রাজকুমারেরা নিজেদের জন্য কাছাকাছি নিশান্তাশির পাহাড়ে কাঠের প্রাসাদ বানাতে শুরু করলেন। আমার প্রথম স্কুলগুলো ছিল যুবরাজ ইউসুফ ইজেদিন পাশার প্রাসাদে এবং প্রধান উজির হালিল রিফত পাশার প্রাসাদে। আমি যখন ওই স্কুলগুলোতে পড়তাম, তখনই দুটি স্কুলই পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, যখন আমি স্কুলের বাগানে ফুটবল খেলছি। আমাদের বাড়ির রাস্তার উল্টোদিকে উৎসব-সচিব ফাইক বে-র প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর আরেকটি অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি তৈরি হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, আমাদের মহল্লায় কেবল একটি মাত্র পাথরের প্রাসাদ এখনো দাঁড়িয়ে, ওটা প্রধান উজিরদের পূর্বতন আবাস ছিল, যেটা অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং রাজধানী আঙ্কারায় স্থানান্তরিত হবার পর পৌরসভার হাতে চলে আসে। আমার মনে আছে, আমি জলবসন্তের টীকা নেবার জন্য আরেকটা পাশাদের পুরোনো প্রাসাদে যেতাম, যেটা এখন জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যালয় হয়েছে। বাকিগুলো, যে প্রাসাদগুলোতে অটোমান কার্যাধ্যক্ষরা এক সময় বিদেশি রাজদূত বা প্রতিনিধিদের আপ্যায়ন করতেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর সুলতান আব্দুল হামিত ২-এর মেয়েদের প্রাসাদগুলো– আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে আছে এগুলো ছিল ভাঙাচোরা ইটের খাঁচা, জানালার জায়গায় বড় বড় হাঁ আর ভাঙাচোরা সিঁড়ি, আগাছা আর বুনো ডুমুরের গাছ গজিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে; এসব মনে হলে একটা ছোট্ট শিশু হয়েও যে গভীর দুঃখ আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখত, সেটা এখনো অনুভব করি। পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে এগুলোর বেশির ভাগই পুড়িয়ে বা ভেঙে ফেলে, অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি তৈরি করা হয়।

টেসভিকিয়ে অ্যাভিনিউ-এ আমাদের বাড়ির পেছন দিককার জানালা দিয়ে, সাইপ্রেস আর বাতাবি লেবুর গাছগুলোর পেছনে, টিউনিসিয় হেরেট্টিন পাশা, ককেশাস-এর একজন সির্কাশিয়ান, যিনি রাশিয়ান-অটোমান যুদ্ধের সময় (১৮৭৭-৭৮) কিছুদিনের জন্য প্রধান উজির হিসেবে কাজ করেছিলেন, তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত। তাঁকে তাঁর বালক বয়েসে (১৮৩০ সালে– ফ্লবার্ট যখন লিখেছিলেন যে, তিনি 'ইস্তাম্বুলে বসবাস করতে চান এবং একটি ক্রীতদাস কিনতে চান') ইস্তাম্বুলে আনা হয় এবং ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হয়; শেষ পর্যন্ত তিনি টিউনিস-এর রাজ্যপাল-এর বাড়িতে পৌঁছান, যেখানে তাকে মানুষ করা হয়; আরবি ভাষায় কথা বলা শেখানো হয়, তারপর তাকে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়; যেখানে তিনি তার যৌবনের অনেকটা সময় কাটান। যখন তিনি টিউনিসিয়ায় ফিরে এসে সৈন্যদলে যোগদান করেন, তখন তিনি খুব অল্প সময়েই পদোন্নতি করতে থাকেন, সৈন্যদলের কমান্ড হেডকোয়ার্টার্সে উচ্চ পদে কাজ করেন, রাজ্যপালের দপ্তরে, কূটনীতিবিদদের বাহিনীতে এবং অর্থমন্ত্রকেও কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অবসর গ্রহণ করে প্যারিসে এসে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই, যখন তার বয়স ষাট হতে চলেছে, তখন আব্দুল হামিত ২ (আরেকজন টিউনিসিয় শেখ জাফরির পরামর্শে) তাকে ইস্তাম্বুলে ডেকে পাঠান। অল্প সময়ের জন্য তাকে অর্থমন্ত্রকের পরামর্শদাতা হিসেবে রাখা হয়, তারপর তাকে প্রধান উজির করা হয়। এইভাবে পাশা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ সারিতে একজন প্রথম হিসাবে কাজ শুরু করেন। তুরস্ক দেশটাকে ঋণ-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার জন্য তাকে আদেশ দেওয়া হয়। তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুসরণে জাতীয় সংস্কার নীতি নির্ধারণে শুধু স্বপ্নই দেখেননি (অন্যান্য গরিব দেশগুলোতে তার মতো মন্ত্রীরা যা করতেন), তার বাইরে সত্যিকারের কাজ করেছিলেন। দেশের লোক তার পরবর্তী অন্যান্য অনুগামীদের মতো, এই পাশার কাছ থেকেও অনেক কিছু আশা করেছিল, কারণ তিনি একজন অটোমান বা তুর্কীর চাইতে অনেক বেশি পাশ্চাত্ত্য মনোভাবাপন্ন ছিলেন। আর ঠিক এই কারণেই– যে তিনি একজন তুর্কী নন– তিনি গভীর লজ্জা অনুভব করতেন। একটা গল্প চালু ছিল যে, টিউনিশিয় হেরেট্টিন পাশা রাজ প্রাসাদে তুর্কী ভাষার সভা সাঙ্গ করে যখন তার ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে নিজের বাড়ি ফিরতেন, তখন তিনি সভার আলোচিত বিষয়গুলো আরবি ভাষায় টুকে রাখতেন। পরে তিনি তার সচিবকে সেগুলো লেখার জন্য ফরাসি ভাষায় নির্দেশ দিতেন। তুলির শেষ টান হল এক গুপ্তচরের গুজবের ওপর নির্ভর করা একটি বিবরণী যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশার তুর্কী ভাষায় দখল ছিল খুব দুর্বল এবং একটি আরবি ভাষা বলা দেশ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার গোপন উদ্দেশ্য। এই গুজবগুলো অধিকাংশই ভিত্তিহীন এটা জেনেও চিরকালের সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আব্দুল হামিত এই অভিযোগগুলোকে কিছু বিশ্বাসযোগ্যতা দান করে পাশাকে উজিরের পদ থেকে সরিয়ে দেন। একজন অপসারিত প্রধান উজির ফ্রান্সে গিয়ে আশ্রয় নেবেন, এটা দৃষ্টিকটু হত বলে পাশাকে বাধ্য হয়ে তার শেষ জীবন ইস্তাম্বুলেই কাটাতে হয়েছিল; গ্রীষ্মকালে তিনি 'কুরু শেষমে'তে তার বসফোরাস ভিলাতে থাকতেন আর শীতকাল কাটাতেন অর্ধবন্দী হয়ে সেই প্রাসাদে যার বাগানে আমরা পরে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করেছিলাম। যখন তিনি আব্দুলহামিতের জন্য রিপোর্ট লিখতেন না, তখন তিনি ফরাসী ভাষায় তার স্মৃতিকথা লিখতেন। এই স্মৃতিকথা (মাত্র আশি বছর বাদে এগুলো তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করা হয়) প্রমাণ করে যে, এর লেখকের রসবোধের চাইতে কর্তব্যবোধ ছিল অনেক বেশি; তিনি বইখানি তার ছেলেদের উৎসর্গ করেন, তাদের মধ্যে একটি ছেলে পরবর্তীকালে প্রধান উজির মাহমুত সেভকেট পাশাকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় আর সেই সময়কালে আব্দুল হামিত তার মেয়ে সাদিয়ে সুলতানের জন্য প্রাসাদটি কিনে নেন।

পাশাদের এই সমস্ত প্রাসাদগুলো যখন পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ধুলিসাৎ করে দেওয়া হত, তখন আমাদের পরিবার পাথরের মতো শক্ত মুখ করে ঠান্ডা মাথায় এসব লক্ষ্য করত যেমন করত সেই সব গল্পগুলো শুনে– ছিটিয়াল খ্যাপা রাজকুমারদের গল্প, প্রাসাদের বিবি মহলের আফিম-আসক্ত, নেশাখোরদের গল্প, ছাদের ঘরে বাচ্চাদের তালা বন্ধ করে রাখার গল্প, সুলতানের বিশ্বাসঘাতক মেয়েদের গল্প এবং নির্বাসিত

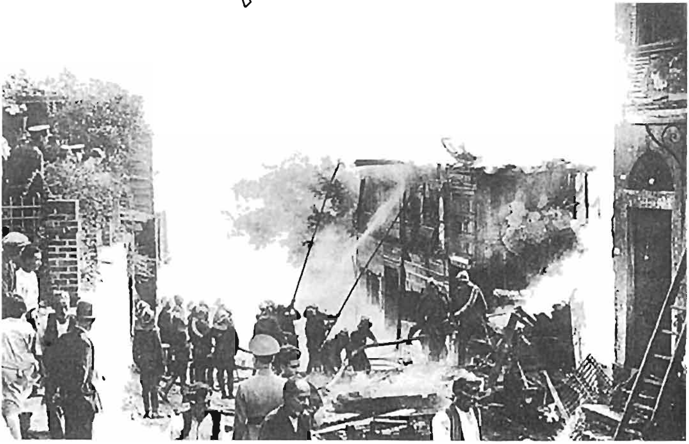

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা নিহত পাশাদের গল্প এবং সবশেষে সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন-এর গল্প। নিশান্তাসিতে আমরা যা দেখলাম, তা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র পাশাদের, রাজকুমারদের এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সরিয়ে দিল, সুতরাং, যে খালি প্রাসাদগুলি তারা পেছনে ফেলে গেল, সেগুলো শুধু ভাঙাচোরা দুঃস্বপ্নের মতো পড়ে রইল।

তবুও এই মৃতপ্রায় সংস্কৃতি আমাদের চতুর্দিকেই ছড়িয়ে ছিল। পাশ্চাত্যপন্থী এবং আধুনিক হওয়ার যতই ইচ্ছা থাক না কেন তার চাইতেও বেশি প্রয়াস ছিল এই ধ্বংসপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের সমস্ত তিক্ত স্মৃতি থেকে মুক্ত হবার; যেমন একজন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক তার হারানো প্রেমিকার পোশাকআশাক, তার প্রিয় জিনিসগুলো, তার ফটোগ্রাফ ইত্যাদি ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু যেহেতু পাশ্চাত্য কিংবা স্থানীয় কিছুই

ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করতে আসল না, তখন পাশ্চাত্যপন্থী হবার যে অদম্য প্রচেষ্টা, তা কেবল অতীতকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টাই হয়ে উঠল; সংস্কৃতির ওপর এর প্রভাব হল পিছিয়ে দেওয়া, খর্ব করা, আমাদের মতো প্রগতিশীল পরিবারেরা প্রজাতন্ত্রের প্রগতিতে খুশি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিজেদের বাড়িগুলোকে মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলেছিল। যেটা আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম একটি সর্বগ্রাসী বিষণ্ণতা ও রহস্য, সেটাকে ছোটবেলায় ভাবতাম একঘেয়েমির ক্লান্তি এবং মন খারাপ করা, একটা মারাত্মক একঘেয়েমি, যেটা আমি 'আলাতুর্কা' সঙ্গীতের সঙ্গে চিহ্নিত করেছিলাম, যে সঙ্গীতের সঙ্গে আমার দাদীমা তার চটি পরা পা দিয়ে তাল দিতেন; আমি আমার স্বপ্ন তৈরি করে এই অবস্থাটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল অন্য আরেকটা পালানোর উপায় ছির, মা-র সঙ্গে বাইরে বেরোনো। তখনো পর্যন্ত প্রতিদিন টাটকা বাতাসের জন্য বাচ্চাদের পার্কে বাগানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়নি, তাই যে দিনগুলোতে মা-র সঙ্গে বাইরে বেরোতাম, সেগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'কাল মা-র সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি', আমি চাচাজীর ছেলেকে গর্ব করে বলতাম, ও আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট ছিল। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আমরা দরজার মুখোমুখি ছোট জানালাটার কাছে এসে থামতাম, যেটা দিয়ে বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক (যখন ও তার নিচতলার অ্যাপার্টমেন্টে নেই) যারা আসত বা যেত, সকলকেই দেখতে পেত। আমি আমার পোশাকটা কাচের প্রতিফলনে দেখে নিতাম আর মা আমার সমস্ত বোতাম আটকানো আছে কিনা দেখে নিতেন; বাইরে এসেই আমি অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠতাম, 'রাস্তা!'

সূর্য, টাটকা বাতাস, আলো। আমাদের বাড়ি সময়ে সময়ে এত অন্ধকার থাকত যে, বাইরে বেরিয়ে আসাটা যেন কোনো গরমের দিনে হঠাৎ করে পর্দা সরানোর মতো লাগত– আলো যেন চোখে বিঁধত। মা-র হাত ধরে আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম, দোকানের জানালায় সাজানো জিনিসগুলোর দিকে; ফুলের দোকানের বাষ্পাবৃত জানালার মধ্যে দিয়ে সাইক্লামেন ফুলগুলোর দিকে যেগুলো দেখতে লাল নেকড়ের মতো, জুতোর দোকানের জানালার মধ্যে দিয়ে প্রায় দেখা যায় না এমন সরু তার দিয়ে শূন্যে ঝোলানো উঁচু হিলের জুতোগুলোর দিকে, ফুলের দোকানের মতোই বাষ্পাচ্ছন্ন লন্ড্রির ভেতরে, যেখানে বাবা তার সার্টগুলো মাড় দেওয়ার আর ইস্ত্রি করার জন্য পাঠাতেন। কিন্তু স্টেশনারী দোকানের জানালা থেকে, যেখানে আমি দাদার যে স্কুলের খাতা ছিল, সেই রকম খাতা দেখেছিলাম, আমি প্রথম একটা শিক্ষা পাই; আমাদের অভ্যাস এবং আমাদের গৃহস্থালী সামগ্রী মোটেই অদ্বিতীয় নয় এবং আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে আরো অনেক লোক আছে, যারা আমাদের মতো একই রকম জীবন নির্বাহ করে। আমার দাদার প্রাথমিক স্কুল, যেখানে আমিও এক বছর পরে যাব, টেসভিকিয়ে মসজিদের একদম পাশেই ছিল। এই মসজিদেই সকলে মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন করত। দাদা যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে উত্তেজিতভাবে 'আমার মাস্টার মশাই, আমার মাস্টার মশাই' বলত, তাতে আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম যে, যেমন প্রত্যেক বাচ্চারই একজন করে আয়া থাকে, তেমনি প্রত্যেক ছাত্রেরই একজন করে নিজস্ব মাস্টার মশাই থাকেন। কাজেই আমি যখন পরের বছর স্কুলে গিয়ে দেখলাম যে, বত্রিশ জন বাচ্চা একই ক্লাসঘরে একজন মাস্টার মশাই-এর কাছে গাদাগাদি করে আছে, আমি প্রচণ্ড হতাশ হয়ে ছিলাম– বাইরের জগতে আমার কোনো মূল্যই নেই এটা বোঝার পরেই আমার পক্ষে প্রতিদিন মা-র সঙ্গ ছাড়া এবং বাড়ির আরামের বাইরে থাকা খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। যখন আমার মা ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের স্থানীয় শাখায় ঢুকতেন, আমি কোনো কথা না বলে তার সঙ্গে ছ'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে ক্যাশিয়ারের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে অস্বীকার করতাম; ওই ধাপগুলো ছিল কাঠের আর প্রতিটি ধাপের মাঝে যে ফাঁক ছিল, আমার মনে ভয় ধরে গিয়েছিল যে, ওই ফাঁক দিয়ে আমি নিচে পড়ে যাব আর বরাবরের মতো হারিয়ে যাব। আমার মা নিচের দিকে তাকিয়ে আমায় বলতেন, 'ভেতরে আসছ না কেন?' আর আমি নিজেকে অন্য আরেকজন মনে করতাম। আমি কল্পনা করতাম, আমার মা হারিয়ে যাচ্ছে, কখনো আমি একটা

প্রাসাদে রয়েছি, কখনো বা একটা কুয়োর ধারে... যদি আমরা ওসমান বে অথবা রাস্তার কোণার মবিল স্টেশন পার হয়ে হারবিয়ে অবধি যেতাম, তাহলে ওই পাখনাওয়ালা ঘোড়াটা যে বিশাল বোর্ডে আঁকা আছে, যেটা একটা অ্যাপার্টমেন্টের পুরো একটা দেওয়াল ঢেকে রেখেছে, সেটা আমার স্বপ্নের মধ্যে এসে যেত।

একজন বুড়ি গ্রীক মহিলা ছিলেন যিনি মোজা রিপু করতেন আর বেল্ট ও বোতাম বিক্রি করতেন। তিনি আবার 'গ্রাম থেকে আনা ডিম'-ও বিক্রি করতেন, যেগুলো তিনি একটা পালিশ করা কাঠের বাক্স থেকে একটা করে বার করতেন, যেন মণিমুক্তো বার করছেন। ওঁর দোকানে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম ছিল, যার মধ্যে ঢেউয়ের মতো দোলায়মান লাল মাছগুলো ওদের ছোট ছোট কিন্তু ভয়াল মুখ হাঁ করে এপাশের কাঁচের দেওয়ালে লাগা আমার আঙুলগুলো কামড়ানোর চেষ্টা করত বোকার মতো নাচতে নাচতে আর আমার দারুণ মজা লাগত। তার পর ছিল একটা ছোট, তামাকের ও স্টেশনারী, খবরের কাগজের দোকান, যেটা চালাত, ইয়াকুব ও ভাসিল, দোকানটা এত ছোট আর ভিড়ে ঠাসা থাকত যে, বেশির ভাগ দিনই আমরা ঢোকার পরই হাল ছেড়ে দিতাম। একটা কফির দোকান ছিল, নাম ছিল 'আরব শপ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(যেমন ল্যাটিন আমেরিকায় আরবদের বলা হত'টার্কস', তেমনি অল্প কিছু ইস্তাম্বুলের কালো মানুষকে বলা হত 'আরব'); যখন এই দোকানের বিশাল বেল্ট লাগানো কফি গুঁড়ো করার মেশিনটা গর্জন করে চলতে শুরু করত, আমাদের বাড়ির কাপড় কাচা মেশিনের মতো, আর আমি ওটার কাছ থেকে দূরে সরে যেতাম, ওই 'আরব' আমার ভয় দেখে প্রশ্রয়ের হাসি হাসত।

যখন এই সব দোকান ফ্যাশন-বহির্ভূত হয়ে গেল আর একটার পর একটা বন্ধ হয়ে গেল এবং তাদের জায়গায় নতুন নতুন আধুনিক দোকানগুলো এল, তখন আমার দাদা আর আমি একটা খেলা খেলতাম, পুরোনো দিনের স্মৃতিতে নয়, আমাদের স্মরণশক্তি পরীক্ষা করার জন্য। খেলাটা এই রকম ছিল : আমাদের মধ্যে একজন বলবে, 'মেয়েদের সান্ধ্য স্কুলের পাশের দোকানটা' আর অন্যজন তখন ওই দোকানের পরবর্তী পরিবর্তনের ধাপগুলো বলবে, যেমন, ১. গ্রীক মেয়েদের পেস্ট্রির দোকান; ২. ফুলের দোকান; ৩. ব্যাগের দোকান; ৪. ঘড়ির দোকান; ৫. ফুটবল খেলার জুয়ার দোকান; ৬. গ্যালারি বই-এর দোকান; ৭. ওষুধের দোকান।

গুহার মতন একটা দোকান ছিল, যেখানে পঞ্চাশ বছর ধরে আলাদীন নামে একটা লোক সিগারেট, খেলনা, খবরের কাগজ এবং মনোহারী সামগ্রী বিক্রি করত; সেই দোকানে ঢুকবার আগে আমি ইচ্ছা করেই মাকে বলতাম আমাকে একটা হুইসেল বা কয়েকটা মার্বেল, একটা আঁকার বই বা একটা ইয়োইয়ো কিনে দাও। মা ওই রকম জিনিস কিনে ব্যাগে ভরে নিলে, আমি বাড়ি যাবার জন্যে অধৈর্য হয়ে পড়তাম। কিন্তু সেটা যে শুধু নতুন খেলনা পাবার আনন্দ থেকে, তা নয়।

'চল, পার্ক পর্যন্ত হেঁটে যাই,' মা বলতেন, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার পা থেকে বুক পর্যন্ত একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করতাম আর বুঝে যেতাম যে আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব নয়। অনেক বছর পরে যখন আমার মেয়েও এই বয়েসি ছিল আর আমি ওকে নিয়ে হাঁটতে যেতাম, ও-ও কিন্তু প্রায় একই রকম যন্ত্রণার অভিযোগ জানাত। যখন ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম, তিনি কিন্তু সাধারণ ক্লান্তি আর বেড়ে যাওয়া যন্ত্রণা রোগ হিসেবে নিরূপণ করলেন। আমারও যখন ওই রকম ক্লান্তি আসত, তখন খানিকক্ষণ আগেও যে রাস্তা আর দোকানগুলো আমাকে মুগ্ধ করে রাখত, সেগুলোই আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে যেত আর আমি সমস্ত শহরটাকে সাদা-কালোতে দেখতে শুরু করতাম।

'মা, আমাকে কোলে নাও।'

'মাকা পর্যন্ত হেঁটে চল,' আমার মা বলতেন, 'আমরা ট্রামে চড়ে বাড়ি যাব।'

১৯১৪ সাল থেকেই আমাদের রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলত। মাক্কা আর নিশান্তাসি থেকে ট্রাকসিম স্কোয়ার, সুড়ঙ্গ পথ, গালাতা ব্রিজ এবং অন্যান্য পুরোনো, দরিদ্র, ঐতিহাসিক মহল্লাগুলো পর্যন্ত, যেগুলোকে মনে হত অন্য কোনো দেশ। যখন সন্ধেবেলায় সকাল সকাল শুয়ে পড়তাম, তখন ট্রামের চলাচলের বিষণ্ণ সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। ট্রামগুলোর কাঠের তৈরি ভেতরটা, ড্রাইভারের জায়গা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাত্রীদের বসার জায়গার মাঝখানে বন্ধ দরজাটার ঘননীল কাচ, এগুলো আমার ভালো লাগত; নামবার সময় যদি লম্বা লাইন হত আর আমি লাইনের শেষের দিকে থাকতাম, তখন ট্রামের ড্রাইভার আমাকে ট্রাম চালানোর হাতলটা নিয়ে খেলতে দিত, সেটাও ভালোবাসতাম। বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি এমনকি গাছগুলো পর্যন্ত সাদা-কালো দেখতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.

কালো এবং সাদা

আমাদের বিবর্ণ মিউজিয়াম বাড়ির আধো অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম বলে, আমি বাড়ির অন্দর মহলে থাকতেই পছন্দ করতাম। নিচের রাস্তা, দূরের বড় রাস্তা, শহরের গরিব পাড়াগুলো, সাদা-কালো গুণ্ডাবাজি সিনেমার মতোই বিপজ্জনক মনে হত। আর এই ছায়ার জগতের প্রতি আকর্ষণের জন্যেই আমি সর্বদাই ইস্তাম্বুলের গ্রীষ্মকালের চাইতে শীতকালটা পছন্দ করতাম। যখন শরৎকাল শেষ হয়ে ধীরে ধীরে শীতকাল আসছে, সেই রকম ঋতুতে সন্ধের মুখে মুখে যখন পাতাঝরা গাছগুলো উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপত আর কালো কোট ও জ্যাকেট পরা লোকেরা অন্ধকার হয়ে আসা রাস্তা ধরে ঘরমুখো ছুটত, সে সব দেখতে আমি ভালোবাসতাম। যখন আমি পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর দেওয়ালের দিকে তাকাতাম, অবহেলিত, রঙচটা, মুখ থুবড়ে পড়া কাঠের প্রাসাদগুলোর অন্ধকার মূর্তিগুলো দেখতাম, তখন যে সর্বগ্রাসী বিষণ্নতা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রাস করত, সেটাও আমি ভালবাসতাম। কেবলমাত্র ইস্তাম্বুলেই আমি এই আলো ছায়ার বুনোট দেখেছি। কোনো শীতের সন্ধ্যায় যখন আমি অন্ধকার হয়ে আসা রাস্তায় সাদা-কালো মানুষের ভীড়কে ছুটে যেতে দেখি, আমি ওদের সঙ্গে একটা গভীর একাত্মতা বোধ করি, যেন এই রাত্রি আমাদের জীবন, আমাদের পথঘাট, আমাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদগুলোকে একটা অন্ধকারের কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, যেন যদি একবার আমরা আমাদের বাড়িতে, আমাদের শোয়ার ঘরে, আমাদের বিছানায় নিরাপদ হতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের অনেক কালের হারিয়ে যাওয়া ধনদৌলত, আমাদের ঐতিহাসিক অতীতের স্বপ্নে ফিরে যেতে পারি। তেমনি, যখন আমি দেখি গোধূলি ধীরে ধীরে একটা কবিতার মতো নেমে আসছে রাস্তার বাতির ফ্যাকাশে আলোয় আর ঢেকে দিচ্ছে শহরের গরিব পাড়াগুলোকে, তখন এটা জেনে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি যে, অন্তত এই রাত্রিটুকুর জন্যে আমরা পশ্চিম দেশের দৃষ্টির আড়ালে নিরাপদে থাকব; যে, আমাদের শহরের লজ্জাকর দারিদ্র্য বিদেশীদের চোখের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকবে।

আরা গুলের-এর তোলা একটা ফটোগ্রাফ আমার ছেলেবেলার সেই পেছন দিকের নির্জন রাস্তাগুলোকে নিখুঁত ভাবে ধরে রেখেছে, যেখানে কংক্রীটের অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলো কাঠের বাড়িগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর রাস্তার বাতিগুলো কিছুই আলোকিত করতে পারছে না এবং গোধূলির আলো-আঁধারি– যেটা আমার কাছে শহরটার সংজ্ঞা– নেমে এসেছে। (যদিও বর্তমানে কংক্রীটের বাড়িগুলোই ভীড় করে কাঠের বাড়িগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে, তবুও আমার অনুভব একই আছে।) এই ফটোগ্রাফটা আমাকে টানে, তার কারণ এই নয় যে, এতে আমার ছেলেবেলার পাথর-বসানো রাস্তা বা পাথর-বসানো ফুটপাথ আছে, বাড়ির জানালাগুলোয় লোহার গ্রিল

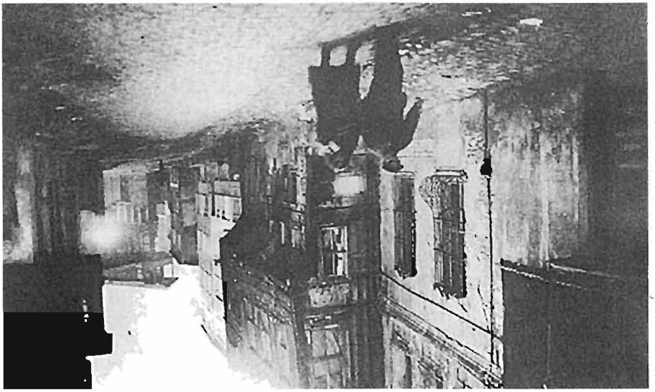

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগানো আছে, বা ভাঙাচোরা খালি কাঠের বাড়িগুলো রয়েছে– এর কারণ হল এই ফটোগ্রাফটায় একটা আভাস আছে, একটা ইঙ্গিত আছে যে, সবে সন্ধে নেমেছে, ওই দুজন লোক বাড়ি যাবার পথে তাদের দীর্ঘায়িত ছায়া দুটিকে টেনে নিয়ে চলেছে, এটা আসলে সমগ্র শহরের ওপর রাত্রির আবরণ টেনে ঢেকে দেওয়া।

১৯৫০-এর এবং ১৯৬০-এর দশকে অন্য সকলের মতো, আমিও সারা শহর জুড়ে 'ফিল্মের লোকদের' দেখতে ভালোবাসতাম– ফিল্ম কোম্পানির নাম লেখা মিনিবাসগুলো, দুটো বিরাট বিরাট জেনারেটরে চলা আলো; প্রমটাররা, যারা নিজেদের 'সৌফ্লিওর' বলে পরিচয় দেওয়া পছন্দ করত এবং যখন দারুণ মেক-আপ করা অভিনেত্রীরা ও রোমান্টিক পুরুষ অভিনেতারা নিজেদের সংলাপ ভুলে যেত, তখন জেনারেটরের গর্জন ছাপিয়ে ওরা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে সংলাপগুলো বলে দিত: অন্য কর্মচারীরা যারা সেট থেকে বাচ্চাদের আর কৌতূহলী দর্শকদের ঠেলেঠুলে বার করে দিত, সব দেখতে ভালোবাসতাম। চল্লিশ বছর পরে এখন আর তুরস্কের ফিল্ম ব্যবসা নেই (বেশিটাই, পরিচালক, অভিনেতা ও প্রযোজকদের অযোগ্যতার দরুণ, অবশ্য অন্য কারণ হল হলিউড-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠল না); এরা এখনো সেই পুরোনো সাদা-কালো ফিল্মগুলোই টেলিভিশনে দেখায় আর যখন আমি রাস্তাগুলোর, পুরোনো বাগানগুলোর, বসফোরাসের দৃশ্যগুলোর, ভেঙে পড়া প্রাসাদ ও অ্যাপার্টমেন্টগুলোর সাদা-কালো ছবি দেখি, তখন মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে, আমি একটা ফিল্ম দেখছি; বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে মনে হয় আমি আমার অতীতকেই দেখছি।

আমার পনেরো থেকে ষোলো বছর বয়েসের মধ্যে আমি যখন নিজেকে ইস্তাম্বুলের রাস্তাঘাটের একজন ইম্প্রেসনিস্ট চিত্রকর হিসেবে মনে করতাম, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তার পাথরগুলো একটার পর একটা আঁকতে খুব আনন্দ পেতাম। অত্যুৎসাহী জেলা কাউন্সিল এই রাস্তাগুলো নির্দয়ভাবে অ্যাসফল্ট দিয়ে ঢেকে দেবার আগে, শহরের ট্যাক্সি এবং ডোল্‌মাস (শেয়ার ট্যাক্সি)-এর ড্রাইভারেরা রাস্তার এই পাথরে তাদের গাড়িগুলোর যে ক্ষতি হত তাই নিয়ে তিক্ত অভিযোগ জানাত। ময়লা-নিকাশি ড্রেনের জন্য, বিদ্যুতের জন্য বা সাধারণ মেরামতির জন্য রাস্তাগুলো যে অবিরাম খোঁড়া হত, তা নিয়েও ওরা অভিযোগ জানাত। যখন রাস্তাগুলো খোঁড়া হত, তখন রাস্তার পাথরগুলো একটা একটা করে খুঁড়ে তুলত এবং তাতেই মনে হত যে, এই কাজ অনন্তকাল ধরে চলছে– বিশেষ করে, যদি খোঁড়ার সময়, নিচে কোনো বাইজানটাইন আমলের গলি বা পথ দেখতে পাওয়া যেত। মেরামতি শেষ হয়ে গেলে, কাজের লোকেরা যখন সম্মোহক ছন্দোময় দক্ষতায় পাথরগুলো একটার পর একটা বসাত, সেগুলো দেখতে আমার দারুণ ভালো লাগত।

আমার ছেলেবেলার কাঠের প্রাসাদগুলোর আর শহরের পেছন দিকের রাস্তার ছোট ছোট মনোরম কাঠের বাড়িগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা ছিল বিমোহক। দারিদ্র্য এবং অবহেলায় এইসব বাড়িগুলো কখনো রঙ করা হয়নি এবং দীর্ঘসময়, ময়লা ও জলীয় বাষ্প একযোগে এই বাড়িগুলোর কাঠকে কালচে করে তুলে একটা বিশেষ রঙ এনে দিয়েছে, একটা অনুপম রঙের বিন্যাস, যা আমি সেই ছোটবেলায় পেছনরাস্তার পাড়াগুলোর সব বাড়িতেই দেখেছি, তখন ভাবতাম এই কালো রঙটাই বুঝি আসল রঙ। কোনো কোনো বাড়িতে একটু বাদামি রঙের আভা ছিল, আর বোধহয় সবচেয়ে গরিব পাড়ার রাস্তায় যে বাড়িগুলো ছিল, সেগুলো রঙ কাকে বলে কখনোই তা জানত না। কিন্তু পশ্চিম দেশের পর্যটকরা অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বড়লোকদের প্রাসাদগুলোকে উজ্জ্বল রঙের বাড়ি বলে বর্ণনা করেছিলেন, আর এই সব বাড়িতে এবং অন্যান্য ধনাঢ্য গৃহগুলোতে শক্তিময় সৌন্দর্যের প্রাচুর্য দেখেছিলেন। বাচ্চা বয়েসে আমি কখনো কখনো এই সমস্ত বাড়িগুলোকে রঙ করার কথা ভাবতাম, কিন্তু

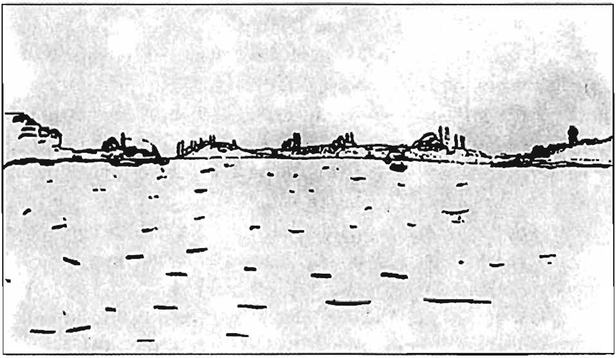

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

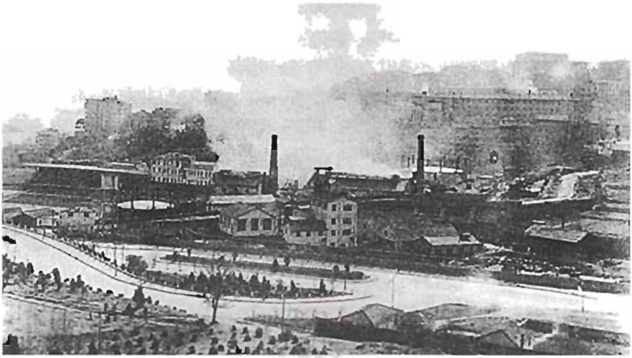

সেই সময়েও শহরের সাদা-কালো ওড়না আমাকে নিরুৎসাহ করত। গ্রীষ্মকালে যখন এইসব পুরোনো কাঠের বাড়িগুলো শুষ্ক হয়ে যেত, কালচে-বাদামি চকের মতো চকমকির বাক্স হয়ে যেত, তখন যে কোনো সময়ে আগুন ধরে যাবার কথা মনে হত; আর শীতকালের দীর্ঘ ঠান্ডার দিনগুলোতে, তুষার এবং বৃষ্টি এই একই বাড়িগুলোকে ছাতা ধরা পচা কাঠের মতো চেহারা দিত। দরবেশদের যে পুরোনো কাঠের আস্তানাগুলো ছিল, সেগুলোর অবস্থাও ছিল একই রকম, ওগুলো প্রজাতন্ত্র, উপাসনার জায়গা হিসেবে ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল; বর্তমানে ওগুলো সব পরিত্যক্ত, আর শুধু রাস্তার ছেলেগুলোর, ভূত ও প্রাচীন নিদর্শন খুঁজে বেড়ানোর লোকগুলোরই ওই বাড়িগুলোর উপর নজর ছিল। এই বাড়িগুলোকে দেখে আমার মনেও একই রকম ভয়, দুশ্চিন্তা ও কৌতূহল জাগরিত হত; যখন আমি ভিজে ভিজে গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে এই বাড়িগুলোর ভাঙা দেওয়াল ও ভাঙা জানালায় উঁকি মারতাম, আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা ঠান্ডা শিহরণ বয়ে যেত।

যেহেতু আমি এই শহরের আত্মাকে সর্বদাই সাদা-কালোতেই ভাবতাম, তাই লে কর্বুশিয়ের-এর মতো বোদ্ধা পাশ্চাত্য পর্যটকের আঁকা রেখাচিত্র এবং সাদা-কালো ছবিওয়ালা ইস্তাম্বুলের ওপর লেখা যে কোনো বই আমাকে বিমুগ্ধ করে রাখত। (আমার পুরো শিশুকালটা আমি কার্টুনিস্ট হার্জের ইস্তাম্বুলে টিনটিনের অভিযান নিয়ে লেখা কোনো কার্টুনের বই-এর জন্য বৃথাই প্রতীক্ষায় ছিলাম। যখন ইস্তাম্বুলে প্রথম টিনটিনের ওপর ফিল্ম তৈরি হল, একটা চোরা প্রকাশনা সংস্থা 'টিনটিন ইন ইস্তাম্বুল' নামে একটা সাদা-কালো কমিক বই প্রকাশ করেছিল, ওটা ছিল এক স্থানীয় ব্যঙ্গচিত্র শিল্পীর আঁকা, যিনি এই ফিল্ম এবং অন্যান্য টিনটিন অ্যাডভেঞ্চারের ফিল্মগুলো থেকে নেওয়া বিভিন্ন ফ্রেমের ছবিগুলোর সঙ্গে নিজস্ব উপলব্ধি মিশিয়ে ছবিগুলো এঁকেছিলেন।) পুরোনো খবরের কাগজগুলোও আমাকে মুগ্ধ করে রাখে; যখনই আমি কোনো খুনের, আত্মহত্যার বা ডাকাতির ঘটনা পড়ি, বহু দিনের চেপে-রাখা শিশুকালের ভীতির গন্ধ পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কিছু জায়গা আছে, টেপেবাসি, গালাতা, ফতি এবং জেইরেক, বসফোরাসের পারে পারে কিছু গ্রাম, উসকুদার-এর পেছনের রাস্তাগুলো– যেখানে, যে সাদা-কালোর আবছায়ার কথা আমি বলতে চাইছি, তা এখনো দেখতে পাওয়া যায়। কুয়াশাচ্ছন্ন, ধোঁয়াটে সকালবেলায়, বৃষ্টি-ঝরা, ঝোড়ো রাত্রিতে, মসজিদের গম্বুজের ওপর যেখানে সামুদ্রিক ঈগল তাদের বাসা বানিয়ে থাকে, সেখানে তুমি এটা দেখতে পাবে; তুমি এটা দেখতে পাবে, গাড়ির এগজস্ট পাইপের ধোঁয়ায়, স্টোভ পাইপের থেকে বেরোনো ঝুলপড়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ায়, জং-ধরা

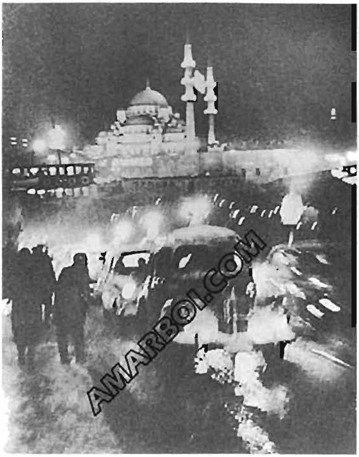

জঞ্জাল ফেলার টিনের বাক্সে, শীতের দিনে পরিচর্যা না করা, খালি ফেলে রাখা পার্কে ও বাগানে এবং শীতের সন্ধ্যায় কাদা, তুষার এর মধ্যে দিয়ে বাড়িমুখো মানুষের ছুটন্ত ভীড়ে; এগুলোই হচ্ছে সাদা-কালো ইস্তাম্বুলের দুঃখ-ভরা আনন্দ। ভেঙে পড়া ফয়ারাগুলো, যেগুলো শতাব্দীকাল হল কাজ করে না, গরিবদের মহল্লা এবং সেখানকার ভুলে যাওয়া মসজিদগুলো, কালো আঙরাখা আর সাদা কলার পরা স্কুলের বাচ্চাদের হঠাৎ ভিড়, পুরোনো জীর্ণ কর্দমাক্ত ট্রাকগুলো, দীর্ঘ সময়, ধুলো-ময়লা আর খদ্দেরের অভাবে কালচে হয়ে যাওয়া ছোট ছোট মুদি দোকানগুলো; হতাশ, কর্মহীন মানুষজনে ভর্তি পাড়ার ছোট ছোট সব জরাজীর্ণ দোকানগুলো, পাথর-বসানো রাস্তাগুলোর মতো শহরের ভাঙাচোরা দেওয়ালগুলো, সিনেমা হলে ঢোকার বিভিন্ন পথগুলো, যেগুলো কিছুক্ষণ পরে, একই রকম মনে হয়, পুডিং-এর দোকানগুলো, ফুটপাথের খবরের কাগজের ফেরিওয়ালারা, মাঝ রাতে রাস্তায় ঘোরা মাতালেরা, ফ্যাকাশে রাস্তার বাতিগুলো, বসফোরাস দিয়ে চলাচল করা ফেরী আর তাদের চিমনি দিয়ে বেরোনো ধোঁয়া, তুষার-ঢাকা শহর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বরফের কম্বল-ঢাকা শহর বাদ দিয়ে আমার ছেলেবেলার কথা মনে করা অসম্ভব। কিছু ছেলেমেয়ে তাদের গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না, আমি কিন্তু বরফ পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতাম না– তার মানে এই নয় যে, আমি বাইরে গিয়ে বরফের মধ্যে খেলব, বরঞ্চ এই কারণে যে, বরফ পড়লে শহরটাকে দেখতে নতুন মনে হত, শুধু কাদা, নোংরা, ধ্বংসস্তূপ এবং মানুষের অবহেলা ঢাকা পড়ে যেত বলে নয়, প্রতিটি রাস্তায় এবং প্রতিটি দৃশ্যে একটা অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার লুকিয়ে থাকত, একটা আসন্ন বিপদের মুখরোচক আগমন বার্তা। বছরে গড়পরতা তিনদিন থেকে পাঁচদিন বরফ পড়ত, আর জমাট বরফ এক সপ্তাহ থেকে দশদিন পর্যন্ত জমে থাকত, কিন্তু ইস্তাম্বুলে সর্বদাই এই ব্যাপারটা ছিল আকস্মিক, তুষারপাতকে এমনভাবে স্বাগত জানানো হত, যেন এই প্রথম তুষারপাত হচ্ছে; প্রথমে পেছনের রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যেত, তারপর প্রধান রাস্তাগুলো বন্ধ হত; পাঁউরুটির কারখানাগুলোর বাইরে লম্বা লাইন পড়ে যেত, যে রকম হত যুদ্ধের বা জাতীয় বিপর্যয়ের সময়। এই বরফ পড়ার ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম এর ক্ষমতা, যা লোকেদের আপন আপন স্বার্থ ভুলে এক হয়ে কাজ করার প্রেরণা জোগাত। বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা সকলে একত্র হয়ে থাকতাম। তুষারপাতের দিনগুলোতে, ইস্তাম্বুলকে মনে হত যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, কিন্তু আমাদের সকলের ভাগ্য একই, এই ভাবনা আমাদের সকলকে আমাদের মহান অতীতের কাছাকাছি নিয়ে আসত।

একবার প্রকৃতির উদ্ভট খেয়ালে মেরুপ্রদেশের তাপমান ব্ল্যাক সী-কে ডানিয়ুব থেকে বসফোরাস পর্যন্ত জমিয়ে দিয়েছিল। একটা ভূমধ্যসাগরীয় শহরের পক্ষে এটা একটা স্তম্ভিত হয়ে যাবার মতো ঘটনা এবং পরবর্তী অনেক বছর ধরে লোকেরা ছেলেমানুষী আনন্দে এই ঘটনার কথা বলত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরটাকে সাদা-কালোতে দেখা মানে ইতিহাসের বিবর্ণতার মধ্যে দিয়ে দেখা। যা পুরোনো হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে,বাকি পৃথিবীর কাছে মূল্যহীন, তার মৃদু আভা। এমনকি, শ্রেষ্ঠ অটোমান স্থাপত্যেরও একটা নম্র সারল্য ছিল, যা সাম্রাজ্যের মৃত্যুর বিষণ্নতার ইঙ্গিত দিত, ক্রমহ্রাসমান ইউরোপীয় দৃষ্টির কাছে একটা যন্ত্রণাদায়ক নতিস্বীকার এবং একটা প্রাচীন দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ যেটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতোই সহ্য করতে হয়; এটা হচ্ছে একটা হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থা যা ইস্তাম্বুলের অন্তর্সন্ধানী আত্মাকে প্রাণশক্তি জোগায়।

শহরটাকে সাদা-কালোতে দেখা, যে কুয়াশার মতো অস্পষ্টতা শহরকে ছেয়ে থাকত, সেটা দেখা এবং এই শহরের অধিবাসীরা যেটা নিজেদের ভাগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল, সেই বিষণ্নতায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, এর জন্য শুধু কোনো ধনী পাশ্চাত্য দেশ থেকে উড়ে এসে সোজা শহরের জনাকীর্ণ রাস্তাগুলোতে চলে আসাই যথেষ্ট। যদি ওটা শীতকাল হয়, গালাতা ব্রিজের ওপর প্রতিটি লোক একই রকম বিবর্ণ, ধূসর, ছায়া ছায়া পোশাক পরে থাকবে। আমার সময়ের ইস্তাম্বুলীয়রা উজ্জ্বল লাল, সবুজ এবং কমলা রঙ, যা তাদের গর্বিত পূর্বপুরুষেরা পরতেন, সেগুলো পরিত্যাগ করেছিল। বিদেশি অতিথিদের কাছে মনে হত যেন এটা কোনো আদর্শগত ব্যাপার প্রমাণ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হচ্ছে। হয়তো সেটা তারা করত না, কিন্তু তাদের গভীর বিষণ্নতার মধ্যে একটা দীনতার ইঙ্গিত ছিল। ওরা মনে হয় বলতে চাইত, একটা সাদা-কালো শহরে আমরা এই রকম পোশাকই পরি, গত একশ' পঞ্চাশ বছর ধরে ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু একটা শহরের জন্য আমরা এই ভাবেই শোক প্রকাশ করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এছাড়া ছিল, কুকুরের পাল, উনবিংশ শতাব্দীতে ইস্তাম্বুলে আসা প্রতিটি পাশ্চাত্য পর্যটক, লামার্টাইন এবং নার্ভাল থেকে মার্ক টোয়েন পর্যন্ত, যাদের উল্লেখ করেছিলেন, সেই কুকুরেরা শহরের রাস্তায় নাটক জমিয়ে দিত। ওগুলো সব দেখতে এক রকমের ছিল, ওদের গায়ের চামড়ার রঙ ছিল একই রকম, যে রঙের কোনো নাম দেওয়া যায় না– ছাইরঙা থেকে কাঠ কয়লার রঙের মাঝামাঝি কোনো রঙ, যেটা কোনো রঙই নয়। ওরাই ছিল শহরের কাউন্সিলের সর্বনাশের প্রতিভূ। যখন সেনাবাহিনী শাসন ক্ষমতা দখল করত, তখন কোনো জেনারেলের এই কুকুর বাহিনীর বিপদ সম্পর্কে ঘোষণা করতে বেশি সময় লাগত না। রাজ্য ব্যবস্থা এবং স্কুল-ব্যবস্থা রাস্তা থেকে কুকুর হঠানোর জন্য সংগঠিত ও ব্যাপক প্রচার কার্য ও অভিযান চালাত, কিন্তু তবুও তারা স্বাধীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। ওরা ছিল ভীতিপ্রদ, রাজ্যের বিরোধিতায় ছিল ওরা ঐক্যবদ্ধ, এইসব পাগল, দিশেহারা, নিজেদের পুরোনো জমি আঁকড়ে থাকা প্রাণীগুলোকে করুণা না করে উপায় ছিল না।

যদি আমরা আমাদের এই শহরকে সাদা-কালোতে দেখি, এর আংশিক কারণ হল, পাশ্চাত্য শিল্পীদের খোদাই শিল্প যেগুলো ওরা আমাদের দেশে রেখে গেছে, সেগুলো থেকে আমরা জানতে পারি; স্থানীয় শিল্পীরা অতীতের উজ্জ্বল রঙগুলিকে কখনোই আঁকেনি। এমন কোনো অটোমান শিল্পকার্য নেই, যা আমাদের চোখে দেখা উপলব্ধিকে সহজেই ধরে রাখতে পেরেছে। অথবা আজকের পৃথিবীতে একটাও এমন কোনো লেখা বা শিল্প কাজ নেই, যা আমাদের অটোমান শিল্প বা ধ্রুপদী পারস্যিক শিল্প যা উদ্বুদ্ধ করেছে, তাতে আনন্দ পাওয়ার শিক্ষা দিতে পারে।

কাজেই কোনো পত্রিকা বা স্কুলের বই-এ যদি কখনো পুরোনো ইস্তাম্বুলের ছবি দরকার হয়, তাহলে সেই পাশ্চাত্য পর্যটক এবং শিল্পীদের তৈরি খোদাই-শিল্পকাজই ব্যবহার করতে হয়। আমার সমসাময়িকেরা কিন্তু মেলিং-এর আঁকা সূক্ষ্ম জলরঙের রাজকীয় ইস্তাম্বুলের ছবিগুলো উপেক্ষা করেন: মেলিং-এর সম্বন্ধে পরে আরো বলব:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে এবং সুবিধা খুঁজে তারা নিজেদের অতীতকে সহজে আঁকা যায় এমন একবর্ণে দেখা পছন্দ করেন। কারণ যখন তাঁরা কোনো নি-রঙ ছবি দেখেন, তাঁরা তাঁদের বিষণ্ণতার সমর্থন পেয়ে যান।

আমার ছেলেবেলায় খুব কমই উঁচু বাড়ি ছিল। যখন শহরে রাত্রি নেমে আসত, তখন বাড়ি, গাছপালা, গ্রীষ্মকালীন সিনেমা হল, ঝুলন্ত বারান্দা এবং খোলা জানালাগুলোর তৃতীয় মাত্রা মুছে দিয়ে শহরের ভাঙাচোরা বাড়িগুলোকে, আঁকাবাঁকা রাস্তাঘাটকে এবং ঢেউ খেলানো পাহাড়গুলোকে রাত্রি একটা অন্ধকার মার্জিত সৌন্দর্য দান করত। টমাস অ্যালোম-এর ১৮৩৯ সালের একটা ভ্রমণের বই-এ একটা খোদাই চিত্র আছে, যেটাতে রাত্রির একটা প্রতীকি রূপ রয়েছে, সেটা আমার ভালো লাগে। অন্ধকারকে অমঙ্গলের উৎস হিসেবে এঁকে এই ছবিটা, কেউ কেউ যেটাকে ইস্তাম্বুলের 'চাঁদের আলোর সংস্কৃতি' বলে, সেটাকে ধরতে চেয়েছে। অন্যান্য অনেকের মতোই, যারা চন্দ্রালোকিত রাত্রির সাধারণ আচারগুলো উপভোগ করতে সমুদ্রের তীরে ভীড় করে, পূর্ণ চাঁদও যে শহরটাকে পুরোপুরি অন্ধকার হওয়া থেকে বাঁচায়, জলের ওপর জ্যোৎস্নার খেলা, অর্ধ চন্দ্রের দুর্বল আলো, অথবা (যেমন এখানে) মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের জ্যোৎস্নার ইঙ্গিত; খুনী যেন এইমাত্র আলো নিভিয়ে দিয়েছে, যাতে ওর অপরাধ সংঘটিত করাটা কেউ দেখতে না পায়।

কেবলমাত্র পাশ্চাত্য পর্যটকরাই রাত্রির ভাষা ব্যবহার করে শহরের দুর্ভেদ্য রহস্যগুলোর বর্ণনা করেননি; তারা যদি রাজপ্রাসাদের অন্দরের গোপন চক্রান্তগুলো সম্বন্ধে কিছু জেনে থাকেন, তার কারণ ইস্তাম্বুলীয়রা, প্রাসাদের হারেমের খুন হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া মেয়েদের লাশ অন্ধকারে প্রাসাদের বাইরে প্রচার করে গোল্ডেন হর্ন-এ নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে ছুড়ে ফেলে দেওয়া নিয়ে কানাকানি করতে ভালোবাসত।

AMARBOI.COM

বহু আলোচিত সালাকাক খুন (যেটা ১৯৫৮ সালে ঘটেছিল, আমি তখনো পড়তে শিখিনি, কিন্তু সেটা আমাদের পরিবারে শুধু নয় প্রত্যেকটি পরিবারে এমন নিদারুণ ভীতির সৃষ্টি করেছিল যে আমি পুরো ব্যাপারটাই জানতাম) একই ধরনের ছিল। এই ভয়ানক ঘটনাটি রাত্রিবেলা সম্পর্কে, নৌকা বাওয়া সম্পর্কে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসফোরাস-এর সমুদ্র সম্পর্কে আমার সাদা-কালো কল্পনাকে জোরদার করেছিল এবং আজ পর্যন্ত আমার রাত্রিকালীন দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার কারণ হয়ে আছে। আমার বাবা-মা'র বর্ণনা অনুযায়ী, দুর্বৃত্তটি ছিল একটি অল্পবয়েসি, গরিব মেছুড়ে, কিন্তু পরবর্তী কালে শহরের লোকেরা তাকে একটি লোককাহিনীর দানবে রূপান্তরিত করে। একটি মেয়েলোক ও তার শিশুদের সে নিজের দাঁড়টানা নৌকোয় তুলে বসফোরাসে পাড়ি দেয়, তারপর মেয়েটিকে ধর্ষণ করবার মানসে সে বাচ্চাগুলোকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেয়; খবরের কাগজগুলো তার নাম দেয় 'সালাকাক্ দৈত্য' এবং আমার মা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, ভাবতেন, আমাদের হেবেলিয়াডা-র গ্রীষ্মকালীন আবাসের কাছে যে মেছুড়েরা জাল ফেলত, তাদের মধ্যে হয়তো আর একজন এই রকম খুনে লুকিয়ে আছে। এবং তাই দাদাকে আর আমাকে বাইরে এমনকি আমাদের বাগানে পর্যন্ত খেলতে যেতে দিতেন না। রাত্তিরে দুঃস্বপ্নে আমি দেখতাম, মেছুড়ে বাচ্চাদের ঢেউয়ের ওপর ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে আর বাচ্চাগুলো বাঁচার জন্য কোনো রকমে আঙুলের নখ দিয়ে নৌকো ধরে থাকবার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে যাচ্ছে; আমি ওদের মায়ের আর্তচিৎকার শুনতে পেতাম, মেছুড়ের ভৌতিক ছায়া বাচ্চাগুলোর মাথায় দাঁড় দিয়ে আঘাত করছে, দেখতাম। এমনকি, আজও যখন আমি ইস্তাম্বুলের কাগজে খুনের খবর পড়ি (যেটা পড়ে আমি আনন্দ পাই) আমি এই দৃশ্যগুলো সাদা-কালোতে দেখতে পাই।

AMARBOI.COM

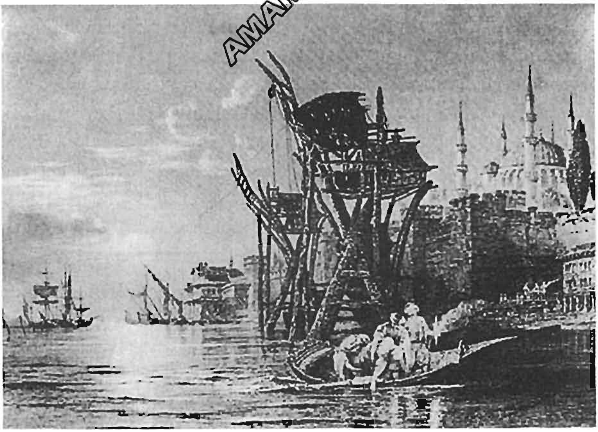

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬.

বসফোরাস আবিষ্কারের ভ্রমণ

সালাকাক খুনের পরে দাদা আর আমি আর কখনোই মার সঙ্গে নৌকা চড়ে বেড়াতে যাইনি। কিন্তু তার আগের বছরের শীতকালে, যখন দাদার আর আমার দুজনেরই হুপিং কাশি হয়েছিল, সেই সময় মা আমাদের প্রতিদিন বসফোরাসে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। প্রথমে আমার দাদা অসুস্থ হয়, তার দিন দশেক পরে আমি। অসুখ হলে কয়েকটা ব্যাপার খুব উপভোগ করতাম; মা আমাকে আরো বেশি আদর করতেন, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন আর আমার সব প্রিয় খেলনাগুলো এনে দিতেন। কিন্তু অসুখের চাইতেও আর একটা জিনিস-এর জন্য আমার বেশি কষ্ট হত, তা হল, পরিবারের সকলের এক সাথে খাওয়া-দাওয়া থেকে বাইরে থাকা, শুধু দূর থেকে ওদের ছুরি-কাঁটা-চামচের, ওদের হাসির আওয়াজ শোনা আর কথাবার্তা কী হচ্ছে, তা না শুনতে পাওয়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের জ্বরটা সেরে গেলে, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যালবার (ওঁর সব কিছুতেই আমরা ভয় পেতাম, ওঁর ব্যাগ থেকে ওঁর গোঁফ পর্যন্ত) মা-কে নির্দেশ দিলেন, দিনে একবার তাজা হাওয়ার জন্যে আমাদের বসফোরাসে নিয়ে যেতে। বসফোরাসের তুর্কী শব্দ যা, গলা-র তুর্কী শব্দও তাই। সেই শীতকালের পর থেকে আমি তাই সর্বদাই বসফোরাসকে তাজা হাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবতাম। তারাবিয়া নামে একটি বসফোরাস শহর এক সময় যেটা একটা ঘুমিয়ে-পড়া গ্রিক মাছ ধরার গ্রাম ছিল আর এখন দুধারে লাইন ধরে হোটেল ও রেস্তরাঁয় সাজানো একটা বিখ্যাত বেড়ানোর জায়গা, আজ থেকে একশ' বছরেরও আগে যখন কবি ক্যাবাফি শিশুকালে সেখানে বাস করতেন, তখন ওই জায়গার নাম ছিল থেরাপিয়া, এটা জানতে পেরে আমি সেই জন্য আশ্চর্য হইনি।

এই শহর যখন বলে পরাজয়ের কথা, ধ্বংসের কথা, বঞ্চনার কথা, বিষণ্ণতা এবং দারিদ্র্যের কথা, বসফোরাস তখন জীবনের, আনন্দের এবং সুখের গান গায়।

AMARBOI.COM

ইস্তাম্বুল তার শক্তি আহরণ করে বসফোরাসের কাছ থেকে। কিন্তু আগেকার দিনে, কেউ বসফোরাসকে বেশি প্রাধান্য দিত না। তারা বসফোরাসকে দেখত কেবল একটি জলপথ, একটি সৌন্দর্যপূর্ণ অংশ এবং গত দুশ' বছর ধরে, গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ বানানোর উপযোগী সুন্দর জায়গা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটা ছিল মালার মতো অসংখ্য গ্রিক মেছুড়েদের গ্রাম, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, যখন অটোমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস বানাতে শুরু করলেন, বেশির ভাগ গোকসু, কুচুকসু, বেবেক, কান্ডিল্লি, রুমেলিহিসারি এবং কানলিকা-র চারপাশে, তখন একটা অটোমান সংস্কৃতি গজিয়ে উঠল, যেটা বাকি পৃথিবীকে বাদ দিয়ে কেবল ইস্তাম্বুলের দিকে তাকিয়ে থাকত। আঠারো এবং উনিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতাব্দীতে মহা মহা অটোমান পরিবারের বানানো সমুদ্রের ধারের জমকালো প্রাসাদগুলো, যেগুলোকে 'ইয়ালি' বলা হত, ওগুলোকে বিংশ শতাব্দীতে, প্রজাতন্ত্র এবং তুর্কী জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে একটা অপ্রচলিত পরিচিতি ও স্থাপত্যের নমুনা হিসাবে দেখা হত। কিন্তু এই 'ইয়ালি'গুলো যেগুলো আমরা বর্তমানে দেখি 'মেমোরিজ অব দ্য বসফোরাস' বই-এর ফটোগ্রাফগুলোতে, মেলিং-এর খোদাই কাজে এবং সেদাত হাক্কি এলদেম-এর 'ইয়ালি'-তে, প্রতিচ্ছবির মতো– এই চমৎকার বাড়িগুলো তাদের উঁচু, সংকীর্ণ জানালা নিয়ে, তাদের প্রশস্ত কার্নিশ, ঘুলঘুলি এবং সঙ্কীর্ণ চিমনিগুলো নিয়ে এই নষ্ট হয়ে যাওয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত সংস্কৃতির ছায়া মাত্র।

১৯৫০-এর দশকে, বাস রাস্তা ছিল টাকসিম স্কোয়ার থেকে এমিরগান পর্যন্ত আর তখনো রাস্তাটা নিশান্তাসি হয়েই যেত। যখন আমরা মায়ের সাথে বাসে চড়ে বসফোরাস-এ যেতাম, আমরা আমাদের বাড়ির সামনে থেকেই বাসে উঠতাম। যদি

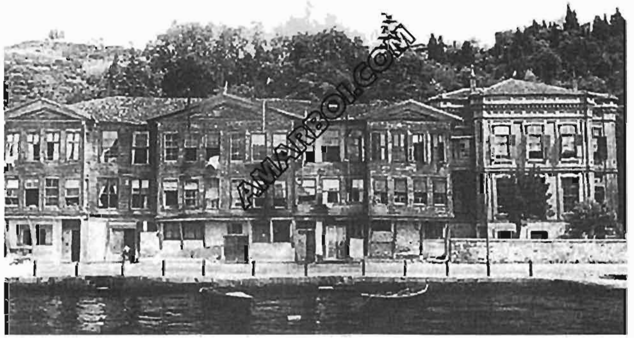

আমরা ট্রামে যেতাম, শেষ স্টপ ছিল বেবেক, আর তীর ধরে অনেকখানি হাঁটার পর আমরা নৌকোর মাঝির দেখা পেতাম, যে কিনা সর্বদাই আমাদের জন্য একই জায়গায় একই সময়ে অপেক্ষা করত এবং তারপর আমরা ওর নৌকোয় চাপতাম। দাঁড় টানা নৌকোগুলোর, বেড়ানোর নৌকোগুলোর এবং শহর মুখী ফেরি, শ্যাওলা ঢাকা বার্জগুলোর এবং লাইটহাউসগুলোর মাঝখান দিয়ে আমরা ভেসে যেতাম, বেবেক উপসাগরের শান্ত জল পেছনে ফেলে বসফোরাসের স্রোতের মুখোমুখী হতাম, পাশ দিয়ে যাওয়া জাহাজের ধাক্কায় ফুলে ওঠা ঢেউ-এ দুলতে দুলতে আমি প্রার্থনা করতাম, যেন এই বেড়ানো চিরকাল চলে।

ইস্তাম্বুলের মতো একটি মহান, ঐতিহাসিক এবং অবহেলিত শহরের মাঝখান দিয়ে ভ্রমণ করা এবং তা সত্ত্বেও মুক্ত সমুদ্রের স্বাধীনতা উপভোগ করা– এটাই হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসফোরাসের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করার রোমাঞ্চ। এর জোরালো স্রোতের ধাক্কা খেতে খেতে, সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় প্রাণবন্ত সজীব হয়ে, যে হাওয়াতে একে ঘিরে থাকা জনাকীর্ণ শহরের ময়লা, ধোঁয়া আর শব্দের সামান্য লেশ মাত্র নেই, পর্যটক উপলব্ধি করবে যে, সব কিছু সত্ত্বেও, এটা এখনো এমন একটা জায়গা যেখানে সে নির্জনতা উপভোগ করতে পারে এবং স্বাধীনতার মুক্তি খুঁজে পায়। শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া এই জলপথকে কিন্তু আমস্টার্ডাম বা ভেনিসের খালপথ বা প্যারিস এবং রোমকে দু'ভাগ করা নদীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। বসফোরাসে শক্তিশালী স্রোত প্রবাহিত হয়, এর উপরিভাগ সব সময়েই বাতাস এবং ঢেউ-এর দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় আর এর জল গভীর এবং কালো। যদি তোমার পেছন দিকে স্রোত থাকে, যদি তুমি শহরের ফেরির যাত্রাপথ অনুসরণ কর, তাহলে তুমি অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলো এবং 'ইয়ালি'গুলো দেখতে পাবে, দেখবে বয়স্কা মহিলারা চা খেতে খেতে ব্যালকনিতে বসে তোমাকে দেখছেন, দেখবে ফেরিঘাটে অবস্থিত কফি হাউসের লতার আচ্ছাদন, দেখবে সমুদ্রে যেখানে নিকাশি জল এসে পড়ছে, সেইখানে জাঙ্গিয়া-ইজের পরা বাচ্চাগুলো সমুদ্রে নামছে এবং কংক্রীটের ওপর রোদ

পোয়াচ্ছে, দেখবে লোকেরা তীরে বসে মাছ ধরছে, নিজেদের প্রমোদতরীতে আলসেমি করছে, স্কুলের বাচ্চারা স্কুল খালি করে বেরিয়ে পার ধরে হেঁটে চলেছে, যানজটে আটকা পড়া পর্যটকরা তাদের বাসের জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে, জাহাজঘাটায় বিড়াল বসে আছে মেছুড়েদের প্রতীক্ষায়, দেখবে বিশাল উঁচু উঁচু গাছের সারি, এত উঁচু তুমি বুঝতেই পারনি, দেখবে লুকিয়ে আছে গ্রামের সব বাসভবন আর প্রাচীরঘেরা বাগান, এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি জানতেই না, সঙ্কীর্ণ গলি পথ, পাহাড়ে উঠে গেছে, পশ্চাৎপটে উঁচু উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি, আর দেখবে, ধীরে, দূরে, ইস্তাম্বুল, তার সমস্ত বিশৃঙ্খল বিভ্রান্তি নিয়ে, তার মসজিদগুলো, গরিব মহল্লা, তার সেতু, মিনার, গম্বুজ, বাগিচা আর ক্রমবর্ধমান উঁচু উঁচু বাড়িগুলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসফোরাস দিয়ে ভ্রমণ করলে, তা সে ফেরিতেই হোক, মোটর লঞ্চেই হোক বা দাঁড় টানা নৌকোতেই হোক, শহরটিকে দেখতে পাবে বাড়ির পর বাড়ি দিয়ে, মহল্লার পর মহল্লা দিয়ে এবং দূর থেকে, একটা কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার মতো একটা অনবরত পরিবর্তনশীল মরীচিকার মতো।

বসফোরাসে আমাদের পারিবারিক ভ্রমণে আমি যেটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করতাম, সেটা হচ্ছে সর্বত্রই একটা ঐশ্বর্যবান সংস্কৃতির রয়ে যাওয়া রেশ, যে সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও নিজের আসল অস্তিত্ব ও প্রাণচাঞ্চল্য

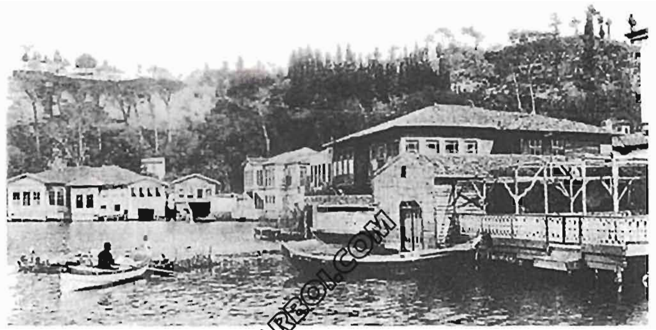

হারায়নি। একটা রঙচটা অবক্ষয়ী 'ইয়ালি'র অপূর্ব লোহার গেটের সামনে দাঁড়ালে, আরেকটা 'ইয়ালি'র শ্যাওলা-ঢাকা কঠিন দেওয়ালের দৃঢ়তা দেখলে, তৃতীয় আরেকটি আরো মহার্ঘ 'ইয়ালি'-র জানালার খড়খড়ি এবং সূক্ষ্ম কাঠের কাজ দেখে মুগ্ধ হলে এবং এগুলোর চেয়ে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের ওপরকার জুডাস গাছগুলোর কথা ভাবলে, চির সবুজ গাছপালা এবং শতাব্দী-প্রাচীন, বয়স্ক প্লেন গাছগুলোর ঘনছায়ায় ঢাকা বাগানগুলি পার হয়ে গেলে– একটি শিশুও বুঝতে পারবে একটা মহান, বর্তমানে অবলুপ্ত, সভ্যতা এখানে বিরাজমান ছিল আর তারা আমাকে যা বলেছিল, তা হল এক সময়ে আমাদের মতো লোকেরা, আমাদের চাইতে অনেক আলাদা, একটা প্রাচুর্যের জীবন কাটাতো, আর পেছনে রেখে গেল তাদের অনুসরণকারী, আমাদের, যারা দারিদ্র্যের, দুর্বলতার এবং আরো সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার বোধ নিয়ে পড়ে রইলাম।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যখন একটার পর একটা সামরিক পরাজয় সাম্রাজ্যকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছিল এবং পুরোনো শহরটি পরিযায়ী মানুষজনে ভরে যাচ্ছিল এবং শ্রেষ্ঠ রাজকীয় প্রাসাদগুলোতেও দারিদ্র্য ও ধ্বংসের চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠছিল, তখন যে সমস্ত পাশা এবং সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যারা আধুনিক, পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত অটোমান আমলাতন্ত্র চালাত, তাদের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসফোরাসের তীর ধরে বানানো প্রাসাদগুলোতে বসবাস করাটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওখানে তারা একটা নতুন সংস্কৃতির প্রচলন করছিল, বাকি পৃথিবীকে বাদ দিয়ে। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা এই দ্বার-রুদ্ধ সমাজের ভেতরে ঢুকতে পারেনি– কোনো পাকা বাঁধানো রাস্তা ছিল না এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফেরি চালু হলেও, বসফোরাস আসল শহরের অংশ হিসেবে তখনো পরিগণিত হয়নি– এবং বসফোরাস প্রাসাদগুলোয় গেড়ে-বসা অটোমানরা তাদের নিজেদের জীবন সম্পর্কে কিছু লিখেও যায়নি, কাজেই আমাদের কেবল তাদের পুত্র ও পৌত্রদের স্মৃতিচারণের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

AMARBOI.COM

এই সব স্মৃতিচারকদের মধ্যে উজ্জ্বলতম হচ্ছেন, আব্দুল হক সিনাসি হিসার (১৮৮৭-১৯৬৩) যাঁর 'বসফোরাস সভ্যতা' প্রাউস্টিয়ান ভঙ্গীতে লম্বা লম্বা বাক্য দিয়ে ভরা। হিসার, যিনি রুমেলিহিসারি 'ইয়ালি' তে বড় হয়েছিলেন, তাঁর যৌবনের কিছু অংশ প্যারিসে কাটিয়েছিলেন এবং কবি ইয়াহিয়া কেমাল (১৮৮৪-১৯৫৮)-এর বন্ধু ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তিনি রাজনীতি-বিজ্ঞান পড়েছিলেন। 'বসফোরাস মুনস্কেপ' এবং 'বসফোরাস ইয়ালিজ' এই দুটো বই-এ, তিনি একজন অভিজ্ঞ ক্ষুদ্র চিত্র শিল্পীর মতো সযত্নে বুনন ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে তাঁর সময়ের অবলুপ্ত-প্রায় সংস্কৃতির রহস্যময় আকর্ষণকে পুনঃসৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁদের দিবাভাগের আচার আচরণ এবং তাঁদের রাত্রিকালীন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন। তাঁরা রাত্রিবেলা নৌকোতে সমবেত হয়ে জলের ওপর ক্রীড়ারত রজত-শুভ্র জ্যোৎস্না নির্নিমেষে দেখতেন, সাথে সাথে দূরের কোনো দাঁড় টানা নৌকো থেকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে আসা সঙ্গীত মূর্ছনায় আপ্লুত হতেন। বসফোরাস মুনস্কেপ বইটি হাতে নিলেই আমার একটা স্পষ্ট দুঃখ হয় যে, আমি এই বইটির বর্ণিত আবেগ ও নীরবতা এই দুটোই সরাসরি উপভোগ করার সুযোগ কখনোই পাইনি। তবে আমি এটা উপভোগ করি যে, লেখকের অতীত স্মৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁর হৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্গের ভেতরকার অন্ধকার এবং অশুভ চোরাস্রোতের প্রতি তাঁকে কী রকম অন্ধ করে রেখেছিল। চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে, যখন দাঁড় টানা নৌকোগুলো সমুদ্রের একটা শান্ত অংশে সমবেত হত এবং সঙ্গীতের মূর্ছনা থেমে যেত, এ এস হিসার-ও তা অনুভব করতেন : 'যখন একটুও হাওয়া বইছে না, জল কখনো কখনো কেঁপে ওঠে, যেন ভেতর থেকে এবং ধোয়া সিল্কের মতো প্রতিভাত হয়।'

মায়ের সঙ্গে দাঁড়টানা নৌকোয় আমার মনে হত বসফোরাস পাহাড়ের রঙ, যেন কোনো বাইরের আলোর প্রতিফলন নয়। আমার মনে হত যেন বাড়ির ছাদগুলো, প্লেন গাছগুলো এবং জুডাস গাছগুলো, সামুদ্রিক চিলের ডানাগুলো, যেগুলোর দ্রুত আন্দোলনে ওরা আমাদের আর অর্ধ-ভগ্ন নৌকো ঘরের দেওয়াল পার হয়ে যায়, এগুলো সব ওদের ভেতর থেকে উৎসারিত কোনো মৃদু আলোর আভায় আলোকিত। এমনকি সবচেয়ে গরমের দিনেও যখন গরিব পাড়ার বাচ্চাগুলো পারের রাস্তা থেকে সাগরের জলে ঝাঁপ দিত, তখনো সূর্য কিন্তু এই দৃশ্যাবলীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে পারত না।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, যখন রক্তিমাভ আকাশ বসফোরাসের আঁধার রহস্যের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেত, তখন জল পাগলের মতো ফেনায়িত হয়ে উছলে উঠত, পাগলের মতো দাঁড় টেনে চলা নৌকোগুলোকে টেনে ধরতে চাইত। কিন্তু সেই ফেনায়িত জলের ঠিক পাশেই থাকত সাগরের একটা শান্ত অংশ, যার রঙ ততখানি পাল্টাতো না, যাতে মনেটের আঁকা জলের ওপর লিলিফুলগুলো দোলায়িত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষাটের দশকে, যখন আমি রবার্ট আকাদেমিতে পড়তাম, তখন ভীড় ঠাসা বেসিকটাস-সরিয়ার বাসের ভেতরে যাত্রী চলাচলের পথে দাঁড়িয়ে দীর্ঘসময় কাটিয়েছি এশিয়ার দিকের পারে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে এবং বসফোরাসকে দেখতাম একটা রহস্যময় সমুদ্রের মতো চকচক করছে আর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কেমন রঙ-এর পরিবর্তন হচ্ছে। বসন্তকালের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যাবেলায়, যখন শহরে গাছের একটি পাতাও নড়ছে না; বাতাসহীন, শব্দহীন গ্রীষ্মকালীন রাত্রে, যখন কোনো লোক মধ্যরাত্রে বসফোরাসের পাড় ধরে একা হেঁটে যায় আর কেবলমাত্র নিজের পায়ের শব্দই শুনতে পায়, তখন এমন একটা মুহূর্ত আসবে, যখন সে আকিন্তিবুরনুর পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, আর্নাভুটকোই পার হয়ে, অথবা আসিইয়ান সমাধিস্থলের পায়ের কাছে বাতিঘরে পৌঁছাবে, সমুদ্রস্রোতের সুখী জলকল্লোল ধ্বনি শুনতে পাবে এবং ভয়-ভয় চোখে আভাযুক্ত সাদা ফেনা দেখবে, মনে হবে সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে এবং তখন তাকে আশ্চর্য হয়ে ভাবতেই হবে, যেমনটা এ এস হিসার এক সময় ভেবেছিলেন এবং আমিও ভেবেছি, যে বসফোরাসের কি আত্মা আছে?

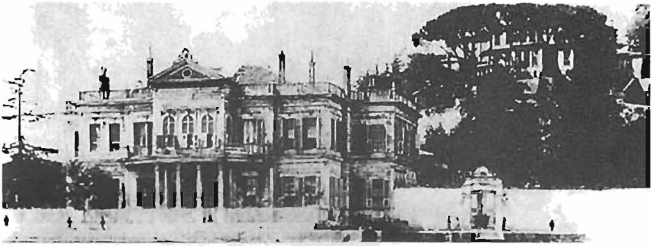

সাইপ্রেস গাছগুলোকে দেখা, উপত্যকার অন্ধকার বনকে, শূন্য এবং অবহেলিত 'ইয়ালি'গুলোকে এবং মরচে-ধরা কাঠামো আর রহস্যময় মাল-বোঝাই পুরোনো, বিবর্ণ জাহাজগুলোকে দেখা– শুধুমাত্র যারা সারাজীবন এই সমুদ্রোপকূলে কাটিয়েছে, তারা যেমন দেখতে পায়, তেমনিভাবে বসফোরাস জাহাজ আর 'ইয়ালি'গুলোর কবিতাকে দেখা, ঐতিহাসিক অভিযোগগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা শিশুর মতো পরিপূর্ণভাবে একে উপভোগ করা, এই জগৎটি সম্পর্কে আরো জানতে চাওয়া, একে বোঝা, এটাই অনিশ্চিতের কাছে অপ্রতিভ আত্মসমর্পণ, যা একজন পঞ্চাশ বছর বয়েসি লেখক মানসিক পরিতৃপ্তি বলে জেনেছে। যখনই আমি বসফোরাস এবং ইস্তাম্বুলের অন্ধকার রাস্তাগুলোর সৌন্দর্য ও কবিতা সম্পর্কে বলতে থাকি, আমার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর আমাকে অতিশয়োক্তির বিরুদ্ধে সাবধান করে দেয়; এটা একটা প্রবণতা যেটা বোধহয় আমার নিজের জীবনে সৌন্দর্যের অভাবকে অস্বীকার করার ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যদি আমি আমার শহরকে এত সুন্দর আর মনোমুগ্ধকর হিসাবে দেখি, তাহলে আমার নিজের জীবনও তো তাই হওয়া উচিত। আগের প্রজন্মের অনেক লেখকই ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে লেখার সময় এই অভ্যাসের কবলে পড়ে যান– এমনকি যদিও তারা শহরের সৌন্দর্যের উচ্চ প্রশংসা করেন, আমাকে তাদের গল্প দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করেন, তবু আমার মনে পড়ে যায় যে, এরা যে জায়গার বর্ণনা করেছেন, সেখানে এখন আর বাস করেন না, বরং পাশ্চাত্যের অনুগামী ইস্তাম্বুলের আধুনিক আরামের জীবনকে বেছে নিয়েছেন। এইসব পূর্বসুরীদের কাছ থেকে আমি শিখেছি যে, ইস্তাম্বুলের সৌন্দর্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গীতিধর্মী প্রশংসা চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার তাদেরই আছে, যারা আর সেখানে বাস করে না এবং কোনো অপরাধবোধ ব্যতীত নয়। কারণ কোনো লেখক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিনি শহরের ধ্বংস এবং বিষণ্নতা সম্বন্ধে বলেন, তিনি কখনোই তার নিজের জীবনকে যে ভৌতিক আলো জেল্লা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। শহরের এবং বসফোরাসের সৌন্দর্যে অভিভূত হওয়া মানে, নিজের শোচনীয় জীবনের সঙ্গে অতীতের সুখী বিজয়োল্লাসগুলোর অবসান সম্বন্ধে মনে করিয়ে দেওয়া।

মায়ের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের নৌকাভ্রমণ শেষ হত একই ভাবে। একবার কি দু'বার বিপজ্জনক স্রোতের মুখে পড়ে আর বার কয়েক পাশ দিয়ে যাওয়া জাহাজের ধাক্কায় ঢেউ-ওঠা জলে দুলুনি খেয়ে, মাঝি আমাদের নৌকো থেকে নামিয়ে দিত আশিইয়ান রোডের পাদদেশে, রুমেলিহিসারি পয়েন্টের ঠিক আগে, যেখানে একেবারে তীর পর্যন্ত স্রোত চলে আসত। তারপর মা আমাদের পয়েন্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ দিয়ে ঘুরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতেন, ওখানে বসফোরাস ছিল সবচেয়ে সরু। তারপর দাদা আর আমি কিছুক্ষণ কামানগুলোর কাছে খেলা করতাম; কামানগুলো বিজেতা মেহমেত শহর অবরোধ করার সময় ব্যবহার করেছিলেন আর এখন প্রাসাদের দেওয়ালের বাইরে বসানো আছে। এই বিশাল পুরোনো সিলিন্ডারের ভেতর মাতাল আর ভবঘুরেরা রাত কাটাত– ভেতরটা মল-মুত্র, ভাঙা কাঁচ, দোমড়ানো টিনের কোটো, সিগারেটের টুকরোতে ভর্তি, এগুলোর ভেতরে তাকালে না ভেবে পারতাম না যে, আমাদের মহান ঐতিহ্য, অন্তত যারা এখনো এখানে বাস করে, তাদের কাছে, একটি বোঝার অগম্য প্রহেলিকা।

যখন আমরা রুমেলিহিসারি ফেরি স্টেশনে পৌঁছতাম, মা তখন একটা পাথর বসানো রাস্তা আর খানিকটা ফুটপাথ, এখন জায়গাটা একটা ছোট কফি হাউস দখল করে আছে, দেখিয়ে বলতেন, "এখানে একটা কাঠের 'ইয়ালি' ছিল। যখন আমি ছিলাম একটা ছোট্ট মেয়ে, তোমাদের নানাজী গ্রীষ্মকালটা কাটানোর জন্য আমাদের এখানে নিয়ে আসতেন।" এই গ্রীষ্মকালীন আবাস, যেটা, আমি ভাবতাম পুরোনো, ভাঙাচোরা আর ভৌতিক, এটা সব সময় আমার মনের মধ্যে, এর সম্বন্ধে প্রথম যে গল্পটা আমি শুনেছিলাম, তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। গল্পটা এ রকম : এই বাড়িটার মালকিন ছিল এক পাশার মেয়ে। সে একতলাতেই থাকত। একদিন সেই মেয়েটি রহস্যময় ভাবে খুন হয়ে গেল, খুন করেছিল নাকি চোরেরা। ওই সময়ে, মধ্য তিরিশে আমার মা তাঁর গ্রীষ্মকালটা এখানেই কাটিয়েছিলেন। এই ভয়ের গল্প শুনে আমার কেমন অবস্থা হয়েছিল, তা দেখে মা সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ওই বাড়ির বর্তমানে অবলুপ্ত নৌকোঘরের ধ্বংসাবশেষের দিকে, আর অন্য আরেকটা গল্প বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মুখে একটা বিষণ্ন হাসি মাখিয়ে মা বলতেন সেই সময়ের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন আমাদের নানা, আমাদের নানীমার রান্না করা ওকরা স্টু খেয়ে ভাল লাগেনি বলে এমন রেগে গিয়েছিলেন যে, পাত্রটা জানালা দিয়ে বসফোরাস-এর গভীর তীব্র স্রোতের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

ইস্তিনিয়ে-তে আরেকটা 'ইয়ালি' ছিল, নৌকোঘরের একটু ওপরে, যেখানে মায়ের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় থাকতেন এবং মা যখন বাবার সঙ্গে ঝগড়ার পর আলাদা থাকতেন, তখন তিনি এই বাড়িতে চলে আসতেন। আমার যতটুকু মনে আছে, পরবর্তীকালে এই বাড়িটাও ভাঙাচোরা হয়ে পড়ে। আমার ছেলেবেলায়, এই বসফোরাস আবাসগুলোর, নতুন ধনীদের এবং আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠা আমলাদের কাছে কোনো আকর্ষণই ছিল না। পুরোনো প্রাসাদগুলো উত্তুরে হাওয়াকে এবং শীতকালের ঠান্ডাকে আটকাতে পারত না। একেবারে জলের ধারেই এগুলো গড়ে উঠেছিল এবং তাই এগুলোকে গরম রাখা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যায়সাধ্য ছিল। যেহেতু প্রজাতন্ত্র আমলের ধনীরা অটোমান পাশাদের মতো ক্ষমতাশালী ছিল না এবং টাকসিম-এর চারপাশের মহল্লাগুলোতে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে বসে নিজেদের বড় বেশি পাশ্চাত্ত্য মনোভাবাপন্ন মনে করত আর দূর থেকে বসফোরাসকে দেখত, সে জন্য বর্তমানে দুর্বল হয়ে যাওয়া ও নীচুতলার বাসিন্দা হয়ে যাওয়া পুরোনো অটোমান পরিবারগুলো, পাশার সন্তানেরা কিংবা এ এস হিসারের মতো লোকেদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের বস্‌ফোরাসের তীরের পুরোনো 'ইয়ালি'-গুলোর জন্য কোনো খদ্দের পেত না। এবং এই কারণেই, আমার সারা ছেলেবেলাটায় এবং সত্তরের দশক পর্যন্ত যখন শহরটা প্রসারিত হচ্ছিল, তখন বেশির ভাগ 'ইয়ালি' এবং প্রাসাদগুলো, হয় পাশাদের পৌত্র-প্রপৌত্রদের আর সুলতানের হারেমের ছিটিয়াল মেয়েমানুষগুলো, যারা সেখানে বাস করত, তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার মামলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়িয়ে গিয়েছিল, না হয়, সেগুলো ভাগ হয়ে হয়ে অ্যাপার্টমেন্টে হিসাবে বা একঘরের ফ্ল্যাট হিসাবে ভাড়া দিয়ে দিয়েছিল; রঙ চটে গেছে, ঠান্ডায় আর জলীয় বাষ্পে কাঠের রঙ কালচে মেরে গেছে, অথবা অজানা অচেনা লোকেরা ওই জায়গায় আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর আশায় হয়তো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

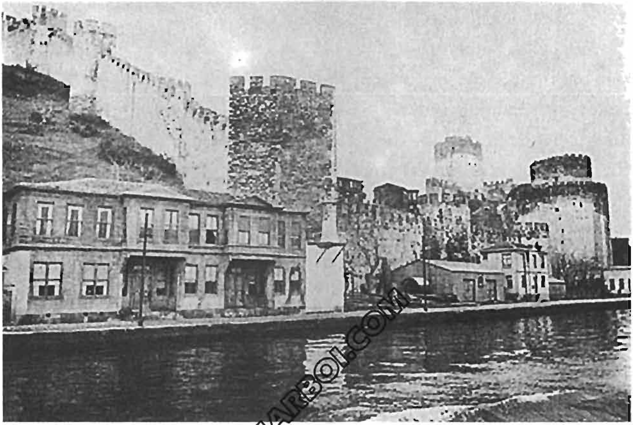

১৯৫০ সালের শেষের দিকে কোনো রবিবারই রবিবার হত না, যদি না আমার বাবা বা চাচাজী আমাদের ১৯৫২ সালের ডজ গাড়ি করে বসফোরাসে প্রাতর্ভ্রমণ করতে নিয়ে যেতেন। বিলুপ্তপ্রায় অটোমান সংস্কৃতির পদচিহ্ন, যতই শোকাবহ হোক, আমাদের ক্ষতি করতে পারত না। যাই হোক না কেন, আমরা ছিলাম প্রজাতন্ত্র যুগের নতুন ধনীর দল; কাজেই এ এস হিসারের 'বসফোরাস সভ্যতা'র শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত কার্যত আমাদের কাছে একটা নিশ্চিত আশ্বাস ছিল। একটা মহান সভ্যতার উত্তরণ দেখে আমরা সান্ত্বনা পেতাম, এমনকি গর্বিতও বোধ করতাম। আমরা সর্বদাই এমিরগান-এর 'সিনারালতি' কাফেতে 'পেপার হালুয়া'র জন্য যেতাম এবং এমিরগান বা বেবেকের কাছে উপকূল বরাবর হাঁটতাম, জাহাজগুলোর চলাচল দেখতাম; রাস্তায় কোনো একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মা, হয় একটা ফুলদানী, অথবা দুটো বড় বড় গোল্ডফিশ কিনতেন।

যখন বড় হলাম, বাবা-মা এবং দাদার সঙ্গে এই বাইরে বেড়ানোগুলো আমার একঘেয়ে লাগ্‌ত আর আমাকে বিষণ্ণ করে তুলত। ছোট ছোট পারিবারিক কলহ, আমার দাদার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যাতে প্রত্যেকটা খেলাই শেষ পর্যন্ত মারামারি পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়াত, একটা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ক্ষুদ্রতম একটা পরিবারের অসন্তোষ, তাদের অ্যাপার্টমেন্টের কারাগার থেকে সাময়িক মুক্তির আশা,– এই সব কিছু মিলে বসফোরাসের প্রতি আমার ভালোবাসাকে বিষাক্ত করে তুলত, যদিও তা সত্ত্বেও আমি বাড়িতে পড়ে থাকতে চাইতাম না। পরবর্তী সময়ে যখন আমি অন্য অসুখী,

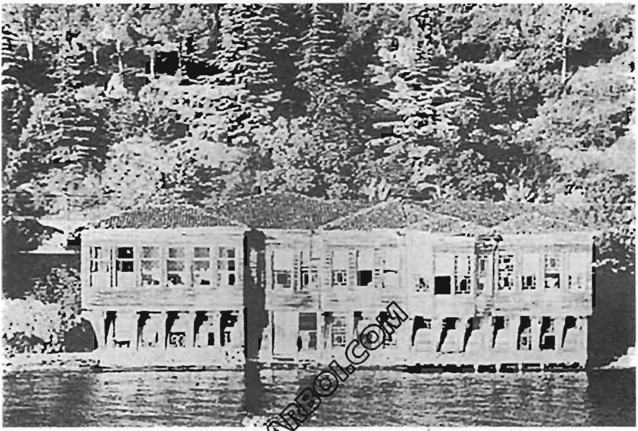
AMARBOI.COM

ঝগড়াটে, চিৎকার চেঁচামেচি করা পরিবারকে বসফোরাসের রাস্তায় গাড়ি চড়ে যেতে দেখতাম, ওই একই, রবিবারের বাইরে বেড়ানো পরিবার, তখন আমার জীবন আর অন্যের জীবনের এই মিলগুলোই কেবল আমাকে প্রভাবিত করত, তা নয়, আমার মনে এই সত্য ছাপ ফেলত যে, অনেক ইস্তাম্বুল পরিবারের জন্যও বসফোরাসই তাদের একমাত্র সান্ত্বনার জায়গা।

ধীরে ধীরে সেসব লোপ পেতে লাগল। 'ইয়ালি'গুলো, যেগুলো একের পর এক, পুড়িয়ে ফেলা হল, আমার বাবা আমাকে দেখিয়েছিলেন যে মাছ ধরার ফাঁদ, সেগুলো, 'ইয়ালি' থেকে 'ইয়ালি'তে নৌকো নিয়ে বিক্রি করতে যাওয়া ফল-ওয়ালারা, বসফোরাসের সেই বেলাভূমি যেখানে মা আমাদের সাঁতার কাটতে নিয়ে যেতেন, বসফোরাসে সাঁতার কাটার সেই পুলকানুভূতি, সেই ফেরি স্টেশনগুলো, যেগুলো সৌখিন রেস্তরাঁতে পরিবর্তিত হবার আগে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল; যে মেছুড়েরা তাদের নৌকোগুলো ফেরি স্টেশনের একেবারে গায়েই নোঙর করত, তারাও কোথায় যেন চলে গেল, এখন আর নেই। এখন আর তাদের নৌকো ভাড়া করে বসফোরাসে ছোট ছোট বেড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমার কাছে, একটা জিনিস একই রয়ে গেছে; আমাদের সকলের হৃদয়ে বসফোরাস-এর স্থান। যেমন আমার ছেলেবেলায়, তেমনি আজও বসফোরাসকে আমরা আমাদের সুস্বাস্থ্যের উৎস বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানি, আমাদের অসুস্থতার প্রতিকার বলে মানি, আর মানি সব শুভ ও মঙ্গলের অনন্ত উৎস হিসাবে, যা এই শহর ও তার অধিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখে।

'জীবন অত খারাপ হতে পারে না', আমি মাঝে মাঝেই ভাবি। 'যাই ঘটুক না কেন, আমি সর্বদাই বসফোরাসের পার ধরে হেঁটে যেতে পারি।'

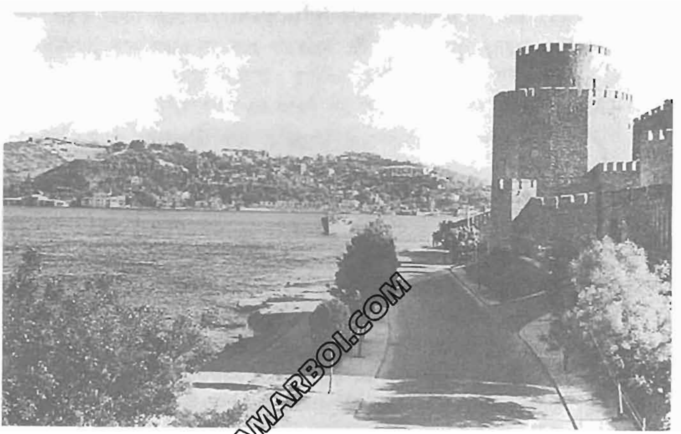

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.

মেলিং-এর বসফোরাস

যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য চিত্রকরেরা বসফোরাস-কে এঁকেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মেলিং-কেই আমি সবচেয়ে স্বতন্ত্র এবং প্রত্যয়ী বলে মনে করি। তাঁর বই, ভয়েজ পিতরেস্কিউ দ্য কনস্তানতিনোপ্‌ল এত্‌ দেস্‌ রাইভ্‌স্‌ দু বসফোর'-এই বই-এর নামটি পর্যন্ত আমার কাছে কবিতা মনে হয়, ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল; ১৯৬৯ সালে আমার মেসো, সেভকেত রাডো, একজন কবি এবং প্রকাশক, এই বই-এর একটা আদ্ধেক সাইজের অবিকল প্রতিরূপ বার করেন, আর যেহেতু আমার হৃদয়ে তখন ছবি আঁকার আবেগের আগুন জ্বলছে, তিনি আমাকে ওই বই এর এক কপি উপহার দেন। আমি ওই ছবিগুলোর প্রতিটি কোণা-খোঁচা পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করতাম আর ওগুলোর মধ্যে, আমার ধারণা অনুযায়ী, অটোমান ইস্তাম্বুলের অবিকৃত সৌন্দর্য খুঁজে পেতাম। একজন স্থপতি বা

AMARBOI.COM

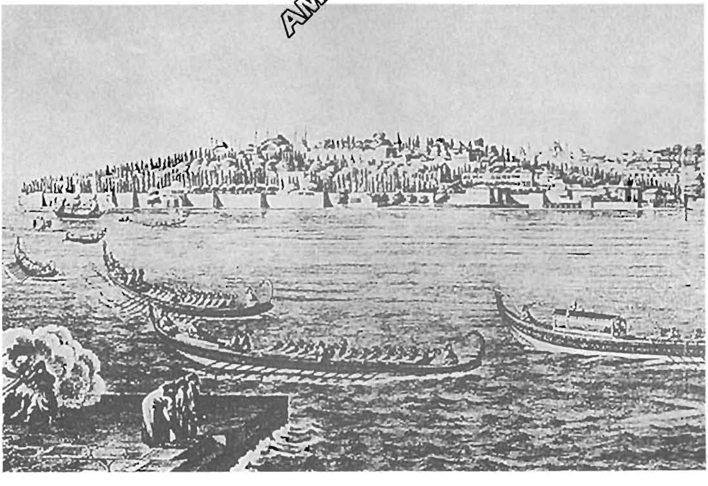

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন গাণিতিক-এর মতো সূক্ষ্ম বিশদের প্রতি মনোযোগ এই চিত্রাঙ্কনে ছিল, শুধু তার জন্যই আমার এই বিভ্রান্তি হয়নি, পরবর্তীকালে এই ছবিগুলো থেকে যে খোদাই-চিত্রগুলো তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলো দেখে। মাঝে মাঝে যখন আমি একটি মহান অতীতকে বিশ্বাস করবার জন্য হন্যে হয়ে যেতাম এবং আমাদের মতো যারা পাশ্চাত্য শিল্প ও সাহিত্যে অতিরিক্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন, তারা প্রায়ই এই রকম ইস্তাম্বুলের প্রতি উৎকট স্বদেশপ্রীতিতে আক্রান্ত হন– তখন আমি মেলিং-এর খোদাই চিত্রগুলো দেখে সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু যতই আমি ভাবাবেগে আপ্লুত হই না কেন, আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন যে, মেলিং-এর ছবিগুলো যে এত সুন্দর, তার আংশিক কারণ হল আমাদের দুঃখজনক উপলব্ধি যে, এই ছবিগুলোতে যা আঁকা হয়েছে, তার আজ আর কোনো অস্তিত্বই নেই। বোধহয় এই জন্যই আমি এই ছবিগুলো বার বার দেখি, কারণ এরা আমাকে বিষণ্ন করে তোলে।

জন্ম ১৭৬৯ সালে, আন্তোইন-ইগনেস মেলিং ছিলেন একজন খাঁটি ইউরোপিয়ান; একজন জার্মান, যাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন ফরাসি এবং ইতালিয়ান। বাবা ছিলেন কার্সলরুহেতে গ্র্যান্ড ডিউক কার্ল ফ্রেডরিক-এর প্রাসাদে একজন ভাস্কর আর মেলিং বাবার কাছেই প্রথম পাঠগ্রহণ করেন। তারপর তিনি তার কাকার সাথে চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য এবং গণিত শিখবার জন্য স্ট্রাসবুর্গে যান। উনিশ বছর বয়েসে তিনি ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে রওনা হন, বোধহয় সেই সময়ে ইউরোপে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়া রোমান্টিক মুভমেন্ট-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। যেদিন তিনি পৌঁছলেন, তিনি ভাবতেই পারেননি যে, এই শহরে পরবর্তী আঠারো বছর তাঁকে বাস করতে

AMARBOI.COM

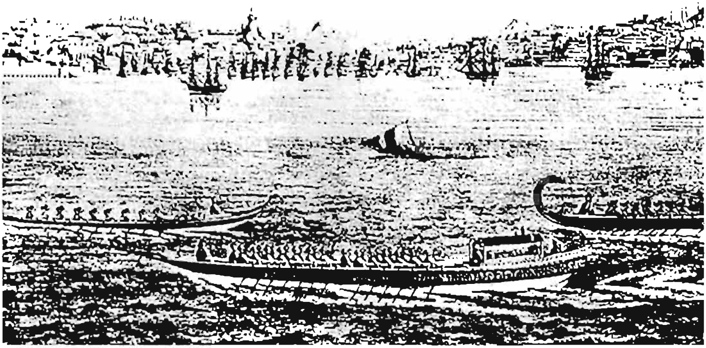

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। শুরুতে মেলিং পেরা আঙুর-বাগিচায় একজন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন, সেখানে দূতাবাসগুলোর চারপাশের মহল্লাগুলোতে একটা আন্তর্জাতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল এবং বর্তমানের বিওগ্‌লু-র প্রথম বীজ সেখানেই আমরা দেখি। যখন সেলিম ৩-এর বোন হাতিশ সুলতান প্রাক্তন ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ব্যারন দ্য হাব্‌স্‌-এর বুয়ুকদের-এর বাড়ির বাগান পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনি ওই রকম একটি বাগানের জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেন এবং ব্যারন তরুণ মেলিং-এর নাম সুপারিশ করেন।

হাতিশ সুলতানের জন্য মেলিং প্রথম যে কাজটি করেন, তা হল বাবলা গাছ ও জলপাই জাতীয় ফুলগাছ দিয়ে পাশ্চাত্য ধাঁচের একটা গোলকধাঁধাঁর মতো বাগান নকশা করা। পরে তিনি সুলতানের দেফতারদারবুরনূ-র (বসফোরাসের ইউরোপীয় উপকূলে বর্তমানে কুরুসেসমে এবং অর্তাকোয় নামে পরিচিত দুটো শহরের মাঝখানে) রাজপ্রাসাদের জন্য একটা ছোট, সুসজ্জিত 'কস্‌ক্‌' তৈরি করেন। এই স্তম্ভশ্রেণী পরিশোভিত, অত্যাধুনিক ধ্রুপদী বাড়িটির এখন আর অস্তিত্ব নেই, মেলিং-এর নিজের আঁকা চিত্র থেকেই কেবল এটার সম্বন্ধে জানতে পারি। এটি কেবলমাত্র বসফোরাসের পরিচিতিই দেয় না, এটি একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে, যাকে ঔপন্যাসিক আহমেত হামদি তানপিনার (১৯০১-৬২) পরবর্তীকালে একটা বর্ণসঙ্কর নমুনা বলে অভিহিত করেন; একটা নতুন অটোমান স্থাপত্যশিল্প, যেটাতে সফলতার সঙ্গে পাশ্চাত্য নকশার সঙ্গে স্থানীয় প্রচলিত নকশা মেলানো হয়েছে।

তারপর মেলিং সেলিম ৩-এর গ্রীষ্মকালীন আবাস, বেসিকতাস প্রাসাদের সংযোজিত অংশের নির্মাণ ও অলঙ্করণের তত্ত্বাবধান করেন এবং এখানেও ওই একই ধরনের হাওয়া বাতাস যুক্ত অত্যাধুনিক ধ্রুপদী নকশা ব্যবহার করেন, যেটা বসফোরাসের আবহাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত। সেই একই সময়ে তিনি হাতিশ সুলতানের, বর্তমান যুগের ভাষায়, অভ্যন্তরীণ সজ্জাশিল্পী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। তাঁর জন্য ফুলের টব কেনা, সূচীশিল্প করা রুমালে মুক্তো সেলাই করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসানো এবং মশারি বোনার তদারক ইত্যাদি করতেন, সাথে সাথে রবিবারে রবিবারে রাষ্ট্রদূতদের স্ত্রীদের প্রাসাদ ঘুরিয়ে দেখানোর কাজও করতেন।

এঁরা দুজনে যে চিঠিপত্র পরস্পরকে লিখেছিলেন, তা থেকেই আমরা এসব কথা জানতে পেরেছি। এই সব চিঠিগুলোতে মেলিং ও হাতিশ সুলতান একটা ছোট বুদ্ধিমূলক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। আতাতুর্ক ১৯২৮ সালে যে 'অক্ষর বিপ্লব'-এর সূচনা করেছিলেন, তারও একশ ত্রিশ বছর আগে এঁরা দুজনে ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার করে তুর্কী ভাষায় লিখতেন। তাঁদের সময়ের ইস্তাম্বুল স্মৃতিকথা বা উপন্যাস লিখতে জানত না, তবুও তাঁদের এই চিঠিগুলোকে ধন্যবাদ, এর থেকেই সুলতানের মেয়ে কেমনভাবে কথা বলতেন, তার একটা মোটামুটি আভাস আমরা পাই।

> মাস্টার মেলিং, মশারী কবে আসছে? দয়া করে বলুন, আগামীকাল... ওদের বলুন, এক্ষুনি কাজ শুরু করতে, শিগগিরই আপনার দেখা পেতে চাই... একটা আশ্চর্য খোদাই শিল্প... ইস্তাম্বুলের ছবিটা পাঠানো হয়েছে, ওটার রঙ হালকা হয়ে যায়নি,... চেয়ারটা আমার পছন্দ হয়নি, ওটা আমি চাইনা। আমি চাই সোনার জল-করা চেয়ার... আমার বেশি সিল্ক চাই না, কিন্তু প্রচুর সিল্কের সুতো ব্যবহার করুন... রূপোর সিন্দুকের ছবিটা আমি দেখেছি, কিন্তু আশা করব, আপনি ওটা ওইভাবে বানাবেন না, দয়া করে পুরোনো ছবিটা ব্যবহার করুন এবং দয়া করে, ওটা নষ্ট করবেন না... আপনাকে আমি মঙ্গলবারে মুক্তোগুলো আর টিকিটের টাকা দিয়ে দেব...

AMARBOI.COM

এইসব চিঠিগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, হাতিশ সুলতান শুধু ল্যাটিন অক্ষর নয়, কিছু ইতালিয়ান অক্ষরও আয়ত্ত করেছিলেন। যখন উনি মেলিং-এর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি শুরু করেন, তখন ওঁর বয়স তিরিশও হয়নি। তাঁর স্বামী, সৈয়দ আহমেদ পাশা, এরজুরুম-এর রাজ্যপাল ছিলেন এং তাই ইস্তাম্বুলে খুব কমই থাকতেন। নেপোলিয়নের ইজিপ্ট অভিযানের খবর যখন শহরে পৌঁছায়, তখন প্রাসাদ মহলে ফরাসীবিরোধী মানসিকতা প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে; সেই রকম সময়েই মেলিং একটি জেনোইজ মেয়েকে বিবাহ করেন এবং তাঁর তখনকার হাতিশ সুলতানকে লেখা সবিলাপ চিঠিগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি তখন রহস্যজনকভাবে অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

> ইয়োর হাইনেস, শনিবার আমি, আপনার বিনীত ভৃত্য, আমার পরিচারককে আমার মাস মাহিনা নেবার জন্য পাঠিয়েছিলাম... ওরা বলল যে, মাহিনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে... ইয়োর হাইনেসের কাছ থেকে এত অনুগ্রহ পাবার পর আমি ভাবতে পারছি না যে, এই হুকুম আপনার কাছ থেকে এসেছে... এই গুজব, এ নিশ্চয়ই ঈর্ষ্যা প্রসূত... এর কারণ, ওরা দেখেছে ইয়োর হাইনেস তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুগত ব্যক্তিদের কত ভালোবাসেন... শীত আসছে, আমাকে বিওগ্‌লু-তে যেতে হবে, কিন্তু কেমন করে যাব? হাতে একটাও পয়সা নেই। বাড়িওয়ালা ভাড়া চাইছে, আর আমাদের নিজেদের দরকার কয়লা, কাঠ, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, আর আমার স্ত্রীর গুটিবসন্ত হয়েছে, ডাক্তারকে ৫০ কুরু দিতে হবে। কিন্তু এই টাকা কোথায় পাব? আমি যতই দরবার করি না কেন, যতই জলপথে নৌকোয় বা স্থলপথে যাতায়াত করতে খরচ করি না কেন আপনার কাছ থেকে কোনো অনুকূল সাড়া এখনো পেলাম না... আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, হাতে একটাও পয়সা নেই... ইয়োর হাইনেস, মিনতি করি, আমাকে পরিত্যাগ করবেন না...

হাতিশ সুলতান তাঁর শেষ মিনতিও যখন অগ্রাহ্য করলেন, তখন মেলিং ইউরোপে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন এবং অন্য কোনো উপায়ে টাকা রোজগারের কথা ভাবতে লাগলেন। মনে হয়, এই মতলবটা তখনই ওঁর মাথায় এসেছিল যে, বড় বড় পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলো, যেগুলো তিনি বেশ কিছুদিন ধরে আঁকছিলেন, সেগুলোকে, তাঁর রাজপ্রাসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভাঙিয়ে একটা খোদাই চিত্রের বই হিসাবে বার করে, তিনি লাভ করবেন। ইস্তাম্বুলের ফরাসী শার্জে দ্য অ্যাফেয়ার্স এবং একজন সুপরিচিত প্রাচ্যবিদ, পিয়ের রুফিন-এর সাহায্য নিয়ে, তিনি প্যারিসের প্রকাশকদের সঙ্গে চিঠি বিনিময় করতে লাগলেন। যদিও মেলিং ১৮০২ সালে প্যারিসে ফিরে যান, তাঁর বইটি প্রকাশিত হতে সতেরো বছর লেগে গিয়েছিল (তখন মেলিং-এর বয়স ছাপ্পান্ন); তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ খোদাই শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন এবং প্রথম থেকেই আসল ছবির প্রতি, যতটা ছবির ফর্ম ধরে রাখা যায়, ততটাই বিশ্বস্ত থাকার প্রতি সকলেরই দায়বদ্ধতা ছিল।

যখন আমরা এই বিশাল বইটার আটচল্লিশটা খোদাই ছবি দেখি, প্রথমেই যেটা আমাদের মনে দাগ কাটে, তা হল ওঁর যথাযথতা। যখন আমরা একটি লুপ্ত জগতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাকৃতিক ভূচিত্রগুলো সমীক্ষা করি, এগুলোতে সূক্ষ্ম স্থাপত্যের বিশদ অঙ্কন এবং দক্ষতার সঙ্গে দৃশ্যগুলোর নিপুণ উপস্থাপন উপভোগ করি, তখন আপাতদৃষ্টিতে সত্যের প্রতীয়মানতার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। হারেমের ভেতরের একটি ট্যাবলো দৃশ্য সম্বন্ধেও এই কথা একদম সত্যি– এই ছবিটা আটচল্লিশটা খোদাই ছবির মধ্যে সবচেয়ে উদ্ভট, তা সত্ত্বেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে 'গথিক' আঙ্গিকের সম্ভাব্য উপস্থাপনা খুঁজে বের করতে একজন ড্রাফটসম্যান-এর নিপুণ দক্ষতার পরিচয় এতে রয়েছে। সাধারণ বীভৎস পাশ্চাত্য ছবিগুলোতে হারেমের যে উদ্ভট যৌনতার প্রকাশ দেখা যায়, তার থেকে অনেক উঁচুতে এই ছবিগুলো, যাতে মর্যাদা ও মার্জিত সৌন্দর্য দৃশ্যগুলোতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং তা এত আন্তরিকতার সঙ্গে করা হয়েছে যে, ইস্তাম্বুলের লোকেরাও এই ছবি দেখে আশ্বস্ত হবে। ছবির প্রান্তগুলোকে মনুষ্যত্বময় করে তুলে মেলিং ছবির ভেতরকার তত্ত্বমূলক আবহাওয়ার সঙ্গে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। হারেমের নিচের তলায় আমরা দুজন মেয়েলোককে দূরের দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তারা পরস্পরকে প্রেমময় আলিঙ্গন করছে, ঠোঁটে ঠোঁট, কিন্তু অন্যান্য পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীদের মতো মেলিং এই মেয়ে দুটিকে অতিরঞ্জিত করেননি বা তাদের ছবির মাঝখানে বসিয়ে তাদের অন্তরঙ্গতাকে আবেগকেন্দ্রিক করেননি।

মেলিং-এর আঁকা ইস্তাম্বুলের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবিগুলোতে প্রায় কোনো কেন্দ্রস্থল নেই বললেই চলে। এই বিশেষ ব্যাপারটা এবং প্রতিটি ছোটখাট বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগই হয়তো আমাকে তাঁর আঁকা ইস্তাম্বুলের প্রতি আকর্ষণ করে। তাঁর বই-এর একেবারে শেষে তিনি একটা মানচিত্র রেখেছেন আর তাতেই মেলিং দেখিয়েছেন, তাঁর আটচল্লিশটি ট্যাবলো দৃশ্যাবলী কোথায় কোথায় অবস্থিত, কোন্

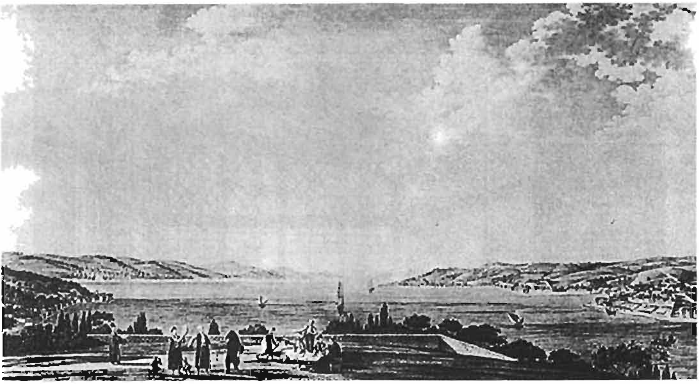

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিকোণ থেকে ওগুলোকে দেখা হয়েছে এবং এর থেকে বোঝা যায় তিনি দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে কতটা মানসিকভাবে বিজড়িত ছিলেন; তবুও, যেমন চিনা স্ক্রোলে অথবা সিনেমা স্কোপ ছবির ক্যামেরার কাজে দেখা যায়, তেমনি তাঁর এই সব ছবিতেও দৃষ্টিকোণ যেন অনবরত বদলাতে থাকে বলে মনে হয়। যেহেতু মেলিং তাঁর মনুষ্যত্বের নাটককে কখনোই তাঁর ছবির কেন্দ্রে রাখেননি, তাই ওই জিনিস ছবিতে খুঁজে খুঁজে দেখা মানে, আমার শিশুকালে বসফোরাসের তীর ধরে গাড়িতে বসে ভ্রমণ করা : একটা উপসাগর হঠাৎ আর একটা উপসাগরের পেছন থেকে উদয় হওয়া, উপকূলের রাস্তার প্রতিটি মোড়ে একটা আশ্চর্যজনক কোণ থেকে একটা দৃশ্যকে দেখা। এবং তাই যখন আমি এই বইটার একটার পর একটা পাতা ওলটাতে থাকি, আমি ভাবতে শুরু করি ইস্তাম্বুল একটা কেন্দ্রহীন, অসীম শহর আর যে গল্পগুলো ছোটবেলায় আমি এত ভালবাসতাম, তার অন্তত একটি গল্পের ভেতর আমি আছি বলে অনুভব করি।

মেলিং-এর আঁকা বসফোরাসের দৃশ্যগুলো দেখা মানে, আমি প্রথম বসফোরাসকে যেমনভাবে দেখেছিলাম, সেই দৃশ্যটিকে চোখের সামনে নিয়ে আসা নয়– সেই ঢালু উৎরাই, উপত্যকা এবং পাহাড় যেগুলো তখনো নগ্ন ছিল, সেই বিশুদ্ধতা যেটা এখন আর শত চেষ্টা করেও মনে করা যায় না, কারণ পরবর্তী চল্লিশ বছরে এই অঞ্চলে কদর্য সব নির্মাণ কাজ জায়গাগুলো ভরিয়ে ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। বইটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে যখন ভাবি যে এই হারিয়ে যাওয়া স্বর্গ আমাকে অন্তত কয়েকটা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও কয়েকটা বাড়ি দিয়ে গেছে যেগুলো আমি আমার নিজের জীবনকালেই দেখেছি, তখন মনটা দারুণ আনন্দে ভরে ওঠে। এখানে যে জায়গায় বিষণ্নতা আনন্দের সঙ্গে মিশে যায়, সেখানে আমি ছোটখাটো

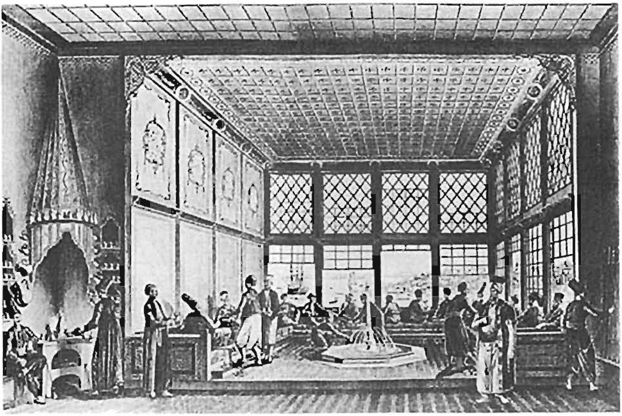

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ করেছি, যেটা কেবলমাত্র যারা বসফোরাসকে খুব ভালোভাবেই জানে, তারাই বুঝতে পারবে। যখন এই লুপ্ত জগৎ ছেড়ে আমার বর্তমান জীবনে পুনঃপ্রবেশ করার সময় আসে, তখন এই ব্যাপারটা উল্টো দিক থেকেও সত্যি হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, আমি নিজেকে বলি, ঠিক যখন তুমি তারাবিয়া উপসাগর ছেড়ে চলে আসছ, এবং সমুদ্র এখন মোটেই শান্ত নয়, হঠাৎ ব্ল্যাক সী থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া উত্তুরে বাতাস এর জলকে উত্তাল করে তুলছে, আর দ্রুত ওঠা অশান্ত ঢেউগুলোর চূড়ায় সেই একই ছোট ছোট, রাগী, অধৈর্য বুদবুদগুলো, যা মেলিং তাঁর ছবিতে এঁকেছেন। হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলায় বেবেক-এর ওপরের দিকে পাহাড়গুলোর জঙ্গলে ঠিক এই রকম অন্ধকার নেমে আসে এবং কেবল আমার মতো, অথবা মেলিং-এর মতো এমন কেউ যে এখানে অন্তত দশ বছর বাস করেছে, সেই জানবে এই অন্ধকার কেমন যা ভেতর থেকে উঠে আসে। প্রচলিত ইসলামিক উদ্যানে এবং বেহেস্ত-এর ইসলামিক চিত্রগুলোতে সাইপ্রেস গাছকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং মেলিং-এর চিত্রগুলোতেও এই গাছগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যেমন কিনা পারস্যের ক্ষুদ্রচিত্রগুলোতে দেখা যায়; ঋজু, সবলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ঘনীভূত অন্ধকার, চিত্রগুলোতে একটা কাব্যিক মূর্ছনা এনে দিয়েছে। মেলিং যখন বসফোরাসের পাইন গাছের বক্রতা এবং কুঞ্চনগুলো আঁকেন, তিনি অন্যান্য পাশ্চাত্য চিত্রকরদের মতো গাছের শাখাগুলোকে অতিরিক্ত অবয়ব দান করে একটা নাটকীয় অভিঘাত সৃষ্টি করতে বা চিত্রটিকে একটি ফ্রেম দিতে অস্বীকার করেন। এইভাবে ভাবলে, মেলিং ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পীদের মতো; যেমন তিনি গাছগুলোকে দূর থেকে দেখেন, তেমনি ভাবে

AMARBOI.COM

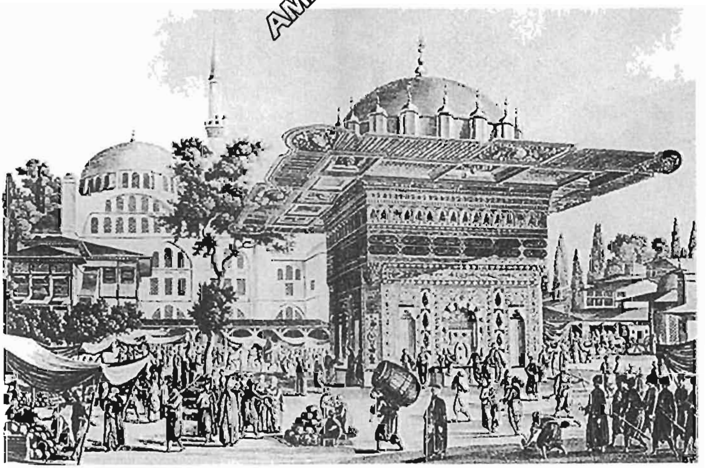

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তাঁর মানুষ চরিত্রগুলোকে তাদের তীব্র আবেগপ্রবণতার মুহূর্তেও দেখেন। এটা সত্যি যে, তিনি মানুষের ভাবভঙ্গিগুলো আঁকতে তেমন দক্ষ নন এবং এটাও সত্যি যে, বসফোরাসের বুকে বসানো নৌকো ও জাহাজগুলো সময় সময়ে অগোছালো মনে হয় (ওগুলো দেখে মনে হয় যেন ওরা সোজাসুজি আমাদের দিকেই আসছে); বাড়ি এবং মনুষ্যাকৃতি আঁকতে তিনি যে গভীর মনোনিবেশ করেছেন, তা সত্ত্বেও, তিনি সময়ে সময়ে এগুলোকে বাচ্চাদের ছবি আঁকার মতো সঠিক আকৃতির করতে পারেননি, কিন্তু এই ভুল-ত্রুটির মধ্যেই আমরা মেলিং-এর কবিতার মুখোমুখি হই; এবং তাঁর এই কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে এমন এক চিত্রশিল্পী বানিয়েছে, যিনি আধুনিক যুগের ইস্তাম্বুলীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। যখন আমরা লক্ষ করি যে, হাতিশ সুলতানের প্রাসাদের মেয়েগুলোর আর সুলতানের হারেমের মেয়েগুলোর মুখশ্রী এমন একই রকম যে তাদের সকলকে বোন বলে মনে হয়, তখন আমরা মেলিং-এর দৃষ্টিভঙ্গির শিশুসুলভ সারল্য দেখে হাসি আর ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা লক্ষ করে গর্ব অনুভব করি।

শহরের স্থাপত্য, ভৌগোলিক অবস্থানগুলো এবং দৈনন্দিনতার খুঁটিনাটি সততার সঙ্গে উপস্থাপনা করে মেলিং আমাদের এই শহরের সোনালী দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেন, যা অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য চিত্রশিল্পীরা, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকের দ্বারা প্রভাবিত, কখনো করতে পারেননি। তাঁর মানচিত্রে তিনি পেরা-র একটি জায়গা নির্দেশ করেছেন, যেখান থেকে তিনি কিজকুলেসি এবং উস্‌কুদার এই দুই জায়গার ছবি আঁকেন আর এই জায়গাটা, এই মুহূর্তে আমি যেখানে বসে এই লাইনগুলো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখছি, অর্থাৎ সিহাঙ্গির-এ আমার পড়ার ঘর, সেখান থেকে মাত্র চল্লিশ পা দূরে; যখন তিনি টোপকাপি প্রাসাদটি আঁকেন, তখন তিনি সেটা টোফেন-এর উৎরাইতে অবস্থিত একটা কফি হাউসের জানালার ভেতর দিয়ে দেখেন এবং তিনি ইওয়াইউপ-এর উৎরাইতে বসে ইস্তাম্বুলের দিগন্তের দৃশ্য আঁকেন। আমাদের জানা এবং অন্তরঙ্গভাবে ভালোবাসার এই সমস্ত দৃশ্যগুলোতে তিনি একটা স্বর্গের আভাস দেন, যাতে এখন আর অটোমানরা বসফোরাসকে কতকগুলো গ্রিক মেছুড়েদের গ্রামের সমষ্টি বলে ভাবে না, বরং ভাবে যে এটা এমন একটা জায়গা যেটা তারা নিজেদের জন্য দখল করে নিয়েছে। স্থপতিরা এখন পাশ্চাত্যের টানে সাড়া দিয়ে বিশুদ্ধতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। এর কারণ এই যে, মেলিং আমাদের একটা চলমান সংস্কৃতির এমন নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে সেলিম ৩-এর পূর্বেকার অটোমান সাম্রাজ্য বহু দূরের বলে মনে হয়।

মার্গুয়েরিট ইওরসেনার একবার লিখেছিলেন, তিনি 'একটা আতসকাচ হাতে নিয়ে' পিরানেসির অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেনিস ও রোমের খোদাই চিত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; মেলিং-এর ইস্তাম্বুলের দৃশ্যাবলীর মনুষ্য মূর্তিগুলোকেও আমি ঠিক অমনিভাবেই দেখতে চাই। টোফেন স্কোয়ার আর টোফেন ফোয়ারার ছবি দিয়ে আমি শুরু করতে চাই– এইগুলো শিল্পী প্রায়ই দেখতে যেতেন এবং এগুলোর সেন্টিমিটার পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন; ছবির বাঁ দিকের তরমুজ বিক্রেতাকে আমি দেখব আর দেখে আনন্দ পাব যে, আজকের তরমুজ বিক্রেতারাও ঠিক অমনিভাবেই তাদের পশরা সাজিয়ে রাখে। মেলিং-এর নিখুঁত মনোযোগকে

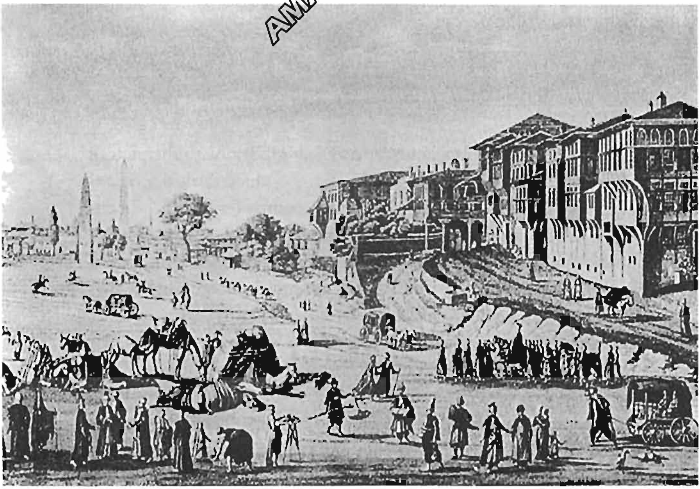

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধন্যবাদ, আমরা এখন দেখি যে, এই ফোয়ারাটি মেলিং-এর সময়ে রাস্তার উপরিভাগ থেকে একটু উঁচুতে ছিল। আর এখন রাস্তাগুলো পাথর দিয়ে বাঁধানো এবং তারপর উপর্য্যুপরি অ্যাসফল্টের স্তরের পর স্তর দিয়ে ঢাকার ফলে ফোয়ারাটি যেন একটি গর্তের মধ্যে অবস্থিত বলে মনে হয়। প্রত্যেকটি বাগানে, প্রত্যেকটি রাস্তায়, আমরা দেখি যে মায়েরা বাচ্চাদের হাত শক্ত করে ধরে আছে (পঞ্চাশ বছর পর, থিয়োফাইল গতিয়ের বললেন যে, মেলিং মেয়েদের বাচ্চাসহ আঁকতে ভালোবাসতেন, কারণ তিনি তাদের একলা হাঁটা মেয়েদের চাইতে বেশি শান্ত এবং সম্মানের যোগ্য বলে মনে করতেন)।

তাঁর শহর (আমাদের শহরের মতো), কাপড় ও খাদ্যদ্রব্যের ফেরিওয়ালাতে ভর্তি ছিল এবং তারা তেপায়া টেবিলের ওপর তাদের মালপত্র সাজিয়ে রাখত: বেসিকটাস-এর পুরোনো মাছ ধরার ঘাটে বসে একটি যুবক মাছ ধরছে (এবং মেলিংকে আমি এত বেশি ভালোবাসা সত্ত্বেও, বলব না যে, বেসিকটাসের সমুদ্র উনি যেমন এঁকেছেন তেমন শান্ত কখনোই নয়); এই যুবকটির পাশে, মাত্র পাঁচ পা দূরে দুজন রহস্যময় লোক রয়েছে, যাদের ছবি 'দ্য হোয়াইট কাসল' পত্রিকার তুর্কী

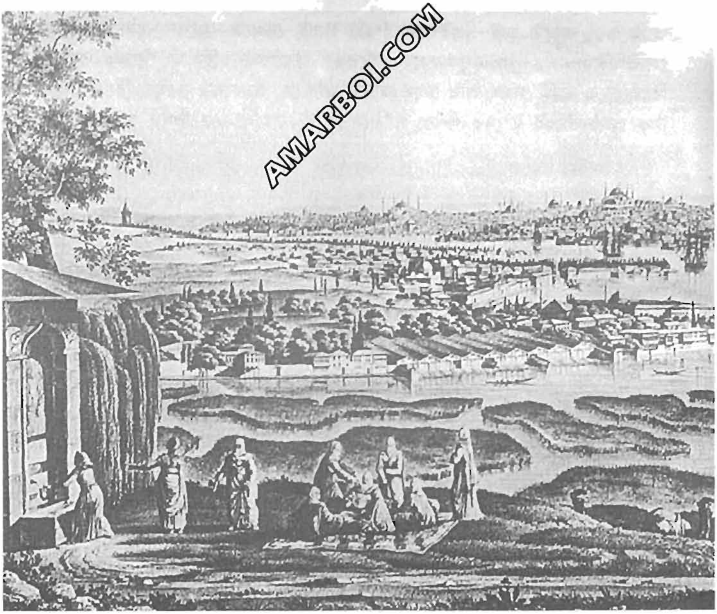

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্করণের মলাটে ছাপা হয়েছে; কান্দিল্লির পাহাড়ের ওপর একটি লোককে একটি নাচিয়ে ভালুকের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে এবং তার সহকারী একটা তাম্বুরীন বাজাচ্ছে; সুলতানাহ্মেত স্কোয়ারের (মেলিং-এর ভাষায় হিপ্পোড্রম) মাঝখানে একটি লোক, ভীড় ও স্তম্ভগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে খাঁটি ইস্তাম্বুলীয়দের মতো, তার ভারবাহী গাধার পাশে পাশে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে; একই ছবিতে জনতার দিকে পেছন ফিরে বসে একটি লোক সিসেম রোল বিক্রি করছে, যেগুলোকে আমরা এখনো 'সিমিট্স' বলি এবং তার তেপায়া টেবিলটাও আজকালকার কোনো কোনো 'সিমিট' বিক্রেতার তেপায়া টেবিলের মতো হুবহু।

স্তম্ভ যতই মহান হোক বা দৃশ্য যতই চমৎকার হোক, মেলিং কখনো সেগুলোকে তাঁর ছবিতে প্রাধান্য দিতেন না। পিরানেসির মতোই যদিও তিনি দৃষ্টিভঙ্গি ভালোবাসতেন, তবুও মেলিং-এর ছবিগুলো কখনোই নাটকীয় হত না (এমন কি, যখন টোফেন-এর নৌকোর মাঝিরা ঝগড়া করছে, তখনো না!)। পিরানেসির খোদাই চিত্রগুলোতে স্থাপত্যের লম্বগুলোর নাটকীয় হিংস্রতা মানুষকে পিষে মারে; এতে মূর্তিগুলো উদ্ভট, ভিখিরি, বিকলাঙ্গ-পঙ্গু এবং বীভৎস কদাকার হয়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

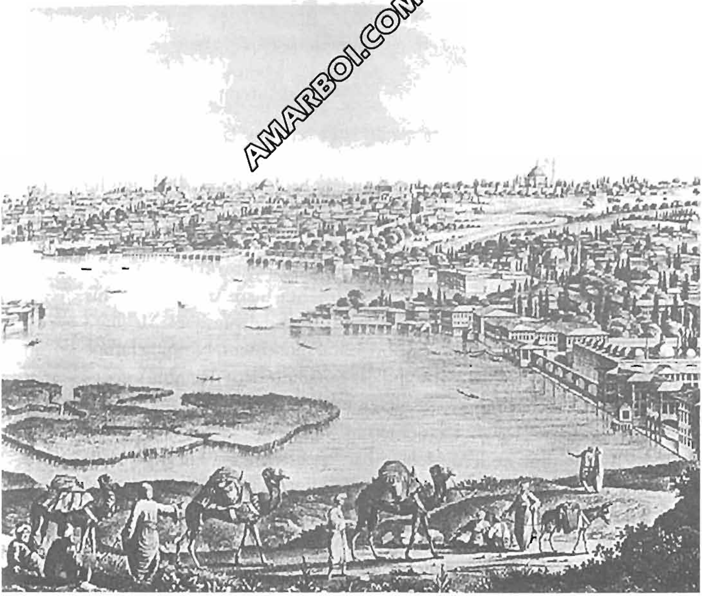

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলিং-এর দৃশ্যাবলী আমাদের একটা আনুভূমিক নড়াচড়ার আভাস দেয়; কোনো কিছুই দৃষ্টির সামনে লাফ দিয়ে ওঠে না; ইস্তাম্বুলের ভূগোল এবং স্থাপত্যের অসীম সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে তিনি আমাদের একটা আশ্চর্য স্বর্গের সন্ধান দেন এবং আমাদের অবসর সময়ে এই স্বর্গ ভ্রমণে আমন্ত্রণ জানান।

যখন তিনি ইস্তাম্বুল ছেড়ে চলে যান, ততদিনে তিনি তাঁর জীবনের অর্ধেক সময় এখানে কাটিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এটা বলা ঠিক হবে না যে, তাঁর ইস্তাম্বুলের সময়টা ছিল একটা 'শিক্ষা'; এইসব বছরগুলোতে তিনি কী দিয়ে তৈরি, তা বুঝতে পেরেছিলেন; এখানেই তিনি তাঁর রোজগার শুরু করেন এবং এই রোজগার করতে করতেই তিনি তাঁর প্রথম কাজগুলো করেন। ইস্তাম্বুলকে এখানকার অধিবাসীরা যেমনভাবে দেখে, মেলিং তা দেখে তাঁর চিত্রাঙ্কনের দৃশ্যগুলোকে উদ্ভটভাবে বা প্রাচ্য রীতিতে আঁকতে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না, যেমনটা অন্য অনেক বিখ্যাত চিত্রকর ও খোদাইশিল্পী, যেমন উইলিয়াম হেনরী বার্টলেট (দ্য বিউটিজ অফ বসফোরাস, ১৮৩৫), টমাস অ্যালোম (কনস্তান্তিনোপল অ্যান্ড দ্য সিনারি অব দ্য সেভেন চার্চেস অফ এশিয়া মাইনর, ১৮৩৯) এবং ইউজিন ফ্ল্যানডিন (লা ওরিয়েন্ট, ১৮৫৩) করেছেন। মেলিং তাঁর চিত্রগুলোকে 'এ থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান নাইটস' এর চরিত্রগুলো দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি; পাশ্চাত্যের রোমান্টিক মুভমেন্ট, যা এখন পূর্ণ শক্তিতে বিদ্যমান, তাঁকে মোটেই আকর্ষণ করেনি; তিনি কখনোই তাঁর ছবির আবহাওয়াতে আলো ছায়ার খেলা, কুয়াশা এবং মেঘের আনাগোনা ইত্যাদি যোগ করতে চাননি বা শহর ও তার অধিবাসীদের গোলগাল, ঢেউ খেলানো, মোটাসোটা, গরিব বা বেশি আরব লোকদের মতো, যা তারা মোটেই নয়, করে আঁকতে চাননি।

মেলিং-এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, ভেতরের লোকদের মতো। কিন্তু যেহেতু, তাঁর সময়ের ইস্তাম্বুলীয়রা কীভাবে নিজেদের ছবি আঁকতে হয়, বা শহরের ছবি আঁকতে হয়, জানতো না– আসলে এসব করার মতো উৎসাহীও ছিল না– তাই যে আঙ্গিক তিনি পশ্চিম জগৎ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, সেই অঙ্কনের রীতি প্রয়োগ করার দরুন, তাঁর খোলামেলা ছবিগুলোতেও একটা বিদেশি ছাপ এনে দিয়েছিল। কারণ তিনি শহরটিকে দেখেছিলেন একজন খাঁটি ইস্তাম্বুলীয়র মতো, কিন্তু শহরটিকে এঁকেছিলেন একটি স্বচ্ছ দৃষ্টি-সম্পন্ন পাশ্চাত্য শিল্পীর মতো এবং তাই, মেলিং-এর ইস্তাম্বুল কেবল একটি পাহাড়, মসজিদ এবং আমাদের চেনা বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা শোভিত জায়গাই নয়, এটি একটি মহান সৌন্দর্যের পীঠস্থান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮.

আমার মা, আমার বাবা এবং বহুবার গৃহত্যাগ

আমার বাবা প্রায়ই দূরে দূরে চলে যেতেন। মাসের পর মাস আমরা বাবাকে দেখতে পেতাম না। ভাবলে অবাক লাগে, বাবা যে বাড়িতে নেই, এটা আমরা বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত খেয়ালই করতাম না। ততদিনে আমরা বাবার অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে যেতাম– যেমন একটা ব্যবহার-না-করা সাইকেল হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়ে গেছে এটা যেমন আমরা অনেক পরে বুঝতে পারি বা আমাদের স্কুলের কোনো বন্ধু, যে বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলে আসছে না, সে আর কোনোদিন আসবে না বুঝতে পারি। বাবা বাড়িতে কেন নেই, সেটা যেমন কেউ বুঝিয়ে বলত না, তেমনি বাবা কবে ফিরে আসবেন, তা-ও কেউ বলত না। আমাদের মনেও হত না যে জিজ্ঞেস করি, কারণ আমরা একটা বড়, ভীড়-ঠাসা অ্যাপার্টমেন্টে বাস করতাম, চারিপাশে চাচারা, চাচীরা, দাদীমা, রাঁধুনি, কাজের লোক থাকত, তাই বাবার অনুপস্থিতিটা, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে হালকাভাবে নেওয়া সহজ ছিল এবং বাবা যে বাড়িতে নেই, সেটা ভুলে যাওয়াও সহজ ছিল। কখনো কখনো অবশ্য, আমাদের কাজের মেয়ে এস্‌মা হানিম যখন আমাদের খুব বেশি করে জড়িয়ে ধরত, কিংবা দাদীমার রাঁধুনি বেকির আমাদের কথাবার্তার মধ্যে অন্য অর্থ খুঁজে বার করত বা আমাদের চাচাজী আইদিন কোনো রবিবারের সকালে তার ১৯৫২-র ডজ গাড়িতে করে আমাদের বসফোরাসে ঘুরতে নিয়ে যেতেন, অতিরিক্ত বাহাদুরি দেখাতেন, সেই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা একটা দুঃখের আবহাওয়া বুঝতে পারতাম, যা আমরা ভুলতে পারতাম না।

কখনো কখনো অবশ্য আমি, মা যখন সারা সকাল ধরে একনাগাড়ে আমার চাচীদের সঙ্গে, নিজের বন্ধুদের সঙ্গে বা নিজের মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে যেতেন, বুঝতাম যে, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। মা তার লাল ফুল গোঁজা লম্বা ঘি-রঙয়ের পোশাকটা পরতেন; যখন পায়ের ওপর পা তুলে বসতেন, পোশাকটা মেঝের ওপর পা-এর চারদিকে গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ত আর আমি ধন্দে পড়ে যেতাম। মায়ের নাইট গাউনটা দেখা যেত আর দেখতাম মায়ের গায়ের চামড়া কি সুন্দর আর মায়ের ঘাড় গলা কী সুন্দর। মায়ের কোলে উঠে, মায়ের মাথার চুল আর গলা আর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার ইচ্ছা হত। অনেক বছর পরে মা নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে, দুপুরে খাবার সময় মায়ের সঙ্গে বাবার প্রচণ্ড ঝগড়া হওয়ার পর, আমি নাকি পরিবারের ওপর যে অশান্তির ঝড় নেমে আসত, তা উপভোগ করতাম।

মায়ের সাজ-গোজের টেবিলে বসে মায়ের সেন্টের শিশি, লিপস্টিক, নেলপালিশ, কোলোন, গোলাপ জল আর বাদাম তেল, এসব নাড়াচাড়া করতে করতে অপেক্ষা করতাম কতক্ষণে মা আমাকে লক্ষ করবেন। শিশি আর ব্রাশগুলোকে টেবিলের মাঝখানটায় ঠেলে দিতাম আর তালা দেওয়া ফুলের কাজকরা রুপোর বাক্সটা, যেটা মাকে কোনোদিন খুলতে দেখিনি, সেটাও ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখে আমি মাথাটাকে সামনে এনে তিন ভাঁজ ওয়ালা আয়নায় নিজেকে দেখতাম, আর দু'পাশের দুটো ভাঁজ করা আয়নাকে একবার বাইরের দিকে, একবার ভেতর দিকে ঠেলে ঠেলে দুটো পাশকেই মুখোমুখি রাখতাম, যাতে একটার প্রতিফলন আরেকটাতেও প্রতিফলিত হয়, আর এভাবেই একটা আয়নার মধ্যে দিয়েই আমি হাজার হাজার ওরহানকে দেখতে পেতাম। যখন আমি সবচেয়ে কাছের প্রতিফলনটা দেখতাম আমি আমার মাথার পেছন দিকটা দেখতে পেতাম আর ওই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমি ভয় পেতাম– যেমন প্রথমে আমার কান দেখেও হয়েছিল, কানগুলো পেছন দিকে গোল মতো ছিল আর একটা কান আরেকটার চাইতে একটু বেশি বাইরের দিকে বেরোনো ছিল, যেমনটা ছিল আমার বাবার। তার চেয়েও মজা লাগত আমার গলার পেছন দিকটা দেখে, মনে হত, আমি যেন একটা অপরিচিত লোকের শরীর বয়ে বেড়াচ্ছি– এই ভাবনাটা এখনো ভীতিপ্রদ। তিনটে আয়নায় ধরা পড়া শয়ে শয়ে প্রতিফলিত ওরহানরা কেমন একটু একটু পালটে যেত, যখনই আমি দু'পাশের অংশ দুটো একটু একটু নড়াতাম। যদিও প্রত্যেকটা বদলে যাওয়া প্রতিফলিত চেহারা একটা আর একটার থেকে আলাদা হত, আমার দেখে মজা লাগত যে, প্রত্যেকটা প্রতিফলিত চেহারা কেমন ক্রীতদাসের মতো আমার প্রত্যেকটা ভঙ্গীকে নকল করত। আমি নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে করে নিশ্চিত হতাম যে, প্রতিফলিত চেহারাগুলো সব আমার নিখুঁত ক্রীতদাস। কখনো কখনো আমি আয়নার সবুজ অসীমের দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে দূরের ওরহানকে দেখতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো মনে হত, আমার বিশ্বস্ত নকলবাজদের কেউ কেউ আমার হাত বা মাথা নাড়ানোটা সঙ্গে সঙ্গে নকল করছে না, এক মুহূর্ত পরে ওরা আমার ভঙ্গীটা নকল করছে। সবচেয়ে ভয় লাগত, যখন আমি আয়নার ভেতর গাল ফুলিয়ে ভুরু তুলে, জিভ বের করে নানা রকম বিকৃত মুখভঙ্গী করে ভ্যাঙাতাম এবং শয়ে শয়ে মুখ-ভ্যাঙচানো ওরহানদের মধ্যে থেকে আয়নার এক কোণার গোটা আটেক ওরহানকে বেছে নিয়ে ওদের ভ্যাঙচাতাম, তখন (আমি যে হাত নাড়িয়েছি, সেটা খেয়াল না করে) দেখতাম, আর একদল ছোট ছোট বহুদূরের বিদ্রোহী ওরহান নিজেদের মধ্যে অঙ্গভঙ্গী করছে।

আমার প্রতিফলিত চেহারাগুলোর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাটা আমার বাবা-মার হারিয়ে যাওয়ার খেলা বলে মনে করতাম এবং বোধহয় এইভাবে আমি নিজেকে সবচেয়ে ভীতিজনক ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুত করছিলাম। যদিও জানতাম না মা টেলিফোনে কী বলছেন, বা বাবা কোথায়, কবে ফিরবেন, তবুও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, একদিন আমার মা-ও চলে যাবেন।

এবং কখনো কখনো মা চলেও যেতেন। তবে মা যখন চলে যেতেন, আমাদের কারণটাও বলা হত, যেমন, 'তোমার মা অসুস্থ আর তোমার মাসী নেরিম্যান-এর বাড়িতে বিশ্রাম করছেন।' আমার আয়নার প্রতিফলনগুলো সম্বন্ধে যা ভাবতাম, এই কারণগুলোর ব্যাপারেও তাই ভাবতাম। আমি জানতাম, ওগুলো দৃষ্টিবিভ্রম, মনগড়া; তবুও আমি এসব মেনে নিতাম আর বোকা সেজে থাকতাম। কিছুদিন কেটে যাবার পর, আমাদের রাঁধুনি বেকির-এর হাতে কিংবা কেয়ারটেকার ইসমাইলের হাতে তুলে দেওয়া হত। এদের সঙ্গে আমরা কিছুটা নৌকোয়, কিছুটা বাসে, ইস্তাম্বুল পার হয়ে, শহরের এশিয়ান দিকটায় এরেনকয়-এ আত্মীয়দের কাছে অথবা বসফোরাসের অন্য শহর ইস্তিনিয়ে-তে অন্য আত্মীয়দের বাড়িতে মার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। এই দেখা-সাক্ষাৎগুলো মোটেই দুঃখজনক ছিল না, বরং এগুলোকে অভিযান বলে মনে হত। আমার দাদা আমার সঙ্গে থাকত বলে আমি ভাবতাম, কোনো বিপদাপদ হলে দাদাই আগে সেসবের মোকাবিলা করবে। যেসব বাড়ি বা 'ইয়ালি'তে আমরা যেতাম, সেই সব জায়গায় মায়ের নিকট ও দূর আত্মীয়রা বসবাস করতেন। এইসব স্নেহময় বুড়ি মামী-মাসীরা আর উলোঝুলো চুলের মামা-মেসোরা আমাদের গাল টিপে,চুমু খেয়ে আদর করতেন। তাদের বাড়ির যে সব অদ্ভুত জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ ছিল, যেমন একটা জার্মান ব্যারোমিটার, যেটার সম্বন্ধে আমি ভাবতাম, শহরের সব পশ্চিমী বাড়িতে থাকে (আর এতে দেখানো আবহাওয়া অনুযায়ী ব্যাভারিয়ান পোশাক পরা স্বামী-স্ত্রী বাড়িতে ঢুকবে বা বেরোবে) অথবা একটা ঘড়ি, যার ভেতর থেকে একটা কোকিল আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর বেরিয়ে এসে সময় ঘোষণা করবে, তারপর ঢুকে যাবে অথবা একটা সত্যিকারের ক্যানারি পাখি, যেটা তার যান্ত্রিক ভাইকে দেখে ডাকাডাকি করবে, সেইগুলো তারা আমাদের দেখতে দেওয়ার পর আমরা শেষকালে মায়ের ঘরে যেতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যেত বিশাল ঝকঝকে সমুদ্র, আমাদের চোখে তীব্র আলোর ঝলক লাগত আর এই আলোর সৌন্দর্যে (বোধহয় এই জন্যই আমি বরাবর 'মাতিসে'র দক্ষিণমুখী জানালার দৃশ্য ভালোবাসতাম) আমরা বিষণ্নচিত্তে ভাবতাম যে, মা আমাদের ছেড়ে এই অপূর্ব সুন্দর জায়গায় রয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘরের সাজ-গোজের টেবিলে মায়ের পরিচিত জিনিসগুলো দেখতে পেতাম, সেই একই চিমটে, সেন্ট-এর শিশি, একই চুলের ব্রাশ, তার পেছন দিকের অর্ধেকটা খসে গেছে, আর ঘরের বাতাসে ভাসা মায়ের অতুলনীয় মিষ্টি গন্ধ। প্রত্যেকটা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে আছে, মা কেমনভাবে আমাদের দুই ভাইকে, এক এক করে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, কেমনভাবে দাদাকে নির্দেশ দিতেন, কী বলতে হবে, কেমন ব্যবহার করতে হবে আর পরের বারে যখন আমরা আবার আসব, তখন মায়ের জন্য যেসব জিনিস নিয়ে আসতে হবে, সেগুলো কোথায় রাখা আছে এই সব– মা নির্দেশ দিতে খুব ভালোবাসতেন। যখন তিনি এইসব করতেন, আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতাম, ওদের দিকে কোনো মনোযোগই দিতাম না, যতক্ষণ না মা আমাকে ডেকে কোলে তুলে নিতেন।

এই রকম একবার যখন মা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন, তখন একদিন বাবা বাড়ি ফিরে এলেন, সঙ্গে একজন আয়া। উনি ছিলেন বেঁটে, গায়ের চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে, মোটেই সুন্দরী নন, গোলগাল আর সব সময়ই মুখে হাসি। যখন উনি আমাদের ভার নিলেন, তখন তিনি বিজ্ঞের মতো বললেন যে, তিনি যেমন ব্যবহার করবেন, আমাদেরও সেই রকম ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য পরিবারের আয়াদের মতো তিনি নন, তিনি ছিলেন তুর্কী। সেই জন্য আমরা খুব হতাশ হয়েছিলাম আর তাই কখনোই তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারিনি। আমরা যেসব আয়াদের জানতাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সবাই ছিলেন জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট আর আমাদের আয়া তাই আমাদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব করতে পারেনি। যখন আমরা দু'ভাই ঝগড়া করতাম, আয়া বলত, 'জোরে জোরে নয়, আস্তে আস্তে' আর আমরা যখন বাবার সামনে ওর নকল করতাম, বাবা হাসতেন; অল্প কিছুদিন বাদে এই আয়াও থাকল না, চলে গেল। দু'চার বছর বাদে, বাবা আবার যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন, আর দাদা ও আমি মরণ-পণ লড়াই করতাম, মা মেজাজ হারিয়ে বলতেন, 'আমিও চললাম,' অথবা 'আমি কিন্তু জানালা দিয়ে ঝাঁপ দেব,' (একবার তো মা সত্যি সত্যিই তার সুন্দর একটা পা জানালার চৌকাঠ গলিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন), কিন্তু তাতেও আমাদের লড়াই থামত না। কিন্তু যখনই মা বলতেন, 'দেখবি, এবার তোদের বাবা ওই মেয়ে লোকটাকে বিয়ে করে আনবে,' আমি ভাবতাম, মা মাঝে মাঝে রাগের চোটে যে দু'চারজন মহিলার নাম উচ্চারণ করতেন, তাদের নয়, বাবা নতুন মা হিসাবে বিয়ে করে আনবেন ওই ফ্যাকাশে রঙ-এর গোলগাল, বোকা সোকা ভালোমানুষ আয়াকে।

AMARBOI.COM

যেহেতু আমাদের এই পারিবারিক নাটকগুলো একই ছোট মঞ্চে অভিনীত হত এবং যেহেতু (পরে আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম যে, এরকম সব সত্যিকারের পরিবারেই ঘটে থাকে) আমরা প্রায় সব সময়ই একই জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলতাম আর একই খাবার খেতাম, তাই তর্কাতর্কিগুলোও ভীষণ একঘেয়ে হয়ে যেত (সমস্ত সুখের পেছনেই রয়েছে একই অভ্যাসক্রম, তার নিশ্চিতির আশ্বাস এবং তার মৃত্যুও!), আর সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যেও মাঝে মাঝে বাবা-মার এই হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়াটাকে আমি স্বাগত জানাতাম, কারণ এটা ছিল একঘেয়েমির সাংঘাতিক অভিশাপ থেকে এক ধরনের মুক্তি; ঠিক আমার মায়ের আয়নাটার মতো, এগুলো ছিল মজার, অবাক করে দেওয়া বিষাক্ত ফুলের মতো, যা আমার জন্য অন্য এক জগতের দরজা খুলে দিত। আর যেহেতু এগুলো আমাকে একটা অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যেত, যেখানে আমি নিজেকে খুঁজে পেতাম আর আমি ভুলতে চাইতাম, এমন এক নির্জনতায় আমাকে এনে ফেলত, তাই এসবে আমি মোটেই চোখের জল ফেলতাম না।

বেশির ভাগ ঝগড়াই শুরু হত খাবার সময়ে। পরবর্তী কালে যদিও এই ঝগড়াগুলো বাবার ১৯৫৯-এর ওপেল গাড়ির মধ্যেই শুরু হত, কারণ যোদ্ধাদের পক্ষে একটা দ্রুত ধাবমান গাড়ির থেকে নিজেদের আলাদা করা কঠিন ছিল, যতটা সহজ ছিল খাবার টেবিল থেকে উঠে যাওয়া। কখনো কখনো যদি আমরা পরিকল্পনা মাফিক কয়েক দিনের লম্বা সফরে গাড়ি নিয়ে বের হতাম, অথবা যদি আমরা বসফোরাসের উপকূল ধরে কোনো একটি দৈনন্দিন ভ্রমণে সবে বের হয়েছি, সে রকম সময়ে হয়তো, বাড়ি থেকে বের হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝগড়া শুরু হয়ে যেত। আমার দাদা আর আমি তখন একটা বাজি ধরতাম। ব্যাপারটা কি প্রথম পুলটার পরেই, নাকি, প্রথম পেট্রল-পাম্পের পরেই ঘটবে যে, বাবা হঠাৎ ব্রেক কষে, গাড়িটা পুরো উল্টোমুখে ঘুরিয়ে (যেমন বদমেজাজি ক্যাপ্টেন, জাহাজের মাল যেখান থেকে তুলেছিল, সেখানেই নামিয়ে দেয়), আমাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে, গাড়ি নিয়ে অন্য কোথাও উধাও হয়ে যাবেন?

প্রথম দিককার একটা ঝগড়া আমাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, বোধহয় কোনো কাব্যিক সুষমা ছিল বলে। একদিন সন্ধেবেলায় আমাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস হেইবেলিয়াডায়, সান্ধ্যভোজনের সময় বাবা-মা দুজনেই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েন (এ রকম ঘটলে আমার ভালো লাগত, কারণ তখন আমি নিজের ইচ্ছা মতো, মায়ের নির্দেশ মতো নয়, খেতে পারতাম)। কিছুক্ষণ দাদা আর আমি প্লেটের দিকে চেয়ে বসে রইলাম আর শুনতে লাগলাম, ওপরের তলায় বাবা-মা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছেন এবং তারপর প্রায় সহজাত প্রবৃত্তিবশেই আমরা দুজনও ওপরে উঠে গেলাম ওঁদের কাছে। মা আমাদের দেখে ধাক্কা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরটা ছিল অন্ধকার, কিন্তু ঘরের দুটো বড় বড় ঘষা কাচের দরজার ওপর সোজাসুজি উজ্জ্বল আলো পড়ে আলোকিত হয়েছিল। দাদা আর আমি ওই দরজার কাঁচ দিয়ে পাশের ঘরে দেখছিলাম, বাবা-মায়ের ছায়া দুটো কেমন পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সামনে এগিয়ে এসে পরস্পরকে ছুঁচ্ছে, চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে দুটো ছায়া একটা অপরটার সঙ্গে মিশে গিয়ে একটাই ছায়া হয়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে এই ছায়া-যুদ্ধ এতই হিংস্র হয়ে উঠছে যে, পরদা (ঘষা কাচ) পর্যন্ত কাঁপছে– যেমনটা দেখেছিলাম যখন আমরা কারাগোজ ছায়া নাট্য দেখতে গিয়েছিলাম,– আর সব কিছুই ছিল কালো-সাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯.

আরেকটা বাড়ি : সিহাঙ্গির

কখনো কখনো বাবা এবং মা, দুজনেই এক সঙ্গে উধাও হয়ে যেতেন। সেই রকমই হয় ১৯৫৭-এর শীতকালে, যখন আমার দাদাকে দু'তলা ওপরে চাচা-চাচীর কাছে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর আমার বেলায়– এক সন্ধ্যায় আমার এক মাসি নিশান্তাসি-তে এলেন আর আমাকে সিহাঙ্গির-এ তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমার যাতে মন খারাপ না হয়, তার জন্য উনি অনেক চেষ্টা করলেন, যেমন যে মুহূর্তে আমরা গাড়িতে বসলাম (একটা ১৯৫৬-এর শেভ্রলে গাড়ি, যেটা ষাটের দশকে ইস্তাম্বুলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল) উনি বললেন, 'আমি সেটিন-কে বলেছি আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার জন্যে দই আনতে,' আর আমার মনে আছে, আমি দই খাবার জন্য মোটেই উন্মুখ ছিলাম না, আমার খুব উৎসাহ ছিল এই ব্যাপারটায় যে এদের গাড়ির শোফার আছে। যখন আমরা এদের বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটায় এলাম (আমার দাদাজী এই বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন এবং আমি এই বাড়ির একটা অ্যাপার্টমেন্টে পরবর্তীকালে বাস করতাম) এবং দেখলাম যে, বাড়িটায় কোনো লিফট নেই, বা ঘর গরম রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই এবং অ্যাপার্টমেন্টগুলো ছোট ছোট, আমি খুব হতাশ হলাম। আমি যখন বিষণ্ন মনে এই নতুন বাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি, তখন পরের দিনই একটা খারাপ ব্যাপার হল। বিকেলের ঘুম-এর জন্যে আমাকে যখন একটা মিষ্টি, আদরে বখে যাওয়া ছেলের মতো পাজামা পরিয়ে শোয়ানো হল, আমি নিজের বাড়িতে যেমন করি, তেমনি ভাবে বাড়ির কাজের মেয়েকে ডাকলাম, 'এমিন হানিম, জলদি এসো, আমাকে তুলে পোশাক পরিয়ে দাও।'– কি হল? আমাকে জোর বকুনি দেওয়া হল। হয়তো এই জন্যেই, আমি যতদিন এই বাড়িতে ছিলাম, আমি আমার বয়েসের চাইতে বড়'র মতো ভাব-ভঙ্গী করতাম। একদিন সন্ধেবেলায় যখন মাসি, আমার মেসো, সেভকেট রাডো (কবি এবং মেলিং-এর অবিকল প্রতিরূপ সংকলনের প্রকাশক) এবং বারো বছরের মাসতুতো ভাই মেহমেত-এর সঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছি এবং যখন কিট্‌শ-এর আঁকা আমার 'দ্বিতীয় আমি'র ছবিটা দেওয়ালের সাদা ফ্রেমের মধ্যে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমি কথায় কথায় বললাম যে, আদনান মেন্ডেরেস, প্রধানমন্ত্রী, আমার চাচা হন। যেমন ভেবেছিলাম, আমার কথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন গুরুত্ব কেউ দিল না, বরং টেবিলের সবাই মিটিমিটি হাসতে লাগল। আমার খুব অপমান বোধ হল। কারণ আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম যে, প্রধানমন্ত্রী আমার চাচা।

আমার মনের এক ধাঁধা তৈরির কোণায় আমার এই বিশ্বাস ছিল। আমার বড়চাচা ওজহ্যান আর প্রধানমন্ত্রী আদনান এদের দুজনেরই নাম ছিল পাঁচ অক্ষরের আর দুটো নামেরই শেষ দুটো অক্ষর ছিল একই; প্রধানমন্ত্রী সবে আমেরিকা গিয়েছিলেন আর সেখানে আমার বড়চাচা অনেক বছর ধরে বাস করছিলেন, ওদের দুজনের ছবি আমি প্রায় প্রতিদিনই দেখতাম অসংখ্যবার (প্রধানমন্ত্রীর ছবি খবরের কাগজে আর আমার বড়চাচার ছবি দাদীমার বসার ঘরে সর্বত্র) আর, কয়েকটা ছবিতে দুজনকে একই রকম দেখতে লাগত– কাজেই আমার মনে এই যে একটা কাল্পনিক দৃশ্য তৈরি হয়েছিল, সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু মোটেই নয়। পরবর্তী জীবনে আমার এই মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতনতা আমাকে অন্যান্য অনেক বিশ্বাস, মতবাদ, সংস্কার এবং নান্দনিক পক্ষপাতিত্ব থেকে বাঁচাতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম যে, দুজন লোকের একই রকম নাম হলে তাদের চরিত্রও একই রকমের হবে, বা একটা অপরিচিত শব্দ, তা সে তুর্কী ভাষারই হোক, বা বিদেশি ভাষারই হোক, অন্য একটা একই রকম বানানের শব্দের সমার্থক হবে, কিংবা গালে টোল-পড়া কোনো মেয়ের আত্মা, আমার জানা অন্য কোনো গালে টোল-পড়া মেয়ের আত্মার বিশেষত্ব বহন করবে, অথবা সব মোটা লোকেরা একই রকম, সব গরিব লোকেরা একই সম্প্রদায়ের, যার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; যে, ব্রাজিল এবং মটর শুঁটির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে– এই জন্য নয় যে তুর্কী ভাষায় ব্রাজিলকে 'ব্রেজিলিয়া' বলা হয় আর তুর্কী ভাষায় মটরশুঁটিকে 'বেজেলিয়ে' বলা হয়, কিন্তু এই জন্য যে, ব্রাজিলিয়ান পতাকায়, মনে হয় একটা মস্ত বড় মটরশুঁটি আঁকা আছে। আমি অনেক আমেরিকানকে একই জিনিস করতে দেখেছি যখন তারা 'টার্কি' নামের দেশের সঙ্গে 'টার্কি' নামের পাখির একটা সম্পর্ক খুঁজে বার করে। আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে আমার বড়চাচা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কটা একই রকম আছে; একবার সম্পর্কটা মনের মধ্যে স্থাপিত হয়ে গেলে, সেটাকে আর ছেঁড়া যায় না, কাজেই আমি যখন এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়কে একটা রেস্তরাঁয় (ছোট বেলায় দারুণ আনন্দ পেতাম যখন শহরে কোনো জায়গায় গেলে আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত) একবার পালংশাকের সঙ্গে ডিম খেতে দেখেছিলাম, আমার মনের একটা অংশে একটা প্রত্যয় জন্মে গিয়েছিল যে, এই আত্মীয়টি এখনো সেই একই রেস্তরাঁয়, পালং-শাকের সঙ্গে ডিম খেয়ে চলেছেন, পঞ্চাশ বছর পরেও।

এই বাড়িতে আমাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হত না আর আমারও মনে হত না যে, আমি এই বাড়ির ছেলে। তাই এই সব মন ভালো-করা দিবাস্বপ্নগুলো দিয়ে আমার জীবনকে সুন্দর করে তোলার যে ক্ষমতা আমার ছিল তাতেই আমার এই বাড়িতে থাকা সম্ভব হয়েছিল। খুব শিগগিরই আমি একটা নতুন পরীক্ষা চালালাম। প্রত্যেকদিন সকালে আমার মাসতুতো ভাই তার জার্মান স্কুলে চলে যাবার পর আমি ওর একটা বিরাট মোটা, সুন্দর বই (সেটা মনে হয় ব্রোকহাউস সংকলন ছিল) খুলে ওর টেবিলে বসে পড়তাম আর বই-এর লেখাগুলো লাইন ধরে ধরে নকল করতাম। আমি জার্মান ভাষা জানতাম না, পড়তে তো পারতামই না, কাজেই কিছুই না বুঝে বই-এর গদ্য লেখার প্রতিটি লাইন, প্রতিটি বাক্য হুবহু ছবি আঁকার মতো এঁকে যেতাম। খুব কঠিন একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গথিক অক্ষর (একটা 'জি' অথবা একটা 'কে') দেওয়া একটা বাক্য শেষ করার পর, সাফেরি ক্ষুদ্র শিল্প আঁকিয়েরা একটা বিশাল প্লেন গাছের হাজার হাজার পাতা একটার পর একটা এঁকে, যা করতেন, আমিও তাই করতাম, অর্থাৎ অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর মাঝখানের ফাঁক দিয়ে খালি জমিগুলো এবং সমুদ্রের দিকে যাওয়া রাস্তাগুলোর ওপর চোখ রাখতাম আর বসফোরাসের ওপর দিয়ে চলাচল করা জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখকে বিশ্রাম দিতাম।

এই সিহাঙ্গিরে এসেই (যেখানে আমাদের ভাগ্য খারাপ হওয়ার পর আমরাও চলে এসেছিলাম) আমি প্রথম জানলাম যে, ইস্তাম্বুল একটা দেওয়াল ঘেরা মানুষদের অজানা জনতার ভীড় নয়– একটা অ্যাপার্টমেন্টের জঙ্গল নয় যেখানে কে মারা গেল বা কারা উৎসব করছে, কেউ জানে না– কিন্তু ইস্তাম্বুল একটা মহল্লাময় দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে। যখন আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতাম, আমি কেবলমাত্র বসফোরাস এবং তার পরিচিত প্রণালীগুলোর মধ্যে দিয়ে জাহাজের ধীর চলাচলই দেখতাম না, আমি বাড়িগুলোর মাঝখানে মাঝখানে বাগানগুলোও দেখতাম, পুরোনো প্রাসাদগুলোও দেখতাম, যেগুলো তখনো ভাঙা হয়নি, আর ভেঙে-পড়া দেওয়ালগুলোর মাঝখানে বাচ্চাদের খেলতেও দেখতাম। বসফোরাসের দিকে মুখ করা অনেক বাড়ির মতোই, আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে একটা খাড়া, আঁকাবাঁকা পাথর বাঁধানো গলিপথ ছিল, যেটা একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বরফ-পড়া সন্ধেবেলায় আমি, মাসী আর মাসতুতো ভাই-এর সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে, দূর থেকে, হুল্লোড়বাজ, খুশি বাচ্চাদের সেই গলিপথ ধরে স্লেড, চেয়ার বা কাঠের তক্তা নিয়ে পিছলে নিচে নেমে যাওয়া দেখতাম।

তুরস্কের ফিল্ম শিল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল বিওগলুতে ইয়েসিলক্যাম স্ট্রীটে, মাত্র দশ মিনিট দূরত্বে। এই ফিল্ম শিল্প তখনকার দিনে বছরে সাতশ' ফিল্ম তৈরি করত, এবং পৃথিবীতে ভারতবর্ষের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম সিনেমা শিল্প ছিল। যেহেতু অনেক অভিনেতাই সিহাঙ্গির-এ বাস করত, তাই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো 'চাচা' এবং ক্লান্ত, বেশি-সাজা-গোজা চাচী-তে ভর্তি ছিল, যারা প্রত্যেকটি ফিল্মে একই ধরনের চরিত্র চিত্রণ করত। কাজেই বাচ্চারা যখন এইসব অভিনেতাদের চিনতে পারত, সেটা কেবল ওদের গতানুগতিক চরিত্রাভিনয়ের জন্যই (যেমন ওয়াহি ওজ, যে সব সময় মোটা বুড়ো তাসের জুয়াড়ীর চরিত্রে অভিনয় করত, যে কিনা নিরীহ অল্পবয়েসি বাড়ির পরিচারিকাদের লোভ দেখিয়ে কাছে টানত)। তাই বাচ্চারা তাদের টিটকারি দিত আর রাস্তায় ওদের পেছনে পেছনে তাড়া করত। বৃষ্টির দিনে সেই খাড়া গলিপথে গাড়িগুলোর চাকা পিছলাত আর ট্রাকগুলো প্রায় লড়াই করে ওপরে উঠত; রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে হঠাৎ কোথা থেকে একটা মিনিবাস উদয় হত আর অভিনেতারা, আলো ধরার লোকেরা এবং ফিল্মের অন্যান্য লোকেরা বেরিয়ে পড়ত গাড়ির ভেতর থেকে; দশ মিনিটের মধ্যে একটা প্রেমের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে ওরা আবার উধাও হয়ে যেত। অনেক বছর পরে আমি এই রকম একটা সাদা-কালো ফিল্ম টেলিভিশনে দেখেছিলাম এবং তখন বুঝেছিলাম যে, আসলে ফিল্মের বিষয়বস্তু সামনের প্রেমের দৃশ্য ছিল না, দূরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল বসফোরাসের দৃশ্যই আসল বিষয়বস্তু ছিল।

AMARBOI.COM

অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে বসফোরাসকে দেখতে দেখতে আমি পাড়ার জীবন সম্পর্কে অন্য কিছু জানতে পারি। কোথাও না কোথাও একটা কেন্দ্রস্থল থাকবেই (সাধারণতঃ একটা দোকান) যেখানে সব গল্পগুলো জমা হয়, নানা রকম ব্যাখ্যা হয় এবং মূল্যায়ন হয়। সিহাঙ্গির-এ এই কেন্দ্রস্থল ছিল একটা মুদি দোকান, আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির এক তলায়। মুদি ছিল একজন গ্রিক (ওর দোকানের ওপরের অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে বসবাসকারী অন্যান্য পরিবারের মতোই); যদি লাইগর-এর কাছ থেকে কারোর কিছু কেনার দরকার হত, তাহলে সে ওপর তলা থেকে একটা ঝুড়ি নামিয়ে দিত আর চেঁচিয়ে নিজের প্রয়োজন জানিয়ে দিত। অনেক বছর পরে যখন আমরা এই বাড়িতে বাস করতে এলাম, তখন আমার মা দেখলেন যে, যখনই ওঁর রুটি বা ডিম ইত্যাদির প্রয়োজন হবে, তখনই ওপর থেকে চিৎকার করে মুদিকে জানাতে হবে, এই ব্যাপারটা ওঁর মোটেই পছন্দ হল না আর তাই মা, অন্য প্রতিবেশিদের চাইতে বেশি সুন্দর দেখতে একটা ঝুড়িতে নিজের জিনিসের প্রয়োজন কাগজের টুকরোয় লিখে নিচে নামিয়ে দিতেন। যখন আমার মাসির দুষ্টু ছেলেটা জানালা খুলত, ও সাধারণত নিচের রাস্তায় খাড়া চড়াই ভেঙে ধীরে চলা গাড়ির ছাদে টিপ করে থুতু ফেলত, কিংবা একটা পেরেক ছুড়ে ফেলত, অথবা একটা সুতোয় কায়দা করে বেঁধে একটা পটকা নিচে ফেলত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো যখন আমি কোনো উঁচু বাড়ির জানালা খুলে নিচে রাস্তায় তাকাই, আমি ভাবি, নিচে হেঁটে যাওয়া পথচারীদের ওপর থুতু ফেলতে কেমন লাগবে।

আমার মাসির স্বামী, সেভকেত রাডো, তার প্রথম জীবনটা একজন কবি হবার চেষ্টায় কাটান এবং অকৃতকার্য হন। পরে তিনি একজন সাংবাদিক ও প্রকাশক হলেন, এবং আমি যখন ওই বাড়িতে ছিলাম, তখন তিনি 'হায়াত' (জীবন), তখনকার তুর্কীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক, পত্রিকার সম্পাদক; কিন্তু পাঁচ বছর বয়েসে আমার এসবে কোনো আগ্রহ ছিল না বা আমার মেসো যে অনেক কবি ও লেখকদের বন্ধু ছিলেন, যারা আমার নিজের ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে ধারণাকে ভবিষ্যতে প্রভাবিত করবেন, তাতেও কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে ছিলেন, ইয়াহিয়া কামাল, তানপিনার এবং কামালুদ্দিন টুগকু, যিনি ভাবপ্রবণ নাটকীয়তায় ভরা ডিকেনস-এর লেখার মতো ছোটদের গল্পের লেখক ছিলেন, যাতে শহরের গরিব পাড়ার উত্তেজনাময় নক্সাকাটা রাস্তার জীবনের ছবি পাওয়া যেত। বরং পাঁচ বছর বয়েসে আমাকে উত্তেজিত করে তুলত শয়ে শয়ে বাচ্চাদের বই যেগুলো আমার মেসো প্রকাশ করতেন আর আমাকে, পড়তে শেখার পর, উপহার হিসেবে দিতেন (আমি পড়তাম সহস্র এক আরব্য রজনীর সংক্ষেপিত সংস্করণ, ফ্যালকন ব্রাদার্স খণ্ডগুলো, আবিষ্কারের এনসাইক্লোপিডিয়া)।

সপ্তাহে একবার আমার মাসী আমাকে নিশান্তাসিতে আমার দাদার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য নিয়ে যেতেন। দাদা বলত পামুক অ্যাপার্টমেন্টে ও কী সুখে আছে, প্রাতরাশে কেমন হেরিং মাছ খায়, সন্ধ্যাবেলায় সবাই মিলে কেমন হাসি, খেলাধুলা করে আর পরিবারের অন্যান্য মজাগুলো করে, যেগুলো আমি করতে পারি না; চাচার সঙ্গে ফুটবল খেলে, চাচার ডজ গাড়িতে চেপে রবিবারে বসফোরাসে যায়, রেডিওতে খেলার খবর শোনে, আর আমাদের প্রিয় রেডিও-নাটক শোনে। এই সব কিছু দাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলত, আর সম্ভব হলেই বাড়িয়ে বলত। তখন সেভকেত বলতেন, 'যেও না, এখন থেকে তুমি এখানেই থাকবে।'

যখন সিহাঙ্গির-এ ফিরে যাবার সময় হত, তখন দাদাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুব কঠিন হত, এমনকি, আমাদের নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টের দুঃখী তালা দেওয়া দরজাকে 'বিদায়' জানাতে ভীষণ কষ্ট হত। একবার এ বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় আমি হল ঘরের রেডিয়েটরটা আঁকড়ে ধরে জোরে জোরে চিৎকার করে কাঁদছিলাম, যাতে না যেতে হয়। ওরা জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল; যদিও আমার লজ্জা করছিল, তবু আমি যতক্ষণ পারি আঁকড়ে ধরে ছিলাম– মনে হচ্ছিল আমি বুঝি কমিক বই-এর হিরো, পাহাড়ের অনেক নিচের খাদে পড়ার আগে একটা পাহাড়ের ধারে গজিয়ে ওঠা একলা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে খাদে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছি।

বাড়িটার প্রতি আমি কি আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম? পঞ্চাশ বছর পরে আমি কিন্তু সত্যিই সেই বাড়িতেই ফিরে এসেছি। কিন্তু এই বাড়ির ঘরগুলো কিংবা ভেতরের জিনিসপত্রগুলোর সৌন্দর্যই আমার কাছে সব নয়। তখনো যেমন ছিল আজও তেমনি, আমার মনের মধ্যে বাড়ি মানে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল– একটা মুক্তির পথ– মুক্তি কথাটার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক, দুই অর্থেই। আমার যাবতীয় দুঃখকষ্টের মুখোমুখি হতে আমি শিখিনি, সে আমার বাবা-মার নিরন্তর ঝগড়াগুলো সম্বন্ধে সচেতনতাই হোক, বা আমার বাবার দেউলিয়া হয়ে যাওয়াই হোক, আমাদের পরিবারের অন্তহীন সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিবাদই হোক, বা আমাদের ক্ষয়িষ্ণু ভাগ্যই হোক; তার পরিবর্তে আমি নিজের মনে মনে কাল্পনিক খেলায় আনন্দ পেতাম, যে খেলায় আমি সত্যের অপলাপ করে কেন্দ্র পরিবর্তন করতাম, নিজেকে ঠকাতাম, আমার আসল দুঃখকষ্ট কী এবং কোথায়, তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে একটা রহস্যময় অস্পষ্টতার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতাম।

এই যে মনের একটা বিশৃঙ্খল, ধোঁয়াটে অবস্থা, একে আমরা বিষণ্নতা বলতে পারি, অথবা এই অবস্থাকে তুর্কী ভাষায় 'হুজুন' বলতে পারি, যেটাতে বোঝায় একটা সাম্প্রদায়িক বিষণ্নতা, একান্ত নিজস্ব নয়। কোনো স্পষ্টতা নয়; পরিবর্তে সত্যকে আড়াল করে 'হুজুন' আমাদের বিষাদ থেকে মুক্তি দিয়ে প্রফুল্ল করে, শীতকালে চায়ের কেটলি থেকে নিঃসারিত বাষ্প জানালার কাচে যেমন ঘনীভূত হয়, তেমনিভাবে দৃশ্যকে নরম ঝাপসা করে তোলে। জানালার কাচের ঘনীভূত বাষ্প দেখে আমি 'হুজুন'কে অনুভব করি আর এখনো উঠে জানালার কাছে গিয়ে আঙুল দিয়ে ওই জানালার কাচে জমা বাষ্পের ওপর লিখি। যখন ঐ রকম লিখি, বা ছবি আঁকি, আমার ভেতরকার 'হুজুন' মিলিয়ে যায় আর আমি তখন নিজেকে এলিয়ে দিই; আমার যাবতীয় লেখা এবং আঁকা হয়ে গেলে হাতের পেছন দিক দিয়ে সব কিছু মুছে ফেলে, বাইরে তাকাতে পারি। কিন্তু বাইরের দৃশ্য আবার তার 'হুজুন' আনতে পারে। তখন সময় হয় এই ইস্তাম্বুল শহর যেটাকে তার ভাগ্য বলে বহন করে নিয়ে চলে, সেই উপলব্ধির মর্মে পৌঁছনোর যাত্রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০
হুজুন

হুজুন; বিষণ্নতার প্রতিশব্দ তুর্কী ভাষায়, এর উৎস হচ্ছে আরবিক। যখন এই শব্দটিকে কোরানে দেখি (দুটো হাদিশে এটা লেখা আছে 'হুজ্‌ন' আর অন্য তিনটে হাদিশে লেখা আছে 'হাজেন' বলে), তখন এর অর্থ সমসাময়িক তুর্কী ভাষায় যা অর্থ হয়, প্রায় তাই। নবী মহম্মদ যে বছরে তাঁর স্ত্রী হাতিশ এবং তাঁর চাচা আবু তালিবকে হারিয়েছিলেন, সেই বছরকে 'সেনেতুল হুজ্‌ন' বা বিষণ্নতার বছর বলেছিলেন; এটাই প্রমাণ করে যে, শব্দটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক ক্ষতির ব্যাঞ্জনা বহন করে। কিন্তু 'হুজুন' শব্দটি যদি ক্ষতি, আধ্যাত্মিক কষ্ট এবং তার অনুষঙ্গ দুঃখ, ইত্যাদি অর্থ নিয়ে তার জীবন শুরু করে থাকে, আমার নিজস্ব উপলব্ধি কিন্তু একটা ছোট্ট দার্শনিক ত্রুটি, যেটা ইসলামিক ইতিহাস পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে আহরণ করেছে; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা 'হুজুন'-এর উদ্ভব আমরা দেখি, আর প্রত্যেকটিই তার নিজস্ব সুস্পষ্ট দার্শনিক মতবাদ তুলে ধরেছে।

প্রথম মতবাদটিতে আমরা 'হুজুন' উপলব্ধি করি তখন, যখন আমরা পার্থিব আনন্দ আর বৈষয়িক লাভ-এর জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগ করি; মর্মার্থ হচ্ছে, 'এই অনিত্য পৃথিবীতে যদি নিজেকে আদ্যন্ত না জড়াতে, যদি তুমি উত্তম এবং সাচ্চা মুসলিম হতে, তাহলে তুমি এই পার্থিব লোকসানগুলোকে নগন্য মনে করতে।' দ্বিতীয় মতবাদটি, যেটা সুফি অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে উদ্ভূত, শব্দটির একটি সাকারাত্মক ও সংবেদনশীলতার এবং জীবনে ক্ষতি ও তদ্‌জনিত দুঃখের বোধ এনে দেয়। সুফিদের কাছে, 'হুজুন' হচ্ছে একটা আধ্যাত্মিক কষ্ট-বোধ, যা আমরা অনুভব করি, কারণ আমরা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারছি না, কারণ এই পৃথিবীতে আমরা আল্লাহর জন্য বিশেষ কিছু করতে পারছি না।

সত্যিকারের সুফি অনুগামী, কোনো পার্থিব বিষয়, যেমন, মৃত্যুর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করবে না, পার্থিব বিষয় সম্পদের কথা তো কোন্ ছাড়! সে দুঃখ, শূন্যতা বোধ এবং অক্ষমতা ইত্যাদিতে ভোগে, কারণ সে আল্লাহর কাছাকাছি কখনো হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ সম্বন্ধে তার ভীতি প্রগাঢ় নয়। উপরন্তু, 'হুজুন'-এর উপস্থিতি নয়, অনুপস্থিতিই তার হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে 'হুজুন'-এর উপলব্ধি পায়নি বলেই, তা পেতে চায়; সে যথেষ্ট কষ্ট পায়নি বলেই, কষ্ট পেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়, এবং এই যুক্তিবাদের সমাধান অনুসরণ করেই ইসলামিক সংস্কৃতি 'হুজুন'-কে একটা উচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। 'হুজুন' যদি বিগত দু'শতাব্দী ধরে ইস্তাম্বুল সংস্কৃতির, কাব্যের এবং দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকে, যদি তা আমাদের সঙ্গীতেও প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তাহলে অন্তত আংশিকভাবে হলেও এটাকে আমরা একটা সম্মান বলে মনে করি। গত এক শতাব্দী ধরে 'হুজুন' শব্দটি কী অর্থ বহন করছে, তা বুঝতে গেলে, শব্দটির টিকে থাকার ক্ষমতা বোঝাতে গেলে, সুফি মতবাদ শব্দটিতে যে সম্মান যোগ করেছে, তা বলাই যথেষ্ট নয়। গত একশ বছর ধরে ইস্তাম্বুলের সঙ্গীতে 'হুজুন'-এর আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বোঝাতে গেলে, 'হুজুন' কেন কেবলমাত্র আধুনিক তুর্কী কবিতার মেজাজই শুধু নয়, তার প্রতীকীবাদেও দখলদারি কায়েম করেছে, সেটা বুঝতে গেলে এবং কেন, ডিভান কবিতার মহান প্রতীকের মতো, একে অতিরিক্ত ব্যবহার, এমনকি, অপব্যবহারও সইতে হয়েছে; পার্থিব লোকসান, অস্থিরতা এবং আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা ভোগ জ্ঞাপন করা একটা সাংস্কৃতিক ধারণা যে 'হুজুন'-এর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব, সেটা বুঝতে গেলে, এই শব্দটির ইতিহাস এবং যে মর্যাদা আমরা এই শব্দটার ওপর আরোপ করি, সেটা জানাই যথেষ্ট নয়। শিশুকালে ইস্তাম্বুল আমাকে 'হুজুন'-এর যে প্রগাঢ়তার বোধ দিয়েছিল, তা বোঝাতে গেলে আমাকে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এই শহরের ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে এবং– আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার– যেভাবে এই শহরের 'সুন্দর' ভূদৃশ্যাবলী এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে এই ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে, তা বলতে হবে। ইস্তাম্বুলের 'হুজুন' কেবলমাত্র তার সঙ্গীত এবং কাব্য আহরিত মানসিকতাই নয়, এটা জীবনকে দেখার একটা পথ, যে জীবন আমাদের সকলকে জড়িয়ে নেয়, কেবল আধ্যাত্মিকতায় নয়, এমন একটা মানসিকতায় যেটা শেষ পর্যন্ত যেমন জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তেমনি অস্বীকারও করে।

শব্দটির এই দ্ব্যর্থবোধ অনুসন্ধান করতে গেলে, আমাদের সেই সব চিন্তাশীল মনীষিদের কাছে ফিরে যেতে হবে, যারা 'হুজুন'-কে একটা কাব্যিক বোধ বা একটা মর্যাদাময় অবস্থিতি হিসেবে দেখেন না, তাঁরা এটাকে একটা অসুস্থতা হিসাবে দেখেন। এল্ কিন্ডির মত অনুযায়ী, 'হুজুন' কেবলমাত্র কোনো প্রিয়জনকে হারানো বা মৃত্যুর সঙ্গেই জড়িত নয়, অন্য আত্মিক অস্থিরতা, যেমন ক্রোধ, ভালোবাসা, বিদ্বেষ এবং অহেতুক ভীতি, ইত্যাদির সঙ্গেও জড়িত। (দার্শনিক-চিকিৎসক ইবন সিনা 'হুজুন্‌কে একই স্থূল অর্থে দেখেন এবং তাই তিনি বলেছিলেন যে, প্রেম পীড়িত অসহায় কোনো যুবকের রোগ নির্ণয় করার সঠিক উপায় হল, ছেলেটির নাড়ী দেখতে দেখতে তাকে মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করা।) সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বার্টন-এর হেঁয়ালি-ভরা কিন্তু আনন্দদায়ক মোটা বইটা, 'দ্য অ্যানাটমি অফ মেলাঙ্কলি'-তে যেভাবে 'হুজুন'-কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ঠিক একই রকমভাবে শ্রেষ্ঠ ইসলামিক চিন্তাশীল মনীষিরাও 'হুজুন'-কে দেখেন। (এই ১৫০০ পাতার বইটির পাশে ইবন সিনা-র শ্রেষ্ঠ লেখা 'ফি'ল হুজ্‌ন'-কে স্রেফ একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা বলে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়।) ইবন সিনার মতো, বার্টন 'কালো যন্ত্রণা' সম্পর্কে একটা সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিলেন, যাতে সম্ভাব্য কারণ হিসাবে মৃতুভয়, প্রেমে পরাজয়, কুকর্ম এবং যে কোনো পানীয় বা খাদ্যকে তিনি তালিকাভুক্ত করেছিলেন আর তাঁর আরোগ্যের তালিকাও মোটামুটিভাবে এই রকম বিস্তৃত ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে দর্শনের সাথে যোগ করে, তিনি তাঁর পাঠকদের কার্য, কারণ, হতাশা, নৈতিক উৎকর্ষ, শৃঙ্খলা এবং উপবাস ইত্যাদির মধ্যে এর উপশম খুঁজতে পরামর্শ দিয়েছিলেন– দু'রকম ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যময় দুটি গ্রন্থের মধ্যে সম চিন্তাধারার একটি আকর্ষনীয় উদাহরণ।

কাজেই 'হুজুন'-এর উৎপত্তি একই 'কালো আবেগ' যাকে বিষণ্নতা (মেলাঙ্কলি) বলা হয়, তা থেকে। কথাটির শব্দতত্ত্ব (মেলান খোলে-কালো পিত্ত) নির্দেশ করে একটা রসিকতার ভিত্তিকে, যা প্রথম ভাবা হয়েছিল অ্যারিস্টটলের সময়ে এবং এই বোধের সঙ্গে সাধারণভাবে যুক্ত বর্ণালী এবং এর দ্বারা বোঝানো সর্বব্যাপী যন্ত্রণা এই শব্দটি আমাদের দেয়। এখানেই কিন্তু আবার আমরা এই দুটি শব্দের মধ্যেকার মৌলিক তফাত দেখতে পাই। বার্টন, যিনি এই রোগটি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গর্ববোধ করতেন, বিশ্বাস করতেন যে, বিষণ্নতা একটি সুখী নির্জনতার পথ তৈরি করে দেয়, কারণ এটি তার কল্পনাশক্তিকে আরো শক্তিশালী করে এবং তাই মাঝে মাঝেই এটাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। বিষণ্নতা নির্জনতার ফল অথবা কারণ যাই হোক না কেন, তাতে কিছুই যায় আসে না; দুটি ক্ষেত্রেই বার্টন নির্জনতাকে দেখেছিলেন, বিষণ্নতার একদম অন্তঃস্থল, একান্ত নির্যাস রূপে। কিন্তু এল কিণ্ডির ক্ষেত্রে, যিনি 'হুজুন'কে একটা রহস্যাবৃত অবস্থা (আল্লাহ্‌র সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আমাদের সবার যে লক্ষ্য, তার ব্যর্থতা প্রসূত) এবং একটি অসুস্থতা হিসাবে দেখেছিলেন, কেন্দ্রীয় অবস্থান, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইসলামিক চিন্তাশীল মনীষিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই, হচ্ছে 'সিমাত', অথবা বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়। তিনি 'সিমাত'-এর মূল্য দিয়ে 'হুজুন্‌কে বিচার করেছিলেন এবং কিছু আরোগ্যের পথ নির্দেশ করেছিলেন, যাতে আমরা এর কাছে ফিরতে পারি; মোট কথায় তিনি 'হুজুন'কে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বিরোধী একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেছিলেন।

একটা বাষ্পাচ্ছন্ন ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলে একটা শিশুর যে আবেগ অনুভূত হয়, তাই দিয়েই আমি শুরু করেছিলাম। এখন আমরা 'হুজুন'-কে বুঝতে শুরু করেছি, একটা মাত্র মানুষের বিষণ্নতা হিসাবে নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের একত্রে যে খাট্টা (কালো) মেজাজ হয়, সেই হিসাবে। আমি যা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে একটা গোটা শহরের, ইস্তাম্বুলের 'হুজুন'-এর কথা।

ইস্তাম্বুলের এই যে অনন্য অনুভূতি, যা তার অধিবাসীদের একত্রে বেঁধে রেখেছে, সেটা বর্ণনা করার আগে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একজন ভূ-দৃশ্য অঙ্কন শিল্পীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, তার আঁকা ভূ-দৃশ্যের চিত্র দেখে দর্শকের মনে সেই অনুভূতিই হবে, যা শিল্পীর নিজের মনেও হয়। মধ্য উনবিংশ শতাব্দীতে কল্পনা প্রবণদের মধ্যে বিশেষ করে এই ধারণা বহুল প্রচলিত ছিল। যখন বদলেয়ার, ইউজিন ডেলাক্রুকসের আঁকা ছবিগুলোতে ওই একই জিনিস দেখতে পান, যা তাঁকেও ছবিগুলোর ভেতরকার বিষণ্নতার পরিমন্ডল হিসাবে প্রভাবিত করেছিল, কল্পনা-প্রবণদের এবং পরবর্তী কালের ক্ষয়িষ্ণুদের মতো, তখন তিনি শব্দটিকে সম্পূর্ণ ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করেছিলেন, প্রশংসা হিসেবে। বদলেয়ার, ডেলাক্রুকসের ওপর তাঁর এই অভিমত লেখার (১৮৪৬ সালে) ছ'বছর পর, তাঁর বন্ধু, লেখক ও সমালোচক থিওফিল গটিয়ের ইস্তাম্বুল আসেন। শহরের ওপর গটিয়ের-এর লেখা, পরবর্তীকালে ইস্তাম্বুলের লেখকদের, যেমন ইয়াহিয়া কামাল এবং তানপিনার, ওপর গভীর ছাপ ফেলে; কাজেই এটা বোঝা যুক্তিযুক্ত হবে যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গটিয়ের যখন শহরের কিছু কিছু দৃশ্যকে বিষণ্ন বলে বর্ণনা করেন, তিনিও সেটা প্রশংসা হিসাবেই করেছিলেন।

এখন আমি যা বর্ণনা করতে যাচ্ছি, তা কিন্তু ইস্তাম্বুলের বিষণ্নতা নয়, সেটা হচ্ছে ইস্তাম্বুলের 'হুজুন', যার মধ্যে আমরা নিজেদের প্রতিফলিত হতে দেখি, সেই 'হুজুন' যা আমরা গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করি এবং একটা সম্প্রদায় হিসাবে ভাগ করে নিই। এই 'হুজুন'-কে অনুভব করা মানে দৃশ্যগুলোকে দেখা, স্মৃতিকে জাগরিত করা, যার মধ্যে এই শহরটা নিজেই 'হুজুন'-এর নির্যাস রূপে, উদাহরণস্বরূপ প্রতিভাত হয়।

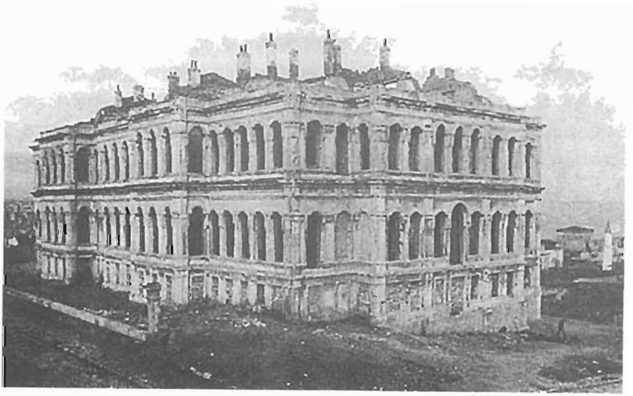

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলছি, সেই সব সন্ধ্যার কথা, যখন সূর্য তাড়াতাড়ি ডুবে যায়, যখন বাবারা হাতে প্লাস্টিকের ঝোলা নিয়ে শহরের প্রত্যন্ত পথে রাস্তার বাতির তলায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে; শীতের মাঝামাঝি, পরিত্যক্ত ঘাট স্টেশনে পুরোনো বসফোরাস ফেরি নৌকোগুলোর নোঙর বাঁধার কথা, যেখানে নাবিকেরা ঘুম চোখে ডেক ঝাঁট দেয়, হাতে একটা ময়লা-দানি আর এক চোখ দূরের সাদা-কালো টেলিভিশনের পর্দায়, সেই সব পুরোনো বই-বিক্রেতাদের কথা, যারা একটা অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে আরেকটা সমস্যায় ভুগতে ভুগতে সারা দিন ধরে খদ্দেরের আশায় ঠান্ডায় কাঁপতে থাকে; সেই সব নাপিতদের কথা যারা অভিযোগ করে যে একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর লোকেরা আর চুল-দাড়ি কামাতে আসে না; পাথর বাঁধানো রাস্তায় গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে বল খেলা শিশুদের কথা; সেই সব সর্বাঙ্গ-ঢাকা নারীদের কথা, যারা প্লাস্টিকের বাজার করার ব্যাগ হাতে নিয়ে দূরের বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে আর কারো সঙ্গে কথা না বলে বাসের জন্য অপেক্ষা করে, যে বাস কোনোদিন আসে না; পুরোনো বসফোরাস আবাসগুলোর শূন্য-নৌকো ঘরগুলোর কথা; বেকার মানুষে ছাদ পর্যন্ত ঠাসা চায়ের দোকানগুলোর কথা; গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় শহরের বড় বড় স্কোয়ারে একটি শেষ মাতাল পর্যটকের খোঁজে এধার ওধার হাঁটতে থাকা ধৈর্যশীল মেয়েছেলের দালালদের কথা; শীতের সন্ধ্যায় ফেরি নৌকো ধরতে ছোটা ভীড়ের কথা; সেই সব কাঠের বাড়ির কথা, যেগুলোর পাশাদের প্রাসাদ থাকার সময়েও তাদের প্রত্যেকটি কাঠের তক্তা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করত, আর এখনতো আরও করে, কারণ এখন ওগুলো পৌর প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে; সেই সব নারীদের কথা, যারা পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে স্বামীদের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে, যে স্বামীরা কখনোই অনেক রাত করে ছাড়া বাড়ি ফেরে না; সেই সব বৃদ্ধের কথা, যারা মসজিদ প্রাঙ্গণে ধর্মগ্রন্থ, জপমালা ও তীর্থের তেল বিক্রি করে; হাজার হাজার একই রকম প্রবেশ-দ্বারের অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর কথা, তাদের বহির্ভাগ ধুলো ময়লা, ঝুল, জং ইত্যাদিতে বর্ণহীন হয়ে পড়েছে; শূন্য পার্কগুলোয় ভাঙা দোলনাগুলোর কথা; কুয়াশার ভেতরে জাহাজের গম্ভীর ভোঁ বেজে ওঠার কথা; বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর শহরের দেওয়াল ও ধ্বংসাবশেষ– এর কথা; সন্ধ্যাবেলায় ফাঁকা হয়ে যাওয়া বাজারগুলোর কথা; দরবেশদের আস্তানাগুলো, ঠেকগুলোর কথা, যেগুলো এখন জরাজীর্ণ; ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে শ্যাওলা, গুগলি ঢাকা জং-ধরা বার্জগুলোর ওপর বসে থাকা অবিচলিত সামুদ্রিক ঈগলদের কথা; বছরের শীতলতম দিনে একশ' বছরের পুরোনো প্রাসাদগুলোর একমাত্র চিমনি থেকে সরু সুতোর মতো ধোঁয়া বেরোনোর কথা; গালাতা ব্রিজের পাশে মাছ ধরতে বসা লোকেদের ভীড়ের কথা; লাইব্রেরির ঠান্ডা পড়ার ঘরগুলোর কথা; রাস্তার ফটোগ্রাফারদের কথা; সিনেমা হলগুলোর মধ্যে নির্গত শ্বাসের গন্ধের কথা, যে সিনেমা হলগুলো একদা সোনালি ছাদ নিয়ে ঝলমল করত; আর এখন যেখানে অশ্লীল ছবি দেখার জন্য লজ্জায় মুখ ঢেকে মানুষেরা ভীড় করে; সেই সব বড় বড় রাস্তার কথা, যেখানে সূর্যাস্তের পর কোনো একলা নারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যাবে না; দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে আসা, গরম ঝোড়ো দিনে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বেশ্যালয়ের দরজার চারপাশের ভীড়ের কথা; সেই সব অল্পবয়েসি মেয়েদের কথা, যারা সস্তায় মাংস বিক্রি করার দোকানগুলোতে লাইন দেয়; ছুটির দিনে মসজিদের গম্বুজে যে সব পবিত্র নির্দেশ আলো দিয়ে লেখা হয়, আর যেখানে যেখানে আলোর বাল্বগুলো কেটে গেছে, সেখানকার হারিয়ে যাওয়া অক্ষরগুলোর কথা; ছেঁড়া খোঁড়া, কালচে হয়ে যাওয়া পোস্টার লাগানো দেওয়ালগুলোর কথা; শহরের সরু গলিপথ আর নোংরা রাস্তা দিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে চলা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত পুরোনো ডলমাস গাড়ি, ১৯৫০-এর শেভ্রলে গাড়িগুলোর কথা, যেগুলো যেকোনো পাশ্চাত্য শহরে যাদুঘরের জিনিস বলে গণ্য হবে, কিন্তু এখানে শেয়ার ট্যাক্সি হিসাবে চলে; যাত্রীদের ভীড়ে ঠাসা বাসগুলোর কথা; সেই সব মসজিদের কথা, যার সিসের প্লেটগুলো আর বৃষ্টির জল বয়ে যাবার ড্রেন-এর ঢাকনাগুলো নিরন্তর চুরি হয়ে যায়; শহরের কবরস্থানগুলোর কথা, যেগুলো একটি দ্বিতীয় বিশ্বে যাবার দরজা বলে প্রতীয়মান হয় এবং সেখানকার সাইপ্রেস গাছগুলোর কথা; কাদিকয় থেকে কারাকয় পারাপার হবার নৌকোগুলোর মৃদু আলোর কথা, যা সন্ধ্যাবেলায় দেখা যায়; প্রত্যেকটি পথচারীকে রাস্তায় একই কাগজের রুমালের প্যাকেট বিক্রি করার চেষ্টা করে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাদের কথা; ঘড়ি-গম্বুজগুলোর কথা, যেগুলো কেউ নজরই করে না; সেই সব ইতিহাস বইগুলোর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা, যাতে শিশুরা অটোমান সাম্রাজ্যের যুদ্ধ জয়ের কথা পড়ে এবং এই একই শিশুরা বাড়িতে যে মারধোর খায়, তার কথা; সেই দিনগুলোর কথা, যখন সবাইকে নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রস্তুতির জন্য বাড়িতে থাকতে হয়; সেই দিনগুলোর কথা, যখন লোক গণনার জন্য সবাইকে বাড়িতে থাকতে হয়; সেই দিনগুলোর কথা, যখন হঠাৎ আতঙ্কবাদীদের তল্লাশির জন্য কারফিউ জারি করা হয় এবং সকলেই ভয়ে ভয়ে বাড়িতে বসে 'আধিকারিক'দের আসার অপেক্ষা করে; খবরের কাগজের এক কোণায় ছাপা পাঠকদের চিঠি পত্রের কথা, যেগুলো কেউ পড়ে না, আর যাতে তিনশ পঁচাত্তর বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদের গম্বুজ ভেঙে যাওয়ার কথা বলা হয় এবং প্রশ্ন করা হয়, সরকার কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না; ভীড় ঠাসা রাস্তার সংযোগস্থলের নিচের সাবওয়ের কথা; রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া ওভারব্রিজের কথা, যার প্রত্যেকটা ধাপই ভাঙা ভাঙা; গত চল্লিশ বছর ধরে একই জায়গায় পোস্টকার্ড বিক্রি করা লোকটার কথা; ভিখারিগুলোর কথা, যারা সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় ভিক্ষা চায় আর যারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন একই সুরে ভিক্ষা চাইতে থাকে; জোরালো পেচ্ছাপের দুর্গন্ধের কথা, যা ভীড়-ঠাসা রাস্তায়, জাহাজে, সাবওয়েতে নাকে এসে ধাক্কা মারে; সেই সব মেয়েদের কথা, যারা তুর্কীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খবরের কাগজ 'হুরিয়েত'-এর বিগ সিস্টার গুজিন-এর লেখার কলাম পড়ে; সূর্যাস্তের সময় 'উসকুদার'-এর জানালাগুলোতে যে লাল-কমলা রঙের আভা দেখা যায়, তার কথা; খুব সকালের কথা, যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, আর কেবল মেছুড়েরা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে; গুলহেন পার্কের সেই কোণটার কথা, যেটাকে চিড়িয়াখানা বলে, কিন্তু আসলে সেখানে দুটো ছাগল আর তিনটে ক্লান্ত বিড়াল খাঁচার মধ্যে পড়ে থাকে; তৃতীয় শ্রেণীর গাইয়েদের কথা, যারা সস্তার নাইটক্লাবে, আমেরিকান গায়কদের আর তুর্কীর পপ গাইয়েদের নকল করার চেষ্টা করে এবং অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর গাইয়েদের কথা; অনন্তকাল ধরে চলা ইংরাজির ক্লাসের একঘেয়েমিতে বিরক্ত হাইস্কুলের ছাত্রদের কথা, যে স্কুলে ছবছর পড়ার পরও কেউ

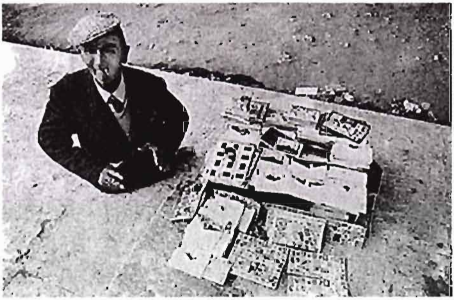

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইয়েস' এবং 'নো' ছাড়া আর কিছু বলতে শেখেনি; গালাতা ডকে অপেক্ষারত অনুপ্রবেশকারীদের কথা; শীতের সন্ধ্যায় পরিত্যক্ত রাস্তার ধারের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে থাকা ফল, সজি, আবর্জনা, প্লাস্টিক ব্যাগ, পুরোনো কাগজ, খালি বস্তা, বাক্স আর প্যাকিং বাক্সের কথা; তিনটে শিশুকে নিয়ে অল্পবয়েসি মায়েদের রাস্তা ধরে কষ্টকর হেঁটে চলার কথা; ১০ই নভেম্বর সকাল ৯.০৫ মিনিটে আতাতুর্ক-এর স্মৃতিকে সম্মান জানানোর জন্য সমুদ্রের সব জাহাজগুলোর একই সময়ে একই সঙ্গে ভোঁ বাজিয়ে শহরের জনজীবনকে থামিয়ে দেওয়ার কথা; একটা পাথরের সিঁড়ির কথা, যার ওপরে এত অ্যাসফল্ট ঢালা হয়েছিল যে, এর ধাপগুলো সব অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল; মার্বেল পাথরের ধ্বংসস্তূপের কথা, যেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চমৎকার রাস্তার ধারের ফোয়ারা ছিল, আর এখন জলহীন, শুকনো, কলগুলো চুরি হয়ে গেছে; পাশের রাস্তার অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর কথা, যেখানে আমার ছেলেবেলায় মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো– ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক এবং তাদের স্ত্রীরা ও বাচ্চারা– আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে বসে সন্ধ্যাবেলায় রেডিও শুনত, আর আজ যেখানে, সেই একই অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি উলবোনার মেশিন আর বোতাম লাগানোর মেশিনে ভর্তি এবং অল্পবয়েসি মেয়েরা যেখানে খুব জরুরি ফরমায়েশের জিনিস তৈরির জন্য শহরের সবচেয়ে কম মজুরিতে সারারাত কাজ করে; গালাতা ব্রিজ থেকে ইয়ুপ-এর দিকে তাকিয়ে গোল্ডেন হর্ন-এর দৃশ্যের কথা; জেটির ওপরের ফেরিওয়ালাদের কথা, যারা খরিদ্দারের অপেক্ষায় বসে এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে; সমস্ত ভাঙা-চোরা, ক্ষয়ে যাওয়া, পুরোনো হয়ে যাওয়া জিনিসের কথা; বলকান থেকে, উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে, দক্ষিণ দিকে উড়ে চলা সারসদের কথা, যখন শরৎকাল এসে পড়ে, যখন তারা বসফোরাসের ওপর দিয়ে এবং মারমারা দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে পুরো শহরটা দেখতে দেখতে যায়;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় ফুটবল ম্যাচের শেষে ধূমপানরত মানুষের ভীড়ের কথা, আমার ছেলেবেলায় যে ম্যাচগুলোতে আমরা শোচনীয়ভাবে হেরে যেতাম; এই সমস্ত কিছুর কথা আমি বলছি।

'হুজুন'-কে দেখে, শহরের রাস্তায়, দৃশ্যে এবং অধিবাসীদের মধ্যে এর বিকাশকে সম্মান জানিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত একে সর্বত্র অনুভব করতে পারি; ঠান্ডা শীতের সকালে, যখন সূর্যের রোদ হঠাৎ বসফোরাসের জলে পড়ে এবং জলের ওপর থেকে মৃদু বাষ্প উত্থিত হয়, তখন 'হুজুন' এত ঘন যে, তাকে প্রায় ছোঁয়া যায়, একটা পাতলা পর্দার মতো লোকেদের ওপর এবং ভূদৃশ্যাবলীর ওপর ছড়িয়ে আছে বলে মনে হয়।

কাজেই 'হুজুন' এবং বার্টনের একক ব্যক্তির বিষণ্ণতার মধ্যে একটা বিরাট অধিবিদ্যাগত দূরত্ব আছে; যদিও 'হুজুন' এবং ক্লদ লেভি স্ট্রস তার ট্রাইস্ট ট্রপিকস বইতে যে অন্য আর এক জাতীয় বিষণ্ণতার বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। লেভি-স্ট্রস-এর উষ্ণাঞ্চলের শহরগুলোর সঙ্গে ইস্তাম্বুলের খুব কমই সাদৃশ্য আছে; ইস্তাম্বুল ৪১ ডিগ্রি অক্ষাংশে আছে আর এখানকার জলবায়ু মৃদু, ভূত্বক পরিচিত, দারিদ্র্য খুব কঠোর নয় কিন্তু ইস্তাম্বুলের অধিবাসীদের ভঙ্গুর জীবন, যেভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করে, আর পাশ্চাত্যের কেন্দ্র থেকে যেভাবে তারা দূরত্ব বোধ করে, তাতে ইস্তাম্বুলে পশ্চিম দেশ থেকে আসা নতুন আগন্তুকদের ইস্তাম্বুল শহরকে বুঝতে কষ্ট হয় এবং তার ফলে তারা একে 'রহস্যাবৃত বাতাবরণ' বলে মনে করে এবং এতেই লেভি-স্ট্রস-এর ট্রাইস্ট-এর সঙ্গে 'হুজুন'কে একাত্ম বলে চিহ্নিত করে। 'ট্রাইস্ট' একটা একক ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার যন্ত্রণা নয়, 'হুজুন' এবং ট্রাইস্ট একটা সর্বজনীন অনুভূতি, একটা পরিমণ্ডল, একটা সংস্কৃতি, যা লক্ষ লক্ষ লোক মানে, তার বার্তা বহন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

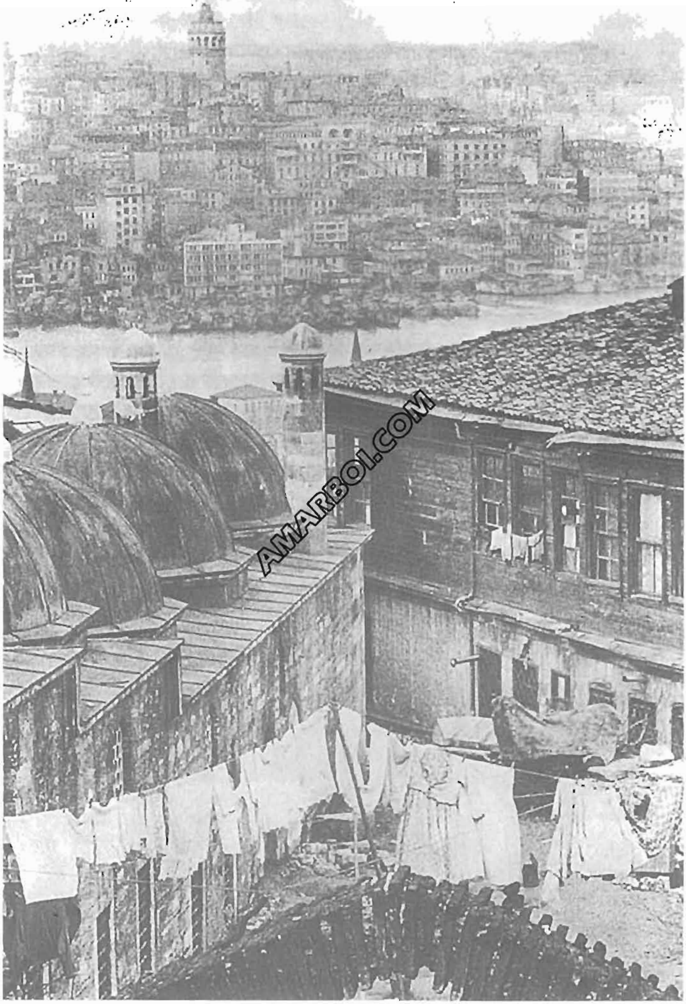

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যে শব্দগুলো এবং অনুভূতিগুলো এরা বর্ণনা করে, তা এক রকম নয় এবং আমরা যদি তফাৎটা সঠিকভাবে ধরতে চাই, তাহলে এটা বলাই যথেষ্ট হবে না যে, ইস্তাম্বুল দিল্লি অথবা সাওপাওলোর চাইতে বেশি ধনী। (যদি দরিদ্র প্রতিবেশী দেশে যাওয়া যায় তাহলে শহরগুলো অথবা দারিদ্র্যের রূপ আসলে একই রকম দেখা যাবে।) তফাৎটা এইখানে যে, ইস্তাম্বুলে সর্বত্র তার মহান অতীতের এবং সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো যতই খারাপভাবে রাখা হোক না কেন, যতই অবহেলিত বা কংক্রীটের দৈত্যদের দিয়ে আড়াল করা থাক না কেন, বড় বড় মসজিদগুলো এবং শহরের অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভগুলো, এবং প্রত্যেকটা গলিতে, কোণায়, সাম্রাজ্যের ছোটখাটো নিদর্শনগুলো, ছোট খিলান, ছোট ফোয়ারা ও পাড়া বেপাড়ার মসজিদগুলো– যারা এসবের মধ্যে বাস করে, তাদের হৃদয়ে যন্ত্রণা এনে দেয়।

পাশ্চাত্যের শহরগুলোতে যে মহান সাম্রাজ্যগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, যেগুলো ইতিহাসের যাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত এবং গর্বের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়, তার তুলনায় এই ধ্বংসাবশেষগুলো কিছুই নয়। ইস্তাম্বুলের অধিবাসীরা এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই নিজেদের জীবন কাটায়। অনেক পাশ্চাত্য লেখক এবং পর্যটক এই ব্যাপারটাকে মনোমুগ্ধকর মনে করেন। কিন্তু শহরের বেশি স্পর্শকাতর ও আত্মিক যোগসম্পন্ন অধিবাসীদের কাছে এই ধ্বংসস্তূপগুলো মনে করিয়ে দেয় যে, বর্তমান শহরটির এতই দৈন্যদশা এবং এতই বিভ্রান্ত যে, এ পুনরায় ধনে মানে, ক্ষমতায়, সংস্কৃতিতে সেই উচ্চতায় পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখতে পারে না। এই সব অবহেলিত বাড়িগুলো, যেখানে ধুলো, ময়লা, কাদা আশপাশের নোংরার সঙ্গে মিশে গেছে, নিয়ে গর্ব করা যায় না, যেমন আমার ছোটবেলায় যে সব সুন্দর, পুরোনো কাঠের বাড়িগুলো একটার পর একটা পুড়িয়ে ধুলিসাৎ করতে দেখেছি, সেগুলো নিয়ে আনন্দ করাও যায় না।

সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের সময় ডস্টয়েভস্কি, জেনেভার অধিবাসীরা তাদের শহরের জন্য যে অত্যধিক গর্ব বোধ করে, সেটা বুঝতে হিমসিম খেয়ে গেছিলেন। 'ওরা অত্যন্ত সামান্য বস্তু, যেমন রাস্তার খুঁটির দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন ওগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার, সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বস্তু,' এই পাশ্চাত্যকে ঘৃণা-করা উৎকট স্বদেশভক্ত তাঁর একটা চিঠিতে লিখেছিলেন। জেনেভার অধিবাসীরা তাদের ঐতিহাসিক শহরের জন্য এমন গর্ববোধ করে যে, তাদেরকে খুব সরল সোজা কোনো ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে তারা বলবে, 'এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান দাদা, তারপর যখন আপনি ওই অপরূপ, চমৎকার ব্রোঞ্জের ফোয়ারাটা পার হবেন...' যদি কোনো ইস্তাম্বুলের অধিবাসীকে এই রকম বলতে হয়, তো সে আহমেদ রাসিম-এর লেখা 'বেদিয়া অ্যান্ড দ্য বিউটিফুল এলেনি' গল্পটিতে যেমন বর্ণনা করা আছে, সেই রকম নির্দেশ দেবে, 'ইব্রাহিম পাশার হামামের পাশ দিয়ে চলে যান। আর একটু হাঁটুন। ডানদিকে যে ধ্বংসস্তূপটা আপনি এইমাত্র পার হয়ে এলেন (হামাম), তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর দিয়ে তাকিয়ে আপনি একটা ভাঙা বাড়ি দেখতে পাবেন।' অবশ্য এখনকার ইস্তাম্বুলী, একজন বিদেশী তার শহরের দুর্দশাগ্রস্ত রাস্তাগুলোতে সব কিছু দেখতে পাবে বলে তার জন্য অস্বস্তি বোধ করবে।

একজন বেশি আত্মবিশ্বাসী অধিবাসী শহরের বড় বড় মুদির দোকান এবং কফি হাউসগুলোকে তার দিক নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা পছন্দ করবে, এটাই সাধারণভাবে চালু অভ্যাস, কারণ এইগুলো আধুনিক ইস্তাম্বুলের মূল্যবান সম্পদ বলে গ্রাহ্য হয়। কিন্তু ধ্বংসের 'হুজুন' থেকে দ্রুততম পলায়নের রাস্তা হল সমস্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভকে অস্বীকার করা এবং অট্টালিকাগুলোর নাম বা তাদের স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্যর দিকে মনোযোগ না দেওয়া। ইস্তাম্বুলের অনেক বাসিন্দাদের দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এদের কাছে ইতিহাস শব্দটার কোনো মূল্য নেই; এরা শহরের ভগ্ন দেওয়ালগুলো থেকে পাথর সংগ্রহ করে সেগুলো আধুনিক বাড়ি বানানোর মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নতুন বাড়ি তৈরি করে অথবা এরা পুরোনো বাড়িগুলোকে আধুনিক কংক্রীট দিয়ে মেরামত করে। কিন্তু এরা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায় : অতীতকে অবহেলা করে এবং অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করেও এরা যে 'হুজুন'কে তাদের নীচু এবং ফোঁপরা প্রচেষ্টার মধ্যে

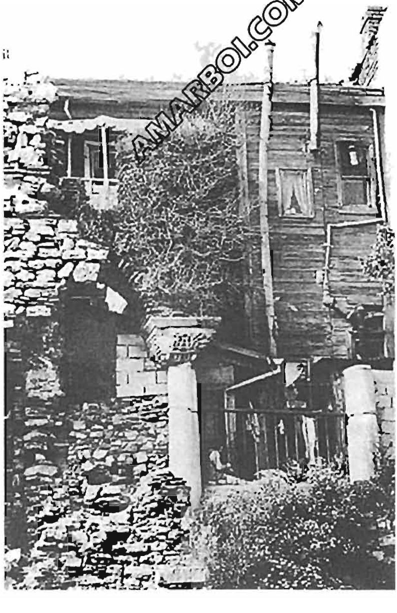

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব করে, তা অনেক শক্তিশালী। যা কিছু চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, তার জন্য যে যন্ত্রণা বোধ, তা থেকে 'হুজুন' আবির্ভূত হয়, কিন্তু এটাই আবার তাদের নতুন পরাজয় আবিষ্কার করতে এবং তাদের দৈন্যের বহিঃপ্রকাশের নতুন পথ খুঁজে বের করতে বাধ্য করে।

লেভি স্ট্রস যে ট্রাইস্টেস বর্ণনা করেছেন, তা একজন পাশ্চাত্যবাসী অনুভব করে যখন সে উষ্ণাঞ্চলের বিশাল বিশাল দারিদ্র্য পীড়িত শহরগুলো, তাদের জটপাকানো ভীড় এবং তাদের চরম দুর্দশাগ্রস্ত জীবন সম্বন্ধে ভাবে। কিন্তু সে এইসব অধিবাসীদের চোখ দিয়ে তো শহরটাকে দেখে না; ট্রাইস্টেস একজন দোষ-ভারাক্রান্ত পাশ্চাত্যবাসীর ইঙ্গিত দেয় যে প্রচলিত সংস্কার দ্বারা তার ধারণাকে প্রভাবিত করাকে অস্বীকার করে তার নিজস্ব যন্ত্রণাকে উপশম করার উপায় খোঁজে। অন্যদিকে 'হুজুন' কিন্তু এমন কোনো অনুভব নয়, যা বহিরাগত আগন্তুককে প্রভাবিত করে। ধ্রুপদী অটোমান সঙ্গীত, তুর্কী জনপ্রিয় সঙ্গীত, বিশেষ করে আরাবেস্‌ক্ সঙ্গীত যা ১৯৮০ সালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, এগুলো কমবেশি এই আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ, যা আমরা শারিরীক যন্ত্রণা এবং মানসিক কষ্ট, এই দুটির মাঝখানে কিছু একটা বলে অনুভব করি। এবং শহরে আগন্তুক পাশ্চাত্যবাসীরা প্রায়ই এটা বুঝতে পারে না। এমনকি, গেরার্ড দ্য নার্ভাল (যার নিজের বিষণ্ণতা তাকে আত্মহত্যার পথে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়) এই শহরের বর্ণনায় রাস্তার জীবন, এর হিংস্রতা এবং এর বাহ্যিক আচরণগুলোর দ্বারা দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন; তিনি এমনকি এও বলেছেন যে, এই শহরের সমাধিস্থলগুলোতে তিনি মহিলাদের হাসতে শুনেছেন। হয়তো এই জন্যে যে, তিনি যখন ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন, তখনো অটোমান সাম্রাজ পূর্ণ মাত্রায় নিজস্ব মহিমায় বিরাজমান এবং তখনো শহর শোকাচ্ছন্ন হওয়ার পথে যায়নি অথবা হয়তো তাঁর নিজের বিষণ্ণতার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে তিনি তার 'ভয়েজ এন ওরিয়েন্ট' বইটির পৃষ্ঠাগুলো বর্ণময় প্রাচ্য কাল্পনিক রূপকথা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

ইস্তাম্বুল তার 'হুজুন'কে 'একটা অসুখ, যার কোনো আরোগ্য নেই', অথবা 'একটা অনাহূত যন্ত্রণা যা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার' এমনভাবে প্রকাশ করে না। এ 'হুজুন'কে বহন করে উপায় নেই বলে। এবং তাই, এ বার্টন-বর্ণিত বিষণ্ণতার দিকে পথ খোঁজে, যা বলে যে অন্য সব আনন্দই শূন্য। কেউই বিষণ্ণতার মতো মিষ্টি নয়।' এ নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করার মতো রসিকতা করে ইস্তাম্বুলের জীবনে নিজের গুরুত্বের ব্যাপারে অহংকার করতে সাহস করে। অনুরূপভাবে, সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তুর্কী কবিতার 'হুজুন'ও তাই, কারণ এ-ও একই ক্লেশের কথা বলে, যেটা কেউ এড়াতে পারে না, বা চায় না, এমন একটা যন্ত্রণা যা শেষ পর্যন্ত আমাদের আত্মাকে রক্ষা করে এবং তাতে গভীরতা এনে দেয়। কবির কাছে 'হুজুন' হচ্ছে তার ও পৃথিবীর মাঝখানের ধোঁয়াটে জানালা। কবি জীবনের ওপর যে পর্দার আস্তরণ বিছিয়ে দেয়, তা যন্ত্রণাময়, কারণ জীবন নিজেও যন্ত্রণাময়। ইস্তাম্বুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কারণ তারা দারিদ্র্য ও হতাশার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। সুফি সাহিত্যে 'হুজুন'কে যে সম্মান দেখানো হয়েছে, তাই নিয়ে 'হুজুন' এই আত্মসমর্পণকে একটা মর্যাদা প্রদান করে, আবার এ-ও ব্যাখ্যা করে যে, এরা ব্যর্থতা, সিদ্ধান্তহীনতা, পরাজয় এবং দারিদ্র্যকে কেন এ রকম দার্শনিকভাবে এবং অহংকারের সঙ্গে গ্রহণ করা পছন্দ করে; ব্যাখ্যাটা এই যে, জীবনের যত দুশ্চিন্তা এবং বিরাট ক্ষতিগুলোর থেকে 'হুজুন'-এর উদ্ভব হয় না, বরং 'হুজুন' হল এইসব হওয়ার আসল কারণ। আমার ছেলেবেলায় এবং যৌবনে তুর্কী ফিল্মের নায়কদের বা আমার জীবনের সমসাময়িক সত্যিকারের নায়কদের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার; তাদের সকলেরই এই রকম একটা মানসিকতা ছিল যে, জন্ম থেকে বুকের মধ্যে 'হুজুন'-কে লালন করার দরুন, তারা অর্থ, সাফল্য বা ভালোবাসার নারীদের কামনা করা থেকে বিরত থাকবে। 'হুজুন' ইস্তাম্বুলের অধিবাসীদের কেবল পক্ষাঘাতগ্রস্তই করেনি, তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার জন্য কাব্যিক স্বাধীনতাও দিয়েছে।

বালজাক-এর নায়ক রাস্টিগন্যাকের মধ্যে কিন্তু এ রকম কোনো বোধ কাজ করে না, সে তার উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আধুনিক শহরের আত্মাকে শুধু উপস্থাপনই করে না, তাকে মহিমান্বিতও করে তোলে। ইস্তাম্বুলের 'হুজুন' কোনো একক ব্যক্তির সমাজের বিরোধিতার কথা বলে না; উল্টে, সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ এবং আদর্শের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতার বিলুপ্তির কথা বলে, আমাদের অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহ দেয়, পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক, সাম্য এবং বিনয় ইত্যাদি গুণকে সম্মান করে। দারিদ্র্য এবং অভাবের সময় আমাদের সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়, জীবনকে এবং শহরের ইতিহাসকে উল্টো দিক থেকে পড়তে উৎসাহিত করে। পরাজয় এবং দারিদ্র্য ইতিহাসের শেষ কথা নয়, বরং তারা জন্মানোর আগে থেকেই এগুলো মর্যাদাময় সূত্রপাত, ইস্তাম্বুলের অধিবাসীদের 'হুজুন' এই কথা ভাবতে শেখায়। কাজেই এই শিক্ষা থেকে আমরা যে মর্যাদার কথা বলি, তা কিন্তু বিভ্রান্তিকর। অবশ্য এর থেকে বোঝা যায় যে, ইস্তাম্বুল 'হুজুন'-কে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়া একটা দুরারোগ্য অসুখ বলে মনে করে না, একটা অপরিবর্তনীয় দারিদ্র্য যাকে দুঃখকষ্টের মতো সহ্য করতে হয় তা বলে মনে করে না, এমনকি একটা বিভ্রান্তিকর অকৃতকার্যতা, যা সাদা-কালোতেই পরিস্ফুট, তা বলে মনে করে না; ইস্তাম্বুল তার 'হুজুন'কে সম্মানের সঙ্গে বহন করে।

সেই ১৫৮০ সালে, মনটেইন তর্ক তুলেছিলেন যে, ট্রাইস্টেস নামে যে আবেগের কথা বলা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে কোনো সম্মান যুক্ত নেই। (তিনি এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন যদিও তিনি জানতেন যে, তিনি নিজেই একজন বিষাদ-রোগী; অনেক বছর পর, ফ্লবার্ট, একই ধরনের রোগী, একই কথা বলেছিলেন) মনটেইন ট্রাইস্টেসকে দেখেছিলেন আত্মনির্ভরশীল যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শত্রু রূপে। তার মতে ট্রাইস্টেস অন্যান্য মহৎ গুণ, যেমন, মান, নৈতিক উৎকর্ষ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

বিবেক, এসবের পাশাপাশি বড় অক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য নয় এবং তিনি, অগণ্য শয়তানির উৎস, সব রকমের উন্মত্ততা এবং আঘাতের সঙ্গে ইতালিয়ান ট্রিসটেজা কথাটির সম্পর্ক অনুমোদন করেছিলেন।

মনটেইনের নিজের দুঃখ শোকপালনের মতো নিঃসঙ্গ, একা একা বই এর সাথে বাস-করা একটি লোকের মনকে ধীরে ধীরে ক্ষইয়ে দেবার মতো। কিন্তু ইস্তাম্বুলের 'হুজুন' এমন একটা জিনিস, যা সমগ্র শহরটি একত্রে অনুভব করে এবং একটি একক হিসাবে মেনে নেয়। তানপিনার-এর 'পীস'– যেটি ইস্তাম্বুলের ওপর লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, তার নায়কদের মতো; শহরের ইতিহাস থেকে আহরণ করা 'হুজুন'-এর জন্য তারা বিধ্বস্ত হয় এবং পরাজিত হয়। 'হুজুন'-ই স্থির করে দেয় যে, কোনো প্রেমের পরিণতিই শান্তিপূর্ণ হবে না। পুরোনো যুগের সাদা-কালো ফিল্মগুলোর মতো, যে কোনো অত্যন্ত প্রভাবশালী বিশুদ্ধ প্রেমের গল্পেও, যদি জায়গাটা ইস্তাম্বুল হয়, তাহলে গোড়া থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে 'হুজুন' নায়কটি জন্ম থেকেই সঙ্গে বহন করে চলেছে, তা গল্পটিকে একটি অবাস্তব রোমাঞ্চপূর্ণ নাটকে পরিণত করে।

এই সব সাদা-কালো ফিল্মে, তানপিনার-এর 'পীস'-এর মতো উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মে যেমন, তেমনই, চরম মুহূর্তটি সব সময়ে একই থাকে। সেটা হচ্ছে সেই সময়, যখন নায়কেরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেয়, যখন তারা যথেষ্ট দৃঢ়তা বা উৎসাহ দেখাতে পারে না, পরিবর্তে ইতিহাস এবং সমাজ আরোপিত শর্তাবলীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর আমরা তাদের বুকে জড়িয়ে ধরি এবং সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে সমগ্র শহরও তাই করে। শহরের সাদা-কালো রাস্তায় নাটকের দৃশ্যাবলী যতই চিত্রানুগ, যতই বিখ্যাতভাবে ফুটে উঠুক না কেন, এর ভেতরেও 'হুজুন'-এর দীপ্তি ফুটে বেরোবে। কখনো কখনো আমি যখন টেলিভিশনের চ্যানেল পাল্টাতে পাল্টাতে এ রকম একটি ফিল্ম মাঝখান থেকে পেয়ে যাই, একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় আসে। যখন দেখি, গল্পের নায়ক একটা দরিদ্র পাড়ার পাথর বাঁধানো রাস্তায় হেঁটে চলেছে, একটা কাঠের বাড়ির আলোকিত জানালাগুলোর দিকে উর্ধদৃষ্টি, প্রেমিকার কথা ভাবছে, অবশ্যই সেই প্রেমিকা তখন অন্য আরেকজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, কিংবা যখন নায়ক কোনো ধনী, ক্ষমতাবান কারখানা মালিকের কথার বিনম্র গর্বের সঙ্গে জবাব দিচ্ছে, এবং এই রকম জীবনকেই মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে সাদা-কালো বসফোরাসের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় যে, নায়কের ভগ্ন, যন্ত্রণাময় গল্পের মধ্যে থেকে, বা ও যে ওর প্রেমিকাকে পেল না, সেই ব্যর্থতা থেকে 'হুজুন' উদ্ভূত হয় না; মনে হয় যে 'হুজুন' শহরের দ্রষ্টব্যগুলো, রাস্তাঘাট এবং দৃশ্যাবলীতে জড়িয়ে থাকে, সেটাই নায়কের হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার ইচ্ছাশক্তিকে নষ্ট করে ফেলেছে। তখন মনে হয় যে, নায়কের গল্পটা জানতে গেলে বা তার বিষাদের ভাগ নিতে চাইলে, শুধু শহরের দৃশ্যগুলো দেখলেই চলবে। এই সব জনপ্রিয় ফিল্মের নায়কদের জন্য, অথবা তানপিনার-এর উচ্চাঙ্গ শিল্পধর্মী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস 'পীস'-এর নায়কদের জন্য, এই অচলাবস্থা মোকাবিলার দুটো পথ আছে: হয় তারা বসফোরাসের তীর ধরে হেঁটে যাবে, অথবা তারা শহরের পেছনের রাস্তাগুলোয় গিয়ে ধ্বংসস্তূপগুলো দেখতে থাকবে।

নায়কের একমাত্র আশ্রয় হল সর্বসাধারণের আশ্রয়। কিন্তু ইস্তাম্বুলের সেই সব লেখক ও কবি যারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমসাময়িক জগতের সঙ্গে মিশতে চায়, তাদের কাছে ব্যাপারটা জটিল। 'হুজুন' যে সামাজিক বোধ নিয়ে আসে, তার সঙ্গে তারা মনটেইনের যুক্তিবাদ এবং থোরিউ-এর আবেগময় নিঃসঙ্গতার বোধ পেতে চায়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে, কয়েকজন এই প্রভাবগুলো থেকে ইস্তাম্বুলের একটি চেহারা গড়ে তোলে, যা অংশত ইস্তাম্বুল এবং অংশত আমার গল্পও। আমি এই বইটি লিখেছি চারজন নিঃসঙ্গ লেখকের সঙ্গে অবিরাম, কখনো হিংস্র বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে, যারা আধুনিক ইস্তাম্বুলকে তার বিষণ্ণতা দিয়েছেন (প্রচুর পড়াশুনা, দীর্ঘ আলোচনা এবং এলোমেলো পদচারণার পর)।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১.
চারজন নিঃসঙ্গ বিষাদগ্রস্ত লেখক

ছেলেবেলায় এদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। যাকে আমি সবচেয়ে ভালো জানতাম, তিনি হলেন মহান, মোটা কবি, ইয়াহিয়া কামাল; ওঁর কয়েকটা কবিতা আমি পড়েছিলাম, যেগুলো সারাদেশে খুব বিখ্যাত ছিল। আমি আরেকজনকেও জানতাম, জনপ্রিয় ইতিহাসবিদ রেসাত এক্রাম কোকু, খবরের কাগজের 'ইতিহাসের পাতায়' তার লেখাগুলোর সঙ্গে যে অটোমান অত্যাচার-পদ্ধতি এঁকে দেখানো হত, সেগুলোর আমি খুব অনুরাগী ছিলাম। যখন আমার বয়স দশ বছর হল, আমি এঁদের সবার নাম জেনে গিয়েছিলাম, কারণ এঁদের বইগুলো আমার বাবার লাইব্রেরিতে ছিল। কিন্তু ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে আমার ধারণাগুলোকে বিকশিত করার মতো প্রভাব এঁরা তখনো আমার ওপর বিস্তার করতে পারেননি। আমার যখন জন্ম হয়েছিল, তখন এঁরা চারজনেই সুস্থ শরীরে বেঁচে ছিলেন এবং আমি যেখানে বাস করতাম, তার থেকে আধ ঘণ্টা হাঁটার দূরত্বে এঁরা থাকতেন। আমার দশ বছর বয়েসে, একজন বাদে বাকি তিনজনই মারা গিয়েছিলেন এবং আমি এঁদের কাউকেই কখনো স্বচক্ষে দেখিনি।

পরবর্তী সময়ে যখন আমি আমার ছেলেবেলার ইস্তাম্বুলের সাদা-কালো ছবি মাথায় রেখে ইস্তাম্বুলকে পুনরাবিষ্কার করছিলাম, এই চারজন লেখকের ইস্তাম্বুল-এর অংশবিশেষ একত্রে মিলেমিশে আমার ইস্তাম্বুলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। কাজেই ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে, এমনকি আমার নিজস্ব ইস্তাম্বুল সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলেই, ওঁদের চিন্তা মাথায় এসে যেত। এক সময়ে যখন আমার বয়েস পঁয়তিরিশ আর 'ইউলিসিস'-এর মতো একটা মহাকাব্য ইস্তাম্বুল নিয়ে লিখব বলে স্বপ্ন দেখছি, তখন আমার কল্পনা করতে ভালো লাগত যে এই চারজন লেখক সেই একই রাস্তায় পদচারণা করেছেন যেখানে আমিও ছেলেবেলায় হেঁটে বেড়াতাম। যেমন আমি জানতাম যে, সেই মোটা কবি প্রায়শই বিওগলুতে আবদুল্লা এফেন্দি রেস্তরাঁতে খেতে যেতেন, যেখানে কিছুদিন আমার দাদীমা-ও সপ্তাহে একদিন খেতে যেতেন আর প্রত্যেকবার ফিরে এসে ওখানকার খাবার সম্বন্ধে খিটখিটে মেজাজে অভিযোগ করতেন। ভাবতে ভালো লাগত যে, সেই বিখ্যাত কবি তাঁর দুপুরের খাবার ইতিহাসবিদ কোকুর সাথে খেতেন, তার ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়ার জন্য মাল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মশলা সংগ্রহ করতেন, আমাদের বাড়ির জানালার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতেন। ইতিহাসবিদ সাংবাদিকের অল্প বয়েসি সুন্দর যুবকদের প্রতি নজর ছিল, তাই আমি কল্পনা করতাম, একটা অপূর্ব সুন্দর দেখতে খবরের কাগজের ছেলে তাকে কাগজ বিক্রি করছে, যে কাগজে ঔপন্যাসিক তানপিনার-এর একটা লেখাও বেরিয়েছে। আমি কল্পনা করতাম যে, ওই একই সময়ে, সাদা-দস্তানাপরা বসফোরাসের স্মৃতিকথার লেখক আব্দুল হক শিনাসি হিসার, একজন ছোটখাটো লোক, যিনি বাড়ি থেকে প্রায় বেরোতেনই না, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এমন বাতিকগ্রস্ত মানুষ যে, তাঁর বিড়ালের জন্য মাংসের দোকানদার নাড়িভুঁড়িগুলো একটা পরিষ্কার খবরের কাগজে কেন মুড়ে দেয়নি, তাই নিয়ে ঝগড়া করছেন। আমি কল্পনা করতাম, আমার চারজন নায়কই একই সময়ে রাস্তার কোণে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একই অলিগলি দিয়ে একই ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে হেঁটে এসেছেন।

ক্রোয়েশিয়ার পারভিটিচ, বিওগলু-টাকসিম-সিহাঙ্গির-গালাতা অঞ্চলের যে বিখ্যাত ইনস্যুরেন্স মানচিত্র তৈরি করেছিলেন সেটা খুলে বসি যাতে আমি আমার নায়করা যে সব রাস্তা, যে সব বাড়ি পার হয়ে হেঁটে গেছেন, সেগুলো দেখতে পারি, আর যখন আমার স্মৃতিশক্তি কোনো কাজ করে না, তখন আমি প্রতিটি ফুলের দোকান, কফি হাউস, পুডিং-এর দোকান, মদের দোকান ইত্যাদির সম্বন্ধে ভাবতে থাকি, যেগুলোয় এরা হয়তো প্রায়শই যেতেন। আমি মনে মনে ভেবে নিই, দোকানের খাবারের গন্ধ, মদের দোকানের চিৎকার-চেঁচামেচি, সিগারেটের ধোঁয়া আর মদের গন্ধ, কফি হাউসে খবরের কাগজের খবরগুলো, একবার পড়া, বারবার পড়া তারপর কুঁচকে-মুচকে যাওয়া, দেওয়ালের পোস্টারগুলো, রাস্তার ফেরিওয়ালা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকসিম স্কোয়ারের পাশেই বড় অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটার (বর্তমানে ভেঙে ফেলা) ওপরে খবরের হেডলাইনগুলোর সরে সরে যাওয়া, যা এক সময় দেখা যেত,– এইসব কিছু আমার নায়কেরা নিশ্চয়ই ভাগ করে নিতেন। যখন আমি এই লেখকদের একসঙ্গে ভাবি, আমার মনে পড়ে যায় যে, এই শহরকে, কেবল তার চেহারা বা তার বাড়িগুলোই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেয়নি, প্রত্যেকটি হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাওয়া, প্রত্যেকটি স্মৃতি, চিঠি, বর্ণ এবং অধিবাসীদের মনের মধ্যে ভীড় করা স্মৃতিগুলোর যোগফল এই শহরকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। এইসব অধিবাসীরাও আমারই মতো গত পঞ্চাশ বছর ধরে একই রাস্তায় বাস করছে। আর তখনই আমি দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকি যে, আমার ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে এই চারজন বিষাদগ্রস্ত লেখকের সঙ্গে আমারও হঠাৎ করে দেখা হয়ে যেতে পারত।

আমার শিশু বয়সে যখন প্রথম প্রথম মায়ের সঙ্গে টাকসিম-এ যেতাম, তখন হয়তো ঔপন্যাসিক তানপিনার-এর সঙ্গে, একই রাস্তা পার হয়েছি। তানপিনার-এর সঙ্গেই আমি ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক অনুভব করি। আমরা প্রায়ই টুনেল-এ ফ্রেঞ্চ হ্যাচেট বই-এর দোকানে যেতাম এবং উনিও যেতেন। এই ঔপন্যাসিক (যাঁর ডাকনাম 'ডাউন-অ্যাট-হিল') এই বই-এর দোকানের ঠিক উল্টোদিক রাস্তার ওপারে নারম্যানলি বিল্ডিং-এর একটা ছোট ঘরে থাকতেন। আমার জন্মের ঠিক পরেই, যখন পামুক অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছিল, তখন আমরা পার্ক হোটেলের উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে আয়াজপাসা-তে ওকাফ অ্যাপার্টমেন্টে বাস করতাম, যেখানে তানপিনার-এর গুরু এবং প্রাক্তন শিক্ষক, ইয়াহিয়া কামাল তার শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। আমি যখন উল্টো দিকের বাড়িতে থাকতাম, তখন কি ঔপন্যাসিক তানপিনার সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত ইয়াহিয়া কামালের কাছে পার্ক হোটেলে যেতেন না? পরবর্তী কালেও হয়তো এদের সঙ্গে আমি পথ হেঁটেছি, যখন আমার মা, আমরা নিশাস্তাসি-তে চলে আসার পর, প্রায়ই পার্ক হোটেলের প্যাটিসারিতে কেক কিনতে যেতেন। আব্দুল হক সিনাসি হিসার, যাঁর বসফোরাস স্মৃতিকথার উল্লেখ আমি আগেই করেছি, প্রায়ই বিওগলু-তে কেনাকাটা করতে এবং খেতে আসতেন, যেমন জনপ্রিয় ইতিহাসবিদ কোকুও আসতেন এবং আমি হয়তো এদের সঙ্গেও পথ হেঁটেছি।

আমি জানি যে, আমি অন্যান্য তারকা-অনুগামীদের মতো ব্যবহার করছি, যারা তাদের প্রিয় অভিনেতার জীবন ও ফিল্ম থেকে বিশদ সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র এবং হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারগুলো কল্পনা করে। কিন্তু এই সেই চারজন নায়ক, এই বইয়ে যাদের কথা আমি মাঝে মাঝেই আলোচনা করব, যাদের কবিতা, উপন্যাস, গল্প, রচনা, স্মৃতিকথা এবং এনসাইক্লোপিডিয়া, যে শহরে আমি বাস করি, তার আত্মার প্রতি আমার চোখ খুলে দিয়েছে। কারণ এই চারজন বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত লেখক অতীত এবং বর্তমানের টানাপোড়েন থেকে তাদের শক্তি আহরণ করেছিলেন অথবা পাশ্চাত্যবাসীরা যাকে বলেন পূর্ব ও পশ্চিমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংঘাত থেকে। এরাই আমাকে শিখিয়েছিলেন, আধুনিক চিত্রকলা এবং পাশ্চাত্যে সাহিত্যের প্রতি আমার ভালোবাসাকে কীভাবে, যে শহরে আমি বাস করি সেই শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

এই সব লেখকদের, তাদের জীবনের একটা সময়ে, পাশ্চাত্য (এবং বিশেষ করে ফরাসি) শিল্পকলা ও সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। কবি ইয়াহিয়া কামাল প্যারিসে ন'বছর কাটিয়েছিলেন এবং ভার্লেইন এবং ম্যালার্মের কবিতা থেকে তিনি 'বিশুদ্ধ কবিতার' ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, যা তিনি পরে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি 'জাতীয়তাবাদী' কবিতার সন্ধানে ছিলেন। তানপিনার ইয়াহিয়া কামালকে প্রায় নিজের পিতার মতোই দেখতেন এবং ওই একই কবিদের এবং ভ্যালেরিরও ভক্ত ছিলেন। এবং এএম হিসার, ইয়াহিয়া কামাল ও

তানপিনারের মতোই, আন্দ্রে গিদে-কে উচ্চতম সম্মানের আসন দিয়েছিলেন। আরেকজন লেখক, থিওফিল গটিয়েরকে ইয়াহিয়া কামাল দারুণ শ্রদ্ধা করতেন এবং এঁর কাছ থেকেই তানপিনার শিখেছিলেন, কীভাবে একটা ভূদৃশ্যকে কথায় প্রকাশ করতে হয়।

এই লেখকেরা তাঁদের যৌবনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সাধারণভাবে এবং ফরাসি সাহিত্যকে বিশেষভাবে যে অসাধারণ, সময়ে সময়ে, ছেলেমানুষী উচ্চতার আসনে বসিয়েছিলেন তা, তাদের নিজেদের সাহিত্যে আধুনিক-পাশ্চাত্য অনুগামী হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, এরা ফরাসিদের মতো করে লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনের এক কোণে এই জ্ঞানটাও ছিল যে, যদি এঁরা হুবহু পাশ্চাত্য লেখকদের মতো লেখেন, তাহলে তাঁরা যে পাশ্চাত্য লেখকদের এত শ্রদ্ধা করেন, তাদের মতো মৌলিক হতে পারবেন না। কারণ আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে ফরাসি সংস্কৃতি এবং ফরাসি ধারণাগুলো থেকে তারা অন্তত একটি শিক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলেন যে, মহান রচনা সব সময়েই মৌলিক, খাঁটি এবং সত্যগুণসম্পন্ন হয়। এই লেখকেরা এই দুই সাহিত্য জগতের পরস্পর বিরোধিতায় হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন, পাশ্চাত্যধর্মী হতে হবে, তথাপি একই সঙ্গে খাঁটি হতে হবে এবং তাদের প্রথম দিককার রচনাগুলোতে এই অস্বস্তির প্রকাশ দেখা যায়।

অন্য আর একটা জিনিস তাঁরা গটিয়ের এবং ম্যালার্মের মতো লেখকদের কাছ থেকে শিখেছিলেন, যা তাঁদের সাহিত্যে, সততা এবং মৌলিকতা আনার প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিল, তা হচ্ছে 'শিল্প শিল্পের জন্যই' অথবা 'বিশুদ্ধ কবিতা', এই ধারণা বা বোধ। তাঁদের প্রজন্মের অন্য কবিরা বা ঔপন্যাসিকরা অন্যান্য ফরাসি লেখকদের লেখা পড়ে তেমনই ধাঁধিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁরা যে শিক্ষা নিয়েছিলেন, তা বিশুদ্ধতার মূল্য শিক্ষা নয়, কাজের মূল্য শিক্ষা, যা তাঁদের কাজে লাগত এবং নির্দেশ হিসাবে কাজ করত। এটাও ছিল বিপজ্জনক, কারণ এটা লেখকদের হয় নীতিশাস্ত্রমূলক সাহিত্য রচনার পথে ঠেলে দিত, নয়তো রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ফেলে দিত। কিন্তু এই দ্বিতীয় পথের লেখকরা যখন হুগো এবং জোলা-র মতগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন, তখন ইয়াহিয়া কামাল, তানপিনার এবং আব্দুল হক সিনাসি হিসার-এর মতো লেখকেরা নিজেদের প্রশ্ন করছিলেন, ভার্লেইন, ম্যালার্মে এবং প্রাউস্ট-এর মতবাদগুলো থেকে কীভাবে লাভ করা যায়। এ ব্যাপারে তাঁদের প্রধান বাধা ছিল, ঘরোয়া রাজনীতি– তাঁদের যৌবনে তাঁরা অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাক্ষী ছিলেন, তারপর সেই সব দিনের সাক্ষী ছিলেন, যখন তুরস্ক পাশ্চাত্যের উপনিবেশ হবার পথে এবং তারপরে এল প্রজাতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের যুগ। ফ্রান্স থেকে আহরণ করা নন্দনতত্ত্ব থেকে তাঁরা এটুকু বুঝেছিলেন যে, তুরস্কতে তাঁরা ম্যালার্মে বা প্রাউস্ট-এর মতো শক্তিশালী এবং বিশুদ্ধ কণ্ঠস্বর আনতে পারবেন না। কিন্তু দীর্ঘ বিশ্লেষণের পর তাঁরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও খাঁটি বিষয়বস্তু পেয়ে গেলেন: যে মহান সাম্রাজ্যে তাঁরা জন্মেছিলেন, তার অবনতি ও পতন। এই অটোমান সভ্যতা এবং তার অনিবার্য ধ্বংস সম্বন্ধে তাঁদের গভীর উপলব্ধি ছিল বলেই তাঁরা দুর্বল স্মৃতি-রোমন্থন, সামান্য ঐতিহাসিক গৌরব, বা তীব্র জাতীয়তাবোধ এবং সাম্প্রদায়িকতা বোধ-এর ফাঁদে পা দেননি, যাতে কিনা সমসাময়িক অনেকেই পা দিয়েছিলেন এবং শেষ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এটাই ছিল অতীতের কাব্যিক বর্ণনা শুরু করার ভিত্তি। যে ইস্তাম্বুলে এঁরা বাস করতেন, তা ছিল ধ্বসে-পড়া সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপে ভর্তি, কিন্তু এটাই ছিল 'তাঁদের শহর'। যদি তাঁরা ক্ষতি এবং ধ্বংস সম্বন্ধে বিষাদময় কবিতা রচনা করেন তাহলে তাঁরা নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে পাবেন, এটাই তারা আবিষ্কার করলেন।

'ফিলজফি অব কম্পোজিশন'-এ এডগার অ্যালান পো, কোলরিজ-এর ঠান্ডা মাথায় লেখার একই যুক্তি অনুসরণ করে লিখেছিলেন যে, 'দি র‍্যাভেন' লেখার সময় তার প্রধান চিন্তা ছিল একটা 'বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত সুর' সৃষ্টি করা। 'আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম– যাবতীয় বিষাদময় বিষয়ের মধ্যে, মানবজাতির সার্বজনীন উপলব্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুযায়ী, সবচেয়ে বিষাদময় কী? নিশ্চিত উত্তর ছিল, মৃত্যু।' একজন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, এইজন্যই তিনি তার কবিতার মর্মকেন্দ্রে একটি সুন্দরী প্রাণহীনা মেয়েকে রেখেছিলেন।

আমার কাল্পনিক ছেলেবেলায় যে চারজন লেখক অসংখ্যবার আমার রাস্তায় হেঁটেছেন, তাঁরা কিন্তু সচেতনভাবে 'পো'-এর যুক্তি অনুসরণ করেননি। কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা যদি কেবলমাত্র শহরের অতীতের দিকে তাকান এবং তার অনুপ্রাণিত বিষণ্নতার কথা লেখেন, তাহলেই তাঁরা নিজেদের বিশুদ্ধ কণ্ঠস্বর খুঁজে পাবেন। যখন তাঁরা প্রাচীন ইস্তাম্বুলের চমৎকারিত্বের কথা মনে করেন, যখন রাস্তার পাশে পড়ে থাকা প্রাণহীনা সুন্দরীর ওপর তাঁদের চোখ পড়ে, যখন তাঁরা চারপাশে ঘিরে থাকা ধ্বংসস্তূপের কথা লেখেন, তখন তাঁরা অতীতকে একটা কাব্যিক সুষমা প্রদান করেন। তাঁদের এই সারগ্রাহী দৃষ্টি, যেটাকে আমি 'ধ্বংসের বিষণ্নতা' বলি, তাঁদের জাতীয়তাবাদীর চেহারা দিয়েছে, যেটা অত্যাচারী রাষ্ট্র চায় এবং তাই তাঁরা সরকারি অনুশাসনের কবলে পড়েননি, যদিও তাঁদের অন্যান্য সমসাময়িকেরা ইতিহাসে সমান অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গীর দোষে সরকারি ক্রোধের কবলে পড়েছিলেন। নভোকভের ধনাঢ্য বনেদি পরিবারের নিখুঁত ত্রুটিহীনতায় আমরা হতাশ না হয়ে নভোকভের স্মৃতিকথা উপভোগ করি, কারণ তিনি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, আমরা অন্য যুগের অন্য ভাষার লেখকের কথা শুনছি; আমরা সর্বদাই সচেতন যে, সেই যুগ দীর্ঘদিন আগে শেষ হয়ে গেছে, আর কখনো ফিরে আসবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। সে যুগের বার্গসোনিয়ান ফ্যাশনের মানানসই সময় ও স্মৃতির খেলা একটা ক্ষণস্থায়ী বিভ্রান্তি জাগিয়ে তুলতে পারত যে, অন্তত একটা নান্দনিক আনন্দ হিসেবে, অতীত এখনো জীবন্ত; এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে, আমাদের চারজন বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত লেখক ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাচীন ইস্তাম্বুলকে যেন জাদুবলে উজ্জীবিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এঁরা এটাকে মায়ার খেলা হিসাবে উপস্থিত করেছেন, যে খেলা যন্ত্রণা এবং মৃত্যুকে সৌন্দর্যের সাথে একাত্ম করে। কিন্তু তাঁদের শুরুর সিদ্ধান্ত এই যে, অতীতের সৌন্দর্য চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে। আব্দুল হক সিনাসি হিসার যখন' বসফোরাস সভ্যতা' যাকে বলেন, তার জন্য শোক করেন, তখন তিনি কখনো কখনো শোক প্রকাশ করা থামিয়ে (যেন এইমাত্র ভাবনাটা মাথায় এল), মন্তব্য করেন, 'সমস্ত সভ্যতাই কবরে-শোয়া মানুষদের মতো ক্ষণস্থায়ী। আমাদের সকলেরই যেমন মৃত্যু আছে, তেমনি আমাদের এটা মেনে নিতে হবেই যে, যে সভ্যতা তার আয়ুশেষে চলে গেছে, সেখানে আর ফেরা যায় না।' এই চারজন লেখককে যে জিনিসটা এক সূত্রে বাঁধে, তা হল, এই জ্ঞান এবং তার সাথে জড়িত যে বিষণ্নতা, তা থেকে তাঁদের রচিত কবিতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ইয়াহিয়া কামাল এবং তানপিনার, বিষাদগ্রস্ত অটোমান-টার্কিশ ইস্তাম্বুলের একটা রূপ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন– কোনো তুর্কী পূর্ববর্তী নজির ছিল না বলে, তাঁরা পাশ্চাত্য পর্যটকদের পদানুসরণ করে শহরের দরিদ্র অঞ্চলগুলোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন– তখন ইস্তাম্বুলের জনসংখ্যা টেনেটুনে পাঁচ লাখ। পঞ্চাশ সালের শেষাশেষি, আমার যখন স্কুলজীবন শুরু হচ্ছে, তখন এই জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ২০০০ সালে, এটা বেড়ে ৫০ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। যদি আমরা পুরোনো শহর, পেরা এবং বসফোরাসকে এক পাশে রাখি, তাহলে এই লেখকেরা যে ইস্তাম্বুলকে জানতেন, তার চেয়ে বর্তমান ইস্তাম্বুল দশ গুণ বড় হয়ে গেছে।

তা সত্ত্বেও, এই শহরের অধিবাসীদের কাছে শহরের যে রূপ, তা কিন্তু এই লেখকেরা শহরের যে রূপ সৃষ্টি করে গেছেন, তার ওপর নির্ভর করে। কারণ যারা এই শহরেই জন্মেছে এবং যারা গত পঞ্চাশ বছরে বাইরে থেকে এসেছে এবং যারা বসফোরাস ছাড়িয়ে, পুরোনো শহর এবং ঐতিহাসিক অঞ্চলগুলো ছাড়িয়ে উপকণ্ঠে বাস করে, তারা কেউই ইস্তাম্বুলের অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রূপ তৈরি করতে পারেনি। মাঝে মাঝেই অভিযোগ শোনা যায় যে, 'এই সব অঞ্চলে বাস করছে এ রকম দশ বছরের অনেক ছেলে আছে, যারা আজ পর্যন্ত বসফোরাস দেখেনি' এবং সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শহরের বাইরে বিশাল উপকণ্ঠ এলাকায় যারা বাস করে, তারা নিজেদের ইস্তাম্বুলীয় বলে মনে করে না। প্রচলিত সংস্কার এবং পাশ্চাত্য সংস্কার, এই দুইয়ের মাঝে আটকে পড়া শহরটায়, যেখানে অল্প সংখক অতি উচ্চবিত্ত এবং অধিকাংশ দরিদ্র নিম্নবিত্ত বাস করে, যেখানে বহিরাগতদের ঢেউ-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে ঢেউ আছড়ে পড়েছে, যে শহর নানা শ্রেণীর এবং মতের বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে বিভক্ত, সেখানে গত দেড়শ বছরে কেউই শহরটাকে একান্ত নিজের বলে ভাবতে পারেনি।

আমাদের চারজন বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত লেখকদের সমালোচকরা আক্রমণ করেছেন, কারণ তাঁরা নাকি প্রজাতন্ত্রের প্রথম চার দশকে অটোমান এবং অতীত নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন, যেখানে সমালোচকদের মতে, তাদের উচিত ছিল পাশ্চাত্যমুখী কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য তৈরি করা। এই জন্য তাঁদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

কার্যত তাদের লক্ষ্য ছিল দুটি মহান সংস্কৃতি থেকেই অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করা, যাকে সাংবাদিকরা, স্থূল ভাষায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বলে থাকেন। শহরের বিষণ্নতাকে একাত্ম করে নিয়ে তাঁরা শহরের সামগ্রিক সত্ত্বায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং একই সময়ে তাঁরা এই সামগ্রিক বিষণ্নতা, এই 'হুজুন'কে প্রকাশ করতে চাইছিলেন– তাঁদের শহরের কাব্যকে বের করে আনতে চাইছিলেন– একজন পাশ্চাত্যবাসীর চোখ দিয়ে ইস্তাম্বুলকে দেখে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, পাশ্চাত্যপন্থী হতে বললে প্রাচ্যপন্থী হয়ে এবং যখন প্রাচ্যপন্থী হওয়া ঈপ্সিত, তখন পাশ্চাত্যপন্থী হয়ে,– এগুলো হয়তো সহজাত প্রবৃত্তি, কিন্তু তাঁরা একটা জায়গা তৈরি করে নিলেন, যেখানে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত নিরাপদ নির্জনতা পেয়ে গেলেন।

স্মৃতি কথার লেখক আব্দুল হক সিনাসি হিসার, কবি ইয়াহিয়া কামাল, ঔপন্যাসিক আহমেদ হামদি তানপিনার এবং সাংবাদিক-ইতিহাসবেত্তা রেসাত এক্রাম কোকু– এই চারজন বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত লেখক সকলেই সারাজীবন একলাই কাটিয়ে গেছেন, কেউ বিয়ে করেননি এবং সকলেই নিঃসঙ্গ মারা গিয়েছিরেন। একমাত্র ইয়াহিয়া কামাল ছাড়া, কেউই মৃত্যুর আগে তাঁদের স্বপ্নপূরণ করতে পারেননি। তাঁরা কেবল অসমাপ্ত বই বা রচনা ফেলে রেখেই মারা যাননি, তাঁদের জীবদ্দশায় যে সব বই প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলো কখনোই তাঁদের কাঙ্খিত পাঠকের দরবারে পৌঁছায়নি। ইস্তাম্বুলের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি ইয়াহিয়া কামাল তাঁর সারাজীবন ধরে কোনো বই প্রকাশ করতে অস্বীকার করে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২.
আমার দাদীমা

যদি কেউ প্রশ্ন করে, তাহলে তিনি অবশ্যই বলবেন যে, তিনি আতাতুর্কের পশ্চিমীকরণ উদ্যোগ-এর স্বপক্ষে– কিন্তু আসলে– এবং এ ব্যাপারে তিনি শহরের অন্যান্য অধিবাসীদেরই মতো– পূর্বই হোক বা পশ্চিমই হোক, কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করত না। কেননা, তিনি কদাচিৎ ঘর থেকে বের হতেন। এই শহরের অধিকাংশ আরামপ্রিয় লোকদের মতো তিনি স্মৃতিস্তম্ভ, ইতিহাস, বা 'সৌন্দর্য'-এর প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করতেন না। অথচ তিনি কিন্তু পড়াশুনো করেছিলেন ইতিহাসের শিক্ষিকা হবেন বলে। আমার দাদাজীর বাগদত্তা হবার পরে এবং বিয়ের আগে, তিনি ১৯১৭ সালের ইস্তাম্বুলে একটা অসমসাহসের কাজ করেছিলেন– তাঁর সঙ্গে একটা রেস্তরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন। যেহেতু ওঁরা একটা টেবিলে সামনাসামনি বসেছিলেন এবং যেহেতু তাঁদের পানীয় পরিবেশন করা হচ্ছিল, তাতে আমি কল্পনা করে নিতে পারি যে, তাঁরা পেরা-র একটা কাফেতে বসেছিলেন। যখন আমার দাদাজী জিজ্ঞেস করলেন উনি কী পানীয় পছন্দ করবেন (মানে, চা অথবা লেমনেড), আমার দাদীমা ভাবলেন যে, দাদাজী ওঁকে কোনো কড়া পানীয় খেতে বলছেন, আর তাই কড়া ভাষায় জবার দিলেন।

'শুনে রাখুন মশাই, আমি কখনো মদ ছুঁইনি।'

চল্লিশ বছর পরে কোনো নববর্ষের দিন আমাদের পারিবারিক ভোজসভায় যদি উনি এক গ্লাস বিয়ার হাতে নিয়ে স্ফুর্তিতে থাকেন, কেউ না কেউ, ওপরের গল্পটা বলবে, আর উনি বেশ বড় করে একটা লজ্জার হাসি হেসে দেবেন। যদি এটা কোনো সাধারণ দিন হয় আর উনি নিজের বসার ঘরে নিজের বরাবরের চেয়ারে বসে থাকেন, তাহলে উনি কিছুক্ষণ হাসবেন এবং ওই 'অসাধারণ' ভদ্রলোকটির, যাকে আমি কয়েকটা ফটোগ্রাফেই কেবল দেখেছি, অকাল প্রয়াণে খানিকক্ষণ চোখের জল ফেলবেন। যখন তিনি কাঁদতেন, আমি কল্পনা করতাম, দাদাজী আর দাদীমা শহরের রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছেন। কিন্তু এই গোলগাল, আয়েসি মহিলা, রেনয়-এর আঁকা ছবির মতো, তাকে মোডিগ্‌লিয়ানি-র ট্যাবলো দৃশ্যের দীর্ঘাঙ্গী, কৃশ, নার্ভাস মহিলা হিসেবে কল্পনা করা কষ্টকর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দাদাজী বিশাল সম্পত্তি করে, রক্তের ক্যান্সার রোগে মারা যাবার পর আমার দাদীমা আমাদের বড় পরিবারটির 'বস' হয়ে বসলেন। তার রাঁধুনি এবং সারা জীবনের বন্ধু বেকির যখন তার অবিরাম হুকুম আর অভিযোগ শুনে বিরক্ত হয়ে যেত তখন হাল্কা রসিকতা করে এই কথা বলত : 'আপনি যা হুকুম করেন, বস!' দাদীমা একটা মস্তবড় চাবির গোছা নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব বাড়ির বাইরে খাটত না।

আমার বাবা এবং চাচাজী যখন অল্প বয়সে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কারখানাটি হারালেন, যখন তাঁরা একটা বিরাট নির্মাণ উদ্যোগ শুরু করলেন এবং তড়িঘড়ি বোকার মতো টাকা বিনিয়োগ করে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন, যখন আমাদের 'বস'-কে একটা একটা করে পরিবারের সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হল, তখন আমার দাদীমা, যিনি প্রায় কোনোদিনই বাইরে পা রাখেননি, কিছুক্ষণ চোখের জল ফেললেন, তারপর ওঁদের ভবিষ্যতে আরো সাবধান হতে বললেন।

সারাটা সকাল উনি বিছানাতেই কাটাতেন, মোটা ভারী লেপের তলায়, এক গাদা বড় বড় পাশ বালিশে হেলান দিয়ে। প্রতিদিন সকালে বেকির একটা মস্ত বড় ট্রে-তে নরম সেদ্ধ ডিম, অলিভ, ছাগলের দুধের চিজ আর পাঁউরুটি টোস্ট সাজিয়ে নিয়ে এসে ওঁকে পরিবেশন করত, ট্রে-টা খুব সাবধানে ও লেপের ওপর একটা বালিশ রেখে তার ওপর বসাত (ফুল তোলা বালিশ আর রূপোর ট্রের মাঝখানে পুরোনো খবরের কাগজ, ব্যবহারিক দিক থেকে যেটা বাঞ্ছনীয়, সেটা করলে পরিবেষ্টনীর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে); দাদীমা অনেক সময় নিয়ে প্রাতরাশ সারতেন, কাগজ পড়তেন আর দিনের প্রথম অতিথিকে স্বাগত জানাতেন। (ওঁর কাছ থেকেই আমি মুখের মধ্যে একটুকরো শক্ত ছাগলের দুধের চিজ রেখে মিষ্টি চা পান করার মজাটা শিখেছি।) আমার চাচাজী, যিনি প্রথমে মাকে আলিঙ্গন না করে কাজে বেরোতে পারতেন না, সকালে প্রথমেই মা-র কাছে চলে আসতেন। চাচীজী তাঁকে কাজে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজেও একটা হাতব্যাগ নিয়ে চলে আসতেন। আমার স্কুল শুরু হবার আগে, ঠিক করা হয় যে, অল্প কিছুদিনের জন্য আমাকে বাড়িতে পড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখতে হবে, আর তাই আমার দাদাও যা করেছিল, আমিও ঠিক তাই করলাম; একটা নোটবই হাতে নিয়ে দাদীমার ঘরে চলে আসতাম, তারপর দাদীমার লেপের ওপর উঠে বসে, ওঁর কাছ থেকে অক্ষরের রহস্য শিখবার চেষ্টা করতাম। পরে আমি যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম, তখন অন্য লোকের কাছ থেকে শিখতে আমার বিরক্ত লাগত, আর তাই একটুকরো সাদা কাগজ হাতে পেলেই, আমি কিছু লেখার বদলে, ড্রইং এঁকে এঁকে কাগজটা কালো করে দিতাম।

যখন আমার পড়ালেখার পাট চলত, তখন মাঝখানে রাঁধুনি বেকির ঘরে এসে রোজকার মতো একই প্রশ্ন করত :

'আজ আমরা সবাইকে কী পরিবেশন করব?'

খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে ও প্রশ্নটা করত, মনে হত, ও যেন একটা বড় হাসপাতালের রান্নাঘরের দায়িত্বে আছে কিংবা সৈন্যদলের ব্যারাকে। দাদীমা আর তাঁর রাঁধুনি, দুজনে মিলে তখন আলোচনা হত, কোন্ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কে বা কারা দুপুরের খাওয়া বা রাত্রের খাওয়ায় আসবে আর তাদের জন্য কী রান্না করা হবে। তারপর দাদীমা তার মস্তবড় পঞ্জিকাটা বার করতেন, সেটায় অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্যময় কথা লেখা, আর নানা রকম ঘড়ির ছবি থাকত; ওঁরা দুজন বইটার মধ্যে 'আজকের খাবার দাবার' দেখে রান্নার প্রেরণা পাবার চেষ্টা করতেন, আর আমি পেছনের বাগানে সাইপ্রেস গাছের ডালের মধ্যে দিয়ে কাকের ওড়াউড়ি দেখতাম।

প্রচুর কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও, বেকির কিন্তু তার রসবোধ কখনো হারায়নি। ও বাড়ির প্রত্যেকের, আমার দাদীমা থেকে তাঁর খুদে নাতি পর্যন্ত, সকলের একটা করে ডাক নাম দিয়েছিল। আমার নাম দিয়েছিল 'কাক'। অনেক বছর পরে ও আমাকে বলেছিল যে, আমি সব সময় পাশের বাড়ির ছাদে কাকগুলোকে লক্ষ করতাম বলে আর আমি খুব রোগা ছিলাম বলে, ও আমার 'কাক' নাম দিয়েছিল। আমার বড় দাদা ওর টেডি বিয়ারকে খুব ভালোবাসত আর ওটা ছাড়া কোথাও যেত না বলে, বেকির ওকে ডাকত 'নার্স' বলে। একজন চাচাতো ভাই যার চোখগুলো ছিল সরু, সে ছিল 'জাপান', আরেকজন খুব গোঁয়ার ছিল বলে, সে ছিল 'ছাগল'। একটা চাচাতো ভাই সঠিক সময়ের আগে জন্মেছিল বলে, ওকে ডাকত 'ছ' মাস' বলে। অনেক বছর ধরে ও আমাদের এই সব নামেই ডাকত, ওর মৃদু রসিকতা থাকত দরদ দিয়ে ঢাকা।

আমার দাদীমার ঘরে, আমার মায়ের ঘরের মতোই একটা ড্রেসিং টেবিল ছিল, আর তাতে লাগানো ছিল ভাঁজ করা আয়না। আমি ওই ভাঁজ করা প্যানেলগুলো খুলে তার ভেতরের প্রতিফলনের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইতাম, কিন্তু এই আয়নাটা আমাকে ছুঁতে দেওয়া হত না। আমার দাদীমা আদ্ধেক দিন বিছানায় কাটাতেন আর কখনো সাজগোজ করতেন না, কিন্তু টেবিলটাকে এমন কায়দা করে বসিয়েছিলেন যে, টেবিলের আয়নার মধ্যে দিয়ে তিনি পুরো লম্বা করিডোরটা, কাজের লোকদের ঢুকবার দরজা, পুরো বসার ঘরটা, জানালা পর্যন্ত, যেটা দিয়ে বাইরেটা দেখা যেত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব দেখতে পেতেন আর কে ঢুকল, কে বেরোল, কোন্ কোণায় কে বা কারা কথাবার্তা বলছে, দূরে নাতি-পুতিরা ঝগড়া মারামারি করছে, সব কিছু দেখতেন আর তদারক করতেন বিছানায় শুয়ে শুয়েই। বাড়িটার ভেতরটা প্রায়শই অন্ধকার থাকত বলে কখনো কখনো কোনো প্রতিফলনে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনা আবছা দেখা যেত, তখন দাদীমা চিৎকার করে জানতে চাইতেন, কে ওখানে, বা কী হচ্ছে ইত্যাদি আর বেকির দৌড়ে এসে জানিয়ে যেত কে কোথায় কী করছে।

যখন দাদীমা খবরের কাগজ পড়তেন না বা (কখনো কখনো) বালিশের ঢাকনায় ফুল তুলতেন না, তখন সারাটা বিকেল তার নিজের বয়সি অন্যান্য নিশাস্তাসি মহিলাদের সঙ্গে বসে সিগারেট খেতেন বা তাস খেলতেন। আমার মনে আছে, কখনো কখনো তাঁদের পোকার খেলতেও দেখেছি। একটা নরম, লাল টকটকে ভেলভেটের থলির মধ্যে পোকারের ঘুঁটিগুলো রাখতেন, তার সাথে থাকত অটোমান মুদ্রা, পুরোনো, ফুটো করা, ধারগুলো কাটা কাটা, মুদ্রার ওপরে রাজকীয় চিহ্ন থাকত আর আমি ঘরের এক কোণায় বসে ওগুলো নিয়ে খেলতাম।

খেলার টেবিলের সঙ্গিনী একজন মহিলা সুলতানের হারেম থেকে এসেছিলেন। সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন অটোমান পরিবার– আমি রাজবংশ কথাটা ব্যবহার করতে পারি না– ইস্তাম্বুল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন তাঁরা হারেম বন্ধ করে দেন এবং এই মহিলা হারেম থেকে বেরিয়ে এসে আমার দাদাজীর একজন সহকর্মীকে বিয়ে করেন। আমার দাদা আর আমি, এই মহিলা দাদীমার বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও যেমন অতিরিক্ত বিনম্র ভাবে কথা বলতেন, তাই নিয়ে ঠাট্টা করতাম। ওরা দুজনে পরস্পরকে 'ম্যাডাম' বলে সম্বোধন করতেন, এবং বেকির উনুন থেকে সদ্য তুলে আনা তৈলাক্ত রোল আর চিজ টোস্ট পরিবেশন করলে, সেগুলোর ওপর মহানন্দে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। দুজনেই ছিরেন মোটাসোটা, কিন্তু এমন একটা সময়ে এবং সংস্কৃতিতে তাঁরা বাস করতেন, যখন এটাকে কলঙ্ক বলে ভাবা হত না, এবং তাই তাঁরা বেশ সহজ ছিলেন।

যদি আমার মোটাসোটা দাদীমাকে বাইরে যেতে হত বা বাইরে নিমন্ত্রণ থাকত, (প্রতি চল্লিশ বছরে একবারই হয়েছিল) তাহলে তার প্রস্তুতি চলত কয়েকদিন ধরে আর শেষ পর্যায়ে দাদীমা কেয়ার টেকার-এর বৌ কামের হানিমকে চিৎকার করে ডাকতেন ওপরে এসে ওঁর কোমরবন্ধনীর সুতো ধরে সর্বশক্তি দিয়ে টানতে। আমি তাকিয়ে দেখতাম, মাথার চুল খাড়া হয়ে যেত, পর্দার ওপাশে দড়ি টানাটানি চলছে। সাথে সাথে চিৎকার, 'আস্তে, মেয়ে, আস্তে!' আমি অবাক হয়ে যেতাম, যখন এর দিন কয়েক আগে দাদীমার হাত পায়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে একজন মেয়েলোক আসত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত, পাশে বাটিতে থাকত সাবান-জল, আর নানা রকমের যন্ত্রপাতি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দেখতাম, মেয়েলোকটা আমার শ্রদ্ধেয় দাদীমার পায়ের নখগুলো টকটকে লাল রঙের করে দিচ্ছে আর দাদীমায়ের পায়ের ফুলো ফুলো আঙুলগুলোর মাঝখানে তুলো গুঁজে দিচ্ছে, আমার অবাক লাগত আবার খারাপও লাগত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুড়ি বছরে পরে যখন আমরা ইস্তাম্বুলের অন্য অংশে অন্য বাড়িতে বাস করতাম, তখন প্রায়ই পামুক অ্যাপার্টমেন্টে দাদীমাকে দেখতে যেতাম। যদি সকালে যেতাম, তাহলে ওঁকে সেই বিছানাতেই দেখতাম, সেই একই ব্যাগ, খবরের কাগজ, বালিশ দিয়ে ঘেরা আর ছায়াচ্ছন্ন। ঘরের ভেতরের গন্ধ, সাবান, কোলোন, ধুলো এবং কাঠের মিশ্রিত গন্ধ, সেটাও একই থাকত। দাদীমা সব সময় একটা পাতলা চামড়া-বাঁধাই নোট বই সঙ্গে রাখতেন আর তাতে প্রতিদিন কিছু কিছু লিখতেন। এই নোটবইতে, তিনি বিল, স্মৃতি কথা, কি খেলেন, খরচ খরচা, কর্মপন্থা, আবহাওয়ার খবর, সব লিখতেন, মনে হত এটা ওঁর একটা আদব-কায়দার বই। বোধহয় তিনি ইতিহাস পড়েছিলেন বলে, সময়ে সময়ে সরকারি আদব-কায়দা অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু যখনই তা করতেন, তাঁর গলায় কিন্তু একটু বিদ্রূপের ছোঁয়া লেগে থাকত। আদব-কায়দা আর অটোমান কেতায় তাঁর আকর্ষণের আরেকটা ফল হয়েছিল– তাঁর প্রত্যেকটা নাতির নাম দেওয়া হয়েছিল, একজন বিজেতা সুলতানের নামে। আমি যখনই তাঁকে দেখতে যেতাম, তাঁর হাতে চুমু খেতাম; তখন উনি আমাকে কিছু টাকা দিতেন, যেটা আমি লজ্জা লজ্জা মুখে (আবার আনন্দের সঙ্গে) পকেটে ঢোকাতাম এবং আমার মা, বাবা এবং দাদা কী কী করেছে, সব জানানোর পর দাদীমা কখনো কখনো নোট বইয়ে কি লিখেছেন, আমাকে পড়ে শোনাতেন।

'আমার নাতি ওরহান আমায় দেখতে এসেছিল। ও খুব বুদ্ধিমান, খুব মিষ্টি। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য শিল্প নিয়ে পড়ছে। ওকে দশ লিরা দিলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও একদিন সফল হবে আর পামুক পরিবারের নাম একদিন আবার সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হবে, যেমন ওর দাদাজী যখন বেঁচেছিলেন তখন হয়েছিল।'

এটা পড়ার পর, উনি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকাতেন আর ওঁর চোখের ছানিটা দেখে দারুণ অস্বস্তি হত। তারপর উনি আমার দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত বিদ্রূপের হাসি হাসতেন আর আমি ভাবতাম, উনি কি নিজের প্রতি হাসছেন, নাকি হাসছেন কারণ এতদিনে উনি জেনে গেছেন জীবন অর্থহীন। আমিও ওঁর মতো করে হাসবার চেষ্টা করতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩.
স্কুল জীবনের আনন্দ ও একঘেয়েমি

স্কুলে প্রথম যে জিনিসটা আমি শিখলাম, তা হচ্ছে, কিছু লোক মূর্খ; দ্বিতীয় শিক্ষাটা এই যে, কিছু লোক তার চেয়েও খারাপ। আমি খুবই ছোট ছিলাম, তাই বুঝতে পারিনি যে, বড় ঘরানার লোকদের এই মূল তফাতটা না জানার ভান করতে হয় এবং ধর্মগত, জাতিগত, লিঙ্গগত, শ্রেণীগত, অর্থগত এবং (পরবর্তীকালে) সংস্কৃতিগত তফাৎ থাকলেও একই সৌজন্য সকলকেই দেখাতে হয়। তাই আমার অজ্ঞতার ফলে যখনই শিক্ষিকা কোনো প্রশ্ন করতেন, আমি হাত তুলতাম, এটা জানাতে যে, উত্তরটা আমার জানা আছে।

কয়েক মাস পরে শিক্ষিকা এবং আমার সতীর্থদের একটা অস্পষ্ট ধারণা হল যে, আমি একজন ভালো ছাত্র, কিন্তু তবুও আমার হাত তুলতে ইচ্ছা হত। ততদিনে শিক্ষিকা আমাকে আর ডাকেন না, অন্য ছাত্রদের বলবার সুযোগ দেন। তা সত্ত্বেও আমার অজান্তে আমার হাত উঠে যেত, তা আমি উত্তরটা জানি বা না-ই জানি। আমি একটু ফুটানি করতাম ঠিকই,কিন্তু এটাও সত্যি যে, আমি আমার শিক্ষিকাকে শ্রদ্ধা করতাম এবং সব সময় সহযোগিতা করবার জন্য উদগ্রীব থাকতাম।

স্কুলে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে শিক্ষিকার 'কর্তৃত্ব'। বাড়িতে, পামুক অ্যাপার্টমেন্টের ভীড়ভাট্টায় এবং বিশৃঙ্খলায়, কোনোকিছুই পরিষ্কার ভাবে হত না। আমাদের খাবার টেবিলের ভীড়ে, সবাই এক সঙ্গে কথা বলত। আমাদের পারিবারিক দৈনন্দিনতা, আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, আমাদের কথোপকথন, খাওয়া-দাওয়া, রেডিও শোনার বাঁধা সময়, এই সব কিছু কখনোই আলোচনা করে করা হত না, হয়ে যেত। আমার বাবার বাড়িতে কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, উনি প্রায়ই থাকতেন না। বাবা, দাদাকে বা আমাকে কখনো বকেননি, কখনো অপছন্দ হলেও ভুরু কোঁচকাননি। পরবর্তীকালে উনি ওঁর বন্ধুদের কাছে আমাদের পরিচয় দিতেন, 'আমার দুই ছোট ভাই' বলে এবং আমরা ভাবতাম, একথা বলার ওঁর অধিকার আছে। আমি জানতাম,বাড়িতে একমাত্র মায়েরই কর্তৃত্ব আছে। কিন্তু তিনি কখনোই দূরের মানুষ ছিলেন না, বা অত্যাচারী ছিলেন না। মায়ের ভালোবাসা পাওয়ার আমার যে আকাঙ্খা, সেটাই ছিল ওঁর শক্তি। এবং তাই আমার শিক্ষিকার পঁচিশ জন ছাত্রের ওপর কর্তৃত্ব দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয় আমার শিক্ষিকাকে আমার মায়ের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলাম, কারণ তাঁর অনুমোদন পাওয়ার জন্য আমার অদম্য আকাঙ্খা ছিল। 'হাত দুটো এইভাবে জড়ো করে, চুপ করে বসে থাক,' উনি বলতেন আর আমি ঠিক ওই ভাবে ধৈর্য ধরে পুরো ক্লাশটা বসে থাকতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাপারটার নতুনত্ব কমে গেল; তখন আর সকলের আগে সঠিক উত্তর দেওয়া, বা একটা অঙ্ক সঠিকভাবে করা, কিংবা সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ায় আর কোনো উত্তেজনা থাকল না। সময় বয়ে যেতে লাগল ধীরে, অতি ধীরে, কিংবা সময় থেমেই গেল।

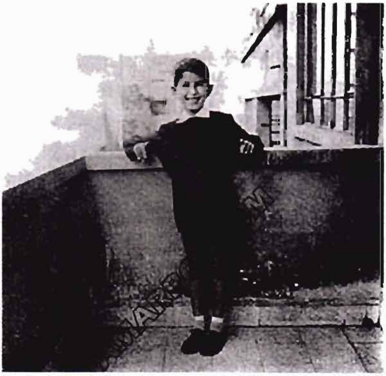

যে মোটা, অল্প বুদ্ধি মেয়েটা বোর্ডে লিখছিল, যে কিনা প্রত্যেককে, শিক্ষিকাকে, স্কুলের তত্ত্বাবধায়ককে, ওর ক্লাশের বন্ধুদের, সবাইকে দেখে একটা বোকা বোকা, বিশ্বাসী হাসি হাসত, তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আমি জানালার বাইরে, অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যে চেষ্টনাট গাছের ডালপালা উঁচুতে উঠেছিল, তার ওপরের দিকের ডালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। একটা ডালে কাক এসে বসত। আমি নিচের দিক থেকে দেখছিলাম বলে, ওই কাকটার পেছনে আকাশে একটুকরো ছোট মেঘ ভেসে যাচ্ছে দেখতাম– মেঘটা ক্রমাগত চলছে, আকার পাল্টাচ্ছে; প্রথমে মনে হল একটা খ্যাঁকশিয়ালের নাক, তারপরে একটা মাথা, তারপরে একটা কুকুর। আমি মনে মনে চাইছিলাম, ওটা কুকুরই থাকুক, কিন্তু মেঘটা চলতে চলতে একটা চার-পা-ওয়ালা রূপোর চিনি রাখবার বাটি হয়ে গেল। ওরকম বাটি আমার দাদীমার তালাবন্ধ কাচের কেসে সাজানো থাকত। তারপরই খুব বাড়ি যাবার ইচ্ছে হত। বাড়ির ভেতরের ছায়ান্ধকারের নীরবতার কথা ভেবে নেওয়ার পর, বাবা সেই ছায়া ছায়া অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতেন, যেন স্বপ্নের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তারপরই আমরা পরিবারের সবাই মিলে বসফোরাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়াতে চলে যেতাম। ঠিক এই সময়ই উল্টো দিকের অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটার একটা জানালা খুলে যেত আর একটা কাজের মেয়ে ওর ঘর-মোছা ন্যাকড়াটা বাইরে ঝেড়ে, অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আমি স্কুলে যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে রাস্তাটা দেখা যেত না। নিচে রাস্তায় কী হচ্ছে? আমি ভাবতাম। পাথরের রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে, আমি শুনতে পেতাম, আর একটা কর্কশ স্বর চিৎকার করছে, পুরোনো লোহা, টিনা-আ-আ-আ!' কাজের মেয়েটা কাবারিওয়ালাকে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখত, তারপর জানালা থেকে মাথা সরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে, জানালাটা বন্ধ করে দিত, কিন্তু হয়তো তক্ষুণি, ওই জানালার পাশেই প্রথম মেঘটার মতোই দ্রুতগতিতে, কিন্তু উল্টোদিকে আমি আর একটুকরো মেঘ দেখতে পেতাম। ততক্ষণে আবার ক্লাশের ভেতর ডাকা শুরু হত আর আমি বাকি সকলের তোলা হাত দেখে, নিজেও হাত তুলতাম; ক্লাসের অন্যান্যদের উত্তর দেওয়া শুনে আমি বুঝে যেতাম শিক্ষিকার প্রশ্নটা কী ছিল, আর আমি অস্পষ্টভাবে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে, উত্তরটা আমি জানি।

আমার ক্লাশের বন্ধুদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে জানা এবং আমার চেয়ে কতখানি আলাদা ওরা তা জানাটা যেমন উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, তেমনি যন্ত্রণাদায়কও ছিল। একটা দুঃখী দুঃখী ছেলে ছিল, তুর্কী ভাষার ক্লাশে যখনই ওকে জোরে জোরে পড়তে বলা হত, ও একটা করে লাইন বাদ দিয়ে পড়ত; ওর এই ভুলটা ছিল যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, ক্লাশের সকলের হাসিও ছিল তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। প্রথম শ্রেণীতে একটা মেয়ে কিছুদিন আমার পাশেই বসত, ওর লাল চুল পনিটেল বাঁধা থাকত। ওর ব্যাগে আধ-খাওয়া আপেল,সিমিত, সিমের বীচি, পেন্সিল, চুলের ব্যান্ড এলোমেলোভাবে ভরা থাকত। ওর চারপাশে পাওয়া যেত শুকনো ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ আর আমাকে ওটা টানত। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট অন্ধবিশ্বাস আর সংস্কারগুলো সম্বন্ধে একদম খোলাখুলি কথা বলার একটা সহজাত ক্ষমতা ওর ছিল, সেটাও আমাকে টানত, আর সপ্তাহান্তে ওকে না দেখতে পেলে আমার মন খারাপ করত। আরেকটা মেয়ে ছিল, খুব ছোট্ট আর রোগা, ওকে দেখে আমি প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম। আরেকটা ছেলে, জানে যে, কেউ ওর কথা বিশ্বাস করে না, তবু কেন যে মিথ্যা কথা বলে? ওর বাড়ির সব ব্যাপার ওই মেয়েটা খোলাখুলি বলে কেন? আর ওই মেয়েটা, আতাতুর্ক-এর সম্বন্ধে কবিতাটা পড়বার সময় কি খাঁটি চোখের জল ফেলছিল?

আমার যেমন অভ্যাস ছিল, গাড়ির সামনের দিকটা ভাল করে দেখে, নাক খুঁজে বার করা, তেমনি আমি আমার ক্লাশের বন্ধুদের পর্যবেক্ষণ করতে ভালোবাসতাম, দেখতাম কোন্ জন্তুর সঙ্গে কার মিল আছে। যে ছেলেটার নাকটা ছুঁচোলো, সে একটা খ্যাঁকশিয়াল আর তার পাশের বড় সড় চেহারার ছেলেটা, সবাই ওকে যেমন বলে, একটা ভালুক, আর মাথা-ভর্তি ঘন চুলওয়ালা ছেলেটা হচ্ছে, শজারু,... মনে পড়ে মারী নামের একটা ইহুদি মেয়েকে; ও আমাদের 'পাসওভার' সম্বন্ধে বলত–

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলত কোনো কোনো দিনে ওর নানীমার বাড়িতে কাউকে আলোর সুইচে হাত দিতে দেওয়া হত না। আরেকটা মেয়ে বলেছিল, একদিন সন্ধেবেলায় ওর নিজের ঘরে ও এত তাড়াতাড়ি পেছন ফিরছিল যে, ও একটা পরীর ছায়া দেখতে পেয়েছিল– গল্পটা শুনে আমি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম এবং এখনো ভয়টা আছে। আর একটা মেয়ে ছিল, খুব লম্বা লম্বা পা, আর ও খুব লম্বা মোজা পরত আর সব সময়েই ওকে দেখে মনে হত যে, ও এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। ওর বাবা ছিলেন সরকারের একজন মন্ত্রী এবং যখন উনি একটা প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান, যে দুর্ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী মেন্ডেরেসও পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন, গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি, তখন আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, মেয়েটি নিশ্চয়ই কাঁদছে, কারণ ও তো আগে থেকেই জেনে গিয়েছিল কী ঘটতে যাচ্ছে। প্রচুর ছেলেমেয়ে ছিল, যাদের দাঁতের সমস্যা ছিল। কারো কারো দাঁতে 'ব্রেস' লাগানো ছিল। স্কুল বাড়ির সবচেয়ে ওপরের তলায় থাকার জায়গা ছিল, খেলার হলঘর ছিল আর ছিল চিকিৎসার জায়গা; ঠিক তার পাশেই একজন দাঁতের ডাক্তার বসতেন বলে শুনেছিলাম আর যখন কোনো ছাত্র দুষ্টুমি করত, শিক্ষক রেগে গিয়ে বলতেন, তাকে ওপরে দাঁতের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অল্প স্বল্প দুষ্টুমি করলে, ঘরের এক কোণায় ব্ল্যাকবোর্ড আর দরজার মাঝখানে, ক্লাশের দিকে পেছন ফিরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন, কখনো বা এক পায়ে। এক পায়ে দাঁড়ালে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে দেখার জন্য ক্লাশসুদ্ধ সবাই উদগ্রীব হয়ে থাকতাম, পড়াশুনো হত না এবং তাই এই শাস্তিটা কমই দেওয়া হত।

আহমেদ রাশিম (১৮৬৫-১৯৩২) তাঁর স্মৃতিকথা 'ফলাকা অ্যান্ড নাইটস'-এ নিজের স্কুলজীবন সম্বন্ধে লিখেছেন, শিক্ষকরা অটোমান স্কুলে এত লম্বা ডান্ডা নিয়ে বসতেন যে, নিজের চেয়ার থেকে না উঠেই, ওই লম্বা ডান্ডা দিয়ে ছাত্রদের মারতে পারতেন। আমাদের শিক্ষকরা আমাদের এই বই পড়তে বলতেন, বোধহয় বোঝাবার জন্য যে, প্রজাতন্ত্র-পূর্ব, আতাতুর্ক-পূর্ব, ফলাকা (বেত মারা) যুগের হাত থেকে আমরা কপালজোরে বেঁচে গেছি। কিন্তু তাহলেও বড়লোকদের জায়গা নিশান্তাসিতে, বড় স্কুল ইসিক লিসেসি-তে অটোমান যুগের শেষ দিকের কিছু শিক্ষক, দুর্বল, আত্মরক্ষায় অপারগ ছাত্রদের জন্য 'আধুনিক' প্রযুক্তি দিয়ে নতুন অস্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। আমাদের ফ্রান্সে তৈরি স্কেল-কাঠি, যেগুলো পাতলা শক্ত মাইকার টুকরো পাশে ঢুকিয়ে আরো শক্ত করে তৈরি, সেগুলো তাঁদের পাকা হাতে ফলাকা এবং ডান্ডার মতোই সমান কার্যকরী ছিল।

আলসে, অসভ্য, বোকা বা অবাধ্য ছেলেদের যখন শাস্তি দেওয়া হত, আমি তাতে খুব আনন্দ পেতাম। একটা মিশুকে মেয়ে গাড়ি চেপে স্কুলে আসত, ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসত; শিক্ষকদের প্রিয় ছিল, যখনই সুযোগ পেত, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে উঠে ইংরাজিতে কর্কশ গলায় 'জিঙ্গল বেলস' গানটা করত– কিন্তু এততেও তার ওপর শিক্ষকদের দয়া হল না, কারণ ওর অপরাধ ছিল, খুব বাজে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোম-ওয়ার্ক করেছিল, ওকে শাস্তি পেতে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। অনেকেই ছিল, যারা হোম-ওয়ার্ক করে আনত না, অথচ স্কুলে এমন ভান করত আর নোট বই, খাতা-পত্র খুঁজত, যেন হোম-ওয়ার্কটা কোথায় রেখেছে, খুঁজে পাচ্ছে না, 'খুঁজে পাচ্ছি না, টিচার', চিৎকার করে বলত, যদি শাস্তিটা এড়ানো যায়। কিছুই হত না, উপরন্তু শাস্তি আরো জোরদার হত। শিক্ষক চড় চাপড় মারতেন, কান ধরে টানতেন।

যখন আমরা আমাদের প্রথম দিককার মিষ্টি মিষ্টি মায়ের মতো শিক্ষিকাদের ছেড়ে, উঁচু ক্লাশের রাগী, বয়স্ক, পোড়খাওয়া শিক্ষকদের কাছে গেলাম, যারা আমাদের ধর্ম, সঙ্গীত এবং জিমনাস্টিক শেখাতেন, তখন এই ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটা আরো বড় মাপের হয়ে গেল। মাঝে মাঝে যখন ক্লাশের লেখাপড়া একঘেয়ে লাগত, তখন এই শাস্তি-টাস্তিগুলো, মিনিট কয়েকের জন্যে হলেও বেশ একটু বিনোদন দিত।

একটা মেয়ে ছিল, যাকে আমি দূর থেকেই সমীহ করতাম, কারণ মেয়েটা বেশ আকর্ষণীয় আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল, অথবা এ-ও হতে পারে যে, মেয়েটা খুব নরম-সরম ছিল– যখন এই মেয়েটিকে শাস্তি দেওয়া হত, ওর চোখে জল চলে আসত আর মুখ লাল হয়ে যেত, আমার খুব ইচ্ছে হত, ওকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাই। যখন মোটা, সোনালি চুলের ছেলেটা, যে টিফিনের সময় আমাকে মার-ধোর করত, একবার কথা বলার জন্য ধরা পড়েছিল আর মার খেয়েছিল, আমি ঠান্ডা চোখে লক্ষ্য করতে করতে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। একটা ছেলে ছিল, আমি ওকে একটা জড়বুদ্ধি বলে ভাবতাম, ওকে যত কঠিন শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন, ও সব কিছুতেই গায়ের জোরে আটকানোর চেষ্টা করত। কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রদের ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে নিয়ে আসতেন, তারা কতখানি শিখেছে তা দেখার জন্য নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা যে পড়াশুনো করেনি, সেটা প্রমাণ করার জন্য। আবার কিছু কিছু মূর্খ ছাত্রদের যে অপমান করা হত, সেটা তারা উপভোগ করত। কিছু শিক্ষক প্রচণ্ড রেগে যেতেন যদি দেখতেন যে নোটবই-এর মলাট অন্য রঙের কাগজ দিয়ে করা হয়েছে। আবার কিছু শিক্ষক কোনো ছাত্র কিছু না করলেও রেগে যেতেন, শুধু ফিসফিস করে কোনো ছাত্র কথা বলেছে, তাতেই ছাত্রকে মারধোর করতেন। কিছু ছাত্র ছিল, তারা কোনো সহজ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার সময় মনে হত যেন মোটর গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ধরা পড়া ভয়ার্ত খরগোস– আর এগুলো আমার সবচেয়ে ভালো লাগত, যখন কোনো ছাত্র সঠিক উত্তর না জানা থাকলে, শিক্ষককে অন্য যে কোনো জানা উত্তর দিত, বোকার মতো ভাবত, এতেই ও পার পেয়ে যাবে।

আমি এই সব দৃশ্য দেখতাম– প্রথমে বকাবকি, ধমক, তারপর রাগের চোটে বই, নোটবই ছুড়ে মারা, আর সারা ক্লাশ ভয়ের চোটে একদম চুপ করে বসে থাকত। আর আমি ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতাম যে, আমি ওইসব ভাগ্যহীন ছাত্রদের একজন নই, যাকে অপমান করা হচ্ছে। ক্লাশের তিন ভাগের এক ভাগ ছাত্রের সঙ্গে আমিও সৌভাগ্যবান ছিলাম। এই স্কুলটা যদি সব রকম আর্থিক অবস্থার ছাত্রদের স্কুল হত, তাহলে সৌভাগ্যবান ছেলেদের যে আলাদা ভাগ ছিল, সেটা স্পষ্ট বোঝা যেত; কিন্তু এটা ছিল বেসরকারি স্কুল, আর সব ছাত্ররাই বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে এসেছিল। টিফিন-এর সময়, খেলার মাঠে আমরা সকলে সকলের বন্ধু হয়ে যেতাম, আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকত না, কিন্তু যখন আমি অন্য ছেলেদের মার খাওয়া, শাস্তি পাওয়া দেখতাম, তখন শিক্ষকের চেয়ারে বসে থাকা ভয়ঙ্কর লোকটার মতো নিজেকে প্রশ্ন করতাম, কেন কিছু ছেলে এত আলসে, এত অসম্মানপূর্ণ, দুর্বল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, বোধহীন, বুদ্ধিহীন হয়। এই সময়ে আমি যে কমিক বইগুলো পড়া শুরু করেছিলাম, তাতেও আমার এই নীতিগত প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না; কমিক বই-এর শয়তানি চরিত্রগুলো সব আঁকা হত, মুখগুলো বিকৃত; ওতেও কোনো কিছু না পেয়ে আমার শিশু হৃদয়ের অন্ধকার গভীরেও কিছু না পেয়ে, আমি শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নটাকে হারিয়ে যেতে দিলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, যে জায়গাটাকে স্কুল বলা হয়, সেখানে জীবনের গভীরে নিহিত প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায় না; বরং এ জায়গাটার আসল কাজ হল, আমাদের রাজনৈতিক পাশবিকতাসম্পন্ন বাস্তব জীবনের জন্য তৈরি করা। এবং তাই, উঁচু স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত, আমি ক্লাসে হাত তুলে ভালো ছেলের মতো লাইনের অন্য দিকে নিরাপদে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলাম।

প্রধান যে জিনিসটা আমি স্কুলে শিখেছিলাম, তা হচ্ছে বিনা প্রশ্নে জীবনের সব সত্যকে গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেও হবে। স্কুলের প্রথম বছরগুলোতে শিক্ষকেরা যে কোনো অজুহাতে ক্লাশে পড়ানো বন্ধ করে গান শেখাতেন। সেই সব ফরাসি আর ইংরাজি গানে আমি শুধু ঠোঁট নাড়তাম, ওগুলো বুঝতামও না, ভালোও লাগত না, যদিও ক্লাশের বন্ধুদের গান গাওয়া দেখতে ভালো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগত। (আমরা তুর্কী ভাষায় গান গাইতাম এবং কথাগুলো এই রকম ছিল, 'পিতা রক্ষক, পিতা রক্ষক, আজকে ছুটির দিন, বাজাও তোমার বাঁশি)। যে বেঁটেখাটো, গোলগাল ছেলেটা আধঘণ্টা আগেও বাড়িতে নোটবই ফেলে এসেছে বলে কাঁদছিল, এখন সে উল্লসিত হয়ে বিশাল হাঁ করে গান গাইছে। যে মেয়েটা অনবরত লম্বা চুল কানের পাশে সরাচ্ছিল, সে গানে মগ্ন হয়ে গিয়ে চুল সরানো ভুলে গেছে। এমন কি, মোটা শয়তানটা, যে আমাকে খেলার সময়ে মারধোর করত, আর ওর গুরু, আরেকটা চালাক শয়তান, যেটা ওর পাশে বসত আর শত বদমায়েসি করেও ধরা পড়ত না, লাইনের অন্য দিকে নিজেকে কি করে নিরাপদ রাখতে হয়, তা ভালই জানত, ওরা দুজনেও একেবারে দেবদূতের মতো আনন্দোজ্জ্বল মুখে গানের আকাশে হারিয়ে যেত। গানের মাঝামাঝি, সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিত ওর পেন্সিলের বাক্স আর নোটবই ঠিকঠাক আছে কিনা। যে চালাক পরিশ্রমী মেয়েটা, যাকে আমি টিফিনের পরে যখন দুজন দুজন করে লাইন দিয়ে ক্লাশে ঢোকার জন্য দাঁড়াতাম, তখন আমার পাশে দাঁড়াতে বলতাম আর ও চুপচাপ ওর হাতটা বাড়িয়ে দিত, সেও খুব দরদ দিয়ে গাইত, আর মোটা, বদমেজাজী ছেলেটা, যে সব সময় নিজের খাতা হাত দিয়ে আড়াল করে রাখত যেন একটা বাচ্চাকে ধরে আছে, যাতে অন্যরা ও কি লিখছে, তা দেখতে না পায়, সেও দুহাত দু'পাশে ছড়িয়ে গান গাইত। এমনকি সেই অকর্মণ্য জড়বুদ্ধি ছেলেটা, যে প্রায় প্রতিদিনই ক্লাশে মার খেত, সে-ও নিজের ইচ্ছায় গানে যোগ দিয়ে গাইত। যখন আমি দেখতাম যে, লাল-চুলো পনিটেল-ওয়ালা মেয়েটাও এটা লক্ষ করেছে, আমরা এ ওর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে গান গাইতাম। আমি গানটা জানতাম না, কিন্তু যখন গানের ওই লা-লা-লা অংশে আসতাম, আমি গানে যোগ দিতাম আর ওই জায়গাটা গলা চড়িয়ে গাইতাম এবং জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভবিষ্যতের দৃশ্যটা ভাবতাম। আর কিছুক্ষণ, অল্প কিছুক্ষণ পরেই, ঘণ্টা বাজবে আর পুরো ক্লাশ হৈ হৈ করে উঠবে; আমি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে লাফ দিয়ে বাইরে আসব, দেখব আমাদের কেয়ারটেকার অপেক্ষা করছে। আমি ওর মস্ত বড় হাতটায় হাত রাখব আর ও আমাকে আর দাদাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হবে। আমি ভাবতে ভাবতে যাব, যে যখন আমি বাড়িতে পৌঁছব, ততক্ষণে আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়ব যে, ক্লাশের সবাইকে ভুলে যাব, আর আমার হাঁটাটা আরো তাড়াতাড়ি হবে, কারণ আমি মনে মনে ভাবব যে, শিগগিরই আমি মা-কে দেখতে পাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪.
এসালপ্ নিটিপ্স্ অন

যখন থেকে আমি পড়তে শিখলাম, আমার মাথার ভেতরের কল্পনার জগৎটা অক্ষরে অক্ষরে ভরে গেল। সেগুলোর কোনো মানে নেই, কোনো গল্প বলে না; সেগুলো কেবল শব্দ করে। যে প্রতিটি শব্দ আমার চোখে পড়ত, ছাইদানের ওপর বা পোস্টারে লেখা কোনো কোম্পানির নাম, সংবাদের শিরোনাম, কোনো বিজ্ঞাপন, কোনো দোকানের বা রেস্তরাঁর ওপর বা কোনো ট্রাকের গায়ে লেখা চিহ্ন, যে কোনো কথাই হোক না কেন– কোনো জিনিস জড়ানো কাগজের ওপর, কোনো ট্রাফিকের চিহ্ন, খাবার টেবিলে রাখা দারচিনির প্যাকেট, রান্নাঘরের তেলের টিন, বাথরুমের সাবান, আমার দাদীমার সিগারেটের প্যাকেট, তাঁর ওষুধের প্যাকেট– এসবের ওপর, যে কোনো কথাই, আমি আপনমনে পড়ে যেতাম। কখনো বা কথাগুলো জোরে জোরে বলতাম, সেই কথাগুলোর মানে না জেনেই। ঠিক যেন আমার ভেতরে একটা যন্ত্র কাজ করছে, আমার চোখ যা দেখছে আর মগজ যা বুঝতে পারছে, সেটা আপনাআপনি অনুবাদ হয়ে শব্দ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা কফির দোকানে একটা রেডিও চলছে, কিন্তু দোকানের ভেতর এত গোলমাল যে

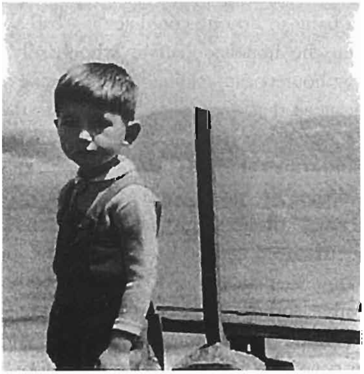

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ শুনতেই পাচ্ছে না। অথচ রেডিও বেজেই চলেছে, তেমনি আমার ভেতরের যন্ত্রটা চলত, ওটা যে চলছে, সেটার সম্বন্ধে সচেতন না থাকলেও।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময়, খুব ক্লান্ত থাকলেও, আমার চোখ দুটো ঠিক কথাগুলো খুঁজে নিত আর মাথার ভেতরের যন্ত্রটা বলে যেত, 'আপনার টাকা এবং আপনার ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য'; 'আইইটিটি বাসস্টপ'; 'এপিকোগ্লুস আসল টার্কিশ সসেজ'; 'পামুক অ্যাপার্টমেন্ট।'

বাড়িতে এলে, আমার দাদীমার খবরের কাগজের শিরোনামের ওপর চোখ যেত, 'সাইপ্রাসে মৃত্যু অথবা বিভাজন'; 'তুরস্কের প্রথম ব্যালে নাচের স্কুল'; 'প্রকাশ্য রাস্তায় তুর্কী মেয়েকে চুমু খাওয়ার জন্য মার খাওয়া থেকে আমেরিকান নাগরিকের বেঁচে যাওয়া'; 'শহরের রাস্তায় হুলা হুপের ওপর নিষেধাজ্ঞা'।

কখনো কখনো অক্ষরগুলো এমন অদ্ভুতভাবে নিজেদের সাজিয়ে নিত যে, আমি সেই পুরোনো জাদুর যুগে ফিরে যেতাম যখন আমি অক্ষর পরিচয় শিখছিলাম। নিশান্তাসিতে রাজ্যপালের প্রাসাদের চারপাশের রাস্তার ফুটপাথে সিমেন্টের ওপর কিছু কিছু লেখা ছিল, ওটা আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র তিন মিনিটের পথ। মা আর দাদার সঙ্গে যখন আমি নিশান্তাসি থেকে টাকসিম বা বিওগ্লুতে হেঁটে যেতাম, আমরা ফাঁকা রাস্তায় সিমেন্টের চৌকোনো ঘরগুলোর ওপর লাফ দিয়ে দিয়ে খেলতে খেলতে যেতাম আর যে অক্ষরগুলোর ওপর দিয়ে লাফ দিতাম, ওগুলো দেখে দেখে মনে করে রাখতাম:

এ সা ক্র ন্ নি টি প্ স্ অ ন

এই রহস্যময় কথা বা নির্দেশগুলো আমাকে উত্তেজিত করে তুলত অমান্য করার জন্য, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি ফুটপাথে থুতু ফেলতে চাইতাম, কিন্তু যেহেতু দু'পা সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকত রাজ্যপালের বাড়ির সামনে, আমি থুতু না ফেলে ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আবার ভয় করত, যদি অজান্তে মুখ থেকে হঠাৎ থুতু বেরিয়ে আসে আর মাটিতে পড়ে। তবে আমি জানতাম যে, থুতু ফেলা বড়দের অভ্যাস, বিশেষ করে বুদ্ধিহীন, দুর্বল, অবাধ্য ছাত্রদের মত, যাদের শিক্ষকরা সব সময়েই শাস্তি দিতেন। পরে যখন আমি চিনাদের থুতু ফেলার পাত্রের কথা পড়ি এবং জানতে পারি যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও থুতু ফেলাটা কী রকম সাধারণ ও স্বাভাবিক, তখন নিজেকেই প্রশ্ন করি, ইস্তাম্বুলে থুতু ফেলা নিষিদ্ধ করা কেন হয়েছিল, কারণ ইস্তাম্বুলে রাস্তায় থুতু ফেলাটা খুব জনপ্রিয় নয়। (যখনই কেউ ফরাসি লেখক বরিস ভিয়ান-এর নামোল্লেখ করে, আমার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর শ্রেষ্ঠ লেখাগুলোর কথা মনে পড়ে না, মনে পড়ে ওর লেখা একটা খুব বাজে বই-এর কথা, 'আমি তোমার সমাধিতে থুতু ফেলি।')

নিশান্তাসির ফুটপাথে পাথরের ওপর লেখা সেই নিষেধাজ্ঞা আমার স্মৃতিতে গেঁথে যাওয়ার কারণ হয়তো আমার মাথার মধ্যে ওই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটির কাজ শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা, ঠিক সেই সময়ে যখন আমার মা আমাদের বাড়ির বাইরে, অচেনা মানুষদের মধ্যে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যেমন মা বলতেন, নির্জন রাস্তায় নোংরা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে খাবার জিনিস না কিনতে এবং কখনোই রেস্তরাঁ থেকে মাংসের কোপ্তা না কিনতে, কারণ ওরা সবচেয়ে খারাপ, তৈলাক্ত, শক্ত মাংস ব্যবহার করে। মায়ের এই সব নির্দেশ, আমার মাথার মধ্যে কাজ করা যন্ত্রটার অন্যান্য ঘোষণা বা লেখাগুলোর যে ছাপ মাথার মধ্যে রয়ে গেছে, তার সঙ্গে মিশে যেত; 'আমরা সব মাংস আমাদের রেফ্রিজারেটরে রাখি'। আরেকদিন মা বললেন, রাস্তায় অচেনা লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকতে। মাথার মধ্যেকার যন্ত্রটা বলল, 'আঠারো বছরের নিচে ঢুকতে দেওয়া হবে না।' ট্রামের পেছনে লেখা থাকত, 'রেলিং ধরে ঝোলা বিপজ্জনক এবং নিষিদ্ধ', যেটা আমার মা-ও বলতেন; মায়ের কথাগুলো সরকারি ঘোষণায় দেখে আমার অস্বস্তি হয়নি, কারণ মা বলে দিয়েছিলেন, আমাদের মতো লোকেরা ট্রামের পেছন দিকে রেলিং ধরে ঝুলেঝুলে যাবার কথা চিন্তাও করতে পারে না। শহরের ফেরিগুলোর গায়ের লেখার ব্যাপারটাও একই, 'প্রপেলারের কাছে যাওয়া বিপজ্জনক এবং নিষিদ্ধ।' মা যখন আমাদের শহরের রাস্তাঘাট নোংরা করার ব্যাপারে বকাবকি করেছিলেন, সেটা যেন সরকারি ঘোষণা মনে হয়েছিল, অথচ একটা বেসরকারি আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা দেওয়াল-লিখন, 'রাস্তায় যে নোংরা ফেলবে' আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। আমাকে যখন বলা হয়েছিল, নিজের মায়ের এবং দাদীমার হাতে চুমু খেতে পারবে, অন্য কারো হাতে নয়, তখন আমার হেরিং মাছের টিন-এর ওপর লেখার কথা মনে হয়েছিল, 'কোনো হাতের স্পর্শ ছাড়াই তৈরি'; 'ফুল তুলিবেন না', বা 'স্পর্শ করিবেন না'– এই দুটো লেখা আমার মায়ের নির্দেশ, যা আমার মাথায় গেঁথে আছে, যেন তারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু এই লেখাটার কি অর্থ আমি বুঝব, 'পুকুরের জল পান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিবেন না', যখন সেই পুকুরে এক ফোঁটাও জল নেই, কিংবা 'ঘাসের উপর দিয়া হাঁটিবেন না', পার্কে লেখা, কিন্তু সেখানে একটা ঘাসের ডগাও নেই, শুধু কাদা আর ময়লায় ভর্তি?

এই সব চিহ্ন এবং ঘোষণাগুলো যে সভ্যতা-ভব্যতার বার্তা বহন করে এবং যেগুলো এই শহরকে ঘোষণা, অনুশাসন এবং শাস্তির অনুজ্ঞা বহনকারী জঙ্গলে পরিণত করেছে, তা বুঝতে গেলে আমাদের এই শহরের খবরের কাগজগুলোর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখক,সাংবাদিকদের এবং তাদের পূর্বসূরি শহরের 'নিজস্ব সংবাদদাতা'-দের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫.
আহমেদ রাসিম এবং
শহরের অন্যান্য সংবাদপত্রের কলাম লেখক

১৮৮০ সালের শেষের দিকে একদিন খুব সকালে-আব্দুল হামিদ তার তিরিশ বছরের একচ্ছত্র শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার অল্পদিনের মধ্যেই, একজন পঁচিশ বছর বয়সি সাংবাদিক, 'হ্যাপিনেস'- নামে একটা ছোট বাবিয়ালি খবরের কাগজের অফিসে নিজের টেবিলে বসে কাজ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, আর একজন লম্বা লোক, মাথায় লাল ফেজটুপি, একটা মিলিটারির জ্যাকেট পরা, যার হাতা দুটো লাল কাপড়ের, একদম মার্চ করে ঘরে ঢুকল। ওই যুবক সাংবাদিককে দেখেই চিৎকার করে উঠল : 'এদিকে এস!' যুবক সাংবাদিকটি ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'টুপি পরে নাও, চলে এস।' সাংবাদিক মিলিটারি জ্যাকেট পরা লোকটার পেছন পেছন বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড় করানো একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। তাঁরা চুপচাপ গালাতা পুল পার হলেন। যাত্রার মাঝামাঝি সময়ে মিষ্টি চেহারার যুবক সাংবাদিকটি সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন?

'বাসমাবেয়িন্সি (সুলতানের মুখ্য সচিব)-র কাছে যাচ্ছি। ওরা আমাকে বলেছে তোমাকে এক্ষুনি নিয়ে যেতে।'

প্রাসাদে যুবক সাংবাদিক প্রতীক্ষাগারে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর একজন সাদা-দাড়িওয়ালা রাগী লোক, যিনি একটা টেবিল-চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁকে ডাকলেন, 'এদিকে এস!'

তার সামনে 'হ্যাপিনেস' কাগজটার একটা সংখ্যা পড়েছিল। ওটার দিকে আঙুল দেখিয়ে উনি রাগতস্বরে বলে উঠলেন, 'এর মানে কী?' সাংবাদিক সমস্যাটা কী বুঝতেই পারলেন না। তখন বুড়ো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বিশ্বাসঘাতক! অকৃতজ্ঞ! তোমার মাথাটা হামান দিস্তায় ফেলে গুঁড়ো করব।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সাংবাদিক লক্ষ করলেন যে, খবরের কাগজের যে অংশটি দেখানো হচ্ছে, সেটা একটা কবিতা আর তার লেখক একজন কবি যিনি মারা গেছেন। কবিতাটির শুরুটা ছিল এই রকম, 'বসন্ত কি আর আসবে না, বসন্ত কি আর আসবে না?' সাংবাদিক বলতে গেলেন, 'স্যার...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে, এতো মুখ বন্ধ করছেন না? যাও, বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।' সুলতানের মুখ্য সচিব বললেন। মিনিট পনেরো বাইরে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে থাকার পর সাংবাদিককে আবার ভেতরে আনা হল। কিন্তু যখনই উনি বলতে চেষ্টা করলেন যে, কবিতাটা ওঁর লেখা নয়, ওঁর ওপর দিয়ে নতুন করে আক্রমণের ঝড় বয়ে গেল।

'অবাধ্য! কুত্তা! জারজ! নির্লজ্জ বদমাইস! চুলোয় যাও! তোমাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত!'

যখন যুবক সাংবাদিক বুঝলেন যে, তাঁকে কিছু বলতেই দেওয়া হবে না, তিনি সাহস সঞ্চয় করে পকেট থেকে নিজের নামের সিলমোহর বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। যখন সুলতানের মুখ্য সচিব সিলমোহরের নামটা পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে, একটা ভুল হয়ে গেছে। 'তোমার নাম কী?' 'আহমেদ রাসিম।'

চল্লিশ বছর পরে নিজের আত্মজীবনী 'গ্রন্থকার, কবি, লেখক' বইয়ে ঘটনাটি বিবৃত করে আহমেদ রাসিম লিখলেন যে, যখন সুলতানের মুখ্য সচিব বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অফিসার ভুল লোককে নিয়ে এসেছে, তিনি সুর বদল করে বললেন, 'বস, বস বেটা, আমি তোমাকে বেটা বলছি বলে কিছু মনে করনি তো?' একটা ড্রয়ার টেনে খুলে তিনি যুবক আহমেদকে কাছে ডাকলেন আর হাতে পাঁচ লিরা দিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা এইখানেই মিটে যাক। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।' এই বলে উনি রাসিমকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। রাসিম তাঁর নিজস্ব উচ্ছ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও রঙ্গ রসিকতার ঢঙে ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন। প্রতিদিনের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে তাঁর গল্পগুলোকে সাজিয়ে তোলাটা তাঁর নিজস্ব ছাপ রেখে গিয়েছিল।

তার জীবনের প্রতি ভালোবাসা, তার বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ এবং তার নিজের পেশার প্রতি আনন্দবোধ, এইগুলিই আহমেদ রাসিমকে ইস্তাম্বুলের শ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন করে তুলেছিল। সাম্রাজ্য-পরবর্তী যে বিষাদ, ঔপন্যাসিক তানপিনারকে, কবি ইয়াহিয়া কামালকে এবং স্মৃতিকথার লেখক আব্দুল হক সিনাসি হিসারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আহমেদ রাসিম তার অসীম কর্মশক্তি, আশাবাদ এবং অদম্য প্রাণচাঞ্চল্য দিয়ে সেই বিষাদের সমতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্য লেখকদের মতো, যারা ইস্তাম্বুলকে ভালোবাসতেন, তিনিও এর ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং এই শহরের ইতিহাস নিয়ে বই-ও লিখেছেন, কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর বিষাদকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সজাগ ছিলেন, তাই তিনি কখনো 'হারিয়ে যাওয়া সোনালি দিনগুলো'র জন্য হা-হুতাশ করেননি। ইস্তাম্বুলের অতীতকে একটা পবিত্র ধনসম্পত্তির কোষাগার হিসাবে না ভেবে, ইতিহাসকে খনন করে একটা খাঁটি কণ্ঠস্বর বার করে এনে, যার মাধ্যমে তিনি একটা পশ্চিমী স্টাইলের মহাকাব্য লিখে ফেলবেন, সেটা না করে, তিনি চেয়েছিলেন, শহরের অন্যান্য সকলের মতো, নিজেকে বর্তমানের গন্ডির মধ্যেই ধরে রাখতে; ইস্তাম্বুল বসবাসের পক্ষে একটা মনোরম জায়গা এবং এটাই শেষ কথা।

তাঁর অগণিত পাঠকদের মতো, তাঁর নিজেরও এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রশ্নে কোনো আগ্রহ ছিল না অথবা আমাদের 'সভ্যতার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা'র ব্যাপারেও কোনো উৎসাহ ছিল না। তার কাছে পাশ্চাত্যপন্থী হওয়া মানে নতুন নতুন ঢঙ-এ নতুন নতুন ভঙ্গীমায় পাশ্চাত্যের অনুকরণ, যা তিনি ব্যঙ্গ করে খুশি হতেন। তাঁর যৌবনের উম্মাদনায় লিখিত উপন্যাস এবং কবিতা কিন্তু এই ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং তাঁকে সন্দিগ্ধ এবং তীব্র আক্রমণাত্মক করে তুলেছিল, যা কিছু কৃত্রিম এবং ভান, তার প্রতি। যখন ইস্তাম্বুলের কবিরা ভণ্ডামি করে নিজেদের কবিতা আবৃত্তি করতেন, পার্নাশিয়ান এবং পতনোন্মুখ কবিদের নকল করে, তখন তিনি তাকে ব্যঙ্গ করতেন, এমনকি রাস্তাঘাটে লোকেদের এইসব উপস্থিতমত অভিনয়গুলোকে থামিয়ে দিতেন এবং তাঁর সতীর্থ প্রতিভা সম্পন্ন লেখকদের নিজেদের জীবনী-সংক্রান্ত ব্যাপারে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিতেন, তখন বোঝাই যেত যে, তিনি নিজের এবং ওইসব পাশ্চাত্যপন্থী সেরা ব্যক্তিদের মধ্যে কতখানি দুরত্ব তৈরি করেছিলেন, আর এইসব পাশ্চাত্যপন্থী সেরা ব্যক্তিত্বরাও তারই মতো বাবিয়ালির প্রকাশক মহলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

কিন্তু খবরের কাগজের কলাম লেখক হিসাবেই আহমেদ রাসিম তার নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিলেন। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া রাজনীতির প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। কেননা, রাষ্ট্রের অত্যাচার এবং রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা রাজনীতিকে একটা কূট, প্যাঁচালো এবং অসম্ভব বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছিল (তিনি ব্যাখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে ভালোবাসতেন যে, এই সরকারি নিষেধাজ্ঞা তাঁর নিজের কলাম লেখাগুলোকে এমন নির্মমভাবে কাটছাঁট করত যে কখনো কখনো কাগজে কেবল খালি জায়গা পড়ে থাকত)। তাই তিনি শহরকেই নিজের বিষয়বস্তু করে নিয়েছিলেন। ('যদি রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং সঙ্কীর্ণতার অর্থ এই হয় যে, তুমি অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারবে না, তাহলে শহরের পৌরসভা এবং শহরের জীবন সম্পর্কে কথা বল, কারণ সাধারণ লোক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সর্বদাই পড়তে ভালবাসে!' একজন ইস্তাম্বুলের কাগজের কলাম লেখকের এই উপদেশ একশ বছরের পুরোনো।)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আহমেদ রাসিম পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছিলেন ইস্তাম্বুলে ঘটতে থাকা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করে, তা শহরের গরিব পাড়ায় বিভিন্ন ধরনের মাতাল থেকে রাস্তার ফেরিওয়ালাই হোক, বা মুদি দোকানি থেকে হাত-সাফাইওয়ালা, বা বসফোরাসের পাড় ধরে শহরের সৌন্দর্যময় জায়গা থেকে হৈ

AMARBOI.COM

হট্টগোলের সরাইখানা ও শুঁড়িখানা, দৈনন্দিন সংবাদ থেকে বাণিজ্যিক সংবাদ, বিনোদন পার্ক থেকে বাগবাগিচা ও সরকারি উদ্যান, বাজার-হাটের দিনগুলো এবং প্রতিটি ঋতুতে বাজারের বিশেষ আকর্ষণগুলো, শীতকালে বরফের গোলা ছুড়ে মারামারি এবং শ্লেডগাড়ি চড়ার আনন্দ এবং অবশ্যই বই প্রকাশনা, স্থানীয় আড্ডার গল্পসল্প এবং রেস্তরাঁর খাদ্য তালিকা, যাই হোক না কেন। বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা এবং শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির ওপর তার ঝোঁক ছিল এবং লোকেদের অভ্যাস এবং মুদ্রাদোষগুলো সহজেই ধরতে পারতেন। একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী জঙ্গলের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য দেখে যেমন পুলক অনুভব করেন, রাসিমও তেমনি পাশ্চাত্য অনুগামী ঢেউ, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ এবং ঐতিহাসিক সংযোগ-এর নানান এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ দেখে উল্লসিত হতেন, এবং এইগুলো তাঁকে নতুন কিছু, আশ্চর্য কিছুর অনুভব দিত, যা তিনি প্রতিদিনই লিখে যেতেন। তিনি অল্পবয়েসি লেখকদের উপদেশ দিতেন, 'যখনই শহরে ঘুরতে বেরোবে, সঙ্গে সব সময় একটা নোট বই রাখবে'।

১৮৯৫ সাল ও ১৯০৩ সালের মধ্যে আহমেদ রাসিম যে শ্রেষ্ঠ 'কলাম'গুলো লিখেছিলেন, সেগুলো সংগৃহীত হয়েছে একটা বইয়ে, নাম 'সিটি করেসপন্ডেন্স'। তিনি ব্যঙ্গ করে ছাড়া নিজেকে কখনো 'সিটি করেসপন্ডেন্ট' বলতেন না; পৌরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে, দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে এবং শহরের নাড়ী পরীক্ষা করে তিনি ১৮৬০ সালে ফ্রান্সে শুরু হওয়া একটা ধারা অনুসরণ করেন। ১৮৬৭ সালে নাসিক কামাল, যাঁর নাম আধুনিক তুর্কী ইতিহাসে

খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করে আছে, এবং যিনি ভিক্টর হুগোকে শ্রদ্ধা করতেন কেবল তার নাটক এবং কবিতার জন্যই নয়, তাঁর রোমান্টিক লড়াকু মনোভাবের জন্য, 'তসবির-ই-ইফকার' সংবাদপত্রে রমজানের সময় ইস্তাম্বুলের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে এক গুচ্ছ চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর ওই চিঠিগুলো, বা যাকে 'শহরের সংবাদ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা হত, সেগুলো ভবিষ্যতে যারা তাঁর পদানুসরণ করবে, তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইল যে কীভাবে সাধারণ চিঠির মতো গোপনীয়তা, অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতার সুর ফুটিয়ে তোলা যায়। এবং তাই সকল ইস্তাম্বুলবাসীকে আত্মীয়, বন্ধু এবং প্রেমিক হিসেবে সম্বোধন করে, এই চিঠিগুলো, কতকগুলো ছাড়া ছাড়া গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এই শহরকে একটা কাল্পনিক অখণ্ডতা দান করতে সফল হয়েছিল। এই রকম একজন সাংবাদিক ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলি এফেন্দি। তাঁর এই নামকরণ হয়েছিল কারণ তিনি দূরদৃষ্টি (ইনসাইট) নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন। (এই সংবাদপত্রটি তিনি রাজপ্রাসাদের আনুকূল্যে প্রকাশ করতেন, কাজেই একটা অবাঞ্ছনীয় রচনা প্রকাশ করায় যখন কাগজটি বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন কিছুদিন তাঁকে বলা হত দূরদৃষ্টিহীন আলি এফেন্দি)। তিনি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাক্রমগুলোতে ক্লান্তিহীন, নিরন্তর ঢুঁ মারতেন এবং তাঁর পাঠকদের যেমন উপদেশ দিতেন, তেমনি ধমক-ধামকও দিতেন এবং যদিও তিনি একদম নীরস ছিলেন, তাঁকে কিন্তু তাঁর সময়ের ইস্তাম্বুলের নিখুঁত বর্ণনাবহুল 'পত্র লেখক' বলে মনে করা হয়।

শহরের প্রতিদিনকার জীবনের বর্ণনাকারী হিসাবে এই শহরের 'কলাম' লিখিয়েরা ইস্তাম্বুলের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-শব্দ, এর মজাদার রসিকতা আর রসবোধের প্রতিফলনগুলো ধরে রাখতেন এবং তাঁরা ইস্তাম্বুলের রাস্তায়, পার্কে, উদ্যানে, দোকানে, জাহাজে, সাঁকোয়, ময়দানে, ট্রামওয়েতে ভব্যতার রীতিনীতি প্রবর্তন করাতেও সাহায্য করেছিলেন। যেহেতু, সুলতানকে, রাষ্ট্রকে, পুলিশকে, মিলিটারিকে, ধর্মীয় নেতাদের বা আরো ক্ষমতাশালী কাউন্সিলরদের সমালোচনা করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক ছিল, তাই এইসব বনেদি সাহিত্যিকরা তাঁদের তিরস্কারের পাত্র করে তুলেছিলেন অসহায়, নামগোত্রহীন জনতাকে, সেইসব ক্ষুদ্র মানুষগুলোকে, যারা নিজেদের কাজ করে চলে আর দুবেলা দুমুঠো জোটাতে প্রাণপণ লড়াই করে চলে। এইসব শিক্ষিত কলাম-লিখিয়ে সাংবাদিক আর শিক্ষিত সংবাদপত্র-পড়ুয়াদের মতো শিক্ষিত নয় যে সব হতভাগ্য ইস্তাম্বুলবাসী, তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় যা কিছু, গত ১৩০ বছরে তারা শহরের রাস্তায় কী করেছে, তারা কী খেয়েছে, কী বলেছে, তারা কী হৈ-হট্টগোল, গণ্ডগোল করেছে– সব কিছু আমরা আজ জানি; তার জন্য– প্রায়শই খিটখিটে, কখনো সহানুভূতিশীল, কিন্তু সব সময়েই দোষদর্শী কলাম-লিখিয়েদের ধন্যবাদ, কারণ তাঁরাই এদের সম্বন্ধে লেখাটা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

পড়তে শেখার পঁয়তাল্লিশ বছর পর আমি দেখি যে, যখনই কোনো খবরের কাগজের কলাম লেখার ওপর আমার চোখ পড়ে, সে লেখা আমাকে চিরাচরিত পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করুক, বা আমার পাশ্চাত্যপন্থী হওয়ার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করুক, আমার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের একটা কথা মনে পড়ে, 'আঙুল দেখিও না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬.

মুখ হাঁ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেও না

বিগত ১৩০ বছর ধরে বিভিন্ন সাংবাদিক কলাম লেখকরা যে লক্ষ লক্ষ পাতা সংবাদপত্রে লিখে গেছেন, তার থেকে বেছে বেছে বেশ কিছু মজার উপদেশ, সতর্কীকরণ, জ্ঞানবাণী এবং তীব্র অভিযোগ, আমি এখন পেশ করছি।

আমাদের ঘোড়ায়-টানা বাসগুলো হয়তো ফরাসি মোটরবাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কিন্তু যেহেতু আমাদের রাস্তাগুলো অত্যন্ত খারাপ, তাই আমাদের বাসগুলো বেয়াজিট থেকে এদির্নেকাপি পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা পাথর থেকে পাথরে তিতির পাখির মতো কায়দা করে হেঁটে যায়। (১৮৯৪)

আমরা দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছি যে যখনই বৃষ্টি হয়, শহরের সব খালি জায়গাগুলো জলে ভরে যায়। যাদের ওপর জলনিকাশি কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে, তাদের শীঘ্রই কাজটি করা উচিত। (১৯৪৬)

প্রথমে ভাড়া এবং ট্যাক্সি বাড়া এবং তারপরে, বহিরাগতদের ধন্যবাদ, শহরে ক্ষুর বিক্রিওয়ালা, সিমিত বিক্রিওয়ালা, পুর দেওয়া শেলফিস বিক্রিওয়ালা, টিস্যু কাগজ বিক্রিওয়ালা, চপ্পল বিক্রিওয়ালা, ছুরি-কাঁটা বিক্রিওয়ালা, বিভিন্ন টুকিটাকি জিনিস বিক্রিওয়ালা, খেলনা বিক্রিওয়ালা, জল বিক্রিওয়ালা এবং নরম পানীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিক্রিওয়ালাদের ভীড়ে ভরে গেল এবং এটা যেন যথেষ্ট নয়, তাই পুডিং বিক্রিওয়ালা, মিষ্টি বিক্রিওয়ালা এবং 'ডোনের' বিক্রিওয়ালা-রা এখন আমাদের জাহাজঘাটায় ভীড় করেছে। (১৯৪৯)

শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে , সমস্ত ঘোড়ায়-টানা গাড়ির কোচোয়ানদের একই রকমের পোশাক পরতে হবে; যদি এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়, তাহলে শহরটি কেমন সুন্দর হয়ে উঠবে। (১৮৯৭)

মিলিটারি আইনের একটা সুফল এই যে, বাসগুলোকে কেবলমাত্র তাদের নির্দিষ্ট স্টপেজে থামতে হবে, এটা নিশ্চিত করা গেছে। পুরোনো দিনের বিশৃঙ্খল অরাজকতার কথা ভেবে দেখুন। (১৯৭১)

শহরের পৌরসভা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এখন থেকে শরবৎ প্রস্তুত-কারকরা শরবতে কোনো রঙ মেশাতে পারবেন না বা শহরের পৌরসভার অননুমোদিত ফল ব্যবহার করতে পারবেন না। (১৯২৭)

যখন আপনি শহরের রাস্তায় কোনো সুন্দরী মহিলাকে দেখবেন, তার দিকে এমন ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যেন আপনি তাকে খুন করতে যাচ্ছেন। আবার তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যেন আপনি তাকে কামনা করছেন। শুধু একটু হেসে চোখ নামিয়ে চলে যান। (১৯৭৪)

সম্প্রতি প্যারিসের নাম-করা পত্রিকা 'মাতিন'-এ শহরের রাস্তায় সঠিকভাবে হাঁটার ওপর একটা লেখা বেরিয়েছিল। সেই লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও শহরের যে সমস্ত লোক রাস্তায় কীভাবে হাঁটতে হয়, তা এখনো শেখেনি, তাদের কাছে আমাদের উপলব্ধি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই,– মুখ হাঁ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেন না। (১৯২৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আশা করি যে, ট্যাক্সি-চালক ও যাত্রীরা, মিলিটারি কর্তৃপক্ষ যে নতুন ট্যাক্সি-মিটার প্রবর্তন করেছেন, তার যথাযথ ব্যবহার করবেন। আমাদের শহর যেন সেই কুড়ি বছর আগেকার দর কষাকষি, তর্কাতর্কি, থানা-পুলিশ করার যুগে ফিরে না যায়, যখন প্রথম ট্যাক্সি মিটার লাগানো হয়েছিল আর শহরের ট্যাক্সি চালকরা বলতে শুরু করেছিল, 'দাদা, যত বেশি পারেন, দিয়ে দিন।' (১৯৮৩)

যখন শুকনো মটর দানা এবং চিউয়িং গাম বিক্রেতারা বাচ্চাদের কাছ থেকে মূল্য বাবদ টাকা-পয়সা না নিয়ে সিসের টুকরো নেয়, তখন এতে শুধু ওদের চুরি করাতেই উৎসাহ দেওয়া হয় না, উপরন্তু ওদের ইস্তাম্বুলের ফোয়ারাগুলো থেকে পাথর চুরি, কলচুরি এবং কবরস্থান ও মসজিদ-এর গম্বুজ থেকে সিসে চুরি করতেও উৎসাহ দেওয়া হয়। (১৯২৯)

আলুর গাড়ি, টম্যাটোর গাড়ি এবং প্রোপেন গ্যাসের গাড়ির ওপর লাগানো লাউডস্পীকার এবং এইসব সামগ্রীর বিক্রেতাদের মাইকে কুৎসিৎ উচ্চস্বর, শহরকে একটা জলজ্যান্ত নরকে পরিণত করেছে। (১৯৯২)

শহরের রাস্তাগুলো থেকে বেওয়ারিশ কুকুর হঠানোর উদ্যম নেওয়া হয়েছে। যদি এটি ধীরে সুস্থে করা যায়– তড়িঘড়ি এক-দু'দিনে নয়, যদি সব কুকুরকে ধরে ফেলা যায় এবং তাদের ভয়ঙ্কর হাইরসিজাদা দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া যায়– যদি সমস্ত কুকুরের দলগুলোকে সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলে আমরা শহরকে চিরকালের জন্য কুকুর-মুক্ত করতে পারতাম... কিন্তু এখনো গর্‌র্‌র্ না শুনে শহরের রাস্তায় হাঁটা অসম্ভব। (১৯১১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুলিরা এখনো অন্যায়ভাবে ওদের ঘোড়াগুলোকে দিয়ে অত্যন্ত ভারী মাল টানায় এবং শহরের মাঝখানেই বেচারা প্রাণীগুলোকে মারধোর করে। (১৮৭৫)

গরিবদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে বলেই আমরা দেখছি, ঘোড়ার গাড়িগুলো শহরের আনাচে কানাচে সর্বত্র ঢুকে যাচ্ছে এবং শহরের সুন্দর দৃশ্যাবলীকে নষ্ট করে দিচ্ছে, যা করার তাদের কোনো অধিকার নেই, অথচ ইস্তাম্বুল একটা নিষেধের আঙুলও তুলছে না। (১৯৫৬)

নৌকো থেকে বা যে কোনো যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে সর্বাগ্রে লাফিয়ে নামার প্রবণতা আমাদের মধ্যে এত বেশি যে, আমরা হায়দারপাশা ফেরি, ঘাটে লাগবার আগেই যারা লাফিয়ে নামছে, তাদের আটকাতে পারি না, যদিও আমরা যতই কেন চেঁচাই 'আগে নামবে যে, সে একটা গাধা।' (১৯১০)

এখন যেহেতু খবরের কাগজগুলো তাদের বিক্রি বাড়ানোর জন্য তুর্কী ফ্লাইং ফান্ড-এর জন্য লটারি চালাচ্ছে, আমরা দেখছি যে, যে দিন লটারির ফল ঘোষণা করা হবে, সেদিন কাগজের অফিসের বাইরে জনতার ভীড় এবং লম্বা লাইন লেগে যাচ্ছে। (১৯২৮)

গোল্ডেন হর্ন এখন আর গোল্ডেন হর্ন নেই। ওটা এখন একটা নোংরা জলাশয়ে পরিণত হয়েছে, চারপাশে কারখানা, ওয়ার্কশপ, কসাইখানা; এই সব কারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক, আলকাতরা, জাহাজের চলাচল এবং ময়লা নিকাশি নর্দমার জল একে দূষিত করে তুলেছে। (১৯[illegible])

AMARBOI.COM

শহরের সংবাদপত্রের কলাম-লেখকরা শহরের নৈশ প্রহরীদের সম্বন্ধে প্রচুর

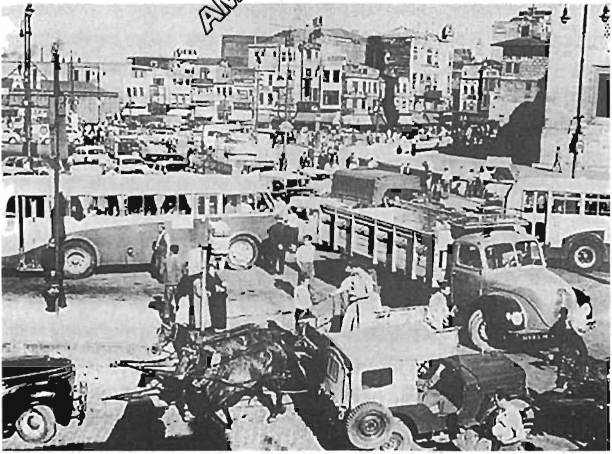

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযোগ পেয়েছেন। এরা বাজার বা পাড়ায় টহলদারি না করে, কফি হাউসে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময় কাটায়; অনেক পাড়ায় এই নৈশ প্রহরীদের লাঠি ঠোকার ঠকঠক আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া যায় না। (১৮৭৯)

খ্যাতনামা ফরাসি লেখক ভিক্টর হুগো ঘোড়ায় টানা গাড়ির ওপর তলায় বসে প্যারিস শহরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে দেখতে যেতেন যে, তার শহরবাসীরা কে কী করছে। গতকাল আমরাও তাই করেছিলাম এবং প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, বেশির ভাগ ইস্তাম্বুলবাসী যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটেন, তখন তারা কী করছেন, খেয়ালই করেন না; ক্রমাগত একজনের আরেকজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, রাস্তায় ছেঁড়া টিকিট, আইসক্রীম মোড়া কাগজ, বাদামের খোলা, এইসব ছুড়ে ফেলেন; সর্বত্রই পথচারীরা রাস্তা দিয়ে হাঁটেন আর গাড়িগুলো ফুটপাথে উঠে যায়,– এবং দারিদ্র্যের জন্য নয়, আলসেমি আর অজ্ঞতার জন্য, শহরের প্রায় সকলেই খুব বাজে পোশাক পরে থাকেন। (১৯৫২)

রাস্তায় এবং শহরের সাধারণের ব্যবহারের জায়গায়, পুরোনো অভ্যাসে এবং কায়দায় চলাফেরা পরিত্যাগ করে এবং ট্রাফিক আইন মেনে (যেমন পাশ্চাত্য দেশগুলোতে করে), আমরা ট্রাফিকের বিশৃঙ্খলা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই শহরের কতজন লোক ট্রাফিক আইন সম্বন্ধে জানে, সেটা আলাদা ব্যাপার..। (১৯৪৯)

আমাদের শহরের জনসাধারণের ব্যবহারের জায়গায় লাগানো অন্য সব ঘড়িগুলোর মতো কারাকয়-এর সেতুটির দু'প্রান্তে লাগানো দুটি বিশাল ঘড়িও সঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় বলে না, আন্দাজ করে নিতে হয়; ঘড়ি বলে যে, জাহাজঘাটায় তখনো বাঁধা একটি ফেরিনৌকো অনেকক্ষণ আগেই ছেড়ে চলে গেছে। অথবা অনেকক্ষণ আগে ছেড়ে চলে যাওয়া ফেরি নৌকাটি এখনো ঘাটে বাঁধা আছে; এই ঘড়ি দুটি ইস্তাম্বুলের অধিবাসীদের অমূলক আশা দিয়ে অত্যাচার করে। (১৯২৯)

বর্ষাকাল এসে গেছে, শহরের সব ছাতাগুলো, ঈশ্বর তাদের রক্ষা করুন, রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। আচ্ছা বলুন তো, আমাদের মধ্যে কতজন অন্যের চোখে খোঁচা না লাগিয়ে, অন্যের ছাতায় ধাক্কা না মেরে, ছাতা ধরে পথ চলতে পারে এবং স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের মতো সারা ফুটপাথ জুড়ে খোলা ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ধাক্কা খায়, কারণ খোলা ছাতার জন্য দৃষ্টি ব্যাহত হয়? (১৯৫৩)

এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, অশ্লীল সিনেমা, ভীড়, বাস এবং নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়ার জন্য এখন আর বিওগলু-তে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। (১৯৮১)

যখনই কোনো ছোঁয়াচে রোগ শহরের কোনো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের পৌরসভা কেবল এখানে ওখানে চুন ছেটান, অথচ সর্বত্র নোংরার পাহাড়...। (১৯১০)

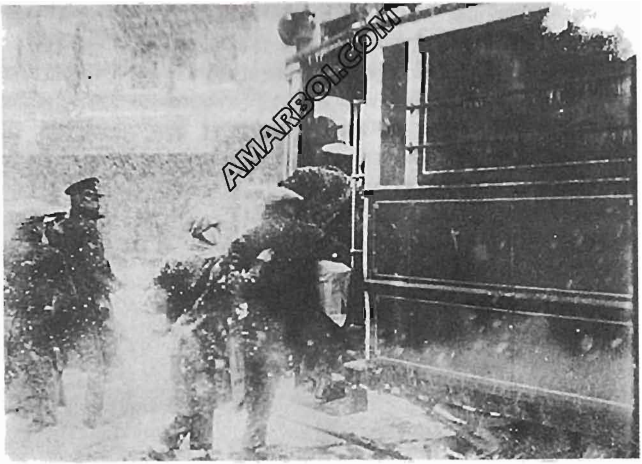

শহরের বেওয়ারিশ কুকুর এবং গাধা হঠানোর পর পৌরসভার সমস্ত ভিখারি এবং ভবঘুরেদের শহরের রাস্তা থেকে সরানোর কর্মসূচি ছিল। কিন্তু এখন এটা পরিষ্কার যে, পৌরসভা এ কাজটা আর করবে না, কাজেই এখন যে সব মিথ্যা সাক্ষী শহরে ঘুরে বেড়ায়, তারা দল বেঁধে ভবঘুরে সেজে নির্ভয়ে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (১৯১৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতকাল তুষারপাত হয়েছিল। কিন্তু কেউ কি শহরে ট্রামে সামনের দরজা দিয়ে উঠেছিল বা বয়স্কদের সম্মান দেখিয়েছিল? দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের শহর কত তাড়াতাড়ি সমাজের ভব্য অনুশাসনগুলো ভুলে যায়, যা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে খুব কম লোকই অবশ্য জানে। (১৯২৭)।

এই গ্রীষ্মকালের প্রতিটি রাত্রে, ইস্তাম্বুলের প্রতিটি কোণে অর্থহীন, পাগলের মতো বিশাল খরচার বাজি পটকা ফাটানোর জন্য লোকেরা কত টাকা অপচয় করছে, এটা জানাটা আমার কর্তব্য বলে মনে করেছিলাম। নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, এই যে বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করবার জন্য মানুষ এত টাকা খরচ করছে, তারা কি সুখী হত না, যদি এই টাকা শহরের গরিবদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্য খরচ করা হত? মনে রাখতে হবে আমাদের শহর এখন এক কোটি মানুষের শহর। কি আমি কি ঠিক বলছি, না, ভুল বলছি? (১৯৯৭)

বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের ফ্রান্সের নকল করা 'আধুনিক বাড়ি' গুলো, যেগুলো ফ্রান্সের মহৎহৃদয় শিল্পীরাই প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করেন, ইস্তাম্বুলের শ্রেষ্ঠ সুন্দর জায়গাগুলোকে পোকার মতো চিবিয়ে খাচ্ছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই, ইউসেক্কালডিরিম এবং বিওগলু-র মতো জায়গাগুলোতে কিছু কদর্য বাড়ির স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখার মতো থাকবে না এবং আমরা দরিদ্র, আমরা দুর্বল ও আমাদের শহরে প্রায়ই আগুন লেগে যায়, এইসব বলে আমরা যদি ব্যাখ্যা করতে না পারি– সেটাও আমাদের শহরকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের মানসিক আচ্ছন্নতা। (১৯২২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭.
আঁকার আনন্দ

আমি স্কুল শুরু করবার কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম আঁকার এবং রং করবার আনন্দ। বোধহয়, 'আবিষ্কার' কথাটা ঠিক নয়– এতে বোঝায় যে একটা কিছু ছিল– নতুন পৃথিবীর মতো– যা খুঁজে পাবার জন্য অপেক্ষায় ছিল। যদি আমার ভেতরে ছবি আঁকার জন্য কোনো গোপন ভালোবাসা বা প্রতিভা লুকিয়ে থেকে থাকে আমি স্কুল শুরু করার সময় তার সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না। এটা বলা আরো সঠিক হবে যে, আমি ছবি আঁকতাম, কারণ এতে আমি স্বর্গীয় সুখ পেতাম। পরবর্তীকালে আমার প্রতিভা আবিষ্কৃত হয়েছিল– শুরুতে সে সব কিছু ছিল না।

হয়তো আমার প্রতিভা ছিল, কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়। আমি দেখলাম যে, ছবি আঁকায় আমার সুখ। সেটাই আসল কথা।

অনেক বছর পরে এক সন্ধ্যায় আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁরা কেমন করে বুঝতে পারলেন যে শিল্পী হবার জন্য আমার সহজাত গুণ আছে। 'তুমি একটা গাছ এঁকেছিলে,' তিনি বললেন, 'তারপর তুমি গাছের একটা ডালে একটা কাক আঁকলে। তোমার মা আর আমি চোখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, কারণ একটি সত্যিকারের কাক গাছের ডালে যেমনভাবে বসে থাকে, তোমার আঁকা কাকটাও ঠিক তেমনিভাবে বসেছিল।'

যদিও এটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর হল না এবং হয়তো পুরো সত্যি নয়, আমার কিন্তু গল্পটা ভালো লেগেছিল এবং বিশ্বাস করে খুশি হয়েছিলাম। খুব সম্ভব আমার কাকটা একটা সাত বছরের বালকের পক্ষে অস্বাভাবিক গুণসম্পন্ন ছিল না। যে ব্যাপারটা পরিষ্কার, সেটা এই যে, আমার বাবার, চিরকালের আশাবাদী এবং সর্বদাই নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত, হৃদয়ের গভীর থেকে বিশ্বাস করার প্রবণতা ছিল যে, তাঁর ছেলেরা যাই করুক না কেন, তা অসাধারণ কিছু হবে। বাবার এই দৃষ্টিভঙ্গী ছোঁয়াচে ছিল এবং তাই আমিও নিজেকে একজন অসাধারণ শিল্পী বলে ভাবতে শুরু করলাম।

আমি একটা ছবি আঁকলে যে মিষ্টি মিষ্টি প্রশংসা পেতাম, তাতে ভেবে নিয়েছিলাম যে, আমাকে একটা যন্ত্র দেওয়া হয়েছে, যেটা লোকেদের আমাকে ভালোবাসতে, চুমু খেতে আর আদর করতে বাধ্য করবে। কাজেই যখনই আমার একঘেয়েমি লাগত, আমি যন্ত্রটা চালু করে দিতাম, মানে বেশ কয়েকটা ছবি এঁকে ফেলতাম। ওঁরা আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাগজ, পেন্সিল, পেন কিনে দিতেন আর আমি খালি এঁকে যেতাম, আর যখন ছবিগুলো দেখানোর সময় হত, আমি সবচেয়ে আগে বাবাকে দেখাতাম। আমি যেমন চাইতাম, বাবার কাছ থেকে সেই রকমই সাড়া পেতাম। উনি প্রথমে অবাক বিস্ময়ে ছবির দিকে তাকাতেন, চোখে থাকত একটা সম্ভ্রমের ভাব, যেটা দেখে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত, তারপর বাবা ছবিটার ব্যাখ্যা করতেন। 'দেখ, মেছুড়ে কেমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা তুমি কী সুন্দর ধরতে পেরেছ। মেছুড়ের মন খারাপ, তাই সমুদ্রও এত কালো। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা নিশ্চয়ই ওর ছেলে। পাখিগুলো আর মাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, ওরাও অপেক্ষা করছে। কী সুন্দর এঁকেছ।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে গিয়ে আর একটা ছবি এঁকে ফেলি। মেছুড়ের পাশের ছেলেটা, আসলে ওর বন্ধু হওয়া উচিত, কিন্তু আমি ওকে খুব ছোট করে এঁকে ফেলেছি। অবশ্য ততদিনে আমি জেনে গিয়েছি, কীভাবে প্রশংসা গ্রহণ করতে হয়। যখন ছবিটা মাকে দেখাই, তখন বলি, 'দেখ, আমি কী এঁকেছি। এক মেছুড়ে আর তার ছেলে।'

'খুব ভালো হয়েছে সোনা,' মা বলেন, 'কিন্তু তোমার স্কুলের হোমওয়ার্কের কী হল?'

একদিন স্কুলে একটা ছবি আঁকার পর, সবাই ছবিটা দেখবার জন্য আমার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াল। আমাদের যে দাঁত-উঁচু শিক্ষক, তিনি ছবিটা দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলেন। আমার মনে হল আমি যেন একজন জাদুকর, জামার হাতার ভেতর থেকে খরগোশ আর পায়রা বার করছি, কয়েকটা এই রকম সুন্দর ছবি আঁকতে পারলেই আর দেখালেই, প্রশংসা কুড়িয়ে নাও।

এতদিনে আমি এমন দক্ষ হয়ে পৌঁছেছি যে, আমার প্রতিভা আছে, এই দাবি করতেই পারি। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে স্কুলের বই-এর সোজা লাইন ড্রইংগুলো, কমিক বই ও খবরের কাগজের কার্টুন ছবিগুলো দেখতে থাকি এবং লক্ষ করি, কীভাবে একটা বাড়ি, একটা গাছ, একটা দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষ আঁকা হয়েছে। আমি বাস্তব জীবন থেকে দেখে স্কেচ করতাম না; অন্যজায়গায় দেখা ছবিগুলো মনের মধ্যে রেখে দিতাম, পরে সেই ছবিগুলো আঁকতাম। যে ছবিগুলো মনের মধ্যে বেশিদিন ধরে রাখতে পারতাম, সেগুলো অবশ্যই সোজা সরল ছবি ছিল। তৈলচিত্র এবং ফটোগ্রাফ অত্যন্ত জটিল ছিল আর তাই, তাতে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। আমি বই-এর ছবিগুলো রঙ করা এবং মায়ের সঙ্গে আলাদীনের দোকানে গিয়ে নতুন বই কেনা, পছন্দ করতাম। তবে নতুন বইগুলো রঙ করার জন্য নয়। ওই বই-এর ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করতাম, যাতে আমি নিজে ওগুলো আঁকতে পারি। আর একবার একটা বাড়ি, একটা গাছ, কিংবা একটা রাস্তা এঁকে ফেললে, সেটা আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যেত।

আমি আঁকতাম, একটা গাছ, একটা একা গাছ, কেবল একটা গাছ। গাছের ডালগুলো আর পাতাগুলো আঁকতাম খুব তাড়াতাড়ি। তারপর আঁকতাম, ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা পাহাড়। তাদের পেছনে একটা কি দুটো আরও বড় উঁচু পাহাড় আঁকতাম। তারপর আমার দেখা জাপানি ছবিগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড়গুলোর পেছনে আরো উঁচু, আরো নাটকীয় একটা পাহাড় বসিয়ে দিতাম। ততক্ষণে আমার হাতের একটা নিজস্ব মন তৈরি হয়ে গেছে। আমার আঁকা মেঘ ও পাখিগুলো, অন্য ছবিতে আমি যেমন দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। তারপর, ড্রইং আঁকা শেষ হয়ে গেলে ছবির সবচেয়ে ভালো জায়গায় চলে আসতাম; পেছনের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার মাথায় আমি একটা বরফের টুপি বসিয়ে দিতাম।

আমার সৃষ্টির দিকে গর্বের চোখে তাকাতাম, ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়তাম, কোনো একটা অংশ কাছ থেকে নিবিষ্ট চোখে দেখতাম, তারপর একটু পিছিয়ে গিয়ে পুরো ছবিটা দেখতে থাকতাম। হ্যাঁ, এটা একটা সুন্দর সৃষ্টি আর আমিই এটা করেছি। না, ছবিটা একেবারে নিখুঁত নয়, কিন্তু তবু আমিই এটা এঁকেছি আর এটা সুন্দরও। আঁকতে আনন্দ পেয়েছি আর পিছিয়ে গিয়ে দেখেও আনন্দ পাচ্ছি আর ভান করছি, যেন আমি অন্য কেউ, জানালা দিয়ে ছবিটা দেখে প্রশংসা করছি।

কিন্তু কখনো কখনো, অন্য লোকের চোখ দিয়ে আমার ছবিকে দেখে, কিছু খুঁত বার করতাম। অথবা ছবিটা আঁকার সময় যে আনন্দ পেতাম, সেটাকে আরো লম্বা করতে চাইতাম। আর সেটা পেতে গেলে, আরো একটা মেঘ বা কয়েকটা আরো পাখি বা একটা পাতা আঁকতে হত। অনেক বছর পরে কখনো কখনো মনে হত, এই অতিরিক্ত আঁকার ফলে ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এগুলো আমাকে আমার সৃষ্টিকার্যের প্রাথমিক উল্লাসের মুহূর্তগুলো ফিরিয়ে দিত এবং তাই আমি নিজেকে থামাতে পারতাম না।

ছবি আঁকতে আমি কী ধরনের আনন্দ পেতাম? এইখানে আপনাদের পঞ্চাশ বছর বয়সি স্মৃতিচারণকারী তার নিজের এবং এক সময়ে তিনি ছিলেন যে শিশু, তার মাঝখানে কিছু দূরত্ব রাখতে চান:

১. আমি ছবি আঁকায় আনন্দ পেতাম, কারণ এতে আমি তাৎক্ষণিক অলৌকিকত্ব সৃষ্টি করতে পারতাম, যেটা আমার চারপাশের সকলে প্রশংসা করতেন। ছবি আঁকা শেষ হওয়ার আগেই, আমার ছবি যে প্রশংসা ও ভালোবাসা আদায় করবে, তার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। যতই এই চাওয়াটা বাড়ছিল, সেটা আমার সৃষ্টির এবং তদ্‌জনিত আনন্দের অংশ হয়ে উঠছিল।
২. কিছু সময় পরে, আমার হাত আমার চোখের মতোই কুশলী হয়ে উঠেছিল। কাজেই, যদি আমি একটা চমৎকার গাছ আঁকতাম, মনে হত, আমার হাত আপনা থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। যখন দেখতাম, পেন্সিলটা কাগজের ওপর দ্রুত নড়াচড়া করছে, আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম যেন ছবিটা অন্য কারো উপস্থিতির প্রমাণ, যেন অন্য কেউ আমার শরীরে আশ্রয় নিয়েছে। যখন তার কাজ দেখে উল্লসিত হতাম, তার সমকক্ষ হতে চাইতাম, তখন আমার মস্তিষ্কের অন্য অংশ গাছের ডালগুলোর বক্রতা, পাহাড়গুলোর অবস্থান, সামগ্রিকভাবে ছবিটার উপস্থাপন এইসব নিরীক্ষণ করতে ব্যস্ত থাকত, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবত যে, একটুক্রো সাদা কাগজে আমি এই দৃশ্যটি সৃষ্টি করেছি। আমার মনটা চলে আসত আমার কলমের ডগায়, আমি ভাবার আগেই কাজ করে যেত, আবার সেই সঙ্গে আমি কী কাজ করলাম, সেটা জরিপও করে নিত। এই যে দ্বিতীয় বোধ, আমার উন্নতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, এগুলো থেকেই এই ছোট্ট শিল্পী আনন্দ পেত যখন সে তার সাহস এবং স্বাধীনতা আবিষ্কার করেছিল। নিজের ভেতর থেকে বাইরে আসা, ভেতরে যে দ্বিতীয় সত্ত্বাটি বাসা বেঁধে আছে, তাকে জানা, তার মানে বিভাজন রেখাটি পুনর্বার টানা, যেমন আমার পেন্সিল কাগজের ওপর দিয়ে পিছলে যায়, একটা ছেলে যেমন বরফের ওপর দিয়ে স্লেডিং করে।

৩. আমার মন এবং আমার হাতের মাঝে এই যে বিভাজন, এই যে বোধ যে, আমার হাত নিজে থেকে কাজ করে যায়, এর সঙ্গে আমার স্বপ্নরাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার যে বোধ, তার বোধ হয় কিছু মিল আছে। কিন্তু আমার আশ্চর্য স্বপ্নরাজ্যের দানবগুলোর মতো– আমার ড্রইংগুলোকে গোপন রাখার কোনো দরকার ছিল না। আমি সবাইকেই ওগুলো দেখাতাম, প্রশংসা আশা করতাম এবং পেয়ে আনন্দিত হতাম। ছবি আঁকার অর্থ ছিল একটি দ্বিতীয় জগৎ খুঁজে পাওয়া যার অস্তিত্ব কোনো অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠেনি।

৪. যে জিনিসগুলো আমি আঁকতাম, তা যতই কাল্পনিক হোক না কেন, সেই বাড়ি, গাছ বা মেঘ ইত্যাদির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। একটা বাড়ি আঁকলে, ভাবতাম, এটা আমারই বাড়ি, ভাবতাম, যাই আঁকি না কেন, সব কিছুরই মালিক আমি। এই জগতের ভেতর ঘুরতে, আমার আঁকা গাছ, দৃশ্যগুলোর মাঝে বাস করতে, একটা জগতের ছবি আঁকতে, যা এত বাস্তব যে অন্যদের দেখাতে পারি, সেটা ছিল বর্তমান সময়ের একঘেয়েমি থেকে পালানো।

৫. কাগজ, পেন্সিল, স্কেচবই, রঙ এবং অন্যান্য আঁকার সরঞ্জাম-এর গন্ধ, তাদের চেহারা আমার ভীষণ ভালো লাগত। সাদা ড্রইং-এর কাগজে হাত বুলোতে খুব ভালোবাসতাম। আমার আঁকা ছবিগুলো কাছে রাখতে ভালোবাসতাম, তাদের বাস্তব উপস্থিতি, তাদের অস্তিত্ব আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

৬. এই সব ছোট ছোট আনন্দ আবিষ্কার করে এবং যত প্রশংসা আমি পেতাম, সব আহরণ করে, আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে, আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা, এমনকি বিশিষ্ট। আমি হামবড়াই করতাম না বটে, কিন্তু চাইতাম যে, সবাই জানুক। ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে যে জগতটা আমি সৃষ্টি করেছিলাম, আমার মাথার ভেতর লুকিয়ে রাখা দ্বিতীয় জগতটার মতো তা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, তার চেয়েও ভালো, এই জগতটা আমাকে দৈনন্দিন জীবনের ধুলো-ময়লা-ছায়াচ্ছন্ন জগৎ থেকে একটা বৈধ মুক্তির রাস্তা দিয়েছিল। আমার পরিবার আমার এই নতুন অভ্যাসকে শুধু মেনে নিয়েছিল তাই নয়, এই জগতে আমার অধিকারকেও মেনে নিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮.

ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়া
রেসাত এক্রেম কোকু'র কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা সংগ্রহ

আমার দাদীমার বসার ঘরে একটা বই-এর ছোট আলমারী ছিল। ওটার ছিটকিনি লাগানো কাচের দরজা, যা কদাচিৎ খোলা হত, তার পেছনে 'লাইফ এনসাইক্লোপিডিয়া'র সঙ্গে সারি করে সাজানো হলদে হয়ে যাওয়া মেয়েদের উপন্যাস আর আমার আমেরিকান চাচাজীর মেডিক্যাল বইগুলোর ওপর ধুলো জমে থাকত; তাদের মধ্যে আরও একটা বই ছিল, খবরের কাগজের মতোই লম্বা আর চওড়া, যেটা আমি পড়তে শেখার কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলাম। বইটার নাম ছিল 'ওসমান গাজি থেকে আতাতুর্ক; অটোমান ইতিহাসের ছশো বছরের পূর্ণদৃশ্য' এবং আমি বইটার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং তার প্রচুর ও রহস্যময় ছবিগুলো খুব ভালোবাসতাম। সেই সব দিনে, যখন আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট আর লন্ড্রী একই তলায় ছিল, বা যখন আমি অসুস্থ হয়ে স্কুলে যেতে পারতাম না, বা যদি আমি বিনা কারণেই স্কুল কামাই করতাম, তখন আমি দাদীমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে চাচাজীর লেখার টেবিলে বসে পড়তাম, আর বইটার প্রতিটি লাইন অনেকবার করে পড়তাম; পরে যখন আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, তখন দাদীমার সঙ্গে যখনই দেখা করতে যেতাম, বইটা বার করে নিয়ে পড়তে বসতাম।

যে সাদা-কালো হাতে আঁকা ছবিগুলো অটোমান ইতিহাস তুলে ধরত, আমি সেইগুলোই বিশেষভাবে উপভোগ করতাম। আমার স্কুলের পাঠ্যবইয়ে, এই ইতিহাস মানে লম্বা যুদ্ধের পর যুদ্ধ, জয়, পরাজয়,সন্ধি, অহংকারী জাতীয়তাবাদী ঢঙ-এ বলা গল্প ইত্যাদি; কিন্তু 'ওসমান গাজি থেকে আতাতুর্ক'-এ এই ইতিহাস ছিল একটার পর একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা, বিস্ময়কর ঘটনা এবং অদ্ভুত সব লোক– জঘন্য মাথার চুল খাড়া-করানো, ভীতিপ্রদ, কখনো কখনো বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী ছবির সারি। অটোমান উৎসবের বইতে দেওয়া মিছিলুগলোর ছবি, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা সুলতানের সামনে দিয়ে নানারকম অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করতে করতে যাচ্ছে, এই বইয়ের ছবিগুলো যেন সেই রকম। মনে হয় যেন ক্ষুদ্র চিত্রগুলো, যাতে গোপন বই-এর ছবি দেওয়া আছে, তার মধ্যে ঢুকে পড়েছি আর সুলতানের পাশে বসে আছি। সুলতান, ইব্রাহিম পাশা রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে সুলতান আহমেদ স্কোয়ারের দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখ দিয়ে জরিপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছেন সাম্রাজ্যের বৈভব, বর্ণ ও দৃশ্য, বিভিন্ন পেশার ও সম্প্রদায়ের মানুষদের, যারা প্রত্যেকেই নিজেদের পেশার আলাদা আলাদা পোশাক পরে আছে। আমরা নিজেদের বলতে চাই যে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এবং তুরস্ক একটা পশ্চিমী রাজ্য হওয়ার পর আমরা আমাদের অটোমান শিকড় উপড়ে ফেলে দিয়েছি এবং আমরা 'যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক' হয়ে গেছি। বোধহয় সেই কারণেই আজ একটা আধুনিক জানালায় বসে বাইরের অসমতা, বিদেশীয়তা এবং অটোমান পূর্বপুরুষদের, যাদের আমরা পেছনে ফেলে এসেছি ভেবেছিলাম, হঠাৎ পাওয়া মানবিকতা, দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে যাই।

সুতরাং, এই ভাবেই আমি পড়ে ফেললাম সেই দড়াবাজিকরের কথা, যে সুলতান আহমেদ (৩)-এর ছেলে রাজকুমার মুস্তাফার ছুন্নত উৎসব পালনের সময় দু'পাশে দুটো জাহাজের মাস্তুলে বাঁধা দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে গোল্ডেন হর্ন পার হয়েছিল এবং এই ঘটনার সাদা-কালোয় আঁকা ছবিটাও খুব ভালো করে দেখলাম। এইভাবেই আবিষ্কার করলাম যে, যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষরা একই সমাধিস্থলে যারা জীবিকার জন্য মানুষ মারে তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের কবর দেওয়া অযৌক্তিক বলে মনে করেছিলেন, তাই 'ইয়ুপ'-এর 'কারিয়াগদি বেইরি'তে কেবলমাত্র জল্লাদদের জন্য বিশেষ কবরখানা তৈরি করা হয়। আমি পড়লাম যে, ১৬২১ সালে ওসমান (২)-এর সময় এত প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছিল যে, পুরো গোল্ডেন হর্ন এবং বসফোরাস-এর কিছু অংশ সম্পূর্ণ জমে যায়। বই-এর গাদা গাদা ছবিগুলো দেখে এবং এটার ছবি দেখেও আমার একথা মনে হয়নি যে, ছবিতে দেখানো বরফে আটকে পড়া স্লেড ও জাহাজগুলোর গায়ে বাঁধা নৌকোগুলো, শিল্পীর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্পনাশক্তির প্রকাশমাত্র, ঐতিহাসিক সত্যতা নয়। ছবিগুলো দেখতে কখনো ক্লান্তি আসতো না। আব্দুল হামিদ (২)-এর সময়ে ইস্তাম্বুলের দুজন বিখ্যাত পাগলের ছবি দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম। প্রথমজন, একটি পুরুষ, তার অভ্যেস ছিল, রাস্তায় উদোম ন্যাংটো হয়ে হাঁটা, যদিও ভব্য শিল্পী ওকে এঁকেছিলেন, লজ্জায় নিজেকে ঢাকতে; দ্বিতীয়জন ছিল একটি নারী, নাম ছিল মাদাম উপোলা, সে যা পেত, তাই পরত। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, যখনই ওই পুরুষ পাগল ও নারী পাগল সামনাসামনি হত, ওদের প্রচণ্ড লড়াই বেধে যেত, যার জন্যে ওদের সেতু পার হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। (সেতু : তখনকার দিনে বসফোরাসের ওপর কোনো সেতু ছিল না, আর গোল্ডেন হর্ন-এর ওপরে একটাই সেতু ছিল, ১৮৪৫ সালে কারাকোয় এবং এমিনোনু-র মাঝখানে তৈরি; বিংশ শতকের শেষ অব্দি এই সেতু তিনবার পুনর্নির্মাণ হয়েছিল, কিন্তু আদি পুলটির, যেটা কাঠের তৈরি ছিল, নাম ছিল 'সেতু'।)

এর পরই আমার চোখ পড়ত আর একটা ছবির ওপর,– একটা লোকের পিঠে একটা ঝুড়ি, তাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমি পড়ে দেখলাম যে, একশ বছর আগে একজন ভ্রমণশীল রুটি-বিক্রেতা তার ঘোড়াটা এবং মালপত্র একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে কফি হাউসে তাস খেলতে বসে গিয়েছিল। শহরের একজন আধিকারিক, নাম 'হুসেইন বে,' নিজের হাতে রুটি-বিক্রেতাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে শাস্তি দিয়েছিলেন, যেহেতু সে একটা নিরপরাধ অবোলা প্রাণীকে গাছের সঙ্গে দীর্ঘসময় বেঁধে রেখে অত্যাচার চালিয়েছিল।

এই গল্পগুলোর মধ্যে অনেক গল্পই 'সমসাময়িক খবরের কাগজে' প্রকাশিত বলা হয়েছে, এগুলো কতখানি সত্যি? যেমন, আমাদের বলা হয়েছে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, 'কারা মেহমেত পাশা'কে একটা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিজের মাথাটি হারাতে হয়েছিল, এবং হয়তো একথা সত্যি যে, তাঁর ছিন্ন মুণ্ডটি দেখে তাঁর লোকজন বিদ্রোহ থামাতে বাধ্য হয়েছিল এবং হয়তো এই রকম অবস্থায় পড়া আরো অনেকের মতো তারা ওই কাটা মুণ্ডটি ছোড়াছুড়ি করে উজিরের প্রতি তাদের ক্রোধ প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু লোকগুলো কি সত্যিই ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমন করেছিল,– পাশার ছিন্ন মুণ্ডটি নিয়ে ফুটবল খেলেছিল? আমি অবশ্য কখনোই এসব কথা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট না করে, পরের ছবিতে চলে যেতাম। যেমন ষোড়শ শতাব্দীর 'খাজনা আদায়কারী' 'ইস্টার কিরা', যাকে সফি সুলতানের 'ঘুষ আদায়কারী'-ও বলা হত; অন্য আরেকটা বিদ্রোহের সময় তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল, তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে, এক এক টুকরো, যারা তাকে ঘুষ দিয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের বাড়ির দরজায় পেরেক দিয়ে আটকানো হয়েছিল। আমি এই রকম একটা, দরজায় পেরেক দিয়ে আটকানো কাটা হাতের ছবি, ভীতির সঙ্গে দেখেছিলাম।

কোকু, যে চারজন বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত লেখকদের কথা আগেই বলেছি, তাদেরই একজন, অন্য একটা বিষয়ের অদ্ভুত, ভয়াবহ বর্ণনার প্রতি তাঁর পূর্ণ মনোযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলেন, যা পশ্চিম থেকে আগত পর্যটকদের রোমাঞ্চিত করে তুলত; বিষয়টি হচ্ছে ইস্তাম্বুলের অত্যাচারী এবং ঘাতকদের অনুসৃত শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি। 'এমিনোনু'-তে একটা জায়গা বিশেষভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, যার নাম ছিল হুক। অপরাধীকে, পুরো ন্যাংটো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে কপিকল দিয়ে ওপরে তোলা হত, তারপর ধারালো হুক বিঁধিয়ে গেঁথে দড়ি খুলে ওপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হত, সটান লোকটা নিচে নেমে আসতো। একজন দরোয়ান ছিল, ইমামের বৌ-এর প্রেমে পড়ে তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর তার চুল কেটে, ছেলেদের পোশাক পরিয়ে ছেলে সাজিয়ে শহরে ঘুরত; পরে যখন ধরা পড়ল, তখন ওর দুই হাত আর দুই পা ভেঙে দেওয়া হল, তারপর একটা কামানের নলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তেল-মাখানো ন্যাকড়া গুঁজে কামানের বারুদে আগুন ধরিয়ে গোলার মতো আকাশে কামান দেগে ওকে উড়িয়ে দেওয়া হল। 'এক ধরনের শাস্তি, যাতে ভীতির সঞ্চার হতে বাধ্য', এইভাবে এনসাইক্লোপিডিয়াতে আরেকটা ভয়ঙ্কর শাস্তির বর্ণনা আছে, যেখানে অপরাধীকে ন্যাংটো করে উপুড় করে একটা ক্রুশে বেঁধে আর ওর কাঁধে এবং পাছায় মাংসে গর্ত করে মোমবাতি ঢুকিয়ে জ্বেলে দেওয়া হত আর সেই মোমবাতির আলোয় ওকে সারা শহরে হাঁটানো হত, যাতে সকলে শিক্ষা পায়। ওই ন্যাংটো অপরাধীর বর্ণনা পড়ে আমার প্রতিক্রিয়া ছিল যৌন উত্তেজনাপূর্ণ, আর ইস্তাম্বুলের ইতিহাস যে অগণ্য মৃত্যু, অত্যাচার এবং বিভীষিকাতে ভর্তি, যা সাদা-কালো ছবিতে দেখানো ছিল, সে কথা ভেবে এক ধরনের আনন্দ পেতাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরুতে, রেসাত এক্রেম কোকু একটা বইয়ের কথা চিন্তা করেননি। ১৯৫৪ সালে চার পাতার 'কুমহুরিয়েৎ' ক্রোড়পত্র, যাতে আমাদের ইতিহাসের 'বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা' বর্ণিত ছিল, সেগুলো একত্রে বাঁধাই করে একটা সংকলন করা হয়। সেই সব বিস্ময়কর গল্প, অদ্ভুত অস্বাভাবিকতা, ঐতিহাসিক এবং বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ বিবরণগুলোর পেছনে রয়েছে কোকুর নিজের আশ্চর্য ও বিয়োগান্তক কাহিনী। তাঁর ভালোবাসার শ্রম, যা তিনি দশ বছর আগে, ১৯৪৪ সালে শুরু করেছিলেন এবং দারিদ্র্যের জন্য ১৯৫১ সালে যা তিনি ছাড়তে বাধ্য হন, ভল্যুম ৪, পৃষ্ঠা এক হাজারে এবং তখনো 'বি' অক্ষর নিয়ে লেখা চলছিল, সেই শ্রমের ফসলই হল ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়া।

সাত বছর পরে কোকু দ্বিতীয় ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়ার ওপর কাজ শুরু করেন, যেটাকে তিনি সঠিকভাবে গর্বের সঙ্গে দাবি করেছিলেন 'একটা শহরের ওপর পৃথিবীর প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া' বলে। এবারও তিনি 'এ' অক্ষর দিয়েই শুরু করেন। এখন বয়েস হয়েছে বাহান্ন, ভয় পাচ্ছেন, তাঁর এই প্রচণ্ড পরিশ্রম, এবারেও না অসমাপ্ত থেকে যায়, তাই তিনি ঠিক করলেন, মাত্র পনেরো ভল্যুম-এই কাজ শেষ করবেন আর যে লেখাগুলো ঢোকানো হবে, সেগুলো যেন বেশি 'জনপ্রিয়' হয়। আর এবারে তাঁর আত্মবিশ্বাস আরো বেশি বলে তিনি তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়াতে, নিজের ব্যক্তিগত আগ্রহকে আরো অনুসন্ধিৎসু করে তুললেন। ১৯৫৮ সালে তিনি প্রথম ভল্যুম বার করলেন, আর ১৯৭৩ সালে তিনি পৌছলেন এগারো নম্বর ভল্যুমে, কিন্তু অক্ষর তখনো কেবল 'জি' পর্যন্ত এসেছে। এই সময় তিনি যা ভয় করেছিলেন, তাই হল, তাঁকে বাধ্য হয়ে কাজটি পরিত্যাগ করতে হল। যাই হোক না কেন, এই দ্বিতীয় এনসাইক্লোপিডিয়ার অদ্ভুত, বর্ণাঢ্য, বিংশ শতাব্দীর ইস্তাম্বুলের ওপর লেখা গুলি, শহরের আত্মায় পৌছনোর অদ্বিতীয় পথ নির্দেশক, কারণ যে গদ্যে লেখা হয়েছে, তার যে মসৃণতা, শহরেরও তাই। এটা বুঝতে গেলে রেসাত এক্রেম কোকু-কে বুঝতে হবে।

কোকু 'হুজুন'সিক্ত ব্যক্তিদের একজন, যিনি বিংশ শতাব্দীর ইস্তাম্বুলকে একটা বিষাদগ্রস্ত অর্ধসমাপ্ত শহরের চেহারা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'হুজুন'-ই তাঁর জীবনের সংজ্ঞা, 'হুজুন' তাঁর লেখায় লুকোনো যুক্তিবাদ দিয়েছে এবং তাঁকে সঙ্গীহীন একক যাত্রায় পাঠিয়েছে, যা তাঁর অন্তিম পরাজয়ে সমাপ্ত,– কিন্তু একই ধরনের অন্যান্য লেখকদের মতো, তিনি এটাকে মোটেই মূল হিসাবে দেখেননি এবং এ নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তাও করেননি। রেসাত এক্রেম কোকু এই বিষন্নতাকে তাঁর ইতিহাস, তাঁর পরিবার বা তাঁর শহর থেকে উদ্ভূত বলে ভাবতেন না, তাঁর 'হুজুন'কে সহজাত বলে মনে করতেন। জীবন থেকে সরে আসা, জীবন মানে শুরু থেকেই পরাজয় এই দৃঢ় ধারণা, এগুলোকে তিনি ইস্তাম্বুলের উত্তরাধিকার বলে মনে করতেন না, তাঁর কাছে ইস্তাম্বুল ছিল সান্ত্বনা-স্বরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

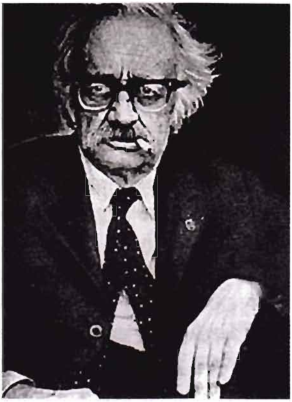

রেসাত এক্রেম কোকু ১৯০৫ সালে একটি শিক্ষক এবং সরকারি চাকুরে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন একজন পাশার মেয়ে, বাবা দীর্ঘদিন সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছেন। পুরো ছেলেবেলাটা তাঁর কেটেছে যুদ্ধ, পরাজয়, বহিরাগতদের ঢেউয়ের পরে ঢেউ-এর সাক্ষী থেকে, যা অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছে এবং ইস্তাম্বুলকে এমন একটা দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যার থেকে কয়েক দশক ইস্তাম্বুল বেরোতে পারেনি। তাঁর পরবর্তী বইগুলোয় এবং রচনায় তিনি প্রায়ই এ বিষয়গুলোতে ফিরে ফিরে এসেছেন, যেমন তিনি ফিরে এসেছেন শহরের শেষ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে, দমকল কর্মীদের কথায়, রাস্তার লড়াইগুলোতে, পাড়ার জীবনে এবং শুঁড়িখানাগুলোতে, যা তিনি ছেলেবেলায় দেখেছিলেন। তিনি একটা বসফোরাস 'ইয়ালি'র কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি ছেলেবেলায় বাস করেছেন এবং পরে সেটা পুড়িয়ে ফেলা হয়। যখন রেসাত এক্রেমের বয়স কুড়ি বছর, তাঁর বাবা 'গোজটেপে'তে একটা পুরোনো অটোমান ভিলা ভাড়া করেন। এইখানে কোকু ইস্তাম্বুলের কাঠের বাড়ির প্রচলিত জীবন যাপন করেন। এইখান থেকেই তিনি তাঁদের বড়-হয়ে-যাওয়া পরিবারকে ছড়িয়ে যেতে দেখেন। এই ধরনের অন্যান্য অনেক পরিবারের মতো, কোকুর পরিবারও ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের চাপে এবং পারিবারিক ঝগড়া ইত্যাদির ফলে কাঠের বাড়িটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। তারপরে কোকু 'গোজটেপে'-তেই নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাধিক কংক্রীটের অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেছেন। এই সময়ে যখন সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে, তুর্কী প্রজাতন্ত্রের আদর্শগত মতবাদ তুঙ্গে এবং পাশ্চাত্যমুখী ইস্তাম্বুল অটোমান-অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু, তাকে বাতিল করছে, দমন করছে, বা ঘৃণা করতে শুরু করেছে, তখন কোকু সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি ইস্তাম্বুলেই ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়বেন এবং স্নাতক হবার পর তাঁর প্রিয় শিক্ষক, ঐতিহাসিক আমেদ রেফিক-এর সহকারী হিসাবে কাজ করবেন। কোকুর এই যে সিদ্ধান্ত, এটা তাঁর বিষন্নতা এবং মনের পশ্চাদ্‌গামিতার সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

জন্ম ১৮৮০ সাল, কোকুর চাইতে পঁচিশ বছরের বড়, আমেদ রেফিক 'অটোমান লাইফ ইন পাস্ট সেঞ্চুরিজ' নামে একটি গ্রন্থ পর্বের লেখক ছিলেন। এটা প্রকাশিত হয়েছিল (যেমন কোকুর এনসাইক্লোপিডিয়াও ভবিষ্যতে হবে) একটার পর একটা পর্বে, ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ইস্তাম্বুলের প্রথম আধুনিক জনপ্রিয় ঐতিহাসিক বলে পরিচিত করে। যে সময়টা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন না, তখন তিনি অগোছালো অটোমান সংগ্রহশালায় (তখন এটা 'কাগজের কোষাগার' বলে পরিচিত ছিল) ধুলো-ময়লা ঝাড়তেন অটোমান ক্রনিক্‌ল-এর হাতে-লেখা বর্ণনাগুলো খুঁজে বার করতে। তিনি যেখানে যা পেতেন, সব খুঁজে খুঁজে দেখতেন, কারণ– কোকুর মতো– তাঁরও সজীব গদ্যের প্রতি ঝোঁক ছিল (তিনি কাব্য ভালবাসতেন এবং অবসর সময়ে কবিতা লিখতেন)। তাঁর খবরের কাগজের লেখাগুলো প্রচুর লোকে পড়ত এবং পরে একটা বই হিসাবে সংকলিত হয়েছিল। ইতিহাসকে সাহিত্যের সঙ্গে সংযোজিত করা, সংগ্রহশালা থেকে বিস্ময়কর সব মহার্ঘ বস্তু বার করে এনে তাদের খবরের কাগজের এবং পত্রিকার রচনায় পরিবর্তিত করা, এক বই-এর দোকান থেকে আর এক বই-এর দোকানে ক্রমান্বয়ে ঘুরে বেড়ানো, ইতিহাসকে এমন একটা বিষয়ে পরিণত করা, যা অতি সহজেই গ্রহণ করা যায় এবং বন্ধুদের সঙ্গে শুঁড়িখানায় দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটানো, মদ খাওয়া, আলাপচারিতা করা, এইসব ছিল কোকুর প্রিয় নেশা, যা তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁদের পারস্পরিক সাহচর্য খুব অল্পদিনের ছিল, কারণ ১৯৩৩ সালে আমেদ রেফিককে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় যখন ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন হয় (দারুল ফুনুন)। 'ফ্রীডম অ্যান্ড এনটেন্টে পার্টি'র প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল বলে জানা যায়, এরা আতাতুর্কের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু এর চাইতেও বেশি, তাঁর অটোমান ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রতি অসীম আগ্রহ, যার জন্য তাঁকে সম্মানিত পদ হারাতে হয়েছিল (আমার নানাজী, মায়ের বাবা-ও ঐ একই সময়ে আইন দফ্‌তর থেকে ছাঁটাই হয়েছিলেন)। যখন তাঁর গুরু তাঁর পদ থেকে অপসারিত হলেন, রেসাত এক্রাম কোকুর ভাগ্যেও তাই হল।

আতাতুর্ক ও রাষ্ট্রের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবার পর তাঁর গুরুর ক্রমাবনতি দেখে কোকু খুব কষ্ট পেয়েছিলেন : কপর্দকহীন, নামহীন, অবহেলিত হয়ে তাঁকে অল্প অল্প করে তাঁর গ্রন্থাগার বিক্রি করে দিতে হয়েছিল, কেবল ওষুধ কেনার জন্যে। পাঁচ বছর এইভাবে লড়াই চালিয়ে তিনি দারিদ্রে, অভাবে মারা যান। এই সময়ে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি যে নব্বইটি বই লিখেছিলেন, তার বেশির ভাগই ছাপা ছিল না। (চল্লিশ বছর বাদে কোকুরও এই একই দশা হয়েছিল।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেদ রেফিকের মৃত্যুর পরে একটি লেখায় কোকু দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর গুরুকে তাঁর জীবদ্দশাতেই লোকে ভুলে গিয়েছিল, তারপর সেই লেখাতেই একটা শিশুসুলভ কবিতা লিখেছিলেন 'আমার অলস কর্মহীন ছেলেবেলায় আমি ছিলাম মেছুড়ের বঁড়শিতে লাগানো সিসার খণ্ডের মতো, আমাদের বসফোরাস 'ইয়ালি'র উল্টোদিকে জেটি থেকে জলে ঢুকতাম আর বেরিয়ে আসতাম একটা আঁশযুক্ত মাছের মতো' । তাঁর মনে আছে, তিনি প্রথম যখন আমেদ রেফিক-এর বই পড়েন, তখন তিনি একটি এগারো বছরের হাসিখুশি বালক। তখনো তাঁকে এই শহর অটোমান ইতিহাসের মতো বিষণ্ন বানায়নি। কিন্তু কেবলমাত্র এই দারিদ্র্য

AMARBOI.COM

জর্জরিত বারবণিতা শহরটিই রেসাত এক্রেম কোকুর বিষণ্নতাকে আহার্য জোগায়নি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একজন সমকামী হিসেবে এই শহরে তাঁর বেঁচে থাকার লড়াইও এর জন্য দায়ী।

সুতরাং তিনি যে তাঁর দ্রুতগতি, পরাক্রমী, জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোতে তাঁর যৌন কামনা প্রকাশ করেছেন এবং সেটা আরো বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে তাঁর ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়াতে, তা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে রেসাত এক্রেম কোকু তার সমসাময়িক অন্য লেখকদের চাইতে অনেক বেশি সাহসী। তাঁর প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া পর্ব থেকে শুরু করে এবং বিশেষ করে পরবর্তী প্রত্যেকটা ভল্যুমে, তিনি বালক এবং অল্প বয়সি ছেলেদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করার কোনো সুযোগই ছাড়েননি। এইখানে রয়েছে মিরিয়ালেস আমেদ আগা, 'সুলেইমান দি ম্যাগনিফিশেন্ট' যে সব ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য নিয়েছেন, তাদেরই একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(একটা তাজা মুখশ্রী-সম্পন্ন যুবক, একটা প্লেন গাছের ডালের মতো মোটামোটা হাত-ওয়ালা মানুষ ড্রাগন...) এবং কাফের দি বারবার, ষোড়শ শতাব্দীর কবি এডলিয়া সেলেবি যার উল্লেখ করেছেন, যিনি তাঁর 'সেহরেঙ্গিজ'– ('সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত একটি অল্পবয়সি যুবক') বইয়ে পেশাদারদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। 'ইয়েতিন আহমেদ, সুশ্রী কাবারিওয়ালা'র উল্লেখ আছে একটা লেখায়। 'ও ছিল খালি পায়ে চলা একটি বালক, যার ঝোলা প্যান্টে অন্তত চল্লিশ জায়গায় তালি দেওয়া ছিল এবং ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে গায়ের চামড়া দেখা যেত, কিন্তু চেহারার বিচারে সে ছিল এক চুমুক জলের মতো, ওর ভুরুতে আর কপালে সুলতানের অধিকারের মতো সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিল, ওর চুল ছিল কোঁকড়া চুলের বন্যা, ওর কালো চামড়ায় সোনালি আভা ঝলকাত, ওর চাহনি ছিল আমন্ত্রণী, ভাষা ছিল প্রেমিকের, ওর শরীরের গড়ন ছিল লম্বা, একহারা, কিন্তু শক্তিশালী।' কোকুর শ্বাসরুদ্ধকারী গদ্য লেখা সত্ত্বেও অন্য রাজকবিদের মতো তিনিও লক্ষ রাখতেন যেন তাঁর অনুগত আঁকিয়েরা এই প্রত্যেক কাল্পনিক নগ্নপদ নায়কদের নম্র সমাজের এবং আইনের প্রচলিত নীতি-নিয়মের মধ্যেই আঁকেন। কিন্তু প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং বাস্তবের মধ্যে টানাপোড়েন আছেই। 'জ্যানিসারি বিস্কুট' নামে একটি রচনায়, তিনি গর্ব করে বলছেন, যখন দাড়ি গোঁফ ওঠেনি এমন ছেলেরা প্রথমে যোগ দিল, 'বলশালী জ্যানিসারি মস্তানরা কীভাবে তাদের নিজের নিজের কব্জায় নিয়ে নিল'।

আর একটা রচনায়, নাম 'সুশ্রী অল্পবয়েসি ব্লেড' তিনি বললেন যে, 'রাজকবিদের কবিতায় বেশির ভাগ যে সৌন্দর্যের গান গাওয়া হয়, তা হচ্ছে পুরুষদের সৌন্দর্য।' যাকে পুজো করা হচ্ছে, সে সব সময়ই একজন অল্প বয়েসি, তাজা মুখশ্রী-যুক্ত যুবক এবং তারপরেই তিনি আনন্দের সঙ্গে এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি বর্ণনা করেছেন। প্রথম দিককার ভল্যুমগুলোতে সুন্দর যুবকদের খুব সাবধানে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাগুলো, যেগুলো আঁকা হত, তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। কিন্তু পরের ভল্যুমগুলোতে কোকুর, সুন্দর ছেলেদের তাদের সুন্দর পায়ের জন্য প্রশংসা করতে কোনো ছুতোর দরকার হত না, অথবা তাদের অঙ্গহানির জন্যেও নয়। 'নাবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডব্রিলোভিচ'-এ আমরা হেইরিয়ে কোম্পানির একজন অপূর্ব সুন্দর অল্পবয়েসি ক্রোয়েশিয়ার নাবিক-এর বর্ণনা পড়ি, যে, ১৮৬৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর যখন তার জাহাজ কাবাতাসের কাছে এসেছে, তখন জাহাজ আর জেটির মাঝে তার দু'পা আটকে যায় (শহরের প্রত্যেকেরই এ ব্যাপারে নিদারুণ ভীতি আছে); তার একটি পা, বুট সমেত কেটে গিয়ে, সমুদ্রে পড়ে যায় আর ওই ক্রোয়েশিয়ো নাবিক কেবল বলে, 'আমার বুটটা হারালাম'।

প্রথম ভল্যুমগুলোতে কোকুর অটোমান অতীতের সুন্দর যুবকরা, অল্পবয়েসি ছেলেরা এবং সুশ্রী নগ্নপদ লোকেরা সর্বাংশে বাস্তব না হলেও অন্তত অংশত 'শহরের বই' (সেহরেঙ্গিজ), জনপ্রিয় উপকথা এবং শহরের বিস্মৃত গ্রন্থাগারগুলোতে পাওয়া মূল্যবান সম্পদ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এগুলোর ভেতর আছে পাণ্ডুলিপি, কবিতা সংগ্রহ, ভাগ্য সম্পর্কিত বই, 'গোপন' বই এবং সম্ভাবনাময় ঊনবিংশ শতাব্দীর খবরের কাগজের সংগ্রহশালা (এই রকম একটি কাগজেই উনি সুশ্রী যুবক ক্রোয়েট নাবিককে আবিষ্কার করছিলেন।)

কোকুর যত বয়স হতে লাগল, উনি ততই দুঃখ এবং ক্রোধের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়াকে পনেরো ভল্যুমের মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব হবে না এবং এটার ভাগ্যেও আছে অসমাপ্ত থাকা। কাজেই তিনি আর লিপিবদ্ধ ইতিহাসের সুন্দর ছেলেদের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। তিনি নানা রকম অজুহাত বের করে অনেক, বিচিত্র সব অল্পবয়েসি যুবকদের নিয়ে লেখাগুলো কৌশলে চাতুরি করে ঢোকাতে লাগলেন ইতিহাসের পাতায়। যে সব ছেলেদের দেখা পেয়েছিলেন রাস্তায়, শুঁড়িখানায়, কফি হাউসে, জুয়োর আড্ডায় এবং শহরের সাঁকোগুলোতে; এছাড়া খবরের কাগজের ছেলেগুলো, যাদের প্রত্যেকের ওপর তাঁর আলাদা আলাদাভাবে আগ্রহ ছিল, এমনকি ফিটফাট সুন্দর ছেলেরা, যারা তুর্কী ফ্লাইং ফান্ডের জন্য গোলাপ ফুল বিক্রি করত, তাদেরও। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এনসাইক্লোপিডিয়ার দশম বছরে, নয় নম্বর ভল্যুমে, যেটা কোকুর তেষট্টি বছর বয়েসে প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি ৪৭৬৭ পাতায়, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের মধ্যে দেখা হওয়া একটা ১৪-১৫ বছরের কুশলী শিশু দড়াবাজ খেলোয়াড়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কোকু স্মৃতিচারণা করছেন, এক সন্ধ্যায় উনি যে এলাকায় তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন, সেই এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'গোজটেপে'-তে 'আন্দ' নামে একটা গ্রীষ্মকালীন সিনেমায়, উনি ছেলেটিকে প্রথম দেখেন; পরনে সাদা জুতো, সাদা ফুলপ্যান্ট, ফ্লানেলের একটা শার্ট, বুকে তারকাচিহ্ন এবং অর্ধ চন্দ্র আঁকা এবং যখন নিজের কলাকুশলতা দেখাচ্ছিল, তখন জামা কাপড় খুলে ফেলে কেবল একটি ছোট্ট সাদা হাফ্‌প্যান্ট পরে পরিষ্কার ঝকঝকে সুশ্রী মুখে ভদ্রজনোচিতভাবে, ব্যবহারে এবং নম্রতায়, ও নিজেকে তার পশ্চিম দেশীয় সমপর্যায়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতা-সম্পন্ন দেখিয়েছিল। লেখক বলছেন, খেলা শেষ হবার পর, যদিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঁর খারাপ লেগেছিল ছেলেটা যখন একটা টাকা পয়সা নেবার জন্য ট্রে নিয়ে ঘুরছিল, তবু তিনি দেখে খুশি হয়েছিলেন যে, ছেলেটা অকৃতজ্ঞ নয় বা লোলুপ নয়।

তিনি বলছেন, ছেলেটা দর্শকদের কাউকে কাউকে নিজের কার্ড দিচ্ছিল এবং পরে পঞ্চাশ বছর বয়েসি লেখক এবং ছেলেটা পরিচিত হয়েছিলেন। সিনেমায় তাদের প্রথম সাক্ষাৎ এবং এনসাইক্লোপিডিয়ায় এই লেখাটা লিপিবদ্ধ করার মাঝের দীর্ঘ বারো বছরের কোনো একটা সময়ে তাদের সম্বন্ধ ভেঙে যায় এবং তারপর ছেলেটাকে এবং তার পরিবারকে অনেক চিঠি লেখা সত্ত্বেও, লেখক, দুঃখ করছেন, তাঁর চিঠিগুলোর কোনো উত্তর পাননি এবং তাই ছেলেটার পরে কী হল, তা বলতে পারছেন না।

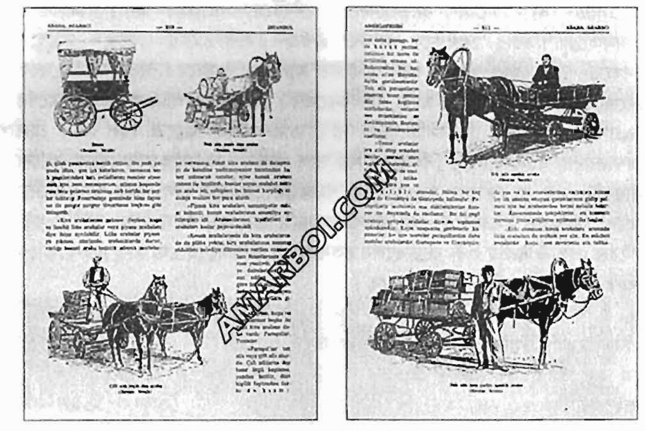

১৯৬০ সালে, যখন কোকুর কাজটা পর্বে পর্বে বেরোচ্ছিল, তাঁর ধৈর্যশীল পাঠকরা ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়াকে শহরের ঘটনাবলীর একমাত্র নির্দেশক বলে মনে করত না, বরং এতে বার হওয়া অদ্ভুত অদ্ভুত আর মজাদার ব্যাপারগুলোকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মেশানো একটা পত্রিকা মনে করে পড়ত। আমি অনেক বাড়িতে গিয়ে দেখেছি যে তারা এই পর্বগুলোকে তাদের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর সঙ্গে রাখত। তা সত্ত্বেও কোকু কিন্তু বাড়ি বাড়িতে পরিচিত নাম হয়ে ওঠেননি। তাঁর বিষাদগ্রস্ত এনসাইক্লোপিডিয়ার শহর ও ১৯৬০ সালের ইস্তাম্বুলের আদর্শ, এই দুই-এর মধ্যে বিরোধ ছিল এবং অধিকাংশ পাঠকই তার যৌনতার রুচিকে শুধু পছন্দ করত না, তাই নয়, সহ্যও করতে পারত না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পর, তাঁর প্রথম ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়া এবং দ্বিতীয়টির প্রথম ভল্যুমগুলোর, বেশ কিছু বিশ্বস্ত অনুরাগী হয়েছিল, বিশেষ করে লেখক ও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে, যারা ইস্তাম্বুলের দ্রুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্ত্যায়নের কারণ খুঁজতে এবং প্রাসাদ, বাড়িগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা এবং অতীতকে মুছে ফেলা ইত্যাদি বুঝতে চাইছিলেন। তাঁরা এই প্রথমদিককার ভল্যুমগুলোকে বেশ ভারী এবং বৈজ্ঞানিক বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, আমি যখন পরের দিককার ভল্যুমগুলোর পাতা ওল্টাই, যে ভল্যুমগুলো আগেকার চাইতে অনেক কম লেখকের দল লিখেছিলেন এবং কোকুর ব্যক্তিগত পছন্দগুলোকে যথেষ্ট জায়গা দিয়েছিলেন, সেগুলো আমার মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, অতীত এবং বর্তমানের মাঝে খুশিমনে ঘুরে বেড়াতে পারি।

আমার মনে হয়, কোকুর যে বিষণ্নতা, তা কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যের পতন বা ইস্তাম্বুলের ক্রমাবনতির ফল নয়, সেটা বরং তাঁর নিজের ছায়াচ্ছন্ন শৈশব যা ইয়ালিতে বা কাঠের বাড়িগুলোতে কেটেছে, তারই ফল। আমাদের এনসাইক্লোপিডিয়ার লেখককে আমরা একজন সত্যিকারের সংগ্রাহক হিসেবে দেখতে পারি, যিনি তাঁর একটি ব্যক্তিগত মানসিক আঘাতের পর পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বস্তুর মধ্যে বাস করতেন। কোকুর অবশ্য একজন উচ্চমার্গের সংগ্রাহকের বস্তুবাদ জিনিসটি ছিল না। তার আগ্রহ বস্তুতে ছিল না। ছিল অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোতে। কিন্তু বেশির ভাগ পাশ্চাত্য সংগ্রাহকদের যেমন কোনো ধারণাই নেই যে, তাদের সংগ্রহ শেষ পর্যন্ত মিউজিয়ামে স্থান পাবে, না, ছড়িয়ে যাবে, কোকুরও সে রকম, কোনো পরিকল্পনাই ছিল না, যখন তিনি কাজটা শুরু করেন। তিনি সংগ্রহ শুরু করেছিলেন কেবলই এই আকর্ষণেই যে, কিছু ঘটনা তাঁকে শহর সম্বন্ধে নতুন কিছু তথ্য জানাবে।

যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সংগ্রহ সীমা ছাড়িয়ে যাবে, তখনই তিনি এনসাইক্লোপিডিয়ার কথা ভাবলেন এবং তখন থেকেই তিনি তাঁর সংগ্রহের ভেতর যে বস্তু আছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হলেন। যখন অধ্যাপক সেমাভি এইআইস, বাইজান্টাইন এবং অটোমান শিল্পকলার ইতিহাসবিদ, যিনি কোকুকে ১৯৪৪ সাল থেকে জানতেন এবং তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়ায় শুরু থেকেই লিখতেন, কোকুর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন, তখন তিনি কোকুর গ্রন্থাগারের বর্ণনা দিয়েছেন, খামে খামে ভরে রাখা খবরের কাগজের কাটিং, ছবির সংগ্রহ, ফটোগ্রাফ, জীবনী, নানা রকম টীকা (বর্তমানে লুপ্ত) ইত্যাদির স্তূপ ঘরের মধ্যে উঁচু হয়ে আছে, তাঁর দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে পড়া উনবিংশ শতাব্দীর খবরের কাগজগুলো থেকে সংগ্রহ করা।

যখন কোকু বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এনসাইক্লোপিডিয়া শেষ করতে পারবেন না, তখন তিনি সেমাভি এইআইসকে বললেন যে, তিনি তাঁর পুরো সংগ্রহ, তাঁর সারা জীবনের ঝাড়ুদারি, তাঁর বাগানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলবেন। একজন সত্যিকার সংগ্রাহকই এই রকম করার কথা ভাবতে পারেন এবং এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঔপন্যাসিক ব্রুস চ্যাটউইন-এর কথা, যিনি তাঁর জীবনের একাংশ সোথেবি-তে কাজ করে কাটিয়েছেন এবং যার নায়ক 'উৎজ' এক মুহূর্তের ক্রোধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নিজের পোর্সিলিন সংগ্রহ চুরমার করে ভেঙে ফেলেছিল। কোকু শেষ পর্যন্ত তাঁর ক্রোধকে প্রভুত্ব করতে দেননি, দিলেও অবশ্য কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হত না; ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রকাশনা কমতে কমতে, ১৯৭৩ সালে বন্ধ হয়ে গেল। দু'বছর আগে কোকুর ধনী অংশীদার কোকুর সমালোচনা করেন যে, তিনি নিজের অসুবিধার দরুন লম্বা লম্বা অপ্রয়োজনীয় লেখা দিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। কোকু তার সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের পুরো সংগ্রহ– টাইপ করা রচনাগুলো, খবরের কাগজের কাটিংগুলো এবং ফটোগ্রাফ ইত্যাদি তাঁর বাবিয়ালির অফিস থেকে নিজের গোজটেপের অ্যাপার্টমেন্টে, সরিয়ে নিয়ে আসেন। অতীতের দুঃখময় ঘটনাগুলোকে গদ্যে সংশ্লেষিত করতে না পেরে, বা কোনো মিউজিয়ামে সুন্দর করে সংরক্ষিত

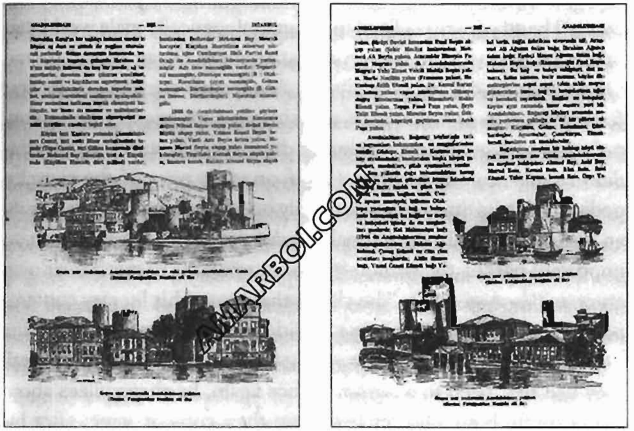

করতে না পেরে, কোকু তাঁর বাকি জীবন অ্যাপার্টমেন্টে ছাদ পর্যন্ত উঁচু কাগজের পাহাড়ের মধ্যে কাটান। তাঁর বোন মারা যাবার পর তাঁর বাবা যে কাঠের বাড়িটি বানিয়েছিলেন, সেটা বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু কোকু তাঁর পুরোনো পাড়া ছাড়েননি। কোকুর জীবনের শেষ বছরগুলোতে মেহমেত নামে একটি ছেলে তাঁর সঙ্গী ছিল। ওর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, যেমন এনসাইক্লোপিডিয়ায় বর্ণিত অন্যান্য ছেলেগুলোর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল। মেহমেত ছিল একটা গৃহহীন বালক, যাকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে মেহমেত একটা প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

প্রায় চল্লিশ জন বন্ধু– তাদের অধিকাংশই সেমাভি এইআইস-এর মতো ঐতিহাসিক কিংবা সাহিত্যিক– তিরিশ বছর ধরে একটিও পয়সা না পেয়ে ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়াতে লিখে গেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সেরমেত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহতার এলুস (যিনি উনবিংশ শতাব্দীর ইস্তাম্বুলের স্মৃতিকথা ও শহরের চরিত্রগুলো, প্রাসাদগুলো এবং পাশাদের দুষ্কর্মগুলো নিয়ে রসরচনা লিখে গেছেন) এবং ওসমান নুরি এরগিন (যিনি একটি বিশদ পৌরসভার ইতিহাস লিখে গেছেন এবং ১৯৩৪ সালে একটি বিখ্যাত শহরের গাইড পুস্তিকা প্রকাশ করেন), পুরোনো প্রজন্মের লোক ছিলেন এবং কোকুর প্রথম ভল্যুমগুলো যখন বেরোচ্ছিল, তখন এঁরা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তী প্রজন্মের অল্পবয়েসিরা এক সময়ে কোকুর কাছ থেকে সরে যান, কারণ 'কোকুর খেয়ালিপনা' (এইআইস বলেছেন)। এবং তাই, অফিসে বসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্পগুজব, এবং পার্শ্ববর্তী শুঁড়িখানায় বসে সন্ধ্যাবেলার দীর্ঘ মদ্যপান, এগুলো কমে আসে।

১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে কোকুর অভ্যাস ছিল, এনসাইক্লোপিডিয়ার অফিসে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করে সন্ধ্যাগুলো কাটানো, তারপর সিরকেসি-তে শুঁড়িখানায় গিয়ে বসা। তাঁদের সঙ্গে কখনোই কোনো নারী থাকত না। এই বিখ্যাত লেখকদের দলটিকে রাজদরবারের সাহিত্যের এবং অটোমান পুরুষ সংস্কৃতির শেষ প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। এই পুরুষ সংস্কৃতির প্রচলিত চেহারাটা ছিল, একই ধরনের নতুনত্বহীন পরিচিত স্ত্রী-চরিত্র নিয়ে কথা বলা, যৌনতার সঙ্গে পাপ, নোংরামি, ছল-চাতুরী, ঠকানো, যৌনবিকৃতি, দুর্নীতা, বিপদ, অপরাধবোধ, ভয় এগুলো জড়িয়ে ফেলা এং এগুলোই এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রতিটি পাতায় ফুটে উঠত। এর তিরিশ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে মাত্র একজন কি দুজন মহিলা এতে লিখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শুঁড়িখানায় সব পুরুষ লেখকদের সন্ধ্যাগুলো, লেখা ও প্রকাশনা ব্যাপারটায় এতটাই গুরুত্ব পেয়েছিল যে, এগুলো নিজস্ব রচনা হয়ে প্রকাশিত হত; 'শুঁড়িখানার রাত্রি' নামক রচনায়, কোকু দাবি করছেন যে, তিনি এবং তাঁর সমাসাময়িক সাহিত্যিকরা একটা সুন্দর ধারাকে অনুসরণ করছেন এবং কয়েকজন অটোমান কবিদের নাম করে বলছেন যে, তাঁরাও কিছুই করতে পারেননি, যতদিন না তারা শুঁড়িখানায় গিয়ে বসেছেন। এখানেও তিনি সেই সব সুন্দর ছেলেদের সম্পর্কে আনন্দ বিহ্বল হয়েছেন, যারা ওঁদের মদের গ্লাস পরিবেশন করত; ওদের পরনের পোশাক, কোমরবন্ধনী, ওদের চেহারার পেলব সৌন্দর্য ও ওদের স্বাভাবিক মাধুর্য তাঁর কলমে যেন আনন্দের সঙ্গে ফুটে উঠেছে; তারপর কোকু ঘোষণা করছেন যে, এই শুঁড়িখানার রাত্রির ধারাবাহিক লেখাগুলোর শ্রেষ্ঠ লেখক হচ্ছেন আহমেদ রাসিম। রাসিমের ইস্তাম্বুলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা এবং জীবনের চলমান মিছিল সম্পর্কে আগ্রহ, রেসাত এক্রেম কোকু এবং তাঁর গুরু আহমেদ রেফিকের ওপর অসীম প্রভাব ফেলেছিল।

ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়াতে এবং 'বাস্তব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে' খবরের কাগজের ধারাবাহিক লেখাগুলোতে কোকু, আহমেদ রাসিমের পুরোনো ইস্তাম্বুলের ওপর লেখা মুখরোচক রচনাগুলো ব্যবহার করেছিলেন এবং এই লেখাগুলোতে শয়তানি, চক্রান্ত, প্রেম ইত্যাদির টক-ঝাল-নুন-মিষ্টি মিশিয়ে একেবারে খাস্তা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলেছিলেন। (দুটো শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে, 'কী হয়েছিল ইস্তাম্বুলে, যখন মানুষ প্রেম চেয়েছিল'– এবং 'ইস্তাম্বুলের প্রাচীন শুঁড়িখানা, সেখানকার অদ্ভুত নাচিয়ে ছেলেরা এবং পুরুষ মহিলারা')। তুরস্কের ঢিলাঢালা কপিরাইট আইনের সুযোগ নিয়ে তিনি গুরুর লেখা থেকে মোটামুটি ভালোই উদ্ধৃত করতেন, কখনো কখনো হুবহু, অবশ্য সব সময়েই সরল বিশ্বাসে।

রাসিমের জন্ম (১৮৬৫) এবং কোকুর জন্ম (১৯০৫), এর মাঝখানের চল্লিশবছর দেখেছে, শহরে প্রথম খবরের কাগজের প্রকাশ, আব্দুল হামিতের দীর্ঘ পাশ্চাত্য অনুগামী শাসনকাল এবং রাজনৈতিক অত্যাচার, বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন, 'ইয়ং টার্ক'-দের বিরোধিতা এবং প্রকাশনা, সাহিত্যিক মহলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রথম তুর্কী উপন্যাস, বহিরাগতদের বিশাল ঢেউ এবং অনেক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড; ইস্তাম্বুলের এই দুই প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক লেখককে ইতিহাসের প্রবাহ ছাড়াও বেশি আলাদা করেছে পাশ্চাত্য কাব্যের ওপর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী। রাসিম তাঁর যৌবনে পাশ্চাত্য প্রভাবিত উপন্যাস ও কবিতা লিখেছেন এবং বলা যায়, অল্পবয়সেই ব্যর্থতাকে মেনে নিতে হয়েছে, তাই পরবর্তীকালে অতিরিক্ত পাশ্চাত্য প্রভাবকে তিনি একটা কৃত্রিম আচরণ, একটা 'অন্ধ অনুকরণ' বলে দেখেছেন; এটাকে তিনি বলেছেন, মুসলমান পাড়ায় শামুক বিক্রি করার মতো ব্যাপার। তাছাড়া বিশুদ্ধতা, সাহিত্যিক অমরত্ব এবং শিল্পীদের ধর্মীয় মতবাদের পুজো করা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকে তিনি অতিমাত্রায় বিদেশি বলে মনে করেছেন, পরিবর্তে তিনি দরবেশদের মতো নম্র বিনয়ী ভঙ্গিকে গ্রহণ করেছেন; তিনি জীবিকার্জনের জন্য খবরের কাগজে লিখতেন এবং আনন্দের জন্যও বটে। ইস্তাম্বুলের অন্তহীন প্রাণচাঞ্চল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার 'শিল্পের' জন্য কষ্ট স্বীকার করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি বা চিরকাল বেঁচে থাকবে বলে 'শিল্প' সৃষ্টি করেননি। তিনি শুধু রচনাগুলো তাঁর কলমে যেমন ভাবে এসেছে, তেমনভাবেই লিখে গেছেন।

তুলনামূলকভাবে কোকু কিন্তু পাশ্চাত্য আঙ্গিক থেকে নিজেকে কোনো মতেই বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। পাশ্চাত্য শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে তিনি বিজ্ঞান এবং সাহিত্যকে সেই একই পাশ্চাত্য নজরে দেখেছিলেন। কাজেই কোকুর পক্ষে তাঁর প্রিয় বিষয়গুলোকে– প্রান্তিক জীবনের উদ্ভট ব্যাপারগুলো, আবিষ্টতা বা আকর্ষণগুলো– ইত্যাদিকে তাঁর পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে মেলানো সম্ভব ছিল না। ইস্তাম্বুলে বাস করতেন বলে তিনি পশ্চিমের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে গজিয়ে ওঠা বিকৃত ভালোবাসার সাহিত্য সম্পর্কে খুব কমই জানতেন। কিন্তু জানলেও কিছু হত না, কারণ তিনি এমন একটা অটোমান ধারায় তৈরি হয়েছিলেন, যা সাহিত্য এবং সাহিত্যিককে, প্রান্তিক অঞ্চলে নয়, বিকৃত নীচুতলায় নয়, সমাজের কেন্দ্রে, কাজ করবে বলে আশা করে, সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে শিক্ষামূলক ভাব বিনিময় করবে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে বলে আশা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোকুর প্রথম স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবেন। অপসৃত হবার পর তাঁর পরবর্তী স্বপ্ন ছিল একটা প্রামাণ্য এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ করবেন। মনে হয়, তাঁর সবচেয়ে বড়ো ইচ্ছা ছিল তাঁর 'অদ্ভুত কল্পনাগুলে'র ওপর কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলোকে একটা বৈজ্ঞানিক বৈধতা দেওয়া।

যে সব অটোমান লেখক তাঁর এই শহরের আঠালো জগৎ সম্পর্কে রুচির অংশীদার ছিলেন, তাঁদের এই ধরনের লুকোছাপার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যে সেহরেঙ্গিজ (শহরের বই) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এত জনপ্রিয় ছিল, তাতে এই লেখকেরা শহরকে তার সমস্ত রূপে এবং বেশে তুলে ধরেছেন এবং এই শহরের সুন্দর অল্পবয়েসি ছেলেদের গুণের কথাও তুলে ধরেছেন। সত্যি বলতে কি, এই কাব্যধর্মী 'শহরের বইগুলো'-তে ছেলেদের নিয়ে পদ্য এবং শহরের সৌন্দর্য ও স্মৃতিস্তম্ভগুলো নিয়ে লেখা পদ্য, দুটোই খুব সহজে মিলিয়ে দিয়েছেন। যে কোনো প্রথম সারির অটোমান লেখক, যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর পর্যটক এভলিয়া সেলেবির লেখাগুলো উল্টে পাল্টে দেখলেই বোঝা যায় যে, কাব্যিক প্রচলিত রীতি কিভাবে লেখকদের শহরের ছেলেদের সঙ্গে একই ভঙ্গিতে শহরের মসজিদ, আবহাওয়া অথবা শহরের জলপথ ইত্যাদি প্রশংসা করার অনুমোদন দেয়। কিন্তু কোকু যখন দেখলেন যে, তিনি একটা দমবন্ধ, কেন্দ্রমুখী, সমধর্মী, পাশ্চাত্যমুখী আন্দোলনের কবলে পড়ে গেছেন, তখন এই প্রাচীনপন্থী ইস্তাম্বুলী লেখকের জন্য তাঁর 'সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়' এমন রুচির বহিঃপ্রকাশ করার আর কোনো রাস্তা রইল না এবং তাই তিনি তখন তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়ার জগতে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু তারপরেও মনে হয় তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়া জিনিসটা বোঝার ব্যাপারে কিছু খেয়ালিপনা আছে। প্রথম ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়া বন্ধ করে দেবার পর তিনি যে 'ওসমান গাজি থেকে আতাতুর্ক' লিখেছিলেন, তার কোথাও তিনি কাজভিনলি জ্যাকারিয়ার লেখা মধ্যযুগের 'অদ্ভুত প্রাণী' সংক্রান্ত একটি বই যার নাম আকাইবু-ই মহলুকত, সেই বইটিকে 'এক ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া' বলে উল্লেখ করেছিলেন। কোকু এক ধরনের জাতীয় গর্ব সহকারে বলছেন, এটাই প্রমাণ যে, অটোমানরা পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়বার আগে থেকেই এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় বই লিখত ও ব্যবহার করত। ওঁর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, উনি এনসাইক্লোপিডিয়াকে একটা অক্ষর অনুযায়ী সাজানো এলোমেলো সংগ্রহের চাইতে বেশি কিছু বলে মনে করতেন। তাঁর মনে এটাও আসেনি যে, ঘটনা এবং গল্পের মধ্যে পার্থক্য আছে, যে একটা ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের যুক্তি থাকা উচিত যা কিছু কিছু জিনিসকে অন্য জিনিসের চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং যা সভ্যতার নির্যাস ও প্রবাহের ওপর আলোকপাত করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কিছু লেখা ছোট হওয়া উচিত, কিছু লেখা বড় এবং কিছু কিছু লেখা– সত্যি বললে– একেবারে বাদ দেওয়া উচিত। তাঁর মাথায় এটা আসেনি যে, তিনিই ইতিহাসের কাজ করে যাচ্ছেন, ইতিহাস তার কাজ করছে না। এই ভাবে দেখলে কোকুর সঙ্গে নীৎসের রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইতিহাসের ব্যবহার ও অপব্যবহার'-এর 'ক্ষমতাহীন ঐতিহাসিক'-এর মিল আছে। তিনি তাঁর শহরের ইতিহাসকে নিজের ইতিহাসে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য তাঁর ক্ষমতা ছিল না কারণ,- সেই সব খাঁটি সংগ্রাহকরা, যারা জিনিসের বাজার দর না দেখে, তার নিজস্ব বিবেচনায় যে দর উচিত মনে করত, সেটাই দেখত, তাদের মতো, তিনিও বহুবছর ধরে খবরের কাগজ, লাইব্রেরি আর অটোমান দলিলপত্র ঘেঁটে যে সব গল্প বার করতেন, তার প্রতি আসক্ত ছিলেন।একজন সুখী সংগ্রাহক (সাধারণত একজন পশ্চিমদেশীয় ভদ্রলোক) হচ্ছেন সেই লোক, যিনি, যা খুঁজছেন তার উৎস কী, তা না দেখে, তাঁর সংগ্রহ করা জিনিসগুলোতে শৃঙ্খলা আনতেন, এমনভাবে তাদের শ্রেণী বিন্যাস করতেন যাতে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র পরিষ্কার থাকত এবং তাঁর পদ্ধতির যুক্তি স্বচ্ছ থাকত। কিন্তু কোকুর ইস্তাম্বুলে কোনো মিউজিয়ামই ছিল না, যেখানে অন্তত একটিও সংগ্রহ রক্ষিত ছিল। কোকুর ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়া একটি মিউজিয়াম নয়, ওটি ছিল একটি কৌতূহলোদ্দীপক বাক্স, যা ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপিয়ান রাজা-রাজড়া এবং শিল্পীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতা ওল্টানো মানে, বাক্সের খোপে চোখ রাখা, ঝিনুক, জন্তু-জানোয়ারের হাড় এবং খনিজ পদার্থের নমুনা দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু এই খেয়ালিপনা দেখে হাসিও পায়। আমার প্রজন্মের বইপ্রেমিকরা ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়ার নাম শুনলে প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। আমাদের মধ্যে অর্ধশতাব্দীর ফারাক আছে, আমরা নিজেদের বেশি পশ্চিমী, বেশি আধুনিক মনে করি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়া কথাটা উচ্চারণ করতে আমাদের ঠোঁট বেঁকে যায়। একটি ব্যক্তি, যিনি ভেবেছিলেন যে, ইউরোপে শয়ে শয়ে বছর লেগে গেছে যে চেহারাটা আনতে, তা তিনি তাঁর এলোমেলো কাজের ধারায় এক ধাক্কায় এনে ফেলবেন, তাঁর এই নিরীহ আশাবাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিও ছিল। কিন্তু এই মৃদু প্রশ্রয়ের পেছনে আমাদের একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার ছিল যে আমরা পেয়েছি এমন একটা বই যা আধুনিকতা ও অটোমান সংস্কৃতির মাঝখানের ইস্তাম্বুল থেকে পাওয়া, যা নৈরাজ্য-উদ্ভূত অদ্ভুত পরিস্থিতির শ্রেণী বিভাজন অথবা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অস্বীকার করে। বিশেষ করে এমন একটা বই যা বারোটি বিশাল ভল্যুমে বিন্যস্ত এবং বর্তমানে সব কটিই ছাপা নেই।

মাঝে মাঝেই কারো না কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যে সবকটি ভল্যুমই পড়েছে। আমার একজন শিল্পকলার ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক বন্ধু, যে ইস্তাম্বুলের ভেঙে ফেলা সুফি ঠেকগুলোর ব্যাপারে গবেষণা করছে, আরেকজন বন্ধু, যে ইস্তাম্বুলের অল্প পরিচিতি সাধারণ স্নানাগারগুলোর ব্যাপার জানতে আগ্রহী... আমরা সবজান্তা হাসি বিনিময় করার পর পরস্পরের নোটগুলোর তুলনামূলক বিচার করার জন্য আগ্রহী হই। মুখে হাসি নিয়ে আমি আমার গবেষক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি, সে কি পড়েছে যে, পুরোনো স্নানাগারগুলোর পুরুষদের দিকটায় দরজার সামনে কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাবাড়িওয়ালা বসে থাকত, যারা ফুটো-ফাটা জুতো এবং সেলাই করা কাপড়চোপড় ধুত? আমার বন্ধু আবার আমাকে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়; একই ভল্যুমে 'ইয়ুব সুলতান তুর্বে প্লামস' নামের লেখাটায় এক ধরনের ইস্তাম্বুল প্লামকে 'তুর্বে' বলা হত, এটার কোনো ব্যাখা আছে কি? এবং নাবিক ফরহাদ কে? (উত্তর : একজন সাহসী নাবিক, যে ১৯৫৮ সালের এক গ্রীষ্মের দিনে সতেরো বছর বয়েসের এক যুবককে বাঁচায়, যে একটা দ্বীপের ফেরি নৌকো থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিল।) তারপরে আমরা আলোচনা শুরু করি আর্নাভুদ কাফের নামে বিইয়গলু-র একটা গুণ্ডার সম্বন্ধে, যে ১৯৬১ সালে তার নাস্তিক প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহরক্ষককে খুন করেছিল (যেমনটি 'দোলাপদেরে মার্ডার' রচনাটিতে বর্ণিত আছে), অথবা 'ডোমিনো খেলোয়াড়দের কফি হাউস' সম্বন্ধে, যেখানে এই খেলায় উৎসাহীরা, বেশির ভাগ শহরের গ্রিক, ইহুদি এবং আর্মেনিয়ান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক খেলার জন্য জড়ো হত। এই আলোচনা শেষ পর্যন্ত আমার পরিবারের দিকে এসে যেত, কারণ নিশান্তাসি-তে আমরাও ডোমিনো খেলতাম। আমি যখন নিশান্তাসি ও বিইয়গলুর পুরোনো খেলনা, তামাক এবং অন্যান্য জিনিসের দোকানগুলোর কথা বলতে থাকি, যেখানে ডোমিনো খেলার সেট বিক্রি হত, তখন আমরা ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থনে হারিয়ে যাই। অথবা আমি 'আন্ডারপ্যান্টস ম্যান' রচনাটি সম্বন্ধে বলতে থাকি (এই রচনায় সুন্দরভাবে ছুন্নৎ করা 'সংগ্রহকারী' সম্বন্ধে বর্ণনা আছে, যে তার পাঁচ মেয়েকে নিয়ে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াত আর আনাতোলিয়া থেকে ইস্তাম্বুলে আসা ব্যবসায়ীরা ওদের সবাইকে খুব ভালোবাসত)। অথবা মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য পর্যটকদের প্রিয় ইম্পিরিয়াল হোটেল সম্বন্ধে, অথবা 'শপস' লেখাটি সম্পর্কে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে ইস্তাম্বুলের দোকানগুলোর কেমন করে এবং কী কারণে নাম পরিবর্তন করা হত, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আমি আর আমার বন্ধুরা যখন অনুভব করতাম যে, পুরোনো বিষণ্নতা আমাদের ছেয়ে ফেলেছে, তখন বুঝতে শুরু করতাম যে, ব্যাপারটার ভেতর আরো বেশি কিছু আছে। আসল বিষয়টা হল, ইস্তাম্বুল কেন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভাজন গ্রহণ করেছিল, সেই ব্যাপারে কোকুর ব্যাখ্যা করার ব্যর্থতা। ইস্তাম্বুল যেহেতু এত বিভিন্নতায় ভরা, এত অরাজক, পাশ্চাত্য শহরগুলো থেকেও এত বেশি অদ্ভুত, এটাই কোকুর ব্যর্থতার জন্য আংশিক দায়ী। ইস্তাম্বুলের বিশৃঙ্খল অবস্থা শ্রেণী বিভাজনের পরিপন্থী। কিন্তু এই অন্যদিকটা, যা নিয়ে আমরা অভিযোগ করি, সেটা, আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালানোর পরই, সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় এবং তখনই আমাদের মনে পড়ে যায়, কেন আমরা কোকুর এনসাইক্লোপিডিয়াকে আমাদের সম্পদ বলে মনে করি– কারণ এটা আমাদের মধ্যে এক ধরনের স্বাদেশিকতা বোধ জাগায়।

ইস্তাম্বুলের এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যকে প্রশংসা করা অভ্যাসে পরিণত না করলেও আমরা একথা মানি যে, কোকু ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই তাকে আমরা ভালোবাসি। ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়া কেন সফল হয়নি, তার কারণ– এবং এর জন্য চারজন বিষাদ-বোধাক্রান্ত লেখকেরই পতন হয়েছিল– লেখকের 'পশ্চিমী' হওয়ায় চূড়ান্ত অসামর্থ্য। শহরকে নতুন চোখে দেখার জন্য ওই লেখকদের ঐতিহ্যগত ব্যক্তি পরিচয় থেকে সরে আসা দরকার ছিল। 'পশ্চিমী' হওয়ার জন্য তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝামাঝি একটা আলোছায়ার জগতের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, আর ফিরতে পারেননি। বাকি তিনজন বিষাদবোধাচ্ছন্ন লেখকদের মতোই, কোকুর সবচেয়ে সুন্দর, গভীর বুদ্ধিগত লেখাগুলো হচ্ছে এই দুই জগতের মাঝখানে রয়ে যাওয়া রচনাগুলো এবং (অন্যদের মতোই) তাঁর নিজস্বতার জন্য তাঁকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল, তা হচ্ছে নিঃসঙ্গতা।

কোকুর মৃত্যুর কয়েক বছর পর, মধ্য-সত্তরে, যখনই আমি ছাদঢাকা বাজারে গেছি, তখনই বেয়াজিৎ মসজিদের পাশে সাহাফ্লার পুরোনো বই-এর বাজারে যেতাম আর কোকু, তার শেষ বছরগুলোতে নিজের খরচায় যে শেষ অ-বাঁধাই পর্বগুলো আর ভল্যুমগুলো প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলো হলদে হয়ে যাওয়া, অস্পষ্ট, ছাতা-ধরা, শস্তা পুরোনো বই-এর গাদার মাঝখানে বসে খুঁজে বার করতাম। এই ভল্যুমগুলো যেগুলো আমি আমার দাদীমার লাইব্রেরিতে বসে পড়া শুরু করেছিলাম, বর্তমানে পুরোনো খবরের কাগজের দরে বিক্রি হচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও আমি জানি, বই বিক্রেতারা এগুলোর খদ্দের পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯.

বিজয়, না পতন? কনস্তান্তিনোপলের তুর্কীকরণ

বেশির ভাগ ইস্তাম্বুলের তুর্কীদের মতো ছেলেবেলায় বাইজানটিয়াম সম্বন্ধে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এই শব্দটিকে আমি মেলাতাম ভুতুড়ে, দাড়িওয়ালা, কালো পোশাক-পরা গ্রিক গোঁড়া পুরোহিতদের সঙ্গে, শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা কৃত্রিম জলপ্রণালীগুলোর সঙ্গে, হাঘিয়া সোফিয়ার সঙ্গে, এবং পুরোনো গির্জার লাল ইঁটের দেওয়ালের সঙ্গে। আমার কাছে এটা ছিল এত দূরের কোনো যুগের অবশেষ যে, এর সম্বন্ধে কিছু জানার প্রয়োজনই নেই। যে অটোমানরা বাইজানটিয়ামকে জয় করেছিল, তারাই কতদূরের মনে হত। যে 'নতুন সভ্যতা' এর জায়গা দখল করেছিল, আমার মতো লোকেরা তারই প্রথম প্রজন্ম। রেসাত এক্রেম কোকু অটোমানদের যতই বিদেশি বলে ভাবুন না কেন তাদের নামগুলো অন্তত আমাদের পরিচিত। আর বাইজানটাইনরা বিজিত হবার পর পরই প্রায় বাতাসে মিলিয়ে গেল, অন্তত আমাকে সেই বিশ্বাসই করানো হয়েছিল। কেউ আমাকে বলেনি যে, তাদের নাতির নাতির নাতিরাই বর্তমানে বিইয়গলুতে জুতোর দোকান, কেক প্যাস্ট্রির দোকান এবং চুলের ফিতে, কাঁটা ইত্যাদির দোকানগুলো চালায়।

আমার ছেলেবেলার একটা বড় আনন্দই ছিল মায়ের সঙ্গে বিইয়গলুতে গিয়ে সেখানকার গ্রিক দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়ানো। দোকানগুলো ছিল পারিবারিক ব্যবসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন আমরা পর্দার কাপড়ের দোকানে যেতাম আর মা পর্দার জন্য দামাস্ক কাপড় দেখতে চাইতেন বা কুশনের ঢাকনার জন্য ভেলভেট দেখতে চাইতেন, তখন ভেতর থেকে মা, বাবা, মেয়েদের দ্রুত বলা গ্রিক ভাষার কথাবার্তা আমাদের কানে আসত। পরে বাড়িতে ফিরে আমি ওদের এই বিদেশি ভাষা এবং দোকানের কাউন্টারে বসা মেয়ের, তার বাবা-মার সঙ্গে উত্তেজনার ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলা, এই সব নকল করে দেখাতাম। আমার এই নকল করায় বাড়ির লোকেদের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারতাম যে, শহরের গরিবদের এবং বস্তির অধিবাসীদের মতো গ্রিকেরাও তেমন সম্মানার্হ নয়। আমি ভাবতাম যে, বিজয়ী মহম্মদ যে শহরটাকে ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, সেই ঘটনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। আমার জন্মের এক বছর পরে ১৯৫৩ সালে ইস্তাম্বুল বিজয়ের ৫০০তম বার্ষিকী বা 'মহান অলৌকিক ঘটনা' উদযাপিত হয়, কিন্তু আমার কাছে এই অলৌকিকত্ব মোটেই আকর্ষণীয় মনে হয়নি, কেবলমাত্র এই উপলক্ষ্যে যে টিকিটগুলো ছাপা হয়েছিল, সেগুলো ছাড়া। একটা টিকিটে দেখানো হয়েছিল জাহাজগুলো রাত্রির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে, আরেকটা টিকিটে বেলিনির আঁকা বিজয়ী মহম্মদের ছবি ছাপা হয়েছিল, আর তৃতীয় একটায় রুমেলিহিসারির স্তম্ভগুলো দেখানো হয়েছিল। কাজেই একথা বলা যায় যে, টিকিটগুলো মোটামুটি বিজয়ের সঙ্গে সম্বন্ধিত পবিত্র চেহারাগুলোর মিছিল।

লোকে কীরকমভাবে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্ণনা করে, সেটা দেখেই বলে দেওয়া যায়, তুমি প্রাচ্যে দাঁড়িয়ে আছ, না পাশ্চাত্যে। পশ্চিমীদের কথায়,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯শে মে, ১৪৫৩ হচ্ছে কনস্তান্তিনোপলের পতনের তারিখ; আবার প্রাচ্যের লোকদের কথায়, এই তারিখটা হচ্ছে ইস্তাম্বুল বিজয়ের তারিখ। অনেক বছর পরে আমার স্ত্রী যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত, ও একটা পরীক্ষায় 'বিজয়' শব্দটা ব্যবহার করেছিল, তাতে ওর আমেরিকান অধ্যাপক ওকে 'জাতীয়তাবাদ' করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। আসলে ও শব্দটা ব্যবহার করেছিল কারণ তুর্কী স্কুলের ছাত্রী হিসেবে ওকে এটাই শেখানো হয়েছিল; কারণ ওর মা ছিলেন রাশিয়ান বংশোদ্ভুত, তাই বলা যেতে পারে যে, ওর সহানুভূতি গোঁড়া ক্রিশ্চানদের প্রতি ছিল। অথবা ও এটাকে 'পতন' বা 'বিজয়' কোনোভাবেই দেখেনি, নিজেকে দুটো জগতের মাঝখানে, যেখানে মুসলিম বা ক্রিশ্চান হওয়া ছাড়া উপায় নেই, একজন হতভাগ্য প্রতিভূ হিসাবে অনুভব করেছিল।

পশ্চিমীকরণ এবং তুর্কী জাতীয়তাবাদই ইস্তাম্বুলকে 'বিজয়' উদযাপন শুরু করতে প্রণোদিত করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শহরের লোকসংখ্যার অর্ধেক ছিল মুসলিম এবং অ-মুসলিম অধিবাসীদের বেশির ভাগই ছিল বাইজান্টাইন গ্রিকদের বংশধর। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন শহরের অধিকাংশ বলিয়ে-কইয়ে জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য ছিল যে, যদি কেউ 'কনস্তান্তিনোপল' কথাটা উচ্চারণ করে তাহলে সে হবে একজন অবাঞ্ছিত বিদেশি, যার অবাস্তব স্বপ্ন এই যে, যে গ্রিকরা এই শহরের প্রথম প্রভু ছিল, তারা আবার ফিরে এসে বর্তমানে পাঁচশ বছর ধরে এই শহরকে অধিকারে রেখেছে যে তুর্কীরা, তাদের তাড়িয়ে দেবে অথবা কমপক্ষে, আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রাখবে। এই জাতীয়তাবাদীরাই 'বিজয়' শব্দটির ওপর জোর দিয়েছিল। অথচ অনেক অটোমানই তাদের শহরকে কনস্তান্তিনোপল বলে সন্তুষ্ট থাকত।

এমনকি আমার সময়েও, যে তুর্কীরা পশ্চিমীকৃত প্রজাতন্ত্রের ধারণার প্রতি দায়বদ্ধ ছিল, তারাও এই 'বিজয়' ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাতামাতি করত না। রাষ্ট্রপতি সেলাল বায়ার, বা প্রধানমন্ত্রী আদনান মেণ্ডেরেস, দুজনের কেউই ১৯৫৩ সালের ৫০০তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি; যদিও দীর্ঘদিন ধরে এটা করার পরিকল্পনা চলছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঠিক হয় যে, এটা করলে গ্রিকরা এবং তুরস্কের পশ্চিমী মিত্ররা ক্ষুব্ধ হতে পারে। সবে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে এবং তুরস্ক, ন্যাটোর সভ্য বলে পৃথিবীকে নিজেদের বিজয় সম্বন্ধে মনে করিয়ে দিতে চায় না। যাহোক, তিনবছর পরে কিন্তু তুরস্ক সরকারই ইচ্ছাকৃতভাবে একটা 'যুদ্ধজয়ের জ্বর'-এর উস্কানি দিয়ে জনতাকে দিয়ে সাড়া শহরে গ্রিকদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, দোকানপাট, সম্পত্তি ইত্যাদি লুটপাট, ভাঙচুর করিয়েছিল। এই দাঙ্গাতে বেশ কিছু গির্জা ধ্বংস করা হয়েছিল আর অনেক যাজক-পুরোহিতকে মেরে ফেলা হয়েছিল এবং তাই পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকরা কনস্তান্তিনোপলের 'পতন' সম্পর্কে লেখার সময় প্রচুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্ঠুরতার কথা বর্ণনা করেছেন। তুরস্কের এবং গ্রিসের রাজ্যগুলো তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বিশ্ব রাজনীতির পণবন্দীদের মতো ব্যবহার করার অপরাধে অপরাধী এবং তাই, ১৪৫৩ সালের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের চাইতে গত পঞ্চাশ বছরে অনেক বেশি গ্রিক ইস্তাম্বুল ছেড়ে চলে গেছে।

১৯৫৫ সালে ব্রিটিশরা সাইপ্রাস ছেড়ে চলে যায় এবং গ্রিস যখন পুরো দ্বীপটা অধিকার করার জন্য তৈরি হচ্ছিল, তখন তুরস্কের সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট গ্রিক শহর সালোনিকার যে বাড়িতে আতাতুর্কের জন্ম হয়, সেই বাড়িতে একটা বোমা ছুড়েছিল। এরপর ইস্তাম্বুলের খবরের কাগজগুলো যখন বিশেষ সংস্করণ বার করে ঘটনাটা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে, তখন শহরের অ-মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন জনতা টাকসিম স্কোয়ারে জড় হয় এবং আমি আর আমার মা বিইয়গলুতে যে সমস্ত দোকানে যেতাম,সেগুলো লুটপাট করে, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে এবং তারপর বাকি রাত তারা শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও সেই একই তাণ্ডব চালায়।

দাঙ্গাবাজরা ছিল প্রচণ্ড উন্মত্ত ও হিংস্র এবং তারা ওর্টাকয়, বালিক্লি, সমত্যা এবং ফেনের অঞ্চলগুলোতে সবচেয়ে ভয়াবহ তাণ্ডব চালায়। এইসব জায়গায় গ্রিকরা ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। দাঙ্গাবাজরা শুধু গ্রিকদের ছোট ছোট মুদি দোকানগুলো, দুধের দোকানগুলো ভাঙচুর করে, পুড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা সব বাড়ি বাড়ি ঢুকে গ্রিক ও আর্মেনিয়ান মেয়েদের ধর্ষণ করে। কাজেই এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বিজয়ী মহম্মদের হাতে শহরের পতনের পর তার নিষ্ঠুর নির্দয় সৈন্যরা যেমন শহরটাকে ধ্বংস করেছিল, তেমনই নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে দাঙ্গাবাজরাও শহরটাকে ধ্বংস করেছিল। পরে জানা যায় যে, যারা এই দাঙ্গার সংগঠক, যে দাঙ্গা দু'দিন ধরে গোটা শহরটাকে জঘন্যতম প্রাচ্য দুস্বপ্নের চাইতেও অনেক বেশি নারকীয় করে তুলেছিল, তাদের পেছনে ছিল সরকারি সমর্থন এবং রাষ্ট্রের আশীর্বাদ নিয়েই এরা শহরটাকে লুন্ঠন করেছিল।

সেই রাতে, যে কোনো অ-মুসলিম যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সাহস দেখিয়ে থাকে, তাহলে সে জনতার হাতে খুন হবার ঝুঁকি নিয়েছে; কারণ পরদিন সকালে দেখা গেল, বিইয়গলুর দোকানগুলো সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত, জানালাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে, দরজাগুলো লাথি মেরে ভেঙে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, পণ্যসামগ্রী হয় লুণ্ঠিত, না হয় জয়োল্লাসে ভেঙে-চুরে ধ্বংস করা হয়েছে। চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে, কাপড় চোপড়, কার্পেট, কাপড়ের গাঁট, উল্টোনো রেফ্রিজারেটর, রেডিও, ওয়াশিং মেশিন; রাস্তায় ডাঁই হয়ে পড়ে আছে ভাঙা পোর্সিলিনের সেট, খেলনা (সেরা খেলনার দোকানগুলো বিইয়গলুতেই ছিল), রান্নাঘরের বাসন-কোসন, অ্যাকোয়ারিয়াম আর ঝাড়বাতির টুকরো, যেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সময়ে খুব চালু ছিল। এখানে সেখানে ভাঙা বাইসাইকেল, উল্টোনো পুড়িয়ে দেওয়া মোটর গাড়ি, ভেঙে টুকরো টুকরো করা পিয়ানো, দোকানের পোশাক-পরানোর মুর্তিগুলো ভাঙা, আকাশের দিকে চোখ তুলে পড়ে আছে কাপড়-ঢাকা রাস্তায় আর এসবের মাঝে রয়েছে ট্যাঙ্কগুলো, যেগুলো দাঙ্গা থামানোর জন্য এসেছিল অনেক দেরি করে।

AMARBOI.COM

যেহেতু আমাদের পরিবারে দাঙ্গার পরে অনেক বছর ধরে দাঙ্গার নানান গল্প বলা হত, তাই এর খুঁটিনাটি বিশদগুলো আমার মনে এমন স্পষ্টভাবে গাঁথা হয়ে গেছে যেন আমি নিজের চোখেই এই দাঙ্গা দেখেছি। যখন ক্রিশ্চান পরিবারগুলো তাদের দোকান এবং বাড়িগুলো পরিষ্কার করছিল, আমার পরিবার তখন মনে করছিল, কেমনভাবে আমার চাচাজী ও দাদীমা এক জানালা থেকে আরেক জানালায় দৌড়াদৌড়ি করছিলেন এবং ভয়ার্ত চোখে দেখছিলেন, ক্রুদ্ধ জনতা নিচে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, দোকানের জানালার কাচ ভাঙছে আর গ্রিক, ক্রিশ্চান ও ধনীদের বিরুদ্ধে চ্যাচাচ্ছে ও গালিগালাজ দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই বেশ কিছু লোক আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে জড়ো হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল কি, আমার দাদার সেই সময় আলাদিনের দোকানে সবে বিক্রি শুরু হওয়া ছোট ছোট টার্কিশ পতাকার প্রতি খুব ঝোঁক হয়েছিল, বোধহয় এই ভেবে যে, তখন দেশ জুড়ে বয়ে যাওয়া জাতীয়তাবাদী মানসিকতার সুবিধা নিতে পারবে; তাই দাদা একটা পতাকা আমার চাচাজীর ডজ্‌ গাড়িতে লাগিয়ে দিয়েছিল এবং আমাদের মনে হয়, সে জন্যই ক্রুদ্ধ জনতা গাড়িটা না উল্টে না ভেঙে, এমন কি জানালাগুলোতেও হাত না দিয়ে চলে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০.
ধর্ম

আমার দশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত, ঈশ্বরের চেহারা সম্বন্ধে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, সাদা স্কার্ফ জড়ানো একজন সম্মানীয় মহিলার মতো চেহারা ছিল আমার ঈশ্বরের। যদিও তার সঙ্গে মানুষের অবয়বের মিল ছিল, কিন্তু আমার স্বপ্নে দেখা দানবগুলোর সঙ্গেই যেন তার বেশি মিল; রাস্তাঘাটে দেখা পাওয়া যাবে, এ রকম কেউ মোটেই নয়। (তুর্কী ভাষায় সে বা তিনি (পুরুষ), সে বা তিনি (স্ত্রী), সে (ইহা), এই তিনটির জন্যই একটি শব্দ আছে, সেটা হচ্ছে 'ও') কারণ যখন তিনি আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হন, তাঁর মাথা নিচে, পা ওপরে আর এক পাশে একটু হেলে পড়া। আমার কল্পনার জগতের দৈত্যগুলোর দিকে যেই তাকাতাম, অমনি ওরা মিলিয়ে যেত, কিন্তু তিনিও একইভাবে মিলিয়ে যেতেন। তারপর আবার ফিল্মে বা টিভিতে যেমন দেখায়, তেমনি চারপাশের পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখার পর তাঁর অবয়বটা স্পষ্ট হত এবং তিনি তখন ওপর দিকে উঠে যেতেন এবং তাঁর আসল জায়গায় মেঘের মধ্যে গিয়ে আবার অস্পষ্ট হয়ে যেতেন। তাঁর মাথা-ঢাকা স্কার্ফটার ভাঁজগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতাম, যেমনটি দেখতাম মূর্তির মাথায় বা ইতিহাস বইয়ের ছবিগুলোয়। স্কার্ফটা তাঁর পুরো শরীরটা ঢেকে থাকত, তাই তাঁর হাত বা পা দেখা যেত না। যখনই এই ছায়া মূর্তিটা আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হত, আমি একটা শক্তিশালী, মহিমান্বিত, উচ্চ উপস্থিতি টের পেতাম, কিন্তু আশ্চর্য, কোনো ভয় পেতাম না। আমার মনে পড়ে না, আমি কখনো তাঁর কাছে সাহায্য বা নির্দেশ চেয়েছি কিনা। আমার মনে হত, তিনি আমার মতো লোকেদের প্রতি আগ্রহী নন; তিনি কেবলমাত্র গরিবদের জন্যেই ভাবেন।

আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে শুধু কাজের মেয়েলোকেরা আর রাঁধুনিরা ছাড়া আমার এই মূর্তি দেখার ব্যাপারে কারো কোনো আগ্রহ ছিল না। যদিও আমি অস্পষ্টভাবে জানতাম যে,-অন্তত কথায়, ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের ছাদের নিচের সমস্ত লোকেদের জন্যেই আছে, তবুও আমি এটাও জানতাম যে, আমাদের মতো লোকেরা ভাগ্যবান যে, এই ভালোবাসা তাদের না পেলেও চলে। যারা যন্ত্রণাকাতর, ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেন, যারা এত গরিব যে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের ঈশ্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবোধ দেন, রাস্তার ভিখারিরা, যারা সর্বদাই তাঁকে ডাকছে, তাদের সাহায্য করেন এবং সৎ, অভাগা মানুষদের বিপদের সময় সাহায্য করেন। এই জন্যই, আমার মা যখন কোনো প্রবল তুষার ঝড়ের কথা শুনতেন, যার তাণ্ডবে দূর দূরান্তের গ্রামগুলোতে যাওয়া-আসার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি হারানো গরিবদের খবর শুনতেন, তখন তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর ওদের সাহায্য করুন!' এটা ঠিক ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য কোনো দরবার করা নয়, এটা আমাদের মতো স্বচ্ছল ঘরের লোকেদের এই রকম বিপর্যয়ের সময়ে অনুভব করা অপরাধ-বোধের প্রকাশ; আমরা যে ওদের সাহায্য করার জন্য কিছুই করছি না, মনের ভেতরকার সেই শূন্যতার থেকে বেরিয়ে আসতে এটা সাহায্য করত।

যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে, ধবধবে সাদা স্কার্ফের তলায় তার ঔজ্জ্বল্য লুকানো নরম বয়স্ক উপস্থিতি, আমাদের কথা শুনবেন না। আমরা তো তাঁর জন্যে কিছুই করিনি। অথচ আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের রাঁধুনি, কাজের মেয়েরা এবং আমাদের চারপাশের অন্যান্য লোকজন, যারা প্রচুর পরিশ্রম করে, তারা যে কোনো সুযোগেই ঈশ্বরকে ডাকে। এমনকি তারা প্রতিবছর একটা গোটা মাস উপবাস করে। যখনই আমাদের পরিবেশন করার কাজ আর থাকে না, তখনই আমাদের এসমা হানিম ওর ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে আসনটা পেতে প্রার্থনা করতে শুরু করে। যখনই ও খুশি, দুঃখী, আনন্দিত, ভীত বা ক্রুদ্ধ হত, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ করত। যখনই ও দরজা খুলত বা বন্ধ করত, যখনই ও কোনো কাজ প্রথমবার অথবা শেষবারের মতো করত, ও ঈশ্বরের নাম নিত, তারপর বিড়বিড় করে আরো কি যেন সব বলত।

গরিব মানুষদের সঙ্গে ঈশ্বরের যে রহস্যময় যোগসূত্র, সেটা সম্বন্ধে আমরা যখন সচেতন হতাম, সেই সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে ঈশ্বর আমাদের খামোখা কষ্ট দিতেন না। এটা জেনে আমরা নিশ্চিন্ত হতাম যে, গরিবেরা অন্য কারো ওপর সাহায্যের বা রক্ষা পাবার জন্য নির্ভর করে, যে অন্য আর একটা 'শক্তি' আছে, যে তাদের 'বোঝা বহন' করে। কিন্তু আমাদের এই স্বস্তির চিন্তা কখনো কখনো ভয়ে পরিণত হত, এই ভেবে যে, গরিবেরা ঈশ্বরের সাথে তাদের যে বিশেষ সম্বন্ধ, সেটা কোনোদিন হয়তো আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।

আমার মনে পড়ে, কখনো কখনো আমি অস্বস্তি বোধ করতাম, যখন কৌতূহল ভরে আমি আমাদের বয়স্কা পরিচারিকাকে প্রার্থনা করতে দেখতাম। আধ-খোলা দরজা দিয়ে দেখে মনে হত, আমাদের এসমা হানিম যেন আমার কল্পনার ঈশ্বরের মতোই দেখতে। ওর প্রার্থনার আসনের ওপর একটু পাশ ফিরে বসে, ও আস্তে আস্তে নিচু হয়ে ওর কপালটা ওর আসনে ছোঁয়াত; ও উঠে দাঁড়াত, আবার নিচু হত আর এখন, যখন সে সম্পূর্ণ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন ও ভিক্ষা করছে, পৃথিবীতে তার এই নিম্নতম জায়গা মেনে নিয়েছে; কিছু বুঝতাম না, তবু উদ্বিগ্ন হতাম, একটু রাগও হত। যখন ওর কোনো কাজ থাকত না, বা বাড়িতে আর কেউ থাকত না, তখনই কেবল ও প্রার্থনা করত এবং তখনকার নীরবতা, মাঝে মাঝে ওর ফিসফিস করে প্রার্থনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাগুলো উচ্চারণ করা, আমাকে নার্ভাস করে দিত। জানালায় হাঁটতে থাকা একটা মাছির ওপর আমার দৃষ্টি পড়ত। মাছিটা পড়ে যেত, তারপর ওর অর্ধস্বচ্ছ পাখাগুলোয় গুনগুন শব্দ তুলে সোজা হত, আর ওই মাছির পাখার শব্দ এস্‌মা হানিমের প্রার্থনা ও বিড়বিড়ানির সঙ্গে মিশে যেত এবং হঠাৎই, আমি যখন আর সহ্য করতে পারতাম না, তখন ওই বেচারার স্কার্ফ ধরে টান দিতাম।

আমার আগের অভিজ্ঞতা ছিল যে, ওর প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটালে ও উদভ্রান্ত হয়ে পড়বে। বেচারি বুড়ি ওর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আমার ব্যাঘাত অগ্রাহ্য করে প্রার্থনা শেষ করতে চাইত, আর আমার মনে হত ও যা করছে, সেটা মেকি, যেন

এটা একটা খেলা, (কারণ এখন ও কেবল প্রার্থনার ভান করছে।) কিন্তু তবুও ওর এই প্রার্থনায় ডুবে যাওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প আর এটাকে একটা পরীক্ষা হিসাবে নেওয়া, এটা আমার মনের ওপর ছাপ ফেলত। এই বুড়ি আমাকে দারুণ ভালোবাসত, আমাকে কোলে নিয়ে বেড়াত আর রাস্তার কোনো লোক আমাকে আদর করলে বলত, 'আমার নাতি' এবং তাই ওর আর আমার মধ্যে ঈশ্বর এসে গেলে আমার অস্বস্তি হত, যেমন কিনা গোঁড়া ধার্মিক লোকেদের ভক্তি দেখলে আমার পরিবারের লোকেদের হয়। আমার ভয়, যেটা আমি তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ মধ্যবিত্ত লোকেদের সঙ্গে একইভাবে অনুভব করতাম, তা কিন্তু ঈশ্বরের ভয় ছিল না, তা ছিল যারা ঈশ্বরে অতিরিক্ত বিশ্বাসী, তাদের ক্রোধোন্মত্ততার ভয়।

কখনো কখনো এস্‌মা হানিম প্রার্থনা করাকালীন, ফোন বাজলে, বা মা ডাকলে, আমি সোজা মার কাছে গিয়ে বলতাম যে ও প্রার্থনায় বসেছে। কখনো আমি এটা ভালো ভেবেই করতাম, আবার কখনো সেই অদ্ভুত অস্বস্তি, সেই ঈর্ষ্যা, সেই গণ্ডগোল পাকানোর ইচ্ছা থেকেই করতাম, কী হয় দেখবার জন্য। ইচ্ছা হত জানতে যে, কে বেশি শক্তিশালী। এস্‌মার আমাদের প্রতি আনুগত্য, না, ঈশ্বরের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুগত্য? আমার ভেতরের একটা অংশ, যে অন্য জগতে এস্‌মা প্রার্থনা করতে চলে যেত, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইত। এস্‌মা কখনো কখনো ওই অন্যজগৎ থেকে ফিরে এসে রাগ দেখাত, ভয় দেখাত।

'আমি যখন প্রার্থনা করছি, তখন যদি আমার স্কার্ফ ধরে টানো, তাহলে তোমার হাত দুটো পাথর হয়ে যাবে।' তা সত্ত্বেও আমি ওর স্কার্ফ ধরে টানতাম, কিছুই হত না। কিন্তু যেমন আমার বড়রা, মুখে বলতেন যে, আমরা এসব বাজে জিনিস বিশ্বাস করি না, অথচ খুব সাবধানে থাকতেন, কারণ যদি ভবিষ্যতে কিছু হয়ে যায়, সেই রকম আমিও জানতাম যে, খানিকটা পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করে ওকে বিরক্ত করতে সাহস করতাম না, এবারে না হয় পাথর হয়ে যাইনি... আমার বিচক্ষণ পরিবারের অন্যান্য সকলের মতো আমিও শিখেছিলাম যে, ধর্মকে অবজ্ঞা করলে, বা ধর্মে নিজের অবিশ্বাসকে প্রকাশ করলে, সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ান্তরে চলে যেতে হয়, যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে। আমরা ঈশ্বর বিশ্বাস এবং দারিদ্র্যকে একই পর্যায়ের বলে ভাবতাম, অবশ্য প্রকাশ্যে জোরে জোরে বলতাম না।

আমার মনে হত, ওরা গরিব বলেই সব সময় ঈশ্বরের নাম করে। যে ধার্মিক ব্যক্তি দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করেন, তাকে আমার পরিবারের লোকেরা যে অবিশ্বাস আর বিদ্রূপের চোখে দেখতেন, সেটা লক্ষ করেই হয়তো আমি আমার এই ভ্রান্ত ধারণায় পৌঁছেছি, এটা সম্পূর্ণ সম্ভব।

একটা সাদা স্কার্ফ জড়ানো নারীর মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল আর ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা একটা ভয়ের ও সাবধানতার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, এটার আংশিক কারণ এই যে, আমার পরিবারের কেউই আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। হতে পারে, আমাকে শেখানোর মতো কিছুই তাদের কাছে ছিল না; আমার পরিবারের কাউকে কখনো প্রার্থনার আসনে বসে মাথা নিচু করতে অথবা উপবাস করতে, কিংবা বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতে দেখিনি। এইভাবে দেখলে বলা যায় যে, আমাদের মতো পরিবারগুলো ইউরোপের ঈশ্বর-চিন্তাহীন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর মতো, যাদের শেষ বাধাটুকু ভাঙবার সাহস নেই।

মনে হতে পারে, এটা একটা আদর্শহীন বিশ্ব নিন্দুকতা, কিন্তু আতাতুর্ক-এর নতুন প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতার উন্মাদনায় ধর্ম থেকে সরে আসার অর্থ হল, আধুনিক ও পশ্চিমী হওয়া। এটা একটা দৃষ্টিকটু আত্মতুষ্টি, যার মধ্যে মাঝে মাঝেই আদর্শবাদের আগুন ঝলসে ওঠে। কিন্তু সেটা সাধারণে দেখাবার জন্য; ব্যক্তিগত জীবনে আধ্যাত্মিক শূন্যতাকে পূরণ করবার মতো কিছুই ছিল না। ধর্মকে ছেঁটে ফেলে দেওয়ার ফলে বাড়িগুলো, শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত 'ইয়ালি'-গুলোর মতো শূন্য হয়ে গিয়েছিল, এবং চারপাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন বাগানগুলোর মতো বিষণ্ন ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং আমাদের বাড়িতে এই শূন্যতা পূরণ করত আমাদের পরিচারিকারা (এবং আমার কৌতূহল চরিতার্থ করত– যদি ঈশ্বরের কোনো দরকারই না থাকে, তাহলে এত এত মসজিদ তৈরি হয়েছিল কেন?)। কুসংস্কারের বোকামি দেখা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন ছিল না। ('এটা ছুঁয়োনা, ছুঁলেই তুমি পাথর হয়ে যাবে', আমাদের পরিচারিকা বলতো। 'ওর জিভ বেঁধে দেওয়া হয়েছে।' 'দেবদূত এসে ওকে স্বর্গে নিয়ে গেছে।' 'কখনোই বাঁ পা প্রথমে ফেলো না।') পীরবাবার মাজারে যত কাপড়ের টুকরো বাঁধা, সিহাঙ্গির-এ সফু বাবার জন্য মোমবাতি জ্বালানো, পরিচারিকাদের তৈরি করা 'বুড়ি গিন্নীর ওষুধ', কারণ ডাক্তারের কাছে কেউ নিয়ে যাবে না, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দরবেশদের হুকুমের উত্তরাধিকার, যা আমাদের প্রজাতন্ত্রের ইউরোপীয়ান বাড়িগুলোর মধ্যেও প্রবাদবাক্য, চলিত কথা, হুঁশিয়ারি এবং উপদেশ হিসাবে ঢুকে পড়েছে; এগুলো অর্থহীন বাজে জিনিস হতে পারে, কিন্তু এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের ছাপ রেখে গেছে। এখনো একটা বড় মাঠে বা অলিন্দে বা ফুটপাথে হাঁটার সময় আমার হঠাৎ মনে পড়ে যে, রাস্তার দুটো পাথরের মাঝখানের ফাঁকের ওপর পা ফেলা উচিত নয় কিংবা কালো পাথরের ওপর, আর সঙ্গে সঙ্গে অচেতনভাবে আমার পা হাঁটার বদলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে।

এই সমস্ত ধার্মিক অনুশাসনের অনেকগুলো আমার মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়, তার কারণ আমার মায়ের অনুশাসন (যেমন 'আঙুল দেখিও না')। অথবা মা যখন বলতেন যে, জানালা খুলো না বা দরজা খুলো না কারণ তাহলে হাওয়া ঢুকবে আর আমি কল্পনা করতাম যে হাওয়া মানে সফু বাবার মতো কোনো সাধু পুরুষ যার আত্মাকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

কাজেই এগুলোকে ঈশ্বরের একটা নিয়মশৃঙ্খলা হিসাবে না দেখে অর্থাৎ ধর্মপ্রবর্ত্তক, বই বা নিয়মনীতি যার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, তা না করে আমরা ধর্মকে একটা অদ্ভুত, কখনো বা হাস্যকর কতকগুলো রীতিনীতির মধ্যে নামিয়ে এনেছি, যার ওপর নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নির্ভর করে; ধর্মের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আমরা একে ঘরের মধ্যে এনে ফেলেছি একটা অদ্ভুত পশ্চাৎপটের সঙ্গীত হিসেবে যার সঙ্গে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মাঝখানে দোল খাচ্ছি। আমার দাদীমা, মা, বাবা, আমার চাচা-চাচীরা– কেউই কখনো একদিনের জন্যও উপবাস করেননি, কিন্তু রমজানের মাসে তাঁরা সূর্যাস্তের জন্য তেমনই ক্ষুৎপীড়িত হয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন, যেমনটি যারা উপবাস করেছে, তারা করে। শীতকালে, যখন তাড়াতাড়ি রাত্রি নেমে আসত, আর আমার দাদীমা তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে বেজিক বা পোকার খেলতেন, তখন উপোস ভাঙাটা অজুহাত করে রীতিমতো ভোজের আয়োজন হত, মানে, উনুন থেকে আসা হরেক রকম রান্না। এছাড়াও ছাড় ছিল; বছরের অন্য কোনো মাসে এই ভোজনবিলাসী বয়স্কা মহিলারা খেলতে খেলতে ক্রমাগত কিছু না কিছু চিবোতেই থাকতেন, কিন্তু রমজানের মাসে, সূর্যাস্ত হবার সময় হতেই এরা খাওয়া বন্ধ করে দিতেন আর লোলুপ চোখে পাশের টেবিলে সাজিয়ে রাখা, সব রকমের জ্যাম,চীজ, অলিভ, বোরেক ও রসুন-এর সসেজ ইত্যাদির দিকে তাকাতেন। যখন রেডিওতে বাঁশির সংগীতে জানিয়ে দেওয়া হত যে, উপবাস ভাঙার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, তখন এঁরা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে টেবিলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে তাকাতেন, যেন তাঁরাও, দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ সাধারণ মুসলিমদের মতো, ভোর বেলা থেকে উপোস করে আছেন। পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আর কতক্ষণ দেরি আছে?' তারপর যখন কামান দাগার আওয়াজ শোনা যেত, তখন তাঁরা রাঁধুনি বেকিরের রান্নাঘরে উপবাস ভঙ্গ করে কিছু খেয়ে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন, তারপর নিজেরাও খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আজও যখনই আমি বাঁশির আওয়াজ শুনি, আমার জিভে জল এসে যায়।

আমি জীবনে প্রথম যখন মসজিদে যাই, তখনই ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে আমার ধারণাগুলো পরিপুষ্ট হয়। একদিন বিকেলবেলা যখন বাড়িতে কেউ ছিল না, তখন হঠাৎই আমাদের পরিচারিকা এস্‌মা হানিম কারো অনুমতি ছাড়াই আমাকে মসজিদে নিয়ে যায়– আসলে ওর নামাজ পড়ার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল তা নয়, ও বাড়িতে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। টেসভিকিয়ে মসজিদে আমরা বিশ তিরিশ জন লোকের ভীড় পেলাম– বেশির ভাগই পেছনের রাস্তার ছোট ছোট দোকানগুলোর মালিক অথবা নিশান্তাসির বড়লোকদের পরিবারের পরিচারিকা, রাঁধুনি এবং দরওয়ান, তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি। ওরা যখন কার্পেটের ওপর বসে আছে, তখন ওদের দেখে নমাজিদের জমায়েত বলে

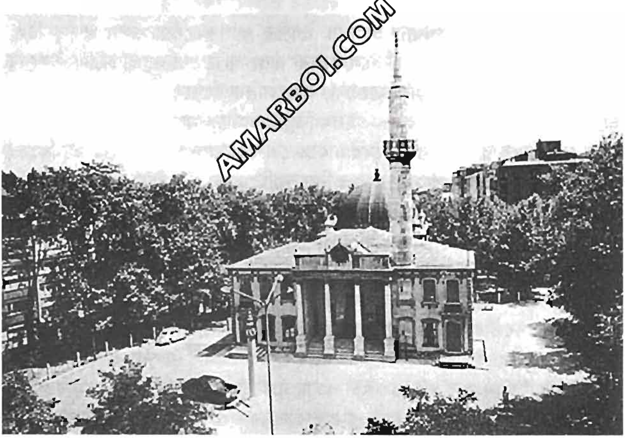

মনেই হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল বন্ধু-বান্ধবের দল বসে বসে গল্পগুজব করছে। ওরা নামাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছিল। নামাজের মধ্যে আমি ওদের মাঝখান দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছি, মসজিদের দূর দূর কোণায় গিয়ে নিজে নিজে খেলা করেছি, ওরা কিন্তু নামাজ থামিয়ে আমাকে বকেনি বরং আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে, যেমন প্রশ্রয়ের মিষ্টি হাসি বড়রা আমাকে দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসত, যখন আমি শিশু ছিলাম। ধর্ম গরিবদের আশ্রয় হতে পারে, কিন্তু এখন আমি বুঝি যে, খবরের কাগজের ব্যঙ্গচিত্র এবং আমাদের প্রজাতন্ত্রী বাড়ির যে ধারণা, তার উল্টো এই ধার্মিক লোকগুলো, এরা অত্যন্ত নিরীহ।

যাই হোক, ওদের প্রতি আমাদের পামুক অ্যাপার্টমেন্টের যে উদ্ধত উপহাস বর্ষিত হত, তার থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে, ওদের সহৃদয় পবিত্রতা কিছু মূল্য দাবি করত। তার ফলে একটা আধুনিক, উন্নতিশীল, পশ্চিমী ধাঁচের তুরস্কের স্বপ্নকে সফল করাটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, বাস্তববাদী, সম্পত্তির মালিক হিসাবে, এই সমস্ত অর্ধশিক্ষিত লোককে শাসন করার অধিকার আমাদের ছিল এবং তাদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে আরো আঁকড়িয়ে ধরাটা নিবারণ করায় আমাদের স্বার্থ ছিল, কারণ ওটা কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হত, তাই নয়, এটার ওপর দেশের ভবিষ্যৎও নির্ভর করত। যদি আমার দাদি দেখতেন যে, বাড়ির একজন বিদ্যুৎ-কর্মী নামাজ পড়তে গেছে তাহলে আমিও বলতে পারতাম যে, দাদিমা তাকে যে সাংঘাতিক বকুনি দিতেন, সেটা কেবলমাত্র ছোট্ট সারাই-এর কাজটা হয়নি বলেই নয়, আসলে ওর নামাজ পড়াটা দেশের প্রচলিত রীতি ও অভ্যাসের পরিপন্থী এবং এর ফলে দেশের উন্নতি বিঘ্নিত হবে।

আতাতুর্কের গোঁড়া শিষ্যরা, যাদের খবরের কাগজগুলোর ওপর প্রভুত্ব ছিল, তাদের কালো-বোরখা-পড়া স্ত্রী লোকদের এবং দাড়িওয়ালা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রার্থনার মালা ঘোরানোর ব্যঙ্গচিত্রগুলো, প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের শহীদ স্মরণে স্কুলে স্কুলে যে অনুষ্ঠানগুলো করা হত– এইসব কিছুই আমাকে মনে করিয়ে দিত যে, এই জাতি-দেশ-সরকার দরিদ্র ধার্মিকদের চাইতে বেশি আমাদের, কারণ ওই ধার্মিকদের ভক্তি তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকেও নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের বাড়ির অঙ্ক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাগলদের সঙ্গে সহমত হয়ে আমি নিজেকে বোঝাতাম যে, আমাদের প্রভুত্ব আমাদের ধন-সম্পদের ওপর নির্ভর করে না, ওটা আমাদের আধুনিক, পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। কাজেই আমি আমাদের মতো ধনী, অথচ আমাদের মতো পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন নয়, এমন পরিবারগুলোকে হীন দৃষ্টিতে দেখতাম। পরবর্তীকালে যখন তুরস্কের গণতন্ত্র কিছুটা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং মফঃস্বলের ধনীরা ইস্তাম্বুলে 'সমাজের' কাছে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য দলে দলে আসতে শুরু করেছে, তখন আর ওই তফাৎটা বজায় রাখা যেত না; ততদিনে আমার বাবার ও চাচার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কু-প্রভাব তাদের ওপর পড়েছে এবং তার ফলে একশ্রেণীর লোক আমাদের ছাপিয়ে যাওয়ার অসম্মান এনে দিয়েছে, যাদের ধর্মনিরপেক্ষতা বা পাশ্চাত্য সংস্কারের প্রতি কোনো রুচি নেই; আলোকপ্রাপ্ত হয়ে যদি আমরা ধনসম্পদ ও সুখ-সুবিধাদি পাবার অধিকার লাভ করি, তাহলে এই ধার্মিক ভুঁইফোড় লোকগুলোর সম্বন্ধে কী ব্যাখ্যা দেব? (সেই সময়ে আমি সুফিতত্ত্ব বা মৌলানা সংস্কৃতি বা মহান পারসিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না।) আমি শুধু জানতাম যে, এই নতুন শ্রেণীর লোকেরা, যাদের বাম রাজনীতির লোকেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধনী চাষি' বলে অভিযোগ করত, আমাদের গাড়ির ড্রাইভার বা বাড়ির রাঁধুনিদের মতো একই দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন ছিল। ইস্তাম্বুলের পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন পয়সাওয়ালা বড়লোকেরা যদি গত চল্লিশ বছরের সামরিক হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে থাকে, রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো আপত্তি না তুলে থাকে, তার কারণ এই নয় যে, তারা বামপন্থী অভ্যুত্থানের ভয় পেয়েছিল (দেশের পড়ে থাকা তুর্কীরা এই রকম করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না); বরং এই বড়লোকেরা মিলিটারিকে সহ্য করত এই ভয়ে যে, একদিন নিচু শ্রেণীর লোকেরা মফঃস্বল থেকে দলে দলে আসা নতুন ধনীদের সঙ্গে এক হয়ে ধর্মের ফতোয়া জারী করে পাশ্চাত্ত্যপন্থী মধ্যবিত্তদের জীবন-যাত্রা প্রণালীকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আমি যদি সামরিক আঘাত এবং রাজনৈতিক ইসলাম-এর ওপর আরো বেশি কিছু বলতে যাই, তাহলে আমার এই বই-এর লুক্কায়িত ভারসাম্য নষ্ট করার ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে।

আমি বুঝি, ধর্মের নির্যাস হল অপরাধ। ছোটবেলায় আমার দিবাস্বপ্নে মাঝে মাঝেই যে সাদা ওড়না ঢাকা মহিয়সী মহিলারা ঢুকে পড়তেন, তাদের সম্বন্ধে বেশি ভীত হতাম না এবং ঈশ্বরেও যথেষ্ট বিশ্বাস করতে পারতাম না বলে নিজেকে অপরাধী মনে হত। আর যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, তাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখতাম বলেও অপরাধী মনে হত। কিন্তু আমি যে কল্পনার জগতে প্রায়ই পালিয়ে যেতাম, সেটাকে নিজের করে নেওয়ার ফলে আমার শিশু মনের সমস্ত জোর প্রয়োগ করে আমি আমার অপরাধবোধকে স্বাগত জানাতাম, নিশ্চিত জানতাম যে, আমার মনের এই অশান্তভাব আমার আত্মাকে গভীর করে তুলবে, আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে ক্ষুরধার করে তুলবে এবং আমার জীবনকে রঙিন করে তুলবে। ইস্তাম্বুলের অন্য বাড়িটায় যে আরেকটা সুখী ওরহান বাস করত– আমার দিবাস্বপ্নে, ধর্ম তাকে কিন্তু অস্থির করে তুলত না। যখন ধর্মীয় অপরাধবোধের চাপে আমি ক্লান্ত বোধ করতাম, আমি তখন ওই অন্য ওরহানকে খুঁজে নিতাম, জানতাম যে, ও এইসব ভাবনায় সময় নষ্ট করবে না, সিনেমা দেখতে চলে যাবে।

অবশ্য, আমার শিশুকালে আমাকে যে একদম ধর্মের নির্দেশের কাছে মাথা নত করতে হয়নি, তা নয়। প্রাথমিক স্কুলের শেষ দিকে, একজন শিক্ষিকা ছিলেন, এখন মনে পড়ে তিনি খুব অপছন্দের মানুষ ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রভূত্বব্যঞ্জক ছিলেন, যদিও সেই সময়ে তাঁকে দেখলেই আমার মন খুশি হয়ে উঠত। যদি তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতেন, আমি স্বর্গীয় আনন্দ পেতাম আর তিনি যদি শুধু একটু ভুরু তুলতেন, তাহলে আমি একেবারে ভেঙে পড়তাম। 'ধর্মের সৌন্দর্য' বর্ণনা করার সময়, সেই বয়স্কা, পাকা চুলের গোমড়া মুখো মহিলা বিশ্বাস, ভয় এবং বিনয় ইত্যাদি বিরক্তিকর প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে ধর্মকে কেবলমাত্র যুক্তিবাদী উপযোগিতা হিসাবে দেখতে চাইতেন। তাঁর মতে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছা শক্তিকে সবল করার জন্যই, উপবাস করাকে জরুরি মনে করেননি, নিজের স্বাস্থ্যকে উন্নত করার জন্যই এটাকে জরুরি মনে করেছিলেন। কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতাব্দী পরেও এখন পাশ্চাত্যে মহিলারা, যারা ধর্মের অন্যান্য সৌন্দর্য সম্বন্ধে শত্রুভাবাপন্ন, তাঁরাও কিন্তু উপবাস করার এই স্বাস্থ্যকর আনন্দ গ্রহণ করেন। প্রার্থনা করলে, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়; জিমনাস্টিকের মতো, এটাও নিজেকে সাবধানী রাখে। আমাদের বর্তমান সময়ে, অসংখ্য জাপানি অফিসে ও কারখানায়, হুইসল বাজলে কাজ বন্ধ করার সংকেত দেওয়া হয়, যখন সকলেই পরবর্তী পাঁচ মিনিট ব্যায়াম করে, যেমন মুসলিমরা প্রার্থনা করার জন্য পাঁচ মিনিটের বিরতি নেয়। তাঁর যুক্তিবাদী ইসলাম, আমার ভেতরে যে ছোট্ট দৃষ্টবাদী বিশ্বাস ও আত্মকৃচ্ছ্রতার গোপন ইচ্ছাকে প্রতিপালন করছিল, তাকে প্রতিপন্ন করেছিল, তাই রমজানের সময় একদিন আমিও উপবাস করব বলে স্থির করলাম।

যদিও আমি এটা আমার শিক্ষকের প্রভাবেই করছিলাম, কিন্তু তাঁকে আমি ব্যাপারটা জানাইনি। কিন্তু যখন আমি মাকে বললাম, দেখলাম যে, মা অবাক হয়ে গেলেও খুশিও হলেন, অবশ্য একটু চিন্তিতও। আমার মা এমন ধাঁচের মানুষ যে তিনি 'যদি প্রয়োজন হয়' এইভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন; তবুও তাঁর মতে উপবাস কেবলমাত্র পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর লোকেরাই করে। আমি আমার বাবাকে বা দাদাকে এসব কথা বলিনি। আমার প্রথম উপবাস করার আগেই আমার এই বিশ্বাস করার ইচ্ছা, একটা গোপন রাখার মতো লজ্জায় পর্যবসিত হয়েছিল। আমার পরিবারের এই স্পর্শকাতর, সন্দিগ্ধ এবং বিদ্রূপকারী শ্রেণী-সচেতনতার সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং আমি জানতাম ওরা আমায় কী বলবেন। তাই আমি কাউকে না জানিয়েই উপবাসটা করেছিলাম, যাতে কেউ আমার পিঠ চাপড়ে না বলতে পারে, 'ভালো করেছিস।' হয়তো আমার মায়ের বলা উচিত ছিল যে, একটা এগারো বছরের বালকের উপবাস করার কোনো প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, তিনি আমার সব প্রিয় খাবারগুলোকে তৈরি রেখেছিলেন,– পাকানো, প্যাঁচালো কেক, অ্যাঙ্কভি টোস্ট– আমার উপবাস শেষ হবার পর খাবো বলে। তাঁর ভেতরের একটা অংশ আমার মতো একটা অল্পবয়েসি বালকের মধে ঈশ্বর-ভীতি দেখে খুশি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মার চোখের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম তাঁর দুশ্চিন্তা যে, এটা হয়তো একটা আত্মহননের প্রবণতা, যা আমাকে একটা ধর্মীয় যন্ত্রণাময় জীবনে ঠেলে দেবে।

কুরবানি পরবের সময় আমাদের পরিবারের ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিচারিতা স্পষ্ট বোঝা যেত। অন্যান্য ধনী মুসলিম পরিবারের মতো, আমরাও একটা ভেড়া কিনতাম আর সেটাকে পামুক অ্যাপার্টমেন্টের পেছন দিকের একটা ছোট বাগানে রাখতাম, তারপর পরবের ছুটির প্রথম দিনে, আমাদের পাড়ার কশাই এসে ওটাকে জবাই করত। আমার তুর্কীভাষার কমিক বইয়ের স্বর্ণহৃদয় শিশু নায়কদের মতো আমি ভেড়াটার প্রাণ বাঁচানোর কথা মোটেই ভাবতাম না। কারণ আমি ভেড়া মোটেই পছন্দ করতাম না, আর তাই ওই দণ্ডপ্রাপ্ত ভেড়াটাকে আমাদের বাগানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করতে দেখলেও আমার মোটেই কষ্ট হত না বরং এটা ভেবে খুশি হতাম যে, খুব শিগগিরই এই কুৎসিত, বোকা, দুর্গন্ধ-যুক্ত পশুটাকে সরিয়ে ফেলা হবে। যদিও আমার মনে আছে, যেভাবে এই কাজটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হত, তাতে আমার বিবেকে আঘাত লাগত; কারণ গরিবদের মধ্যে ভেড়ার মাংসটা বিলিয়ে দেবার পর আমরা নিজেরা একটা বড় পারিবারিক ভোজে বসতাম, যেখানে আমরা ধর্মীয় অনুশাসনে নিষিদ্ধ বিয়ার পান করতাম এবং কশাই-এর দোকান থেকে আনা মাংসের ভোজ খেতাম, এইজন্যে যে আমাদের উৎসর্গ করা ভেড়াটার মাংসে খুব জোর গন্ধ বেরোত। এই অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য ছিল, 'একটি শিশুর বদলে', একটা পশুকে উৎসর্গ করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র প্রমাণ করা, যার ফলে আমরা অপরাধ-বোধ থেকে মুক্ত হব; এবং এর ফলে আমাদের মতো লোকেরা, যারা উৎসর্গ করা পশুটার মাংসের বদলে কশাই-এর দোকান থেকে কেনা ভালো মাংস খেত, তারা আরো বেশি অপরাধ বোধে ভুগত।

আমাদের বাড়িতে এর চাইতে আরো বেশি যন্ত্রণাদায়ক সংশয় নীরবে সহ্য করা হত। যে আধ্যাত্মিক শূন্যতা আমি ইস্তাম্বুলের অনেক ধনী, পাশ্চাত্যধর্মী, ধর্মনিরপেক্ষ পরিবারে লক্ষ করেছি, তা এই নীরবতার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠত। সকলেই গণিত সম্বন্ধে, স্কুলের সফলতা সম্বন্ধে, ফুটবল সম্বন্ধে,বা স্ফূর্তি করা সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা বলত, কিন্তু তারা বেঁচে থাকার মূল প্রশ্নগুলো, যেমন ভালোবাসা, সমবেদনা, ধর্ম, জীবনের অর্থ, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা ইত্যাদির সঙ্গে চরম বিভ্রান্তি ও যন্ত্রনাময় একাকীত্ব নিয়ে লড়াই করত। ওরা সিগারেট ধরাত, রেডিও-র খবর শোনার দিকে নজর দিত, নিজেদের অন্তর্জগতে নীরবে ফিরে যেত। আমার ঈশ্বরের প্রতি গোপন ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য আমি যে উপবাস করেছিলাম, সেটাও প্রায় এই ধরনেরই ছিল। সেটা ছিল শীতকাল এবং সূর্য ডুবে যেত তাড়াতাড়ি। তাই মনে হয়, আমার বেশি খিদে সহ্য করতে হয়নি। তাহলেও আমার মার তৈরি খাবার খেতে খেতে (প্রচলিত রমজান ভোজের সঙ্গে আমার এই অ্যাঙ্কোভি, মেয়নিজ এবং মাছের রো স্যালাড-এর কোনো সাদৃশ্যই ছিল না) আমার মনে সুখ ও শান্তি বিরাজ করত। ঈশ্বরকে সম্মান দেখিয়েছি, এই ভাবনার সঙ্গে কিন্তু আমার সুখের কোনো সম্পর্ক ছিল না বরং আমি যে একটা পরীক্ষা দিয়েছি এবং তাতে উত্তীর্ণ হয়েছি, এই চিন্তায় আমার সন্তুষ্টি ছিল। পেট ভরে খাওয়ার পর আমি একটা হলিউড সিনেমা দেখার জন্য কোনাক সিনেমা হলে গেলাম আর সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। এরপরে আমি কখনো উপবাস করার জন্যে সামান্যতম ইচ্ছাকেও প্রশ্রয় দিইনি।

যদিও আমি যতই ইচ্ছা হোক না কেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারতাম না, কিন্তু আমার একটা অংশ আশা করত যে, ঈশ্বর যদি, যেমন লোকে বলে, সর্বজ্ঞ হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন আমি কেন তাঁর ওপর বিশ্বাস করতে অসমর্থ এবং তাই আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। যতক্ষণ আমি আমার এই অবিশ্বাস প্রচার না করছি, কিংবা বিশ্বাসের ওপর পণ্ডিতি আক্রমণ না করছি, ঈশ্বর নিশ্চয়ই বুঝবেন এবং আমার এই অবিশ্বাসের জন্য আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করছি এবং আমার যে অপরাধ বোধ, সেগুলো হাল্কা করে দেবেন, অথবা আমার মতো একটা শিশুর ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামাবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভয় করতাম ঈশ্বরকে নয়, যারা ঈশ্বরে অতিরিক্ত বিশ্বাস করত, তাদের। আর দ্বিতীয় যেটাকে ভয় পেতাম, সেটা হল সাধুদের মূর্খামি, যাদের বিচার ও সিদ্ধান্তকে ঈশ্বরের বিচারের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, ঈশ্বর-না করুন– যে ঈশ্বরকে তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে পূজো করত। বছরের পর বছর, আমি এই ভয়ে ভীত ছিলাম যে, আমি 'ওদের মতো' নই বলে একদিন আমাকে শাস্তি পেতে হবে এবং এই ভয় আমার ওপর, আমার বামপন্থী যৌবনে যে সমস্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব পড়েছিলাম, তার চাইতেও গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। অনেক পরে আমি এটা আবিষ্কার করে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, আমার বেশ কিছু সতীর্থ ধর্মনিরপেক্ষ, আধা বিশ্বাসী, আধা পাশ্চাত্যপন্থী ইস্তাম্বুলীয় আমার এই গোপন অপরাধবোধের ভাগীদার ছিল। কিন্তু আমি এটা ভাবতে ভালোবাসি যে, একটা পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যে সব লোক কোনোদিনও কোনো ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেনি আর সাধু-সন্তদের অবজ্ঞার চোখে দেখত, তারা কেমন ঈশ্বরের সঙ্গে একটা গোপন বোঝাপড়ায় চলে আসে।

মিডল স্কুলে আমার একজন ক্লাশের বন্ধু ছিল, যার এই ধরনের গোপন আঁতাত-এর ব্যাপারটার বিরুদ্ধাচরণ করার মতো সাহস ছিল। ও ছিল একটা অত্যন্ত ধনী পরিবারের বখাটে, শয়তান ছেলে, যে পরিবার অনেক টাকা করেছিল জমি বিক্রি ইত্যাদি ব্যবসায়ে। বসফোরাসের ওপর দিকে পাহাড়ের ওপর ওদের একটা বিশাল জাঁকাল বাড়ি ছিল, তার বিশাল বাগানে ও ঘোড়ায় চড়ত এবং আন্তর্জাতিক অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতাতে ও তুরস্কের হয়ে যোগ দিয়েছিল। একবার স্কুলের টিফিনের সময় আমরা অধিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যেমন ছেলেরা করে থাকে, তখন ও দেখল যে, আমি ভয়ে কাঁপছি। ও তখন আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে বলল, 'যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে, তাহলে সে যেন এক্ষুনি আমাকে মেরে ফেলে!' এবং তারপরে এমন একটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও বলল, যাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম,' দেখলি তো, কিছুই হল না, এখনো আমি বেঁচে আছি, শ্বাস নিচ্ছি।' আমার এই রকম সাহস নেই বলে নিজেকে অপরাধী মনে হল, আর ও যে একদম সঠিক, সেটা মনে মনে ভেবেও নিজেকে অপরাধী মনে হল, যদিও কেন জানি না, আমার এই বিমূঢ় ভাবের মধ্যেও আমি বেশ আনন্দ পেলাম।

আমার বয়স যখন বারো হল আর আমার আগ্রহ এবং অপরাধবোধ দুইই যখন ধর্মের বদলে ইন্দ্রিয়াসক্তির দিকে ঝুঁকল, তখন আর আমার বিশ্বাস করার ইচ্ছা, এবং ওদের সঙ্গে মেলার ইচ্ছা, এই দুই-এর ভেতরে যে বোঝার অগম্য সংঘাত ছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো আগ্রহ আর রইল না। তখন থেকে মনে হল, আমার যে যন্ত্রণাবোধ, তা ঈশ্বর থেকে দূরে আছি বলে নয়, বরং আমার চারপাশের সকলের কাছ থেকে, শহরের সামগ্রিক আকর্ষণ থেকে দূরে আছি বলে। এ সত্ত্বেও, যখনই আমি কোনো ভীড়ের মধ্যে থাকি, অথবা জাহাজের ওপরে একটা সেতুর ওপরে অথবা কোনো সাদা ওড়না ঢাকা বয়স্কা মহিলার মুখোমুখি হই, তখনই আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা কাঁপুনি বয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১.

ধনবান ব্যক্তিরা

ষাট-এর দশকের মাঝামাঝি, আমার মা প্রতি রবিবার সকালে এক কপি 'ইভনিং' কাগজ কেনার জন্যে খবরের কাগজের দোকানে যেতেন। আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজের মতো, এই কাগজটা আমাদের বাড়িতে এসে দিয়ে যেত না এবং আমার বাবা জানতেন যে, আমার মা এই কাগজটা কিনতে যেতেন কেবলমাত্র একটা কলাম, 'আপনি কি শুনেছেন?' যেটা 'গুল পরী' এই ছদ্মনামে লেখা হত এবং তাতে সমাজের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির গল্প-গুজব থাকত, সেটা পড়বার জন্যে, আর তাই বাবা এই নিয়ে মাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ছাড়তেন না। বাবার এই ঠাট্টা শুনে আমার ধারণা হয়েছিল যে, সমাজের কেচ্ছা কেলেঙ্কারির গল্পগুজবের প্রতি এই আগ্রহ একটা দুর্বলতার চিহ্ন। যে সাংবাদিকেরা এই ছদ্মনামের আড়ালে লুক্কায়িত থাকত, তারা এই তথাকথিত 'ধনবান' ব্যক্তিদের (যাদের সঙ্গে আমরা সামাজিকভাবে মিশতাম এবং তাদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত হবার আকাঙ্খাও ছিল) প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব তৈরি করত, তাই এগুলোকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করা যেত। অবশ্য এগুলো যদি মিথ্যা না-ও হত, ধনী ব্যক্তিরা সামাজিক কলাম-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অযোগ্য হলেও তারা কিন্তু অনুকরণীয় জীবন কাটাত না। এই অন্তর্দৃষ্টি কিন্তু আমার বাবাকে এই কলামগুলো পড়া এবং বিশ্বাস করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

• বেচারা ফেজিয়ে মাদেনসি। তাঁর বেবেক-এর বাড়িটায় চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ জানে না, কী চুরি গেছে। দেখা যাক, পুলিশ এই রহস্যের সমাধান করতে পারে কিনা।

• আইজেল মাদ্রা গত গ্রীষ্মকালে একবারও সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যাননি– কারণ তাঁর টনসিল অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই গ্রীষ্মে তিনি কুরুসেসমে দ্বীপে বেশ ভালোই উপভোগ করছেন– যদিও শোনা যায়, তিনি এখনো খিটখিটে মেজাজে রয়েছেন। কেন, তা জিজ্ঞাসা না করাই ভালো...

• মুয়াজ্জেজ আইপার রোমে গেছেন! আমরা আগে কখনো ইস্তাম্বুলের এই শৌখিন সামাজিক ব্যক্তিকে এত সুখী দেখিনি। তার এত আনন্দ হল কিসে? আমরা ভেবে চলেছি। তার সহচর শৌখিন পুরুষটির জন্যই কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

• সেমিরামিস সারিয়ে 'বাইয়ুকাদা'-তে সাধারণত তাঁর গ্রীষ্মকাল কাটাতেন, কিন্তু এখন তিনি আমাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ক্যাপ্রিতে তাঁর বাগান বাড়িতে ফিরে গেছেন। যতই হোক, জায়গাটা প্যারিসের কত-ও-ও-ও-ও কাছে। শুনেছি, তিনি নাকি তার শিল্পকলার কয়েকটি প্রদর্শনীও করতে চলেছেন। তাহলে কবে উনি তাঁর মূর্তিগুলো আমাদের দেখাবেন?

• শয়তানি চোখ ইস্তাম্বুলের সমাজকে নষ্ট করে দিচ্ছে! অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি, যাদের নাম এই কলামে প্রায়ই দেখা যেত, তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। আমাদের কাছে সবশেষ খবর এসেছে শোকসন্তপ্ত রুসেন আসরফ-এর ক্যামলিকা-র বাড়ি থেকে, যেখানে একটি চন্দ্রালোকিত পার্টিতে হারিকা গুরসয় খুব ভাল সময় কাটাচ্ছিলেন...

'তাহলে, হারিকা গুরসাও এখন ওর টনসিল কাটিয়ে নিয়েছে, তাই না?' আমার মা বলেন। 'ভালো হত, যদি ও প্রথমে ওর মুখের চামড়ার গুটিগুলো কাটিয়ে নিত,' আমার বাবা অলস বিদ্বেষ ভরে বলতেন।

এই সব শৌখিন সামাজিক ব্যক্তিদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হত, আবার অনেকের নাম লেখা হত না, কিন্তু আমি আগাগোড়া পড়ে এই সিদ্ধান্তে আসতাম যে, আমার বাবা-মা এই সব লোকেদের চিনতেন, জানতেন; আর আমার মায়ের এদের প্রতি আগ্রহ এই কারণে ছিল যে, এরা ছিল আমাদের চেয়েও ধনী। আমার মা ওদের ঈর্ষ্যা করতেন– সঙ্গে সঙ্গে ওদের এত ধন-সম্পদকে অনুমোদন করতেন না। এটা ছিল ওদের প্রতি মায়ের খিটখিটানি, ওদের নাম খবরের কাগজে উঠেছে বলে। এটা একমাত্র আমার মায়েরই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না; ধনীদের জনসাধারণের সামনে নিজেদের বড়লোকিপনা জাহির করা উচিত নয়, এই বিশ্বাস প্রায় সমস্ত ইস্তাম্বুলবাসীরই সেই সময় ছিল।

মাঝে মাঝেই এইকথা তারা জোর গলায় বলত; এটা অবশ্য বিনয় দেখানোর জন্য চিৎকার করা নয়, অথবা অহঙ্কারের গর্তে পড়ে যাওয়া এড়ানোর চেষ্টা নয় এবং এটা প্রোটেস্ট্যান্ট কর্মপদ্ধতির কথা বলত, তাও নয়। সরকারের প্রতি ভীতি থেকেই এর উৎপত্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাসক অটোমান পাশারা অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের, যাদের বেশির ভাগই শক্তিশালী পাশা ছিলেন, নিজেদের আসন্ন বিপদ বলে মনে করতেন, আর তাই সুযোগ পেলেই যে কোনো অজুহাতে তাদের খুন করে তাদের সমস্ত ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নিতেন। আর ইহুদিদের ক্ষেত্রে, যারা অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ শতাব্দীগুলোতে রাজ্যসরকারকে টাকা ধার দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন এবং গ্রিক ও আর্মেনিয়ানরা, যারা ব্যবসায়ী এবং কারিগর হিসাবে অনেক ওপরে উঠেছিলেন, তারা সবাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে শাস্তিমূলক সম্পদ কর তাদের ওপর ধার্য করা হয়েছিল, তার তিক্ত স্মৃতি বহন করতেন এবং পরবর্তীকালে তাদের সমস্ত জমি ও কারখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং ১৯৫৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালের ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বরের দাঙ্গায় তাদের অসংখ্য দোকান লুটপাট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সুতরাং বড় বড় অ্যানাতোলিয়ান জমির মালিকরা এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পপতিরা, যারা এখন ইস্তাম্বুলে চলে আসছে, তারা বুক ফুলিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ লোক সমক্ষে জাহির করছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মতো যারা এখনো সরকারকে ভয় পায়, যারা নিজেরা ব্যর্থ হয়েছে নিজেদের অকর্মন্যতার জন্যে, নিজেদের ধনসম্পদ এক প্রজন্মের বেশি সংরক্ষণ করতে পারেনি, তারা এই বুক ফুলিয়ে সাহস দেখানোকে শুধু বোকামিই মনে করে না, এটাকে অশ্লীল বলেও মনে করে। এই রকম একজন দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পপতি, সাকিব সাবান্কি, বর্তমানে তুরস্কের দ্বিতীয় ধনী শ্রেষ্ঠ পরিবারের কর্তাকে তার হঠাৎ বাদশা হওয়ার মতো জাঁক, উল্টোপাল্টা মতামত এবং রীতিনীতি বর্জিত ব্যবহারের জন্য উপহাসের পাত্র করা হয়েছিল (যদিও কোনো খবরের কাগজই এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি, কারণ তাহলে বিজ্ঞাপনের টাকা বন্ধ হওয়ার ভয় ছিল); কিন্তু তার প্রাদেশিক সাহস দিয়ে তিনি ফ্রিক-এর উদাহরণ অনুসরণ করে নিজের বাড়িটিকে ইস্তাম্বুলের সর্বশ্রেষ্ঠ বেসরকারি মিউজিয়ামে পরিণত করেছিলেন ১৯৯০ সালে।

যাই হোক আমার ছোটবেলার ইস্তাম্বুলের ধনীব্যক্তিদের ওপর যে দুশ্চিন্তা ভর করেছিল, তা কিন্তু অমূলক ছিল না এবং তাদের চিন্তা ভাবনাও ভুল ছিল না। সরকারি আমলাতন্ত্র সমস্ত রকমের উৎপাদনের ওপর লোভী নজর রাখত এবং যেহেতু রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে চুক্তি না করে সত্যিকারের ধনবান হওয়া অসম্ভব ছিল, সেহেতু প্রত্যেকেই ধরে নিত যে, ভালো মানুষ ধনী ব্যক্তিদেরও অতীত কলঙ্কিত ছিল। আমার দাদাজীর টাকা পয়সা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এবং আমার বাবা অনেক বছর ধরে তুরস্কের অন্য একটি অগ্রগণ্য শিল্পপতি পরিবারের কর্তা ভেহবি কক-এর অধীনে চাকরি করার পরেও, বাবা, তার মালিকের প্রাদেশিক উচ্চারণ অথবা তার কম মেধাবী ছেলের বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেই সন্তুষ্ট থাকতেন না, উপরন্তু রেগে গেলে বাবা বলতেন যে, ওই পরিবারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাদের ধনসম্পদ উপার্জন করে এবং এদের কারণেই দেশে সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যের জন্য লাইন দেওয়া ইত্যাদি হয়েছিল।

আমার সারা ছেলেবোয় এবং যৌবনে আমি ইস্তাম্বুলে এমন কোনো ধনী ব্যক্তি দেখিনি, যে নিজের ক্ষমতায় ধনী হয়েছে, বরং তারা অনেকদিন আগে সরকারের আমলাদের সুযোগ সুবিধা মত ঘুষ খাইয়ে বড়লোক হয়েছে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত যখন সরকারের প্রতি ভীতি ধীরে ধীরে কমে গেছে, আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, এদের অধিকাংশই খুব দ্রুত টাকা কামিয়েছে এবং বাকি জীবনটা ওই টাকা ভালোভাবে লুকিয়ে রাখার জন্য ব্যয় করেছে এবং নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে বৈধ রূপ দেবার চেষ্টা চালিয়েছে। যেহেতু ধনী হবার জন্য বুদ্ধিজীবী হওয়ার দরকার হয় না, সেহেতু এই সমস্ত ধনী ব্যক্তিদের বই-এর প্রতি, লেখাপড়ার প্রতি, কিংবা দাবা খেলায় প্রতি কোনো আগ্রহই ছিল না। অটোমান যুগের মেধার চর্চার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইটাই ছিল বিশাল তফাৎ, কারণ সেই যুগে কেবলমাত্র শিক্ষার গুণেই সাধারণ অবস্থার যে কোনো ব্যক্তি সামান্য অবস্থা থেকে ওপরে উঠতে পারত, ধনী হতে পারত, এমনকি পাশাও হতে পারত। প্রজাতন্ত্র আসার পর প্রথম দিকে যখন সুফি ঠেকগুলো বন্ধ হয়ে গেল, ধর্মীয় গ্রন্থ তথা সাহিত্যকে অবজ্ঞা করা হতে লাগল, অক্ষর বিপ্লব হল এবং স্বেচ্ছায় ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির দিকে ঝোঁকা শুরু হল, তখন থেকে আর শিক্ষার মাধ্যমে নিজের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভবপর হল না।

নতুন ধনীরা যখন সরকারকে ভয় পেতে শুরু করল (উপযুক্ত কারণেই), তখন এই ভীত পরিবারগুলোর সামনে অগ্রগতির একটিই রাস্তা খোলা ছিল, তা হল নিজেরা যা নয়, তার চেয়ে বেশি করে নিজেদের ইউরোপিয়ান দেখানো। সেই জন্যেই তারা তখন ইউরোপে প্রমোদ ভ্রমণে যেতে শুরু করল, দামি কাপড় চোপড়, মালপত্র এবং সর্বাধুনিক গৃহস্থালীর জিনিসগুলো (ফলের রস বানানোর জুইসার থেকে শুরু করে ব্যাটারি-চালিত দাড়ি কামানোর শেভার পর্যন্ত) কিনতে শুরু করল, আর এইসব জিনিসের মালিক হয়ে গর্ববোধ করতে লাগল। কখনো কোনো পুরোনো ইস্তাম্বুলী পরিবার একটা ব্যবসা শুরু করে নতুন করে ধনী হয়ে যেত (যেমন হয়েছিল এক বিখ্যাত খবরের কাগজের মালিক এবং লেখক, যিনি কিনা আমার খালার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন)। কিন্তু তারা ততদিনে শিক্ষা পেয়ে গেছে; যদিও তারা কোনো আইন ভাঙেনি, কোনো সরকারি আধিকারিককে অপমান করেনি এবং সরকারকে ভয় করবার কোনো কারণই ছিল না, তবুও এই ধরনের লোকেদের পক্ষে এটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না যে, এরা তাদের সব সম্পদ বিক্রি করে দিয়ে চলে যেত লন্ডনে, কোনো সাধারণ ফ্ল্যাটবাড়িতে, সেখানে থেকে তারা হয় উল্টোদিকের প্রতিবেশীর বাড়ির দেওয়াল দেখত, অথবা ইংরেজি টেলিভিশন দেখত যেটা তারা মোটেই বুঝতে পারত না, কিন্তু তবুও কোনো নিজেদের অবোধ্য কারণে, তারা ভাবত যে, ইস্তাম্বুলে বসফোরাসের দৃশ্য দেখা যায় এ রকম একটা অ্যাপার্টমেন্টের অনিশ্চিত আরামের চাইতে তারা বেশি ভাল আছে। এ রকমও হত যে, তাদের এই পাশ্চাত্যগামী আকাঙ্খা থেকে 'অ্যানা কারেনিনা'র প্রতিধ্বনি-সম্পন্ন গল্পও তৈরি হয়ে যেত; একটা ধনী পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশি ভাষা শেখানোর জন্য বিদেশি আয়াকে পরিবারে নিয়ে আসত, আর কিছুদিন পরেই পরিবারের কর্তা ওই আয়াকে নিয়ে পালিয়ে যেত।

অটোমান সাম্রাজ্যের কোনো বনেদিয়ানার উত্তরাধিকার ছিল না, কিন্তু প্রজাতন্ত্র আসার পর ধনীরা অটোমান বনেদিয়ানার উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের দেখাবার অদম্য চেষ্টা চালাত। তাই আশির দশকে, যখন ওরা হঠাৎ অটোমান সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশের প্রতি আগ্রহ দেখাতে লাগল, তখন ওরা ওই সব প্রাচীন নমুনাগুলো, কাঠের তৈরি 'ইয়ালি'গুলো পুড়িয়ে দেবার পরও যেগুলো কিছু কিছু অক্ষত ছিল, সংগ্রহ করার জন্য জোরদার চেষ্টা করত। যেহেতু আমরাও এক সময় ধনী ছিলাম এবং এখনো লোকে তাই ভাবে, তাই আমরা, বড়লোকেরা কীভাবে নিজেদের ধন সম্পদ তৈরি করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বিষয়ে গল্পগুজব করতে ভালোবাসতাম। (আমার একটা প্রিয় গল্প ছিল যে, একটা লোক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক জাহাজ চিনি কিনেছিল আর তা বিক্রি করে রাতারাতি এত বড়লোক হয়ে গেল যে, তার মৃত্যু পর্যন্ত সে ওই টাকা ভোগ করে গিয়েছিল)। হয়তো এই সব গল্পের চকচকে দিকগুলো, হয়তো এর বিষাদময় পরিণতি, এই অগাধ সম্পদ নিয়ে কী করব, সেই সাংঘাতিক অনিশ্চয়তা এবং কেমন করে এই অলৌকিকভাবে অর্জন করা ধন সম্পদ রক্ষা করা যায়, যে কারণই হোক না কেন, আমি যখনই কোনো ধনী ব্যক্তিকে দেখতাম, তা তিনি আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হোন বা পরিবারের বন্ধু বা মার কিংবা বাবার ছেলেবেলার বন্ধু, আমাদের নিশান্তাসি মহল্লার কোনো প্রতিবেশী অথবা সেই সব হৃদয়হীন, সংস্কৃতি বিমুখ ধনী লোকেদের কোনো একজন যার নাম 'আপনি কি শুনেছেন?' কলামে উঠেছে,– তাদের ওই শূন্য জীবনটায় অনুসন্ধান চালানোর অদম্য ইচ্ছা হত।

আমার বাবার এক বাল্যবন্ধু ছিলেন, একজন ফ্যাশন দোরস্ত, ঝকঝকে মানুষ, যিনি তার বাবার কাছ থেকে প্রচুর ধন সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন (বাবা ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ দিকের একজন উজির); এই উত্তরাধিকার থেকে তাঁর যে আয় হত, তা এত বিশাল ছিল– আমি বলতে পারি না লোকে যখন এই সব ধন সম্পত্তির উল্লেখ করত তখন তারা তাঁর প্রশংসা করত, না নিন্দা করত, যে তাঁকে সারা জীবনে একটি দিনের জন্যও কোনো কাজ করতে হয়নি, কেবল কাগজ পড়তেন আর তার নিশান্তাসি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রাস্তা দেখতেন; বিকেল হলে দীর্ঘ সময় নিয়ে দাড়ি কামাতেন এবং গোঁফ আঁচড়াতেন; তারপর প্যারিস বা মিলানে তৈরি চমৎকার পোশাক পরে তাঁর সারাদিনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেরিয়ে পড়তেন, সেটা হল হিল্টন হোটেলের লবিতে বা পেস্ট্রি শপ-এ বসে দু'ঘণ্টা ধরে চায়ে চুমুক দেওয়া; একদিন যেমন উনি ভুরু তুলে যেন কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করছেন, শোকাচ্ছন্ন মুখে, যেন গভীর আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন, এইভাবে বাবাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, 'কারণ, শহরে এটাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা, যেখানটায় এলে ইউরোপের মতো মনে হয়।' ওই একই প্রজন্মে, আমার মায়েরও একজন বন্ধু ছিলেন; প্রচণ্ড ধনী, প্রচণ্ড মোটা একজন মহিলা, যিনি নিজে একটা বাঁদরের মতো দেখতে হওয়া সত্ত্বেও (অথবা হয়তো সে জন্যই) সকলকে এই কথা বলে সম্ভাষণ করতেন, 'কেমন আছ, বাঁদর?'– এই মুদ্রাদোষটা আমি আর আমার দাদা দুজনেই নকল করতে ভালোবাসতাম। তিনি তাঁর প্রায় গোটা জীবনটাই বিবাহ-প্রার্থী সমস্ত পুরুষকেই বাতিল করেছিলেন, বলতেন যে, তারা নাকি যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন, বা ইউরোপিয়ান নয়; আর যখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, তখন তিনি প্রচণ্ড ধনী বা অত্যন্ত সুপুরুষ, চমৎকার মানুষ, যারা কিনা তাঁর মতো সাধারণ ঘরোয়া মহিলাকে চাইবে না, তাদের বাদ দিয়ে একজন 'অত্যন্ত বিশিষ্ট, পরিমার্জিত' তিরিশবর্ষীয় পুলিশম্যানকে বিয়ে করলেন; কিছুদিনের মধ্যেই এই বিয়ে ভেঙে গেল এবং তিনি তাঁর বাকি জীবন, তাঁর শ্রেণীর মেয়েদের কেবলমাত্র ধনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষদের, যারা কিনা সামাজিকভাবে তাদের সমকক্ষ, তাদের বিয়ে করার উপদেশ দিয়ে দিয়েই কাটিয়ে দিলেন।

ইস্তাম্বুলে বাণিজ্য এবং শিল্পে অগ্রগতির যে বিশাল আলোড়ন উঠেছিল, শেষ অটোমান প্রজন্মের পাশ্চাত্যপন্থী ধনী ব্যক্তিরা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন সম্পদ নিয়ে তাতে অংশ নিতে মোটামুটিভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন; প্রায়ই দেখা যেত, এইসব পুরোনো পরিবারের মাথারা 'দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী'-দের সাথে ব্যবসা করার ব্যাপারে একই টেবিলে বসে কথাবার্তা বলতে অস্বীকার করতেন, কারণ তারা তাদের জাল জুয়াচুরি ও শঠতা ঢাকত তাদের 'আন্তরিক' সৌহার্দ্য এবং সাম্প্রদায়িক সৌজন্য দেখিয়ে। তারা এমনকি এদের সঙ্গে চা পর্যন্ত খেতেন না। এই প্রাচীন অটোমান পরিবারগুলোকে ঠকাত তাদেরই উকিলেরা (ওরা সেটা জানতেন না) যাদের ভাড়া করা হত তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এবং ভাড়া ইত্যাদি আদায় করার জন্য। যখনই আমরা এই মুমূর্ষু শ্রেণীর কোনো ব্যক্তির প্রাসাদে, বা তার বসফোরাস 'ইয়ালি'-তে যেতাম, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম যে, এরা মানুষের চাইতে নিজেদের পোষা বিড়াল কুকুরদের বেশি পছন্দ করতেন এবং তাই ওরা যখন আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করতেন, আমি তাকে মূল্য দিতাম। যখন পাঁচ কি দশ বছর বাদে বিক্রেতা রফি পোর্তাকাল তার পুরোনো জিনিসের দোকানে সেই একই আসবাবপত্র প্রদর্শন করত, যেগুলো এই সব লোকেদের বাড়িতে এক সময় সাজানো থাকত, গদি, বিছানা, ডিভান, ঝিনুক বসানো চেয়ার, তৈল চিত্র, বাঁধানো ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম, পুরোনো রাইফেল, ঐতিহাসিক তলোয়ার, যেগুলো তাদের প্র-পিতামহ, পিতামহ-র থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে, ট্যাবলেট, বিশাল বিশাল ঘড়ি– তখন আমি, তারা যে শূন্য জীবন কাটাতেন, সেটা মনে মনে ভাবতাম। তাদের সকলেরই কিছু না কিছু নেশা ও মুদ্রাদোষ ছিল, যা তাদের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যন্ত্রণাময় যোগাযোগ থেকে সরিয়ে রাখত। আমার মনে পড়ে একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তির কথা, যিনি আমার বাবাকে তার ঘড়ি এবং অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ এমন গোপনীয়ভাবে দেখাতেন, যেন তিনি একগোছা যৌন ক্রিয়ার ছবি দেখাচ্ছেন। যখন একজন বয়স্কা চাচী, একটা নৌকোঘরে যাবার পথে একটা ছোট কিন্তু বিপজ্জনকভাবে ভেঙে পড়া দেওয়াল-এর পাশ দিয়ে সাবধানে ঘুরে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন, আমাদের মজা লাগত এই মনে করে যে, পাঁচ বছর আগে যখন আমরা তার কাছে এসেছিলাম, তখনো তিনি সেই একই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আরেকজন ফিসফিস করে বলতেন যে, তার কাজের লোকেরা যেন তার দামী গোপন কথাগুলো না জানতে পারে। তৃতীয় একজন আমার মাকে বিরক্ত করতেন রূঢ় স্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করে যে, আমার বাবার মা'র বাড়ি কোথায় ছিল। আমার একজন মোটাসোটা মামার অভ্যাস ছিল, তার অতিথিদের নিয়ে সারা বাড়ি ঘোরানো, যেন তাঁর বাড়িটা একটা মিউজিয়াম। তারপরে তিনি সাত বছরের পুরোনো সব কেচ্ছা কেলেঙ্কারির এবং বিপর্যয়ের গল্প ফাঁদতেন, যেন সেগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন সকালেই 'হুরিয়াৎ' কাগজে খবর হয়ে বেরিয়েছে আর সারা শহর তোলপাড় করে তুলেছে। এই সমস্ত অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখতে দেখতে আমি মা'র দিকে তাকাতাম, জানতে যে কোনো ভুলত্রুটি হচ্ছে কিনা, তারপরেই আস্তে আস্তে বুঝতে পারতাম, এই যে ধনী আত্মীয়রা আমাদের প্রভাবিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, ওদের চোখে আমাদের কোনো গুরুত্বই নেই, আর তাই আমি তখন হঠাৎ ওদের 'ইয়ালি' থেকে নিজেদের বাড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবতাম। যখন এই রকমই কেউ আমার বাবার নামটা ভুল বলত, কিংবা আমার দাদাজীকে একটা গ্রাম্য চাষী বলে ভুল করত, অথবা যেটা আমি প্রায়ই এইসব নির্জনবাসী ধনীদের মধ্যে দেখতাম, কোনো ছোটখাট অযৌক্তিক বিরক্তিকর ব্যাপারকে অতিরঞ্জিত করে তুলত (কাজের মেয়েলোকটা ঝুড়ো চিনির বদলে চিনির কিউব এনেছে, একটা অপছন্দের রং-এর মোজা পড়েছে, স্পীডবোটটা বাড়ির খুব কাছে এসে গিয়েছিল), তখন আমি আমাদের এবং তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যে পার্থক্য ছিল, তা বুঝতে পারতাম। কিন্তু তাদের এই স্বজনদের অবজ্ঞা করার স্বভাব সত্ত্বেও, তাদের ছেলেদের বা নাতিদের, বা আমার সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে আমাকে বন্ধুত্ব করতেই হত, যদিও তাদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা খুব কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হত,– ওদের মধ্যে অনেকেই কফি হাউসে গিয়ে মেছুড়েদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করত, শহরের অন্য প্রান্তের ফরাসি স্কুলের যাজকদের মারধোর করত, অথবা (সুইস পাগলাগারদে তালাবন্ধ না থাকলে) আত্মহত্যা করত।

এইসব পরিবারগুলো তুচ্ছ, একরোখা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ত, যার ফলে তাদের আদালতে পর্যন্ত দৌড়তে হত, এবং এই ব্যাপারে আমি বুঝতাম যে, ওদের আমাদের পরিবারের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। কেউ কেউ তাদের বিশাল প্রাসাদে বছরের পর বছর একত্রেই থাকত, এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে আইনি মামলা লড়া সত্ত্বেও, পারিবারিক ভোজে সামিল হত (যেমন আমার বাবা, ফুফুরা এবং চাচারা করতেন)। যারা তাদের অভিযোগে খুব গুরুত্ব দিত এবং তাদের আবেগের বশে মামলা করে বসত, তারা বেশি কষ্ট পেত, বছরের পর বছর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কেউ, যদিও তারা একই 'ইয়ালি'-তে বাস করত, তাদের বিরাগভাজন আত্মীয়দের মুখ দেখতে চাইত না এবং তাই তাদের 'ইয়ালি'র সবচেয়ে সুন্দর ঘরগুলোতে দেয়াল তুলে, ছাদের সিলিং-এর সৌন্দর্য নষ্ট করে, কুৎসিত প্লাস্টার করা দেয়াল তুলে বসফোরাসের অনির্বচনীয় দৃশ্যকে আটকে দিত, অথচ ওই পার্টিশন দেওয়ালগুলো এতই পাতলা ছিল যে, ওদের সেই ঘৃণ্য আত্মীয়দের কাশির শব্দ, পায়ের আওয়াজ সারাদিন ধরে বাধ্য হয়ে শুনতে হত। যদি ওরা 'ইয়ালি'র বাকি অংশগুলোও ভাগাভাগি করত ('তুমি হারেমটা নাও, আমি নতুন ঘরগুলো নেব'), সেটা তাদের নিজেদের আরামের জন্যে নয়, এই জন্যে যে, এতে তাদের ওই অবাঞ্ছিত আত্মীয়দের অসুবিধা ঘটানো হবে; আমি এমনও শুনেছি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মীয়দের বাগানে প্রবেশ বন্ধ করার জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই পরিবারে পরবর্তী প্রজন্মেও যখন আমি একই ধরনের বাদ-বিসম্বাদ গজিয়ে উঠতে দেখি, তখন আমি ভাবি যে, ইস্তাম্বুলের ধনী পরিবারগুলোতে কি একই রক্তের মধ্যে লড়াই চালানোর মতো বিশেষ প্রতিভা আছে? প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিকে, যখন আমার দাদাজী তাঁর ধন সম্পদ বাড়াচ্ছিলেন, তখন একটা ধনী পরিবার নিশান্তাসিতে উঠে এল, এবং আমাদের টেসভিকিয়ে অ্যাভিনিউতে যে বাসস্থান ছিল, তার কাছেই বাস করতে আরম্ভ করল। তাদের ছেলেরা, ওদের বাবার, আব্দুল হামিতের এক পাশার কাছ থেকে কেনা জমিটা নিয়ে দু'ভাগ করল। প্রথম ভাইটা শহরের নিয়ম অনুযায়ী, ফুটপাথ থেকে অনেক দূরে তার অংশতে, একটা অ্যাপার্টমেন্ট বানাল। কয়েক বছর বাদে পরের ভাইটা তার নিজের অর্ধেক অংশে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বানাল। এবং শহরের নিয়ম কানুন মেনেই, ফুটপাথের তিন মিটার দূরত্বে এসে তার অ্যাপার্টমেন্টটা এমনভাবে বানাল, যাতে তার ভাই-এর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পুরো দৃশ্যটা আড়াল হয়ে যায়। তখন প্রথম ভাইটা একটা পাঁচতলা সমান উঁচু দেওয়াল খাড়া করল, যেটা– নিশান্তাসির সকলেই জানে– কোনো উদ্দেশ্যেই কাজে লাগত না, কেবলমাত্র তার ভাই-এর বাড়ির পাশের দিকের জানালাগুলো থেকে সব কিছুই আড়াল করে দিল।

প্রদেশগুলো থেকে ইস্তাম্বুলে আসা পরিবারগুলোর সম্পর্কে এ ধরনের ঝগড়া বিবাদের কথা শোনাই যায় না। এরা পরস্পরকে সমর্থন করে, আশ্রয় দেয়, বিশেষ করে যদি তারা খুব বড়লোক না হয়। ১৯৬০-এর পরে যখন শহরের লোকসংখ্যা আকাশ ছোঁয় এবং তার সাথে জমির দামও আকাশ ছোঁয়া, তখন যে সব পরিবার ইস্তাম্বুলে কয়েক পুরুষ ধরে বাস করে আসছিল, এবং যেভাবেই হোক, কিছু জমিজমার মালিক হয়েছিল, তাদের ভাগ্য খুলে গেল। এবং ওরা যে 'পুরোনো ইস্তাম্বুল টাকা' এটা প্রমাণ করার জন্য প্রথমেই ওরা ওইসব বিষয়সম্পত্তির ভাগাভাগির মামলায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলল। দুই ভাই ছিল, বাকিরকয়-এর পেছনে পাহাড়ের ওপর ওদের যে প্রচুর বন্ধ্যা জমি ছিল, তা থেকে ওরা দু'ভাই বিশাল ধনসম্পদের মালিক হয়ে বসল, যখন শহর ওই দিকে বাড়তে লাগল। এর থেকেই বোঝা যায়, কেন ছোট ভাইটা ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে একটা বন্দুক দিয়ে বড় ভাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। যতদূর মনে পড়ে খবরের কাগজগুলো লিখেছিল যে, বড় ভাইটা নাকি ছোট ভাই-এর বৌ-এর সঙ্গে প্রেম করত। ওই খুনি ভাই এর সবুজ-চোখো ছেলে সিসলি টেরাক্কিতে আমার ক্লাসের সহপাঠী ছিল এবং তাই আমি এই কেচ্ছা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতাম। বেশ কয়েকদিন ধরে এটাই ছিল খবরের কাগজের প্রথম পাতার খবর এবং সারা শহর যখন এই লোভ ও প্রেমের রসালো গল্পের ছোট ছোট বর্ণনাগুলোয় মশগুল, তখন ওই খুনির ফর্সা, লাল চুলো ছেলেটা তার প্রথাগত পোশাক পরে একটা রুমাল নিয়ে সারাদিন ক্লাসে বসে চুপচাপ কেঁদে যেত। চল্লিশ বছর কেটে গেছে, এখনো যখন আমি শহরের ওই জায়গাটা দিয়ে যাই, যেখানে এখন দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস আর পাড়াটা আমার ওই স্কুলের-পোশাক-পরা সহপাঠীর নামে পরিচিত, কিংবা যখনই ওই পরিবারের কথাটা উল্লেখ হয় (আসলে ইস্তাম্বুল একটা বড় গ্রাম বই তো নয়), আমার মনে পড়ে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই লাল-চুলো বন্ধুর দুচোখ কেঁদে কেঁদে কেমন টকটকে লাল হয়ে থাকত আর ও কেমন চুপচাপ চোখের জল ফেলত।

যে সমস্ত পরিবার বিশাল বিশাল জাহাজ বানাত (তারা সকলেই ব্ল্যাক সী অঞ্চল থেকে এসেছিল) তারা অবশ্য পারিবারিক ঝগড়াগুলো নিয়ে কোর্ট কাছারি করত না, তারা নগ্ন উল্লাসে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই এগুলো মেটাত। তারা শুরু করেছিল ছোট ছোট কাঠের নৌকার বাহিনী দিয়ে, সরকারি ঠিকা নেবার জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু তাকে ঠিক পশ্চিমী কায়দার খোলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা চলত না; পরিবর্তে তারা, একজন আরেকজনকে উসকে দেবার জন্য গুন্ডা বাহিনী পাঠাত; মাঝে মাঝে যখন তারা খুনোখুনিতে হাঁফিয়ে উঠত, তখন তারা মধ্যযুগে রাজারা যেমন করত, তেমনিভাবে এক পরিবার আর এক পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিত। কিন্তু পরবর্তী শান্তি বেশিদিন স্থায়ী হত না, আর তখন তারা আবার একে অপরকে গুলি চালিয়ে মারত, মাঝখান থেকে মেয়েগুলো উভয় পরিবারের সাথেই সম্পর্কিত হওয়ার দরুণ বিপদে পড়ত। পরে যখন তারা বড় বড় গাদা নৌকো কিনতে শুরু করল আর ছোট ছোট মালবাহী জাহাজ বানাতে আরম্ভ করল এবং ওদেরই কোনো এক পরিবারের একটি মেয়ে রাষ্ট্রপতির ছেলেকে বিয়ে করল, তখন তারা কাগজের 'আপনি কি শুনেছেন?' কলামে নিয়মিত হয়ে উঠল, যার ফলে আমার মা এদের 'জাঁকজমকওয়ালা খানা ও শ্যাম্পেনে ভেজা' পার্টিগুলোর গুলপরীর লেখা বিবরণগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তেন।

এই ধরনের পার্টিতে, বিয়েতে, বল নাচে, যেগুলোতে আমার মা-বাবা,চাচারা এবং আমার দাদীমা প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন– অনেক ফটোগ্রাফারও যেত। আমার আত্মীয়রা যে সব ফটোগ্রাফে নিজেদের ছবি থাকত, সেগুলো বাড়িতে এনে বুফে-টেবিলের ওপর বেশ কিছুদিন সাজিয়ে রাখতেন। এই সব ছবিতে আমি বেশ কিছু লোককে চিনতাম, যারা আমাদের বাড়িতে আসতেন, তাছাড়া বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদের ছবি আমি খবরের কাগজে দেখেছি, তার সাথে বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যারা এদের ওপরে উঠতে সাহায্য করেছেন। যখন আমার মা টেলিফোনে নিজের বোনের সঙ্গে পারস্পরিক বিবরণগুলো মেলাতেন, কারণ মার বোন এই ধরনের পার্টিতে আরো বেশি বেশি যেতেন, তখন আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করতাম যে, এই পার্টিগুলো কী ধরনের হয়। ১৯৯০ সালের পর থেকে সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানগুলো জমকালো ব্যাপার হয়ে উঠেছে এবং এতে সংবাদ মাধ্যমের লোক, টেলিভিশনের লোক এবং দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত মডেলরা উপস্থিত হয়; এদের আবার আকাশে রকেট ছুড়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, যে বিজ্ঞাপন সারা শহর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক পুরুষ আগেও এসব ব্যাপার অন্য রকম ছিল। ব্যাপারটা ঠিক লোক দেখানো জাঁক ছিল না। এগুলো তখন ছিল ধনী ব্যক্তিদের একত্রিত হওয়া এবং সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও লোভের দরুন তাদের যে ভয় এবং দুশ্চিন্তা ছিল সেটা অন্তত একটি সন্ধ্যার জন্যও ভুলে থাকা। আমার বালক বয়েসে আমি যখন এ রকম কোনো বিয়ে বা পার্টিতে যেতাম, তখন মানসিক বিভ্রান্তি সত্ত্বেও এত সব বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের মাঝখানে নিজে থাকতে পেরে খুব ভালো লাগত। একই ভালো লাগা আমি আমার মায়ের চোখেও দেখতে পেতাম,– যখন মা সারাদিন ধরে সাজগোজ করে পার্টিতে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বের হতেন। এক রাত্তির বাইরে মজা করার যে সুখ, এটা শুধু সে জন্যই নয়, বরং এটা ছিল এক সন্ধ্যা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কাটানোর সন্তুষ্টি– এটা জেনে যে, যে কারণেই হোক না কেন– তুমি এদের শ্রেণীভুক্ত।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বিশাল আমন্ত্রণী হলঘরে কিংবা (গ্রীষ্মকালে) প্রকাণ্ড বাগানে ঢুকে সুন্দরভাবে সাজানো টেবিল, তাঁবু, ফুলের বেডগুলো, পরিবেশনকারী ও পরিচারকদের মাঝখানে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে আমি লক্ষ করতাম যে, ধনী ব্যক্তিরাও, একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করতেন, আর যখন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা থাকতেন, তো কথাই নেই। আমার মা যেমন করতেন, তেমনিভাবে, সমবেত ভীড়কে সমীক্ষা করে 'আর কে কে এসেছেন' দেখা হত এবং 'যোগ্য ব্যক্তিরাই এসেছেন' দেখে সকলে উল্লসিত হত। এদের বেশির ভাগই তাদের ধন সম্পাদ রোজগার করেছে ভাগ্যজোরে, অথবা জুয়াচুরি করে, যা তারা এখন ভুলে যেতে চায়। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে বা বুদ্ধি প্রয়োগ করে নয়। এরা সারাজীবনে যা টাকা খরচ করতে পারবে, তার চেয়েও অনেক বেশি ধনদৌলত তাদের আছে, এই জ্ঞানই তাদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে। এরা আসলে এমন ধরনের লোক, যারা কেবলমাত্র আরাম করবে, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধেই ভাববে আর যদি তারা তাদের শ্রেণীর অন্যান্যদের সঙ্গে একই উচ্চতায় থাকতে পারে, তাহলেই সুখী থাকবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমবেত ভীড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথমবার ঘোরার পর কোথা থেকে জানি না, একটা অদ্ভুত বাতাস বয়ে যেত, আর আমার মনে হত আমি এই জায়গায় কেন রয়েছি? হয়তো আমি কোনো একটা অত্যন্ত দামী আসবাব বা কোনো বিলাস-বহুল গৃহস্থালীর জিনিস, যেমন বিদ্যুৎচালিত মাংস কাটার ছুরি দেখলাম, যেটা আমাদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয় এবং আমার মন খারাপ হয়ে গেল অথবা আমার বাবা-মাকে এমন লোকেদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে দেখলাম, যারা নিজেরাই অহঙ্কার করে বলত যে, তাদের ধনসম্পদ এসেছে কোনো অসম্মানকর, অন্যায় কাজ বা বিপর্যয় বা জোচ্চুরির মাধ্যমে, আর এতে আমার অস্বস্তি আরো বেড়ে যেত। পরে আমি আবিষ্কার করতাম যে, আমার মা, যিনি ওদের সঙ্গে মিশে সত্যিকারের আনন্দ পেতেন, এবং আমার বাবা, যিনি হয়তো তাঁর কোনো প্রণয়িনীর সঙ্গে প্রেম করছেন, তাঁরা বাড়িতে নিজেদের মধ্যে যে নোংরা গল্পগুজব করতেন, সেগুলো আসলে ভোলেননি, শুধু সেই রাত্রের জন্য ওগুলো সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। সব ধনীরাই কি আসলে এই রকমই করে না? আমি ভাবতাম, হয়তো বড়লোক হলেই এ রকম হতে হয়। সব সময়েই অভিনয় করতে হয় 'যদি এ রকম'। এইসব বড়লোকেরা পার্টিতে সব সময় অভিযোগ জানাত, ওদের প্লেন ভ্রমণের সময় কী বাজে খাবার দিয়েছিল,– যেন এটা একটা মহা সমস্যার ব্যাপার এবং সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ, যেন বেশির ভাগ সময়, যা তারা খেত, তা এত নিম্নমানের ছিল না। এবং তারপরে তারা আরো বলত কীভাবে তারা তাদের টাকা সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করত (বাবা-মা বলতেন, টাকা পাচার করত), ওরা এত দূরের একটা দেশে, যেখানে সহজে পৌঁছনো যায় না, ওদের টাকা লুকিয়ে রেখেছে, এই জ্ঞান ওদের একটা আরামদায়ক আত্মবিশ্বাস এনে দিত, যা দেখে আমি ঈর্ষ্যা বোধ করতাম।

ওদের এবং আমাদের মধ্যে তফাৎটা আমি যেমন ভাবতাম, তেমন বেশি নয়, এটা আমার কাছে একদিন আমার বাবাই একটা কথা বলে পরিষ্কার করে দিলেন। আমার তখন কুড়ি বছর বয়েস এবং আমি এইসব হৃদয়হীন, বুদ্ধিহীন বড়লোকদের বোকামির বিরুদ্ধে একটা লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, কারণ ওরা নিজেরা কত পাশ্চাত্যপন্থী এটা দেখাতে কি না করত, নিজেদের শিল্প সংগ্রহ জনসাধারণের সঙ্গে ভাগ না করে, মিউজিয়ামে না দিয়ে, নিজেদের শখ বা আগ্রহকে কোনো মর্যাদা না দিয়ে ভীরু, মাঝারি জীবন কাটাত; আমি বিশেষ করে আমাদের পারিবারিক পরিচিতদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে নিলাম, আবার বাবার ছেলেবেলার কয়েকজন বন্ধুকে, আর আমার নিজের কয়েকজন বন্ধুর বাবা-মাকে; আর বাবা, আমার ভাষণের মাঝখানেই বাধা দিয়ে– হয়তো ভেবেছিলেন, আমি অসুখী জীবন যাপন করতে যাচ্ছি, অথবা হয়তো আমাকে সাবধান করার জন্যে– বললেন যে, যে ভদ্রমহিলার নাম আমি একটু আগে উচ্চারণ করলাম, (অত্যন্ত সুন্দরী একজন মহিলা) তিনি সতিই একজন, সহৃদয়, ভালো মনের 'মেয়ে' এবং যদি কখনো তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ আমার হয়, তাহলেই আমি তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২.
বসফোরাসের জাহাজগুলো, বিখ্যাত যত অগ্নিকাণ্ড, বাড়ি বদল এবং অন্যান্য বিপর্যয়

আমার বাবা ও চাচার একটার পর একটা ব্যবসা ডুবে যাওয়া, বাবা এবং মায়ের মধ্যে ঝগড়া, আমার দাদিমার কর্তৃত্বের শাসনে থাকা বর্দ্ধিত পরিবারের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ, এই সব কিছু কিছু ব্যাপার থেকে আমার এই জ্ঞান হয়েছিল যে, এই পৃথিবী আমাকে যা কিছু দিচ্ছে (চিত্রাঙ্কন, ইন্দ্রিয় সুখ, বন্ধুত্ব, ঘুম, ভালোবাসা, খাওয়া-দাওয়া, নানা রকম খেলা, সব কিছু দু'চোখ ভরে দেখা) তা সত্ত্বেও, যদিও সুখ আহরণ করবার সুযোগ সীমাহীন এবং এমন একটা দিনও যেত না, যেদিন আমি নতুন কোনো সুখ আবিষ্কার করিনি, জীবন কিন্তু বিভিন্ন গুরুত্বের, বিভিন্ন আকৃতির হঠাৎ করে আসা, অভাবনীয়, অকল্পনীয়, দ্রুত ছড়িয়ে পড়া বিধ্বংসী আগুনের মতো বিপর্যয়ে ভর্তি। যখন তখন এসে পড়া এই দুর্যোগগুলো আমাকে রেডিওর 'সমুদ্র যাত্রার ঘোষণা'র কথা মনে করিয়ে দিত, যেখানে সমস্ত জাহাজকে (এবং বাকি আমাদেরও) বসফোরাসের মুখের কাছে 'ভাসমান মাইন'-গুলো এবং তাদের সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হত।

যে কোনো সময়ে, আমার বাবা-মা কোনো একটা বিষয় (যা আগে থাকতে বলে দেওয়া যেত) নিয়ে ঝগড়া শুরু করতেন অথবা ওপরতলার আত্মীয়দের কারো সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়ে যেত, অথবা আমার দাদা মাথা গরম করে জ্ঞান হারিয়ে আমাকে এমন শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিত, যা আমি কখনো ভুলতে পারব না। আবার হয়তো, বাবা বাড়ি এসে খবর দিতেন যে, উনি আমাদের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন, অথবা বাবার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, অথবা আমাদের বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে, অথবা উনি আবার কোনো ভ্রমণে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

সেই সব দিনে আমরা অনেকবার বাড়ি পাল্টেছি। প্রত্যেকবার বাড়িতে মানসিক চাপ বেড়ে যেত কিন্তু যেহেতু মা প্রতিটি থালা, বাটি, বাসন-কোসন পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে মুড়বার প্রতি অখন্ড মনোযোগ দিতেন, যেটা তখনকার রেওয়াজ ছিল, তাই আমাদের দিকে নজর দেবার মতো সময় তাঁর হাতে থাকত না এবং তার অর্থ এই ছিল যে, আমি ও দাদা সারা বাড়িতে দৌড়ে বেড়াতাম। যখন দেখতাম যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাল সরাবার লোকগুলো ক্যাবিনেট, কাঠের আলমারি, টেবিল এই সব তুলছে, আমাদের জীবনে এই জিনিসই নিয়মিত দেখতাম, আর আমাদের এতদিনের বসবাস করা অ্যাপার্টমেন্ট খালি করে চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, তখন আমার খুব মন খারাপ হয়ে যেত, শুধু একটাই সান্ত্বনা থাকত যে, এই মালপত্র সরানোর সময় হয়তো আমার একটা অনেকদিন আগে হারানো পেন্সিল, একটা মার্বেল কিংবা একটা অতি প্রিয় খেলনা একটা আসবাবের নিচে পাওয়া যাবে। নিশান্তাসিতে আমাদের পামুক অ্যাপার্টমেন্টের তুলনায় আমাদের নতুন বাড়ি হয়তো এতো উষ্ণ বা এত আরামদায়ক হত না, কিন্তু সিহাঙ্গির আর বেসিকটাস-এর বাড়িগুলো থেকে বসফোরাসের সুন্দর দৃশ্য দেখা যেত, তাই আমার নিজেকে কখনো অসুখী মনে হয়নি আর যতই সময় যেতে লাগল, আমিও ধীরে ধীরে আমাদের ভাগ্য যে পড়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে উদাসীন হতে লাগলাম।

এই সব ছোটখাট বিপর্যয়ের আমাকে অস্থির করে তোলার বিরুদ্ধে আমার কতকগুলো কায়দা ছিল। আমার নিজের জন্য আমি কিছু কড়া অন্ধবিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছিলাম (যেমন দুই পাথরের মাঝের ফাটলে পা না ফেলা, কোনো কোনো দরজা পুরো বন্ধ না করা) অথবা খুব দ্রুত একটা অভিযান করে ফেলতাম (অন্য ওরহান-এর সঙ্গে দেখা করা, আমার সৃষ্ট দ্বিতীয় পৃথিবীতে চলে যাওয়া, ছবি আঁকা, আমার দাদার সঙ্গে মারামারি শুরু করে একটা আকস্মিক দুর্বিপাকে পড়া)। অথবা বসফোরাসের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া জাহাজগুলো গোণা।

আসলে বেশ কিছুদিন থেকেই আমি বসফোরাসের ওপর দিয়ে আসা এবং যাওয়া জাহাজগুলোকে গোণা শুরু করেছিলাম। আমি গুণতাম রোমান ট্যাঙ্কারগুলো, সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজগুলো, ট্রাবজন থেকে আসা মাছ-ধরা নৌকোগুলো, বুলগেরিয়ান যাত্রীবাহী জাহাজগুলো, তুর্কী মেরিটাইম যাত্রীবাহী লাইনারগুলো, যেগুলো কৃষ্ণসাগরের দিকে যেত, সোভিয়েত আবহাওয়া দেখার জাহাজগুলো, চমৎকার ইটালিয়ান মহাসাগরীয় লাইনারগুলো, কয়লাবাহী নৌকোগুলো, ছোট রণতরীগুলো, জংধরা, রঙ-না-করা, অবহেলিত, ভার্নায় নথিভুক্ত মালবাহী জাহাজগুলো এবং জরাজীর্ণ জাহাজগুলো, যেগুলোর পতাকা আর কোন্ দেশের জাহাজ, তা অন্ধকারে ঢাকা থাকত। তার মানে এই নয় যে, আমি সব কিছুই গুণতাম। আমার বাবার মতো, আমিও যে মোটর লঞ্চগুলো বসফোরাসের ওপর দিয়ে এদিক-ওদিক যেত, যেগুলোতে ব্যবসায়ীদের কাজে নিয়ে যাওয়া হত আর সওদা-করা পঞ্চাশটা ব্যাগ সমেত মেয়েলোকদের নিয়ে যাওয়া হত, সেগুলোকে গ্রাহ্য করতাম না, আর গুণতাম না শহরের ফেরি নৌকোগুলোকে, যেগুলো উপকূল থেকে উপকূলে, ইস্তাম্বুলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, ছুটোছুটি করত, বিষণ্ন যাত্রীদের বয়ে নিয়ে যেত, যে যাত্রীরা আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে ধূমপান করে এবং চা পান করে নিজেদের যাত্রা সাঙ্গ করত; আমাদের বাড়ির আসবাবপত্রের মতোই, এগুলোই ছিল আমার প্রাত্যহিক জীবনের স্থায়ী জিনিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

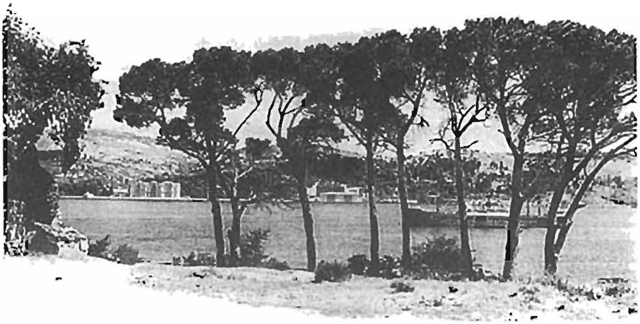

শিশু বয়সেই আমি এই জাহাজগুলো গুণতাম, অথচ এই জাহাজগুলো আমার মনে যে অস্থিরতা, অশান্তভাব এবং ক্রমবর্ধমান ভয় এনে দিত, সেটা গ্রাহ্য করতাম না। আমি ভাবতাম এই গোণাগুণির ব্যাপারটা আমার জীবনে শৃঙ্খলা এনে দিচ্ছে। কারণ প্রচণ্ড রেগে গেলে বা দুঃখ হলে যখন আমি নিজের কাছ থেকে, স্কুল থেকে, জীবনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম, তখন আমি জাহাজ গোণা একদম বন্ধ করে দিতাম। তখনই আমার মন চাইতো বিপর্যয়, আগুন, অন্যজীবন, অন্য ওরহানকে, খুব নিবিড়ভাবে।

কেমন করে আমার এই জাহাজ গোণার অভ্যাসটা হল, সেটা ব্যাখ্যা করলে ব্যাপারটা বোধগম্য হবে। ওই সময়– আমি ষাট-এর দশকের গোড়ার দিকের কথা বলছি– আমার বাবা, মা, দাদা ও আমি সিহাঙ্গির-এ আমার দাদাজীর একটা ছোট বসফোরাসের দিকে মুখ করা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। আমি প্রাথমিক স্কুলের শেষ বছরে, তার মানে আমার বয়েস তখন ছিল এগারো। মাসে একবার আমি আমার অ্যালার্ম ঘড়িটা (একটা ঘণ্টার ছবি ছিল ঘড়িটার গায়ে) ভোর হবার ঘণ্টা কয়েক আগে সেট করে রাখতাম আর রাত্রের শেষ প্রহরে ঘুম ভেঙে উঠে পড়তাম। আমরা শুতে যাবার আগে আগুনের স্টোভটা নিভিয়ে দেওয়া হত, আর আমি নিজে নিজে স্টোভ জ্বালাতে পারতাম না, তাই শীতের রাত্রে, শরীর গরম রাখার জন্যে আমি কদাচ-ব্যবহৃত কাজের লোকের ঘরে খালি বিছানায় চলে যেতাম, আমার তুর্কী ভাষার টেক্সট বইগুলো নিতাম আর স্কুলে যাবার আগে মুখস্থ করার জন্যে কবিতাটা আবৃত্তি করা শুরু করতাম।

'ও পতাকা, ও মহান পতাকা
উড়ছ আকাশে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কেউ কোনো প্রার্থনা বা কোনো কবিতা মুখস্থ করতে গেলে, জানে যে, কথাগুলোকে মাথার মধ্যে ঢোকানোর সময়, চোখের সামনে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর দিকে মনোযোগ না দেওয়া উচিত। যখন কথাগুলো মাথার মধ্যে একদম ছাপা হয়ে গেল, তখন মনটা স্মৃতিকে সাহায্য করতে পারে এমন দৃশ্য খুঁজে নিতে পারে। ঠান্ডা শীতের সকালে, আমি যখন চাদরের তলায় কাঁপতে কাঁপতে কবিতা মুখস্থ করছি, তখন আমি জানালা দিয়ে বাইরে বসফোরাসের দিকে তাকাতাম, একটা স্বপ্নের মতো অন্ধকারে বিছিয়ে আছে।

আমাদের বাড়ির নিচের চারতলা ও পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর মাঝখানকার ফাঁক দিয়ে বসফোরাসকে দেখতে পেতাম, প্যাঁকাটির মতো কাঠের বাড়িগুলোর ছাদ আর চিমনির ওপর দিয়ে দেখতাম, যে বাড়িগুলো পরবর্তী

AMARBOI.COM

দশবছরেই পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা হবে এবং সিহাঙ্গির মসজিদের গম্বুজগুলোর মাঝখান দিয়ে দেখতাম; ওই রকম সময়ে কোনো ফেরি চলাচল করত না, আর সমুদ্রকে দেখাত এত কালো যে, কোনো সার্চলাইট বা অন্য আলো এই কালো অন্ধকারকে বিদ্ধ করতে পারত না। দূরে এশিয়ান দিকটাতে হায়দার পাশার পুরোনো ক্রেনগুলো দেখতে পেতাম আর নিঃশব্দে চলে যাওয়া কোনো মালবাহী জাহাজের আলো দেখতে পেতাম। হালকা চাঁদের আলোয়, অথবা, কোনো একটা মোটর বোটের আলোয় কখনো কখনো দেখতাম বিশাল, জং-ধরা, গুগলি-শামুক-শ্যাওলা জড়ানো গাধাবোটগুলো, একটা দাঁড়টানা নৌকোয় একা একজন মেছুড়ে, কিজকুলেসির সাদা, ভুতড়ে আকার। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই সমুদ্রে ডুবে থাকত অন্ধকারে। এমন কি, যখন– সূর্যোদয়ের অনেক আগে– এশিয়ান দিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলো আর সাইপ্রেস-গাছ-ঘেরা কবরস্থানগুলো আবছা আবছা দেখা যেত, তখনো বসফোরাস থাকত কুচকুচে কালো– মনে হত চিরকালই বুঝি এই রকমই থাকবে।

অন্ধকারে আমি কবিতা মুখস্থ করতে থাকতাম, মনটা ব্যস্ত থাকত কবিতা আবৃত্তিতে আর অদ্ভুত সব স্মৃতি-আশ্রয়ী খেলায়। আর আমার চোখ আটকে থাকত একটা কিছুর ওপর যেটা বসফোরাসের স্রোতের টানে খুব ধীরে ধীরে সরে সরে যাচ্ছে– একটা অদ্ভুত দেখতে জাহাজ, একটা মাছ ধরা নৌকো, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে। যদিও আমি এই দৃশ্যটিতে মন দিতাম না, এবং আমার চোখ অভ্যাস মতো কাজ করে যেত,– চোখের সামনে দিয়ে যে বস্তুটি চলে যাচ্ছে, সেটি দেখে এবং সেটি কী বস্তু, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করার পর আমি নিজেকে বলতাম, হ্যাঁ, ওটা একটা মালবাহী জাহাজ, হ্যাঁ ওটা একটা মাছ-ধরার নৌকো, যেটা আলো জ্বালায়নি; হ্যাঁ ওটা একটা মোটর লঞ্চ, দিনের প্রথম যাত্রী নিয়ে এশিয়া থেকে ইউরোপের দিকে যাচ্ছে; হ্যাঁ ওটা একটা বহুদূরের সোভিয়েত বন্দর থেকে আসা পুরোনো যুদ্ধ জাহাজ...

এই রকম এক সকালে, যখন আমি যথারীতি কম্বলের তলায় কাঁপতে কাঁপতে কবিতা মুখস্থ করছি, আমার চোখে পড়ল একটা অবাক করা দৃশ্য, যে রকম আমি আগে কখনো দেখিনি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি ওখানে বসে ছিলাম, জমে গিয়েছিলাম ঠান্ডায়, আমার হাতে ধরা বইটার কথা মনেই ছিল না। একটা বিরাট অবয়ব কুচকুচে কালো সমুদ্র গহ্বর থেকে উঠে আসছে, বড় হচ্ছে, আরো বড় হচ্ছে, বিশাল আকৃতি ধারণ করছে আর কাছের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে, যে পাহাড় থেকে আমি দেখছি; এটা একটা বিশালকায়, একটা প্রাগৈতিহাসিক কিছু, আকার ও চেহারায় আমার রাত্রের দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা; একটা সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ! রূপকথার গল্পের মতো, রাতের কুয়াশা ফুঁড়ে উঠে আসা একটা বিশাল ভাসমান দুর্গ! ওটার ইঞ্জিন চলছিল খুব মৃদু,জাহাজটা যাচ্ছিল নিঃশব্দে, অতি ধীরে কিন্তু এত শক্তিশালী যে ওটার চলার শক্তিতে বাড়ির জানালার কাচ, কাঠের কাজ আর আসবাবপত্র কাঁপছিল; রান্নার স্টোভের পাশে ঝুলিয়ে রাখা চিমটে, সাঁড়াশীগুলো, পাত্রগুলো ও সসপ্যানগুলো, যেগুলো অন্ধকার রান্নাঘরে ঝোলানো ছিল, আমার মা, বাবা, দাদা, যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল, সেই ঘরের জানালাগুলো, সব থরথর করে কাঁপছিল এবং যে পাথরের গলিপথ বাড়ির পাশ দিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে, সেটাও কাঁপছিল। এমনকি, বাড়িগুলোর সামনে রাখা জঞ্জাল ফেলার টিনগুলোও এমন ঝনঝন করছিল যে মনে হচ্ছিল এই শান্ত পাড়াটায় বুঝি ছোটখাট ভূমিকম্প হচ্ছে। বোঝা গেল যে, ঠান্ডা লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে ইস্তাম্বুলের অধিবাসীরা যে ফিসফিস করে আলোচনা করত, তা সত্যি। রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বড় যুদ্ধজাহাজগুলো মাঝরাতের পর বসফোরাস দিয়ে অন্ধকারের আড়ালে পার হয়ে যাচ্ছে।

এক মুহূর্তের জন্যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ভাবলাম, কিছু একটা করতে হবে। সমস্ত শহর ঘুমোচ্ছে আর আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে এই সোভিয়েত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাজটাকে দেখেছে, না জানি কোথায় গিয়ে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ডই না করবে। আমাকে এক্ষুনি কাজে লেগে পড়তে হবে, ইস্তাম্বুলকে সতর্ক করে দিতে হবে, সারা পৃথিবীকে সাবধান করে দিতে হবে। আমি পত্রিকাগুলোয় দেখেছি, অনেক সাহসী নায়ক ছেলেরা এই রকম কাজ করে, সারা শহরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বন্যার হাত থেকে, আগুনের হাত থেকে, যুদ্ধবাজ সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু আমার গরম বিছানা ছেড়ে উঠে যাবার মতো ইচ্ছাই হল না।

যখন দুশ্চিন্তা আমাকে গ্রাস করেছে, তখন একটা সাময়িকভাবে আটকানোর বুদ্ধি মাথায় এল, যেটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল; আমি পুরো মনঃসংযোগ করলাম, মুখস্থ করতে করতে এমনিতেই মাথাটা খুব পরিষ্কার কাজ করছিল, সোভিয়েত জাহাজটার ওপর, গুণলাম আর মুখস্থ করলাম। আমি কী বলতে চাইছি? আমি ঠিক সেই জিনিসই করলাম, যা প্রবাদপ্রতিম আমেরিকান গুপ্তচররা করত, যারা বসফোরাসের ওপর দিকে পাহাড়ের ওপর লুকিয়ে থাকত বলে রটনা আছে, আর সেখান থেকে প্রতিটি কমিউনিস্ট জাহাজ যাওয়ার সময় ফটো তুলে রাখত (এটা হয়তো আরও একটা ইস্তাম্বুল প্রবাদ, যেটার অন্তত ঠান্ডা যুদ্ধের সময়টায় কিছু বাস্তব অস্তিত্ব থাকতেও পারে); আমি যে জাহাজটা দেখলাম, তার প্রতিটি অংশ মনে মনে সূচিবদ্ধ করলাম। আমার কল্পনায়, অন্য জাহাজের যা যা অংশ আছে, তার সঙ্গে এই জাহাজের অংশগুলো মেলালাম, বসফোরাসের স্রোত এবং বোধহয় যে অনুপাতে পৃথিবী ঘুরছে, তা-ও মেলালাম। এই সব গণনা করার পর আমি মনে মনে ওই বিশাল আকৃতির জাহাজটাকে একটা সাধারণ জাহাজে পরিণত করে ফেললাম এবং শুধু সোভিয়েত জাহাজই নয়; উল্লেখ করার মতো সব জাহাজগুলোকে গুণে, আমি আমার পৃথিবীর ছবি এবং সেখানে আমার নিজের অবস্থানকে নিশ্চিত করে ফেললাম। তাহলে স্কুলে আমাদের যা শেখান হত, তা সত্যি; বসফোরাসই হচ্ছে মূল চাবি, ভৌগোলিক-রাজনৈতিক পৃথিবীর হৃৎপিন্ড, আর সেইজন্যেই পৃথিবীর সমস্ত দেশ এবং তাদের সেনাবাহিনী এবং বিশেষ করে রাশিয়ানরা আমাদের এই সুন্দর বসফোরাসের দখল নিতে চায়।

আমার সারা জীবন, ছেলেবেলা থেকে শুরু করে, আমি সর্বদাই বসফোরাসের ওপর দিকে পাহাড়ে বাস করেছি, যেখান থেকে বসফোরাসকে দেখা যায়, যদিও দূর থেকে এবং অ্যাপার্টমেন্টগুলোর ফাঁক দিয়ে, মসজিদের ছাদের ডোম ও পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে। বসফোরাসকে দেখতে পাওয়া, দূর থেকে হলেও ইস্তাম্বুলীয়দের পক্ষে যেন একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার এবং এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, জানালাগুলো কেন সমুদ্রের দিকে মুখ করা, মসজিদের মিহরাব-এর মতো, গীর্জার বেদির মত, এবং সিনাগগের টেভান-এর মতো এবং কেন আমাদের বসফোরাসের দিকে মুখ করা বসার ঘরে সব চেয়ার, সোফা এবং খাবার টেবিল এমনভাবে সাজানো, যাতে বসফোরাসের দৃশ্য দেখা যায়। বসফোরাসের দৃশ্য দেখার যে আবেগ-প্রবণতা, তার আরেকটি ফল : যদি তুমি মারমারা থেকে আসা কোনো জাহাজে থাক, দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবে ইস্তাম্বুলের লাখ লাখ লোভী জানালা, একটা আর একটার দৃশ্য আটকে দিচ্ছে, নির্দয়ভাবে একটা আরেকটার ঘাড়ে চেপে ভীড় করেছে, যাতে তোমার জাহাজটাকে ভালোমতো দেখতে পায় এবং যে সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে জাহাজটা ভেসে চলেছে, তাও দেখতে পায়।

বসফোরাসের ওপর দিয়ে যাওয়া জাহাজগুলোকে গোণা একটা অদ্ভুত অভ্যাস হতে পারে, কিন্তু যখন থেকে আমি এই ব্যাপারটা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করতাম, তখন আমি আবিষ্কার করলাম যে, এই অভ্যাসটা যে কোনো বয়েসি ইস্তাম্বুলীর ক্ষেত্রেই অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে কোনো একটা দিনে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিয়মিত জানালার কাছে গিয়ে এবং ব্যালকনিতে গিয়ে জাহাজ গুণে হিসাব রাখে এবং আমরা এটা করি আগামী দুর্যোগ, মৃত্যু এবং বিধ্বংসী বিপর্যয় সম্পর্কে কিছু আগাম আভাস পাবার জন্যে, যা এই বসফোরাস প্রণালী দিয়ে

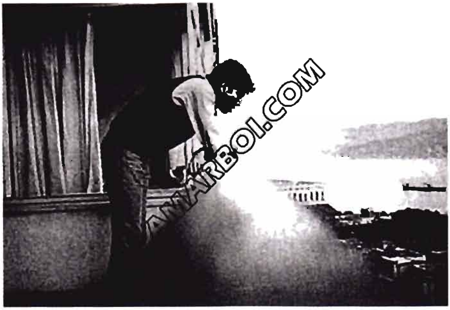

আমাদের জীবনকে ছারখার করে দিতে, আসতেও পারে, আবার না-ও আসতে পারে। বেসিকতাস-এ, যেখানে আমার বয়ঃসন্ধিকালে আমরা গিয়েছিলাম এবং বাস করতাম, সেখানে আমাদের একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন যিনি প্রতিটি চলমান জাহাজের বিবরণ এত নিখুঁতভাবে, অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লিখে রাখতেন, যে মনে হবে, ওটাই যেন তার চাকরি। এবং আমার নার্সারি স্কুলের একজন সহপাঠী ছিল, যে মনে করত যে, প্রতিটি সন্দেহভাজন জাহাজ– যেগুলো পুরোনো, জং–ধরা, বাজেভাবে মেরামত করা, বা কোন্ দেশের জাহাজ, জানা যায় না– হয় সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র অমুক অমুক দেশের বিদ্রোহীদের কাছে চোরাচালান করছে, অথবা অন্য কোনো দেশে পেট্রল চালান করছে, যাতে পৃথিবীর বাজারে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সর্বনাশ করা যায়।

টেলিভিশন আসার আগেকার সময়ে, এটা ছিল সময় কাটানোর একটা মনোরম পথ। কিন্তু আমার জাহাজ গোণার অভ্যাস, যা আরো অনেকেরই ছিল, আসলে ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় থেকে উদ্ভুত, যেটা শহরের আরো অনেকেরই ক্ষতি সাধন করত। মধ্য প্রাচ্যের সমস্ত ধনসম্পদ তাদের শহরগুলো থেকে বেরিয়ে যাওয়া দেখে, অটোমান সাম্রাজ্যের রাশিয়ার কাছে এবং পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে পরাজয়, যা তাদের শহরকে দারিদ্র্য, বিষণ্ণতা এবং ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল, এবং ধীরে ধীরে এই সাম্রাজ্যের অবনতি দেখে, ইস্তাম্বুলবাসীরা নিজেদের অন্তর্মুখী, জাতীয়তাবাদী করে তুলেছিল; আমরা সেই জন্যেই যা কিছু নতুন, তাকে সন্দেহের চোখে দেখতাম, বিশেষ করে সেই সব জিনিস যেগুলোর মধ্যে বিদেশি বিদেশি গন্ধ থাকত, (যদিও সেই সব জিনিস আমরা ব্যগ্রভাবে কামনা করতাম)। বিগত একশ পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা ব্যাপক বিপর্যয়ের পূর্বানুমান করে ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি, যে বিপর্যয় আমাদের নতুন করে পরাজয়ের সম্মুখীন করবে এবং ধ্বংস নিয়ে আসবে। এই ভয় এবং বিষণ্ণতার বিরুদ্ধে লড়াই করাটা এখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই বসফোরাসের ওপর অলস চিন্তা আমাদের কাছে কর্তব্য বলে মনে হয়।

যে ধরনের বিপর্যয় এই শহর মনে রেখেছে এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যার জন্য অপেক্ষা করে, সেগুলো হল, বসফোরাসের বুকে জাহাজ দুর্ঘটনা। সেই সব সময়, শহরের সকলেই একত্রিত হয় এবং শহরটিকে একটা বড় গ্রাম বলে তখন মনে হয়। কারণ এই ধরনের বিপর্যয়ে দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম-নীতি মুলতুবি রাখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ওরা 'আমাদের মতো লোকেদের' বাদ দিয়ে দেয় এবং তাই আমি এসব উপভোগ করতাম (অবশ্য নিজেকে অপরাধীও মনে হত)।

আমার বয়স তখন আট বছর। সেই রাত্তিরে, প্রচণ্ড আওয়াজ আর নক্ষত্র খচিত আকাশের বুক বিদীর্ণ করা আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আমি অনুমান করেছিলাম, যে দুটো পেট্রল বোঝাই ট্যাঙ্কার জাহাজ, বসফোরাসের মাঝখানে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে এবং একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেছে; কিন্তু আমি যতটা না ভয় পেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। অনেক পরে আমরা টেলিফোনে জানতে পারি যে, জ্বলন্ত জাহাজগুলো থেকে পারের আশেপাশের পেট্রোলিয়াম ডিপোগুলোয় বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল এবং একটা আশঙ্কা ছিল যে, এই আগুন ছড়িয়ে গিয়ে পুরো শহরটাকে গ্রাস করে নিতে পারে। ওই যুগের দর্শনীয় সব অগ্নিকাণ্ডের মতো, এখানেও একটা পূর্ব নির্ধারিত বিন্যাস ছিল। প্রথমে আমরা কিছু আগুনের শিখা আর কিছু ধোঁয়া দেখেছিলাম, তারপরে গুজব ছড়াতে লাগল, বেশির ভাগই মিথ্যা এবং তারপর মায়েদের, মাসি-পিসিদের বারণ করা সত্ত্বেও, আগুনটা নিজেরা দেখবার অদম্য ইচ্ছা আমাদের ঘিরে ধরল।

সে রাতে আমার চাচা আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে, গাড়িতে তুলে, বসফোরাসের পেছন দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন তারাবিয়া-তে। বড় হোটেলটার (তখনো নির্মীয়মান) ঠিক সামনেই, রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে আগুনটার মতোই আমি একাধারে দুঃখ ও আনন্দ পেয়েছিলাম। পরে আমার এক ফুটানিবাজ স্কুলের বন্ধু যখন বলল যে, ওরা রাস্তার পুলিশের ঘেরার ভেতর দিয়ে আরো এগিয়ে গিয়েছিল, কারণ ওর বাবা একটা কার্ড দেখিয়ে 'প্রেস' বলে চিৎকার করেছিল, তখন আমার খুব হিংসা হয়েছিল। এবং তাই ১৯৬০ সালের শরৎকালের এক রাত্রে ভোর হবার ঠিক আগে, আমি বসফোরাসকে জ্বলতে দেখেছিলাম, একটা কৌতূহলী, এমনকি খুশি খুশি মানুষের ভীড়, পায়জামা পরা, তাড়াতাড়ি বোতাম আঁটা প্যান্ট আর পায়ে চটি পরা লোকেরা, কোলে বাচ্চা, হাতে ব্যাগ, এরাও ছিল আমার সাথে। পরবর্তীকালে যখন প্রায়ই বিশাল অগ্নিকাণ্ডে, যাতে 'ইয়ালি'গুলো, জাহাজগুলো পুড়ে ধ্বংস হয়ে যেত এবং কখনো কখনো পরবর্তী বছরগুলোতে সাগরের বুকের ওপরেও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলত, তখন কোথা থেকে জানি না, রাস্তায় ভীড়ের মধ্যে বিক্রিওয়ালা, ফেরিওয়ালারা উদয় হত, পেপার হালুয়া, সিমিটস, জলের বোতল, ভাজাভুজি, মাংসের বড়া এবং সরবৎ ইত্যাদি বিক্রি করত। খবরের কাগজের সংবাদ অনুযায়ী, 'পিটার জোরানিচ' নামে একটা তৈলবাহী জাহাজ সোভিয়েত বন্দর ট্ভাপ্সে থেকে দশ টন গরম-করার তেল নিয়ে যুগোস্লাভিয়া যাওয়ার পথে বসফোরাসের ওপর ভুল রাস্তায় যাচ্ছিল আর তখনই একটা গ্রিক তৈলবাহী জাহাজ, যার নাম 'ওয়ার্ল্ড হারমনি', যে সঠিক রাস্তায় সোভিয়েত ইউনিয়নে তেল ভরতে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা লাগার দু'এক মিনিট পরেই যুগোস্লাভিয়ান তৈলবাহী জাহাজটা থেকে যে তেল ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, তাতে এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় যে, সেই শব্দ সারা ইস্তাম্বুল শহরে শোনা গিয়েছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং নাবিকরা সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজ পরিত্যাগ করার জন্যই হোক, কিংবা বিস্ফোরণে সকলেই মারা যাওয়ার ফলেই হোক, দুটো জাহাজের কোনটাতেই নিয়ন্ত্রণ করার মতো লোক ছিল না, এবং তাই দুটোই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে, বসফোরাসের তীব্র, রহস্যময় স্রোতে এবং ঘুর্নীতে পড়ে পাক খেতে থাকে; একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে, দুলতে দুলতে, দুটো জাহাজই আগুনের গোলা হয়ে ওঠে এবং কান্‌লিকা, এমিরগান ও ইয়েনিকয়-এর 'ইয়ালি'গুলোর, চুবুক্‌লুর পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসের ডিপোর এবং বেকোজ উপকূলের লাইন করা কাঠের বাড়িগুলোর কাছাকাছি চলে আসে ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যে উপকূলকে মেলিং এক সময় পৃথিবীতে একটি স্বর্গ বলে বর্ণনা করেছিলেন, এবং এ এস হিসার বলেছিলেন, 'বসফোরাস সভ্যতা', সে জায়গাটা আগুনে জ্বলে গিয়েছিল এবং কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল।

যেখানেই জাহাজ দুটো পারের খুব কাছাকাছি চলে আসছিল, লোকেরা তাদের 'ইয়ালি' ও কাঠের বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছিল, এক বগলের তলায় বিছানা, অন্য বগলে ছেলেমেয়ে, তারা যত দ্রুত পারে, তীর ছেড়ে ভেতরের দিকে দৌড়চ্ছিল। যখন যুগোস্লাভিয়ান জাহাজটা এশিয়ার দিক ছেড়ে ইউরোপের দিকে ভাসতে ভাসতে এল, তখন ওটা 'তারসুস' নামে একটা তুর্কী যাত্রীবাহী জাহাজ, যেটা ইস্তিনিয়ে-তে নোঙর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা ছিল, তার সঙ্গে ধাক্কা খেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এই জাহাজটাতেও আগুন ধরে গেল। জ্বলন্ত জাহাজগুলো যখন 'বেকোজ' পার হয়ে যাচ্ছিল, তখন বিছানা বগলে আর রাতের পোশাকের ওপরে তাড়াতাড়িতে চাপানো রেনকোট পরা জনতার ভীড় হুড়মুড় করে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছিল। সমুদ্র তখন তীব্র, উজ্জ্বল হলদে আগুনের শিখায় আলোকিত। জাহাজগুলো গলন্ত লোহার বিশাল বিশাল স্তূপ, তাদের মাস্তলগুলো, ধোঁয়া বেরোনোর চিমনিগুলো আর জাহাজের ওপরের ডেক ডাইনে-বাঁয়ে হেলতে হেলতে গলে যাচ্ছে। আকাশে একটা লালচে আলোর আভা, যেন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই এক একটা বিস্ফোরণ হচ্ছে আর জ্বলন্ত লোহার বিশাল বিশাল পাত সমুদ্রে পড়ে ভাসছে; পার থেকে আর পাহাড় থেকে, মানুষজনের চিৎকার, চেঁচানি, আর্তনাদ আর বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সাইপ্রেস আর পাইন-এর তরুবীথি, মালবেরি গাছের ছায়ায় ঢাকা আর হানিসাক্ল্ ও জুডাস ফুলের সুগন্ধে ভরা বাগিচাগুলোর এই যে স্বর্গ, এই চন্দ্রালোকিত জগতে যখন গ্রীষ্মকালের সায়াহ্নে, সমুদ্র সিল্কের মতো চমকাতে থাকে, বাতাসে অনুরনণ তোলে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, একটা তরুণ যুবক ধীরে ধীরে দাঁড় বেয়ে নৌকোর গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে পথ করে চলে যায়, তার দাঁড়ের ডগায় রূপোলি জলবিন্দু ঝলকায়, তখন একটি হৃদয়-বিদারক অথচ চেতনা– জাগরুক ভাবনা আসে, যে এই স্বর্গ ধোঁয়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে, যখন লোকেরা রাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক পরে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে রক্তিম আকাশের পটভূমিতে তখনো দাঁড়িয়ে থাকা অবশিষ্ট কাঠের 'ইয়ালি'গুলো ছেড়ে পালাতে থাকবে।

এই বিপর্যয় হয়তো রোধ করা যেত, পরে আমি ভাবতাম, যদি আমি জাহাজ গোণা চালিয়ে যেতাম। শহরের ওপর নেমে আসা সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী মনে করে, আমার এদের কাছ থেকে পালানোর ইচ্ছা হত না এবং প্রকৃতপক্ষে এসবের যত কাছে সম্ভব যেতে চাইতাম, নিজের চোখে এই বিপর্যয়গুলো দেখতে চাইতাম। পরে অন্যান্য অনেক ইস্তাম্বুলবাসীর মতো আমি আরো বিপর্যয় আসুক, এটা চাইতাম, এবং সত্যি সত্যিই পরবর্তী বিপর্যয় এসে গেলে, নিজের ওই ইচ্ছার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করতাম।

এমনকি তানপিনার– যার বইগুলো, অটোমান সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা দ্রুত পাশ্চাত্যধর্মী হয়ে যাওয়া দেশ হওয়ার অর্থ কী, তার একটা গভীর বোধ এনে দেয় এবং যিনি দেখান যে কীভাবে শেষকালে লোকেরা নিজেরাই, তাদের নির্বুদ্ধিতা ও দুর্দশার মধ্যে দিয়ে অতীতের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে– তারাই একটা পুরোনো কাঠের প্রাসাদ আগুনে পুড়ে ধুলোয় মিশে যাওয়ার দৃশ্য দেখে আনন্দ পায় বলে স্বীকার করে এবং 'ফাইভ সিটিজ' বইটার ইস্তাম্বুল অধ্যায়ে তিনি নিজেকে নিরো-র সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেমন গ্যেটে করেছিলেন। আরো অদ্ভুত ব্যাপার, কয়েক পাতা আগে, তানপিনার শোকাহতের মতো লিখছেন : 'চোখের সামনে দেখছি, একটার পর একটা শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম, নুন-পাথর যেমন জল লেগে দ্রুত গলে যায়, তেমনি গলে যাচ্ছে, আর শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকছে শুধু ছাই আর ধূলোর স্তূপ।'

AMARBOI.COM

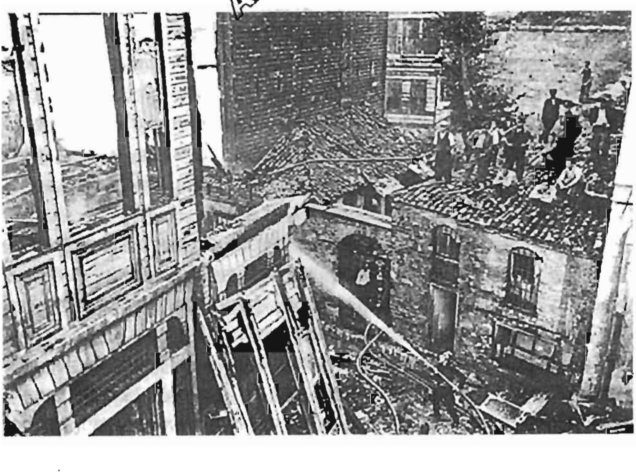

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তানপিনার এই লাইনগুলো লিখেছিলেন ১৯৫০-এ, যখন উনি 'মুরগি উড়তে পারে না গলি'-তে বাস করতেন– সেই একই রাস্তা, যেখানে আমি সোভিয়েত জাহাজ গোণার সময় বাস করতাম। এইখান থেকেই উনি সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখেছিলেন, যাতে রাজকুমারী সাবিহা'র সমুদ্র তীরবর্তী প্রাসাদটা ধ্বংস হয়ে যায়, এবং সেই কাঠের বাড়িটাও ধ্বংস হয়ে যায়, যেখানে এক সময় অটোমান বিধান সভা বসত এবং পরে যেটাকে ফাইন আর্টস একাদেমি করা হয়, যেখানে উনি একজন শিক্ষক ছিলেন। আগুন জ্বলেছিল এক ঘণ্টা ধরে, প্রতিটি নতুন নতুন বিস্ফোরণের সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হচ্ছিল এবং 'লাফিয়ে ওঠা লেলিহান অগ্নিশিখা এবং ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি শেষ বিচারের দিন ঘনিয়ে এসেছে।' মহম্মদ-২-এর রাজ্যকালের সবচেয়ে সুন্দর বাড়িগুলোর একটার, তার অমূল্য সংগ্রহ সহ (স্থপতি সেদাদ হাক্কি এলডেম, যার সংগ্রহ এবং অটোমান স্মৃতিস্তম্ভগুলোর বিশদ নক্সা, যা তদানীন্তন কালে শ্রেষ্ঠ বলা হত, সেই সংগ্রহ সহ) ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য দেখে তিনি হয়তো যে হতাশা অনুভব করেছিলেন, তার সঙ্গে তিনি নিজের আনন্দটা মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, কারণ পরে তিনি বলেছেন, অটোমান পাশারা তাদের সময়কার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডগুলো দেখে কেমন একই ধরনের আনন্দ পেত। কেউ 'আগুন!' চিৎকার করেছে, শুনলেই তারা তাদের ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলোতে লাফ দিয়ে চড়ে বসত আর আগুনের জায়গায় চলে যেত, তানপিনার অপরাধী ভঙ্গিতে আমাদের বলছেন, আর সেই পাশারা শীত কাটানোর জন্য সঙ্গে কী কী জিনিস নিত, তারও তালিকা দিচ্ছেন; কম্বল, লোমের চাদর এবং– যদি ওই অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে চলে তাহলে তার জন্য– স্টোভ এবং কফি বানানোর ও খাবার গরম করার জন্য বাসনপত্র।

কেববলমাত্র পাশারা, লুটেরা-রা, চোরেরা এবং বাচ্চারাই পুরোনো ইস্তাম্বুলে অগ্নিকাণ্ড দেখতে ছুটত না; পশ্চিমী পর্যটক লেখকরাও এই অগ্নিকাণ্ড দেখা এবং বর্ণনা করার প্রয়োজন অনুভব করত। এই রকম একজন লেখক হলেন থিওফিল গ্যেটে, যিনি ১৮৫২ সালে তাঁর দু'মাস ইস্তাম্বুলে অবস্থিতির মধ্যে পাঁচটা অগ্নিকাণ্ড দেখেছিলেন এবং সবগুলোকেই স্বর্গীয় আনন্দের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। (তিনি বিওগলু কবরস্থানে বসে একটা কবিতা লিখছিলেন, যখন প্রথম অগ্নিকাণ্ডের খবর তাঁর কাছে পৌঁছয়।) যে আগুনগুলো রাত্রে লাগত, সেগুলো দেখা তিনি বেশি পছন্দ করতেন, কারণ দৃশ্যটা রাত্রে বেশি ভালো দেখা যেত। গোল্ডেন হর্ন-এর একটা রঙ কারখানায় আগুন লেগে যে বহুবর্ণের অগ্নিশিখা ফেটে বেরোচ্ছিল, তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, 'অভূতপূর্ব দৃশ্য' বলে, এবং তাঁর চিত্রশিল্পীর চোখ সমস্ত খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগী ছিল, সমুদ্রের জাহাজগুলোর গায়ে আলোছায়ার খেলা, ফাটতে-থাকা কড়ি-বরগাগুলো, আগুন দেখতে জড়ো হওয়া আন্দোলিত জনতার ভীড়, কাঠের বাড়িগুলোয় দুম করে আগুন ধরে যাওয়া। পরে তিনি ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা ভস্মাবশেষ দেখতে যেতেন এবং দেখতেন যে, শয়ে শয়ে পরিবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দিনের মধ্যে কোনোরকমে মাথা গোঁজার আশ্রয় বানিয়ে কেমন করে আছে, হাতের কাছে যা পেয়েছে, কার্পেট, গদি, বালিশ, বাসন-পত্র, যেগুলো আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে, তাই নিয়ে। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এরা এদের দুর্ভাগ্যকে 'অদৃষ্ট' বলে মেনে নিয়েছে, তখন তিনি ভাবলেন যে, তিনি আরো একটা অদ্ভুত তুর্কী মুসলিম প্রথা আবিষ্কার করলেন।

যদিও অটোমান শাসনকালের পাঁচশ বছরে প্রচুর এবং ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, তবু উনবিংশ শতাব্দীতেই বিশেষ করে, লোকে এই অগ্নিকাণ্ডের জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। ইস্তাম্বুলের সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলোয় কাঠের বাড়ির অধিবাসীরা, অগ্নিকাণ্ডের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব বলে মনে তো করতই না, উপরন্তু ভাবত, এটা একটা ভয়ঙ্কর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, যার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যদি অটোমান সাম্রাজ্যের পতন নাও হত, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে অগ্নিকাণ্ডগুলো শহরকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল,– হাজার হাজার বাড়ি, পুরো মহল্লাগুলো, শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জ্বলে খাক হয়ে গিয়েছিল, যাতে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন, অসহায়, কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিল,– তাতে সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে দিত এবং অতীতের গৌরবকে মনে রাখার মতো কিছুই থাকত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যারা ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে শহরের শেষ 'ইয়ালি'গুলো, প্রাসাদগুলো এবং জরাজীর্ণ কাঠের বাড়িগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে দেখেছিলাম, তাতে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তার শেকড় ছিল একটা আধ্যাত্মিক যন্ত্রণার মধ্যে, যেটা অটোমান পাশাদের থেকে আলাদা ছিল, কারণ তারা স্রেফ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার আনন্দ পেত; এটাই হচ্ছে অপরাধবোধ, ক্ষতি এবং ঈর্ষ্যা, যা আমরা অনুভব করতাম একটা মহান সংস্কৃতির সামান্য অবশিষ্টাংশেরও হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখে এবং একটা মহান সভ্যতার, যার উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা বা প্রস্তুতি আমাদের নেই, অপমৃত্যু দেখে, কারণ আমরা ইস্তাম্বুলকে একটা বিবর্ণ, দরিদ্র, পশ্চিমী শহরের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুকরণে পরিণত করবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার শিশুকালে এবং যৌবনে, যখনই কোনো বসফোরাস 'ইয়ালি'তে আগুন ধরে যেত, সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশে মানুষের ভীড় জমে যেত এবং যারা আরো কাছ থেকে দেখতে চায়, তারা দাঁড় টানা নৌকোয় কিংবা মোটর বোটে চড়ে সমুদ্র থেকে দেখত। আমার বন্ধুরা এবং আমি সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পরকে ফোন করে দিতাম, তারপর মোটর গাড়িতে চেপে, ধরা যাক, এমিরগান-এ চলে যেতাম এবং গাড়িগুলোকে ফুটপাথে লাগিয়ে টেপডেক বাজিয়ে (তখনকার ফ্যাশন) 'ক্রিডেন্স ক্লিয়ারওয়াটার রিভাইভাল' শুনতাম, পাশের চা-দোকানে অর্ডার দিয়ে চা, বিয়ার এবং চিজ টোস্ট আনিয়ে নিতাম আর এশিয়ান উপকূলের সেই রহস্যময় জ্বলন্ত আগুনের উর্ধ্বমুখী লেলিহান শিখা দেখতাম।

গল্প করতাম, আগেকার দিনে পুরোনো কাঠের বাড়িগুলোর কড়ি-বর্গার পেরেকগুলো কেমন আগুনে ফেটে জ্বলন্ত অবস্থায় এশিয়ার দিকের আকাশে উঠে বসফোরাস পার হয়ে ইউরোপিয়ান উপকূলের অন্য কাঠের বাড়িগুলোর ওপর পড়ে আগুন ধরিয়ে দিত। অবশ্য আমরা আমাদের হাল আমলের মোহময় আকর্ষণ সম্বন্ধেও কথাবার্তা বলতাম, রাজনৈতিক গল্প-গুজবগুলোর আদান প্রদান করতাম, ফুটবলের খবরাখবর নিতাম এবং আমাদের বাবা-মা-রা যে সব বোকামির কাজগুলো করতেন, সে সম্পর্কে আলোচনা অভিযোগ তো ছিলই। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, যদি একটা কালো তৈলবাহী জাহাজ ওই জ্বলতে থাকা বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে চলে যেত, কেউ তাতে মনোযোগ দিত না, গোনা তো দূরের কথা; কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ বিপর্যয় তো ঘটেই গেছে। আগুন যখন একদম উঁচুতে, আর কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে, তখন আমরা চুপ করে যেতাম এবং আমি কল্পনা করে নিতাম যে, আমরা প্রত্যেকেই অদূরে ঘাপটি মেরে থাকা একটা বিশেষ নিজস্ব বিপর্যয়ের কথা ভাবছি।

আর একটা নতুন বিপর্যয়, এমন একটা বিপর্যয়, যেটা ইস্তাম্বুলের অধিবাসীরা জানে যে, বসফোরাসের দিক থেকেই আসবে। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই বেশির ভাগ সময় এই সব ভাবতাম। সকালে, ভোরের দিকে, একটা জাহাজের ভোঁ আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাত। যদি দ্বিতীয় একটা ভোঁ শুনি– লম্বা এবং গম্ভীর এবং এত শক্তিশালী যে, চারপাশের পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি জাগত,– আমি বুঝে যেতাম যে, প্রণালীতে কুয়াশা জমে গেছে। কুয়াশাবৃত রাত্রিতে, কিছুক্ষণ পরে পরেই, আহিরকাপি বাতিঘর থেকে বিষণ্ন ভোঁ শুনতে পেতাম, যেখানে বসফোরাস, মারমারাতে গিয়ে পড়েছে। এবং ঘুমের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে আমার মনের মধ্যে একটা বিশাল জাহাজের অবয়ব ফুটে উঠত, যেটা বিশ্বাসঘাতক স্রোতের মধ্যে পথ খুঁজে নেওয়ার লড়াই চালাচ্ছে।

এই জাহাজটা কোন্ দেশে নথিভুক্ত, কত বড় এই জাহাজটা, কী মাল নিয়ে যাচ্ছে? পাইলটের সঙ্গে আর কতজন জাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে এবং ওরা এত আশঙ্কিত কেন? ওরা কি চোরা স্রোতের মধ্যে পড়েছে, নাকি কুয়াশার মধ্যে থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে ধেয়ে আসা একটা কালো আবছায়া দেখতে পেয়েছে? ওরা কি নিজেদের সমুদ্র পথ থেকে অন্যদিকে সরে গেছে এবং যদি তাই হয়, তাহলে কি কাছাকাছি যদি অন্য কোনো জাহাজ থাকে, তাকে সতর্ক করার জন্য ভোঁ বাজাচ্ছে? কোনো ইস্তাম্বুলবাসী যখন অশান্ত ঘুমের মধ্যে জাহাজের ভোঁ শোনে, তখন সেই জাহাজের ওপর যে সব লোক রয়েছে, তাদের জন্য যে করুণা অনুভব করে, তা ওদের বিপর্যয় সম্পর্কে যে ভীতি, তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে বসফোরাসে সব কিছু ছয়ছয় হয়ে যাচ্ছে, এই রকম ভয়াল স্বপ্নের সৃষ্টি করে। ঝড়ের দিনে, আমার মা বলতেন, 'এই আবহাওয়ায় যারা সমুদ্রে গেছে, তাদের ঈশ্বর রক্ষা করুন!' অন্যদিকে যাদের মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, তাদের সবচেয়ে ভালো ওষুধ হল, অনেক দূরে কোথাও কোনো বিপর্যয় ঘটা, যা তাদের জীবনকে স্পর্শ করতে পারবেনা। ইস্তাম্বুলে যাদের রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, তাদেরও জাহাজের ভোঁ গুণতে গুণতে ফের ঘুমোনো উচিত। এবং হয়তো তাদের স্বপ্নে, তারা কল্পনা করে যে, তারা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভেসে যাওয়া একটা জাহাজে রয়েছে এবং কোনো বিপর্যয়ের মুখে পড়তে চলেছে।

তাদের স্বপ্ন যাই হোক না কেন, বেশির ভাগ লোকেরই সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর, আগের রাত্তিরে যে জাহাজের ভোঁগুলো শুনেছে, তার কথা মনে থাকে না। ওগুলো অন্যান্য দুঃস্বপ্ন যেমনভাবে ভুলে যায়, তেমনি ভাবেই ভুলে যায়। কেবল শিশুরা, আর শিশুর মনোবৃত্তি সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্কদের এই সব কথা মনে থাকে। তারপর যে কোনো একটা সাধারণ দিনে, হয়তো কোনো পেস্ট্রির দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে অথবা মধ্যাহ্নের আহার করতে করতে, এই রকম লোক হঠাৎ বলে উঠবে, 'গত রাতে একটা কুয়াশার ভোঁ আমার একটা স্বপ্নের ঘুম ভেঙে দিল।'

তখনই আমি জানতে পারি যে, বসফোরাসের ওপরে পাহাড়ে বসবাসকারী লাখ লাখ লোক, কুয়াশার রাতে একই রকম স্বপ্ন দেখে কষ্ট পায়।

আরও একটা জিনিস, আমরা, যারা উপকূলে বাস করি, তাদের তাড়া করে বেড়ায়। এটা ওই বিশাল তৈলবাহী জাহাজের অগ্নিকাণ্ডের মতোই আরেকটি দুর্ঘটনার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়িত, মন থেকে মোছা যায় না। এক রাত্তিরে, কুয়াশা এত ঘন ছিল যে, দশ মিটার দূরে কিচ্ছু দেখা যায় না, ঠিক মত বললে, ১৯৬৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভোর চারটের সময়, একটা ৫,৫০০ টনের সোভিয়েত মালবাহী জাহাজ, যেটা কিউবাতে সেনাবাহিনীর রসদ নিয়ে যাচ্ছিল, বালটিমিলান-এর অন্ধকারে দশ মিটারে ভেতরে ঢুকে যায় এবং দুটো কাঠের তৈরি 'ইয়ালি' গুঁড়িয়ে দেয়, তিনজনের মৃত্যু হয়।

'একটা ভয়াবহ আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। আমরা ভাবলাম, 'ইয়ালি'-র ওপর বুঝি বাজ পড়েছে; বাড়িটা দু'টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। কপাল জোরে আমরা বেঁচে যাই। যখন হুঁশ ফিরে পেলাম, আমরা চারতলার বসার ঘরে গেলাম আর একটা বিশাল তৈলবাহী জাহাজের মুখোমুখি হলাম।'

খবরের কাগজে বেঁচে যাওয়া মানুষের এই বর্ণনার সঙ্গে তাদের বসার ঘরে জাহাজটার ছবিও ছাপা হয়; দেয়ালে ঝুলছিল, ওদের পাশা দাদাজীর ফটোগ্রাফ, সাইড বোর্ডের ওপর বসানো ছিল একটা আঙুর ভর্তি বাটি; অর্ধেকটা ঘর ভেঙে গিয়েছিল বলে কার্পেটটা পর্দার মতো নিচের দিকে ঝুলছিল আর হাওয়ার ঝাপটায় দুলছিল, এবং ওখানে, সাইড বোর্ড, টেবিল, ফ্রেম-বাঁধানো ছবি আর উল্টে যাওয়া ডিভানের সঙ্গে ওই ভীতিপ্রদ জাহাজের সামনের সূঁচালো দিকটাও ছিল। এই ফটোগ্রাফগুলোকে রহস্যাবৃত আর ভীতিজনক করে তুলেছিল ঘরটির গৃহসজ্জা যার ভেতরে ওই ট্যাঙ্কারটি মৃত্যু এবং ধ্বংস নিয়ে এসেছিল। চেয়ার, সাইড বোর্ড, পর্দা, টেবিল,সোফা, সব একদম আমাদের বসার ঘরের আসবাবপত্রের মতো একরকম। আমি যখন এই চল্লিশবছরের পুরোনো খবরটা পড়ছি, সেই সুন্দরী, সদ্য বাগদত্তা ছাত্রীটি, যে ওই দুর্ঘটনায় মারা যায়, তার বর্ণনা– সে দুর্ঘটনার আগের রাত্তিরে যারা এই দুর্ঘটনায় বেঁচে গেছে, তাদের সঙ্গে কী কথাবার্তা বলেছিল, পাড়ার যে যুবকটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ওর মৃতদেহটি দেখতে পেয়েছিল, তার দুঃখ– আমার মনে পড়ে ইস্তাম্বুলের বাসিন্দারা অনেক দিন ধরে অন্য কিছুই আলোচনা করেনি, এই দুর্ঘটনা ছাড়া।

সেই সময়ে শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র দশ লাখ, আর আমরা বসফোরাসের এই বিপর্যয়গুলো সম্পর্কে যে গল্প বলতাম, তা গুজব ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণ বেড়ে যেত। যখন আমি লোকেদের বলেছিলাম যে, আমি ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে লিখছি, আর আমাদের আলোচনা সেই সব পুরোনো বসফোরাস বিপর্যয়ের দিকে ঘুরে যেত, তখন ওদের গলার স্বরের আর্তি শুনে আমি অবাক হয়ে যেতাম, ওদের চোখের কোণায় জল জমছে, যেন ওরা ওদের খুশির মুহূর্তগুলো স্মরণ করছে এবং কিছু কিছু লোক জবরদস্তি করত যে, তাদের প্রিয় বিপর্যয়গুলোর কথা লিখতেই হবে।

এই রকম একটা অনুরোধকে সন্তুষ্ট করতে আমি লিখছি যে, জুলাই ১৯৬৬-তে তুর্কী-জার্মান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সদস্যদের নিয়ে একটা মোটর লঞ্চ আরেকটা জলযানের সঙ্গে ধাক্কা খায়, যেটা ইয়েনিকয় ও বেকোজ-এর মধ্যে কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল– এতে তিনজন লোক বসফোরাসের কালো জলে পড়ে যায় ও মারা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে এটাও উল্লেখ করতে বলা হয়েছে যে, আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি এক রাত্রে তার 'ইয়ালি'র ব্যালকনিতে ছিল এবং নিজের স্বাভাবিক হতাশা নিয়ে জাহাজ গুণছিল, যখন একদম তার চোখের সামনেই একটা মাছ ধরার নৌকো 'প্লোইএসটি' নামের একটা রোমানিয়ান ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারে এবং দু'টুকরো হয়ে যায়।

একদম হাল আমলের একটা বিপর্যয় হল, রোমানিয়ান ট্যাঙ্কার (দ্য ইন্ডিপেনটে) অন্য একটা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেল (একটা গ্রিক মালবাহী জাহাজ, নাম ইউরিয়ালি) একদম হায়দারপাশার সামনেই (এশিয়ান শহরটির প্রধান রেল স্টেশন), এবং যখন ফুটো দিয়ে বেরোনো পেট্রলে আগুন ধরে গেল, ট্যাঙ্কারটা, যেটা সম্পূর্ণ পেট্রল ভর্তি ছিল, বিস্ফোরিত হল, এত প্রচন্ড জোরে আওয়াজ হল যে, আমাদের সকলের ঘুম ভেঙে গেল– আমি স্থির করলাম, এটার কথা বাদ দেওয়া চলবে না। বাদ দিলাম না, এবং তার কারণও আছে। সেটা হল এই যে, যদিও আমরা দুর্ঘটনার জায়গা থেকে বহু কিলোমিটার দূরে বাস করছিলাম, আমাদের পাড়া প্রতিবেশিদের অর্ধেকের ওপর জানালা বিস্ফোরণের শব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল এবং শহরের রাস্তায় ভাঙা কাঁচের স্তূপ হয়ে গিয়েছিল হাঁটু-ভর।

আর একটা ছিল, এক জাহাজ ভেড়া; ১৯৯১-এর ১৫ নভেম্বর, একটা লেবানীজ পশু চালানকারী জাহাজ, নাম 'রাবুনিয়ন', রোমানিয়া থেকে তোলা কুড়ি হাজারেরও বেশি ভেড়া নিয়ে যাচ্ছিল; একটা ফিলিপাইন-এ নথিভুক্ত মালবাহী জাহাজ 'ম্যাডোনা লিলি' যেটা নিউ অরলিনস থেকে রাশিয়ায় গম নিয়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগে। ওই জাহাজটা ডুবে যায়, সঙ্গে প্রায় সমস্ত ভেড়াও। খবর শোনা গিয়েছিল যে, কয়েকটা ভেড়া জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে পড়েছিল। আর সেখানে কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে কয়েকজন লোক বসে খবরের কাগজ পড়ছিল ও কফি খাচ্ছিল, তারা ওগুলোকে উদ্ধার করে, কিন্তু বাকি অভাগা কুড়ি হাজার ভেড়া, এখনো কেউ তাদের জলের গভীর থেকে উদ্ধার করবে বলে অপেক্ষা করে আছে। এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ঠিক ফেইথ ব্রিজের নিচে (দ্বিতীয় বসফোরাস সেতু) এবং বোধহয় আমার উল্লেখ করা উচিত যে, এই সেতুটা নয়, প্রথম সেতুটা থেকেই ইস্তাম্বুলীয়রা আত্মহত্যা করা পছন্দ করে। এই বইটা লেখার সময়ে, আমি ছোটবেলায় পড়া সেই সব খবরের কাগজগুলো পড়বার জন্য সংগ্রহশালায় প্রচুর সময় ব্যয় করেছি এবং আমি যখন জন্মেছিলাম, সেই সময়কার একটা কাগজে আমি অনেকগুলো রচনা পড়লাম, যাতে বসফোরাস সেতু থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার চাইতে আরো বেশি জনপ্রিয় অন্য আরেকরকম আত্মহত্যা করার কায়দার কথা লেখা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ :

> একটা মোটরকার যেটা রুমেলিহিসারির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, উড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ল। গতকালের (২৪ শে মে, ১৯৫২) দীর্ঘকালীন অনুসন্ধানের পরেও গাড়ি অথবা তার যাত্রীদের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। গাড়িটা যখন সমুদ্রের ওপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড়ে গিয়ে পড়ছিল, ড্রাইভারটা নাকি গাড়ির দরজা খুলে 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করেছিল, কিন্তু অজানা কারণে, ও আবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং গাড়ি সমেত সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিল। মনে করা হচ্ছে যে, স্রোত হয়তো গাড়িটাকে তীর থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে গেছে এবং জলের গভীরে ঠেলে ফেলেছে।

পঁয়তাল্লিশ বছর পরের, ৩রা নভেম্বর, ১৯৯৭-এর আরেকটি খবর :

বিয়েবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার সময়, তেলিবাবাকে পুজো দেবার জন্য গাড়ি থামাতে গিয়ে মাতাল ড্রাইভার ন'জন যাত্রী সমেত গাড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তারাবিয়া-র দিকে যাবার সময় সমুদ্রের জলে উড়ে গিয়ে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় দুই সন্তানের মা, এক মহিলার মৃত্যু ঘটে।

যাই হোক, বছরের পর বছর ধরে এত যে গাড়ি 'উড়ে গিয়ে' বসফোরাসে পড়ে, গল্প কিন্তু একই থেকে যায়; যাত্রীরা সকলেই সমুদ্রের গভীর অতলে তলিয়ে যায়, যেখান থেকে কেউ ফেরে না। আমি শুধু এসব সম্বন্ধে শুনেছি বা পড়েছি, তা নয় : আমি নিজের চোখে গোটা কয়েক গাড়িকে জলে তলিয়ে যেতে দেখেছি! যাত্রীরা যারাই হোক না কেন, আর্তনাদ করা শিশুরা, বা একজোড়া ঝগড়া করতে থাকা প্রেমিক প্রেমিকা, একদল উচ্ছৃঙ্খল মাতাল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা স্বামী, কোনো বৃদ্ধ মানুষ, যে অন্ধকার হলে ভালো দেখতে পায় না, কোনো নিদ্রালু ড্রাইভার, যে বন্ধুদের সঙ্গে চা খাবার জন্যে জেটিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরে যাবার সময়, ব্যাক গিয়ার না দিয়ে প্রথম গিয়ারে গাড়ি চালিয়েছিল, বুড়ো খাজাঞ্চি সেফিক ওর সুন্দরী সেক্রেটারির সঙ্গে, বসফোরাসের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া জাহাজ গণণাকারী পুলিশের লোকেরা, কোনো নতুন ড্রাইভার যে কারখানা থেকে বিনা অনুমতিতে গাড়ি বার করে পরিবার নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের পরিচিত এখন নাইলনের মোজা প্রস্তুতকারক, একই রকমের রেইনকোট পরা বাবা ও ছেলে, এক কুখ্যাত বিওগলু গুণ্ডা এবং তার প্রেমিকা, প্রথমবার বসফোরাস সেতু দেখতে আসা এক কনিয়া পরিবার– যখন গাড়িগুলো জলের ওপর উড়ে গিয়ে পড়ে, সেগুলো কখনোই পাথরের মতো ডুবে যায় না; দু'এক মুহূর্তের জন্য ওগুলো ইতস্তত করে, যেন জলের ওপর বসে আছে। সে দিনের আলোতেই হোক, অথবা কাছের কোনো শুঁড়িখানা থেকে আসা একমাত্র আলোতেই হোক, বসফোরাসের বেঁচে-থাকার পাড়ের লোকেরা যখন জলে ডুবতে থাকা লোকেদের মুখের দিকে তাকায়, তারা একটা জানা আতঙ্ক দেখতে পায়। এক মুহূর্ত পরে গাড়ি ধীরে ধীরে গভীর, অন্ধকার, তীব্রস্রোতা সমুদ্রে ডুবে যায়।

আমি পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, একবার যখন গাড়ি ডুবতে থাকে, তখন গাড়ির দরজা খোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ দরজার ওপরে জলের চাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংঘাতিক। এক সময়ে যখন অস্বাভাবিক সংখ্যায় গাড়ি বসফোরাসে পড়ছিল, তখন একজন সংস্কৃতিবান, চিন্তাশীল সাংবাদিক তাঁর পাঠকদের এই কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য একটা বুদ্ধির কাজ করেছিলেন। তিনি একটা বাঁচার নির্দেশিকা, সুন্দর করে আঁকা ছবিসহ প্রকাশ করেছিলেন :

বসফোরাসে পড়ে যাওয়া গাড়ির ভেতর থেকে কীভাবে বাঁচা যায়

১. ভয় পাবেন না। জানালাগুলো বন্ধ করুন এবং গাড়ি জলে ভরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। দরজাগুলো তালাবদ্ধ নেই, এটা নিশ্চিত করুন। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত করুন, যেন সব যাত্রীরাই স্থির থাকেন।
২. যদি গাড়ি বসফোরাসের গভীরে ডুবে যেতে থাকে, হ্যান্ডব্রেক টানুন।
৩. গাড়ি যখন প্রায় পুরোটা জলে ভরে গেছে, তখন জল ও গাড়ির ছাদের মধ্যবর্তী অংশের বাতাসের শেষ স্তরে শেষবারের মতো শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে দরজাটা খুলুন এবং আতঙ্কিত না হয়ে, গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসুন।

আমি চতুর্থ নির্দেশটা দেবার লোভ সামলাতে পারছি না; ঈশ্বর সাহায্য করলে আপনার রেইনকোট হ্যান্ডব্রেকে আটকে যাবে না। আপনি যদি সাঁতার জানেন এবং কোনো রকমে জলের ওপরে উঠে আসতে পারেন, আপনি লক্ষ করবেন যে, এত বিষণ্নতা সত্ত্বেও বসফোরাস কী অপূর্ব সুন্দর, জীবনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩.
ইস্তাম্বুলে নার্ভাল: বিওগলুতে হাঁটা

যে পাহাড়ে আমি সারা জীবন বাস করেছি, মেলিং-এর ছবিতে সেই পাহাড়ই আঁকা হয়েছে, কিন্তু যখন এই পাহাড়ের ওপর একটা বাড়িও ওঠেনি, তখনকার ছবি। ইলডিজ, মাকা, অথবা টেসভিকিয়ে-তে, মেলিং-এর ভূ-দৃশ্যাবলীর ছবিগুলোর কিনারার দিকে তাকালে, ওই সব পপলার, প্লেন গাছ ও রান্নাঘরের বাগানওয়ালা শূন্য পাহাড়গুলো দেখলে, আমি ভাবি, তাঁর সময়কার ইস্তাম্বুলীরা যদি দেখতে পেত তাদের স্বর্গের বর্তমানের কী হাল হয়েছে, তাহলে তারা কী ভাবত এবং আমারও সেই একই যন্ত্রণা বোধ হয় যখন আমি পুড়িয়ে ফেলা প্রাসাদগুলোর বাগান, ভেঙে পড়া দেওয়াল, আর্চ এবং ভস্মাবশেষ দেখি। যে জায়গায় আমরা বড় হয়েছি,– আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল, আমরা যা কিছু এ পর্যন্ত করেছি, তার শুরুর জায়গা– সেটার যে আমাদের জন্মের একশ বছর আগেও কোনো অস্তিত্ব ছিল না এটা আবিষ্কার করার অর্থ একটা ভূতের মত নিজের জীবনে পেছন ফিরে দেখার মতো অনুভব, সময়ের মুখোমুখি হয়ে কাঁপতে থাকা।

গেরার্ড দ্য নার্ভাল-এর 'ভয়েজ এন ওরিয়েন্ট'-এর ইস্তাম্বুল অধ্যায়ের একটা বিশেষ জায়গাতে আমার এই ধরনের অনুভূতি হয়েছিল। এই ফরাসি কবি ১৮৪৩ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন, মেলিং তার ছবি আঁকা শেষ করার অর্ধ শতাব্দী পরে এবং তাঁর বইয়ে তিনি স্মরণ করছেন, গালাতার মেভলেভি দরবেশ লজ থেকে (যেটার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে নামকরণ হয়েছিল 'তুনেল') আজ আমরা যাকে টাকসিম বলি, সেই জায়গা পর্যন্ত হাঁটার কথা– যে একই হাঁটা আমি হেঁটেছি আমার মায়ের হাত ধরে, ১০৫ বছর পরে। এই জায়গাকে এখন আমরা জানি বিওগলু নামে; ১৮৪৩ সালে, এর প্রধান সড়ক (প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন নাম হয়েছিল 'ইস্তিকলাল') ছিল গ্র্যান্ড রু দ্য পেরা, এবং তখন এই সড়ক যেমন দেখতে ছিল, আজও প্রায় তেমনই আছে। নার্ভাল, লজ থেকে এগিয়ে যাওয়া এই এভিনিউকে প্যারিসের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে বর্ণনা করেছেন: আদব-কায়দা দোরস্ত কাপড় চোপড়, লন্ড্রি, জুয়েলার, ঝকঝকে সাজানো জানালা, মিষ্টির দোকান, ইংরাজি ও ফরাসি হোটেল, কাফে, দূতাবাস। কিন্তু কবি, যে জায়গাকে ফরাসি হাসপাতাল (আজকের ফরাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র) বলেছেন, সেটা ছাড়িয়ে শহর এসে একটা জঘন্য, বিশৃঙ্খল এবং আমার কাছে, আতঙ্কজনক জায়গায় শেষ হয়েছে। কারণ নার্ভালের বর্ণনায়, আজকের টাকসিম স্কোয়ার, আমার প্রাণকেন্দ্র এবং শহরের এই অঞ্চলের বৃহত্তম খোলা মাঠ, যার চারপাশে আমি সারা জীবন বাস করে এসেছি, এটা ছিল একটা বিশাল সমতল জায়গা যেখানে ঘোড়ায়-টানা গাড়িগুলো মাংসের বড়া, তরমুজ ও মাছ বিক্রেতাদের সঙ্গে মিশে থাকত। তিনি বলেছেন, আশেপাশের মাঠে এদিকে ওদিকে থাকা সমাধিগুলোর কথা; একশ বছর পরে এগুলো আর নেই। কিন্তু নার্ভালের একটি বাক্য কখনো আমার মন থেকে মুছে যাবে না এবং সেটা এই 'সমতল ভূমি' সম্পর্কে, যেটা আমি আমার সারাজীবন ধরেই দেখে আসছি, পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর ভীড়ে ভর্তি একটা অঞ্চল, 'একটা বিশাল, সীমাহীন, চারণভূমি, পাইন এবং বাদাম গাছে ছাওয়া!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নার্ভাল যখন ইস্তাম্বুলে আসেন, তখন তাঁর বয়স ৩৫ বছর। দু'বছর আগে তাঁর প্রথমবার মানসিক অবসাদের আক্রমণ হয়, যেটায় শেষ পর্যন্ত বারো বছর বাদে তাঁকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল, অবশ্য তার আগে বেশ কয়েকটি উন্মাদাশ্রমে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। ছ'মাস আগে, তাঁর ইস্তাম্বুলে পৌঁছানোর আগে, অভিনেত্রী জেন কোলোন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্রী, কিন্তু কখনো তিনি সে ভালোবাসার সার্থকতা পাননি, মারা যান। 'ভয়েজ এন ওরিয়েন্ট', যা তাঁকে ঈজিপ্টের আলেকজান্দ্রা এবং কায়রো থেকে সাইপ্রাস, রোডস, ইজমির এবং ইস্তাম্বুলে নিয়ে যায়, তাতে তাঁর এই দুঃখ এবং তার সঙ্গে উত্তেজক প্রাচ্যদেশীয় স্বপ্নের রেশ দেখতে পাওয়া যায়, যে স্বপ্নকে, স্যাটুব্রিয়াণ্ড, লামার্টিন, এবং হুগো একটা মহান ফরাসি ধারায় দ্রুত পরিবর্তন করেন। তাঁর আগের লেখকদের মতো, তিনি প্রাচ্যকে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন এবং যেহেতু নার্ভালকে ফরাসি সাহিত্যের অঙ্গনে বিষণ্ণতার সঙ্গে এক করে দেখা হয়, তাই ভাবতেই পারা যায় যে, তিনি ইস্তাম্বুলেও বিষণ্ণতার দেখা পেয়েছিলেন।

কিন্তু নার্ভাল যখন ১৮৪৩ সালে ইস্তাম্বুলে আসেন, তিনি তখন তাঁর নিজের বিষণ্ণতার দিকে মোটেই নজর দেননি, বরং সেই সব জিনিসের প্রতি নজর দিয়েছিলেন যা তাঁকে এই বিষণ্ণতাকে ভুলতে সাহায্য করবে। তাঁর বাবাকে লেখা একটা চিঠিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, দুবছর আগে তার যে পাগলামোর রোগ হয়েছিল, সেটা আর কখনো ফিরে আসবে না এবং এটাই 'আমাকে লোকের কাছে প্রমাণ করতে সাহায্য করবে যে, আমি একটা বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম মাত্র'; তিনি খুব আশা নিয়ে আরো লিখেছিলেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য এখন চমৎকার। আমরা ধরে নিতে পারি যে, তখনো পর্যন্ত যে ইস্তাম্বুলকে পরাজয়, দারিদ্র্য এবং পশ্চিম দেশ দ্বারা দুর্বল ভাবার লজ্জা, গ্রাস করতেপারেনি, সেই ইস্তাম্বুল কবিকে তার বিষণ্ণতার দিকগুলো দেখায়নি। একথা ভুললে চলবে না যে, এই শহরের বড় বড় পরাজয়গুলো না হওয়া পর্যন্ত বিষাদাচ্ছন্নতা এই শহরের ওপর নেমে আসেনি। তাঁর ভ্রমণের বইতে, এখানে ওখানে, নার্ভাল অবশ্য লিখেছেন, তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতায় যার কথা, 'বিষণ্ণতার কালো সূর্য', তা তিনি প্রাচ্যে দেখেছেন, যেমন নীল নদের উপকূলে। কিন্তু ১৮৪৩-এর ধনী, অত্যাশ্চর্য সুন্দর ইস্তাম্বুলে তিনি উত্তম বিষয়ের সন্ধানী একজন গতিশীল সাংবাদিক।

রমজানের মাসে তিনি শহরে এসেছিলেন। তাঁর চোখে, এটা ছিল মেলায় উৎসবের সময় ভেনিসে যাওয়ার মতো। (সত্যিই, তিনি রমজানকে বর্ণনা করেছেন, একটা 'উপবাস' ও 'মেলা উৎসব' বলে।) নার্ভাল রমজানের সন্ধ্যাগুলো কাটাতেন, কারাগোজ ছায়া-নাট্য দেখে, আলো-জ্বলা শহরের দৃশ্যাবলী দেখে আর কাফেতে গিয়ে গল্প-বলিয়েদের মুখে গল্প শুনে। যে দৃশ্যগুলোর কথা তিনি বর্ণনা করেছেন, তা আরো অনেক পাশ্চাত্ত্য পর্যটককে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছিল; এখন যদিও আর এইসব জিনিস দরিদ্র, পাশ্চাত্যমনা, বিজ্ঞান-মনস্ক আধুনিক ইস্তাম্বুলে দেখা যায় না, তবুও এটা বহু ইস্তাম্বুল লেখকদের ওপর গভীর ছাপ রেখে যায়, যারা 'পুরোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমজানের রাত্রি',-এর ওপরে প্রচুর লিখে গেছেন। এই যে সাহিত্য, যা আমি আমার ছেলেবেলার উপবাসের সময়কালীন পুরোনো দিনের স্মৃতি ঘাঁটার মতো, পড়েছিলাম, তার ভেতরে কিন্তু ইস্তাম্বুলের আর একটা বিদেশি চেহারা আছে, যা প্রথমে নার্ভালের দ্বারা উদ্ভাবিত এবং পরে নার্ভালের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভ্রমণ কাহিনী-লেখকরা যা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যদিও তিনি সেইসব ইংরেজ লেখকদের বিদ্রূপ করেছেন, যারা তিনদিনের জন্য ইস্তাম্বুলে এসে সমস্ত পর্যটন দৃশ্যগুলো দেখে নিয়েই বই লিখতে বসে যেত। নার্ভাল নিজে কিন্তু ঘূর্ণমান দরবেশদের দেখতে অবহেলা করেননি, দূর থেকে সুলতানকে প্রাসাদের বাইরে যেতে দেখেছেন (নার্ভাল বিনম্র দাবি করেন যে, যখন তাঁরা মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখন আব্দুল মেসিত তাঁকে লক্ষ করেছিলেন) এবং তিনি সমাধিস্থলগুলোতে দীর্ঘক্ষণ হেঁটে বেড়িয়েছেন, আর সর্বদা তুর্কী পোশাক পরিচ্ছদ, তুর্কী আদব-কায়দা এবং প্রথাগত আচার আচরণ ইত্যাদি লক্ষ করেছেন।

তাঁর হাড়ে-কাঁপুনি-ধরানো 'অরেলিয়া' অথবা 'লাইফ অ্যান্ড ড্রিমস', যেটা তিনি দান্তের 'নিউ লাইফ'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং যেটা অধিবাস্তববাদী আঁদ্রে ব্রেটন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল এলুয়ার্ড এবং আন্তোনিন আর্তদ দারুণভাবে প্রশংসা করেছেন, তাতে নার্ভাল সরাসরি স্বীকার করেছেন যে, যে মহিলাকে তিনি ভালোবাসতেন, তিনি তাঁকে বাতিল করবার পর, তিনি মনে করেছিলেন যে, বাঁচার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট নেই, শুধু 'অমার্জিত বিক্ষিপ্ততা' আছে এবং তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে দূর দূর দেশের পোশাক-আশাক, এবং অদ্ভুত সব রীতিনীতি দেখার মতো অর্থহীন, ফাঁকা মানসিক বিক্ষেপই চেয়েছিলেন। নার্ভাল জানতেন যে, তাঁর এই বিভিন্ন প্রথার বর্ণনা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাচ্য মহিলাদের বর্ণনা, তাঁর রমজান সন্ধ্যার ওপর লেখাগুলোর মতোই সস্তা ও স্থূলরুচির এবং 'ভয়েজ এন ওরিয়েন্ট'-এ যেমন বহু লেখকই করে থাকেন যখন তাঁরা বোঝেন যে, গল্পের শক্তি কমে আসছে– গতি বাড়ানোর জন্য তিনি তাঁর নিজের বানানো দীর্ঘ গল্প যোগ করতেন। (তানপিনার তাঁর সতীর্থ বিষাদ-বায়ুগ্রস্ত ইয়াহিয়া কামাল ও এ এস হিসারের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা 'ইস্তাম্বুল' বইয়ে শহরের ঋতুগুলোর ওপরে লেখা একটা দীর্ঘ রচনায় বলেছেন যে, তিনি এই গল্পগুলোর মধ্যে কোনগুলো বানানো আর কোনগুলো খাঁটি অটোমান গল্প, তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন।) বানানো গল্পগুলো, যাতে নার্ভালের গভীর কল্পনা শক্তি প্রকাশ পায়, কিন্তু ইস্তাম্বুলের কথা কমই থাকে, সেগুলো শেহেরাজাদের মতো একটা কাঠামো গড়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে যখনই তিনি মনে করতেন যে, কোনো দৃশ্যে উদ্দীপনা নেই, নার্ভাল তখন তাঁর পাঠকদের মনে করিয়ে দিতেন যে, শহরটা '১০০১ রাত্রির মতো'; এবং তিনি অন্য অনেকে যার বর্ণনা দিয়েছে, সেই প্রাসাদ, হামাম এবং মসজিদ নিয়ে তেমন আলোচনা করেননি, ব্যাখ্যা করার পর, তিনি সেই কথাগুলো বলেছিলেন, যা ইয়াহিয়া কামাল এবং তানপিনার-এর মতো লেখকরা প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রতিধ্বনি করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমী পর্যটকরা সস্তা প্রবাদে পরিণত করেছিলেন; 'ইস্তাম্বুল, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ভূ-দৃশ্যাবলী অনেক আছে, একটা রঙ্গমঞ্চের মতো এবং দর্শকাসন থেকেই সবচেয়ে ভালো দেখা যায়, যাতে পর্দার আড়ালের দারিদ্র্য পীড়িত এবং প্রায়শ নোংরা পাড়াগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া যায়।'

আশি বছর পরে, যখন ইয়াহিয়া কামাল এবং তানপিনার শহরটির একটি চেহারা ফুটিয়ে তোলেন, যা ইস্তাম্বুলবাসীদের আলোড়িত করেছিল,– যেটা তাঁরা করতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র 'পর্দার আড়ালের' দারিদ্র্যের সঙ্গে ওই সুন্দর দৃশ্যগুলো মিশিয়ে দিয়ে– তখন তারা নিশ্চয়ই মনে মনে নার্ভালকেই ভেবেছিলেন। এই দুজন মহান লেখক (দুজনেই নার্ভালকে দারুণ শ্রদ্ধা করতেন) কী আবিষ্কার করেছিলেন, কী আলোচনা করতেন এবং কী নিজেরা তৈরি করেছিলেন, তা বুঝতে গেলে এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের ইস্তাম্বুলের লেখকরা তাদের ওই আবিষ্কারকে সরল এবং জনপ্রিয় করেছিলেন কীভাবে তা দেখতে গেলে এবং কেমন করে তাদের এই বোধ যতটা শহরের সৌন্দর্য নয়, তার চেয়ে বেশি শহরের ক্রমাবনতির বিষণ্ণতা বোঝায়, তা বুঝতে গেলে, আমাদের আরেকজন লেখকের কাজকর্ম দেখতে হবে, যিনি নার্ভালের পরে ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪.
শহরের দরিদ্র পাড়াগুলোর মধ্যে দিয়ে গ্যেটের বিষন্ন পথ হাঁটা

লেখক, সাংবাদিক, কবি, অনুবাদক এবং ঔপন্যাসিক, থিওফিল গ্যেটে, নার্ভালের ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু ছিলেন। তাঁরা নিজেদের যৌবন কাটিয়েছিলেন এক সঙ্গে, দুজনেই হুগোর রোমান্টিসিজম-কে শ্রদ্ধা করতেন, এবং একটা সময়ে তাঁরা প্যারিসে পরস্পরের খুব কাছাকাছিই বাস করতেন, কখনো ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। তাঁর আত্মহত্যার কয়েকদিন আগে নার্ভাল গ্যেটের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর বন্ধু রাস্তার বাতি-স্তম্ভ থেকে ঝুলে পড়বার পর, গ্যেটে তাঁর হারানো বন্ধুর সম্বন্ধে একটা মর্মগ্রাহী স্মারক লিখেছিলেন।

এর দু'বছর আগে, ১৮৫২ সালে (নার্ভালের ভ্রমণের ন' বছর পরে এবং আমার জন্মের ঠিক একশ বছর আগে) ঘটনাপ্রবাহ আরও একবার ফরাসি পাঠকদের কাছে প্রাচ্য ভ্রমণকে আকর্ষনীয় করে তুলেছিল, যা পরবর্তীকালে রাশিয়াকে ইংল্যান্ডের বিরোধী করে তুলবে, ফ্রান্সকে অটোমান সাম্রাজ্যের কাছাকাছি নিয়ে আসবে এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করবে। নার্ভাল যখন দ্বিতীয়বার প্রাচ্য ভ্রমণের স্বপ্ন দেখছিলেন, তখন গ্যেটে ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন। তখন ভূমধ্যসাগরে দ্রুতগামী বাস্পচালিত নৌকো চলত বলে তিনি প্যারিস থেকে এই যাত্রা মাত্র এগারো দিনে সম্পন্ন করেছিলেন। গ্যেটে এখানে ছিলেন সত্তর দিন; তাঁর এই ভ্রমণের ওপর রচনা তিনি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন খবরের কাগজে, যে কাগজের তিনি ছিলেন মুখ্য খবর লিখিয়ে এবং পরে প্রকাশ করেছিলেন একটি বইয়ে, যার নাম 'কনস্তান্তিনোপল'। এই জনপ্রিয় পুস্তিকাটি অনেক ভাষায় অনূদিত হয় এবং উনিশ শতকে ইস্তাম্বুলের ওপর লেখা বইগুলোর জন্য একটি মান তৈরি করে দেয় (তার সঙ্গে এডমন্ডো ডি অ্যামিসি'র লেখা 'কনস্তান্তিনোপলি,' যা তিরিশ বছর পরে মিলানে প্রকাশিত হয়।)

নার্ভালের সঙ্গে তুলনা করলে, গ্যেটে ছিলেন বেশি দক্ষ, বেশি গোছালো এবং ঝরঝরে। অবাক হওয়ার কিছু নেই; একজন খবর লিখিয়ে, সমালোচক এবং শিল্পী-সাংবাদিক, যিনি ধারাবাহিক উপন্যাসও লিখেছিলেন (তিনি এক সময় নিজেকে শেহেরাজাদের সঙ্গে তুলনা করতেন, প্রতি রাত্রে একটি নতুন গল্প বানাতেই হবে), গ্যেটেকে প্রতিদিনই খবরের কাগজের জন্য লিখতে হত বলে একটা গতিশীলতা ও প্রাণচাঞ্চল্য তাঁর লেখার মধ্যে ছিল। (ফ্লবার্ট এর জন্য তাঁর সমালোচনাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন।) কিন্তু (যদি আমরা তাঁর সুলতান, হারেম ও সমাধিস্থল সম্পর্কে গতানুগতিক ও শস্তা মন্তব্য গুলো বাদ দিই), তাঁর বইটি ছিল খবর পরিবেশন করার একটি চমৎকার নিদর্শন। এটা যদি ইয়াহিয়া কামাল এবং তানপিনারকে আন্দোলিত করে থাকে, তাঁদের এই শহরের একটা অবয়ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে, তার কারণ গ্যেটে, পাকা সাংবাদিক ছিলেন বলে, তাঁর বন্ধু যেটাকে বলেছিলেন শহরের পর্দার আড়ালে, তার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, শহরের গরিব

অঞ্চলগুলোতে চলে যেতেন, সেখানকার ধ্বংসস্তূপ, তাদের অন্ধকার, নোংরা রাস্তাগুলোতে ঘুরতেন, পশ্চিমী পাঠকদের দেখাতে চাইতেন যে, শহরের সুন্দর দৃশ্যগুলোর মতো গরিব পাড়াগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সাইথেরা দ্বীপের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় (কিথিরা-র আয়োনিয়ান দ্বীপ), গ্যেটের মনে পড়েছিল, নার্ভাল তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি তৈলাক্ত কাপড়ে জড়ানো একটা মৃতদেহকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলতে দেখেছিলেন। (এই চিত্রকল্পটি, দুই বন্ধুর অত্যন্ত প্রিয়, বোধহয় একজনের কাছে বেশি অর্থবহ, পরবর্তীকালে বদলেয়ার চুরি করেছিলেন তাঁর কবিতায়, 'জার্নি টু সাইথেরা'।) ইস্তাম্বুলে আসার পর গ্যেটে, নার্ভালেরই মতো, 'মুসলিম পোশাক' পরতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাতে শহরে ঘোরাঘুরি করতে সুবিধা হয়। নার্ভালের মতো, তিনিও রমজানের সময়েই এসেছিলেন এবং রমজান রাত্রের আমোদ প্রমোদকে অতিরঞ্জিত করতে, তিনি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরই মতো, তিনি রুফাই দরবেশদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো দেখতে উসকুদারে গিয়েছিলেন, সমাধিস্থলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতেন (যেখানে তিনি বাচ্চাদের কবরের পাথরগুলোর মধ্যে খেলতে দেখেছিলেন), কারগোজ ছায়ানাট্য দেখতে গিয়েছিলেন, দোকানে দোকানে ঘুরতেন আর শহরের ব্যস্ত বাজারগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, পথচারীদের প্রতি খুব ঘনিষ্ঠ, উৎসাহী মনোযোগ দিতেন এবং– আবার নার্ভাল-এর নকল করে-সুলতান আব্দুল মেসিত শুক্রবারের নামাজে যাবার সময়, তাঁকে দেখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। বেশির ভাগ পাশ্চাত্য পর্যটকদের মতো,

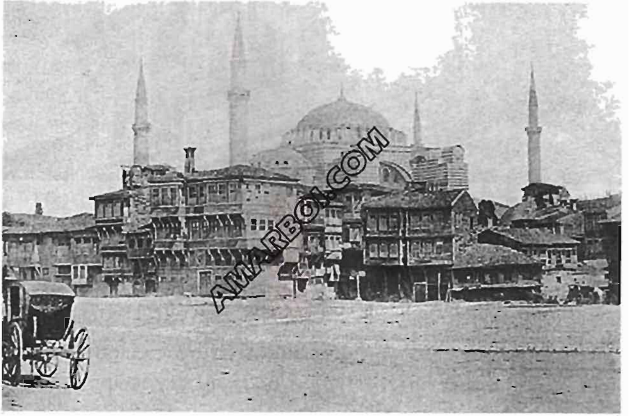

তিনিও মুসলিম নারীদের সম্বন্ধে নিজের মতবাদ প্রচার করতেন,– তাদের বন্দী জীবন, তাদের অগম্যতা, তাদের রহস্যময়তা (তিনি পাঠককে উপদেশ দিচ্ছেন, কারো স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কখনো কোনো প্রশ্ন না করতে)। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি আমাদের বলেছেন যে, শহরের রাস্তাঘাটে প্রচুর স্ত্রীলোক, কেউ কেউ সঙ্গীহীন। তিনি অনেক সময় ধরে টোপক্যাপি প্রাসাদ, মসজিদ, হিপ্পোড্রোম এবং অন্যান্য সব স্থান যেগুলো নার্ভাল পর্যটকদের ফাঁদ বলে উল্লেখ করেছেন, সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। (যেহেতু এই সমস্ত দর্শনীয় স্থান এবং বিষয় পাশ্চাত্য পর্যটকদের পক্ষে অপরিহার্য, কাজেই এই বিষয়ে নার্ভালের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করার প্রয়োজন নেই।) তাঁর লেখার মধ্যে কখনো খানিকটা ঔদ্ধত্য থাকলেও সব কিছুকে সমান ভাবে দেখার প্রবণতা এবং উদ্ভট জিনিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকার ফলে তাঁর চমৎকার ব্যাঙ্গাত্মক লেখা এবং শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁর লেখা উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

উনিশ বছর বয়েসে হুগোর 'ওরিয়েন্টালিস' বই-এর কবিতাগুলো পড়বার আগে পর্যন্ত থিওফিল গ্যেটের স্বপ্ন ছিল চিত্রশিল্পী হওয়ার। তাঁর সময়ে চিত্রকলার সমালোচক হিসাবে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। ইস্তাম্বুলের ভূদৃশ্য এবং দর্শনীয় স্থানগুলো বর্ণনা করার জন্য, তিনি এমন একটা

AMARBOI.COM

সমালোচনামূলক শব্দ ভান্ডার থেকে ভাষা চয়ন করেছিলেন, যা আগে কখনো ইস্তাম্বুলের ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। গালাতা মেভলেভি লজ পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা ইস্তাম্বুলের ছায়াদৃশ্য এবং গোল্ডেন হর্ন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে (ওই একই জায়গা যেটা নার্ভাল ন'বছর আগে বর্ণনা করে গেছেন; আমার মায়ের সঙ্গে বিওগলুতে কেনাকাটা করতে যাওয়ার শেষ বিন্দু, মাক্কা টানেল ট্রামওয়ে এবং বর্তমানের টানেল স্কোয়ার) তিনি বলেছেন; 'দৃশ্যটা এত আশ্চর্যজনক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর যে, মনে হয় অবাস্তব', কিন্তু তার পরেই বর্ণনা করেছেন মিনারেট, গম্বুজ, গোল ডোম, হাঘিয়া সোফিয়া, বেয়াজিত মসজিদ, সুলেমানিয়া মসজিদ, সুলতান আহমেদ মসজিদ, গোল্ড হর্নের মেঘ, জল, সারায়াবারনু-র সাইপ্রেস গাছে ঢাকা বাগান এবং তাদের পেছনে 'আকাশের অভাবনীয় চিক্কন নীলিমা এবং তারই ফাকে ফাঁকে আলোর খেলা,'- এইসব কিছুই একজন শিল্পী তাঁর নিজের আঁকা ছবির বিশুদ্ধতা যেমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন, সেই রকম আনন্দের সঙ্গে এবং একজন অভিজ্ঞ লেখকের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। যে পাঠক এই দৃশ্য কখনো দেখেনি, সেও এই বর্ণনা পড়ে আনন্দ পায়। তানপিনার, ইস্তাম্বুল লেখক, যিনি ইস্তাম্বুলের ভূদৃশ্যাবলীতে 'অনবদ্য আলোর খেলা' যে পরিবর্তন আনে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, তিনি তাঁর শব্দ ভান্ডার এবং খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি, গ্যেটের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময় একটা লেখায় তানপিনার তাঁর নিজের বৃত্তের অন্য ঔপন্যাসিকদের তাদের চারপাশের জিনিসগুলো দেখার বা বর্ণনা করার অনিচ্ছাকে সমালোচনা করেছিলেন এবং স্টেনঢাল, বালজাক এবং জোলার মতো অঙ্কন-শিল্পী সুলভ লিখন-শৈলীর প্রশংসা করার সময় তিনি বলেছিলেন যে, গ্যেটে নিজেও ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী।

গ্যেটে জানতেন দৃশ্যকে কী করে ভাষায় রূপ দিতে হয়, বর্ণালী নকশা থেকে, আকর্ষক খুঁটিনাটি থেকে এবং আলোছায়ার খেলা থেকে কী করে নিজের মনের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে হয়; 'পর্দার আড়ালে' তাঁর ভ্রমণকে বর্ণনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

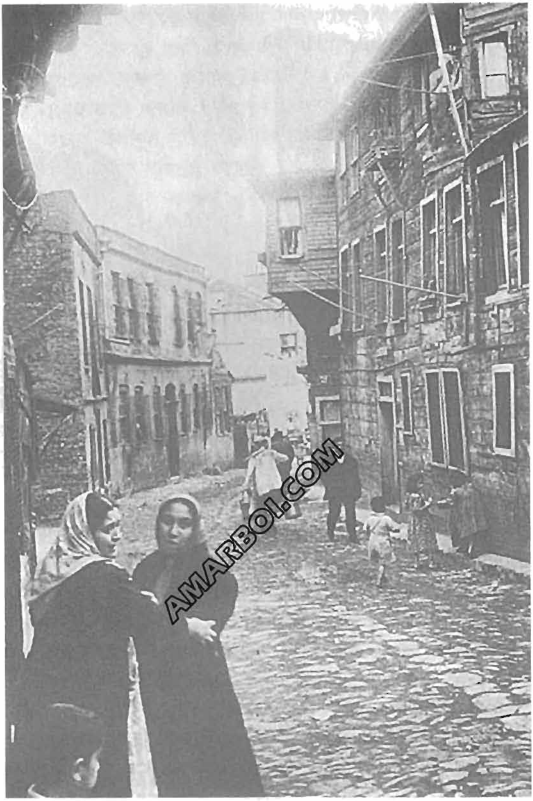

করবার সময় তিনি তার সাহিত্যিক ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন। শহরের দেওয়াল ধরে ধরে বহিঃসীমা পর্যন্ত ভ্রমণের আগে তিনি তাঁর পূর্বসূরী বন্ধুদের, যারা আগে ভ্রমণ করে গেছেন, তাদের বর্ণনা পড়ে লিখেছেন যে, শহরের চমৎকার দৃশ্যগুলো দেখার জন্য দরকার আলো এবং পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় এমন জায়গা, কারণ মঞ্চের মতোই, একেবারে কাছ থেকে দেখলে আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়; দূরত্ব দৃশ্যকে চমৎকার আকর্ষণীয় করে তোলে, শহরের বিষণ্ন, সঙ্কীর্ণ, খাড়া, নোংরা রাস্তাগুলোকে, বাড়িঘর ও গাছপালার অবিন্যস্ত ভীড়কে সূর্যের বর্ণচ্ছটায় রঙিন করে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু গ্যেটের, নোংরা এবং বিশৃঙ্খলার সত্ত্বেও একটা বিষাদ-মাখা সৌন্দর্য দেখবার মতো চোখ ছিল। গ্রিক ও রোমান ধ্বংসাবশেষ এবং লুপ্ত সভ্যতার অবশেষের ওপর লেখা কল্পনাবিলাসী সাহিত্যের উত্তেজনা, এবং যদিও তিনি উপহাস করেছেন, তার সশ্রদ্ধ ভয়, তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁর যৌবনকালে, যখন শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখতেন, ডয়েন কুল-ডি-স্যাক এবং সেন্ট টমাস-ডু-ল্যুভর গির্জার খালি বাড়িগুলোকে (ল্যুভর এর কাছে, যেখানে কাছেই নার্ভাল বাস করতেন) চন্দ্রালোকিত রাত্রে গ্যেটে মনে করতেন অত্যন্ত সম্মোহিনী।

হোটেল থেকে বেরিয়ে (আজকের বিওগলু-তে), এবং গালাতার মধ্যে দিয়ে গোল্ডেন হর্ন-এর উপকূলে এসে, সেখান থেকে গালাতা সেতু পার হয়ে (১৮৫৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালে নতুন তৈরি, তিনি বলেছেন একটা 'নৌকো দিয়ে তৈরি সেতু') গ্যেটে এবং তাঁর ফরাসি পথ-প্রদর্শক উস্কাপানি এবং উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে যেতেন: তারপরেই তাঁরা 'তুর্কী অলি-গলির গোলক ধাঁধায় ঢুকে পড়তেন।' যতই ভেতরে ঢুকতেন, ততই নিজেদের বিচ্ছিন্ন বোধ হত, আর কুকুরের বড় বড় দল ঘেউ ঘেউ করে তাঁদের পেছন পেছন যেত। সেই সব বিবর্ণ, অন্ধকার, ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠের বাড়িগুলো, ভেঙে পড়া ফোয়ারাগুলো, অবহেলিত তারবেসগুলো তাদের ভেঙে পড়া ছাদ সহ এবং অন্যান্য যা কিছু তাঁরা ভ্রমণকালে দেখেছিলেন, প্রতিবারই যখন সেই লেখা পড়ি, আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে, একশ বছর পরে আমার বাবার গাড়িতে চড়ে যখন আমি এই একই জায়গাগুলো দেখি, তখনো সেগুলোর কোনো পরিবর্তন হয়নি, একই রকম আছে, শুধু পাথরের রাস্তাগুলো ছাড়া। আমারই মতো তিনিও ভেবেছিলেন, এগুলো খুব সুন্দর এবং তাই গ্যেটে লক্ষ্য করেছিলেন কালো হয়ে যাওয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠের বাড়িগুলো, পাথরের দেওয়াল, ফাঁকা রাস্তা এবং সাইপ্রেস গাছগুলো, যা ছাড়া কোনো সমাধিস্থলই সম্পূর্ণ হয় না। আমি যখন এই নিঃসঙ্গ, দারিদ্র্যগ্রস্ত এবং তখনো পর্যন্ত পাশ্চাত্য প্রভাবহীন অঞ্চলগুলোতে ঘুরে বেড়ানো শুরু করেছিলাম (যে অঞ্চলগুলোকে আগুন এবং কংক্রিট শিগগিরই মুছে ফেলবে), আমি সেই দৃশ্যগুলো ক্লান্তিকর মনে করেছিলাম, যেমন তিনিও করেছিলেন, অথচ তারপরেও গলি থেকে গলি, মাঠ থেকে অন্য মাঠে ঘুরে বেড়ানোর তাগিদ অনুভব করেছিলাম। আজানের ডাক, তাঁর কাছে মনে হয়েছিল, যেমন পরে আমার কাছেও, যেন বোবা, কালা, অন্ধ, নিঃশব্দে, নির্জনে ভেঙে পড়া বাড়িগুলোর উদ্দেশ্যে ডাকা হচ্ছে। তিনি দেখছেন, তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকজন, প্রাণী, একটা বুড়ি, পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা টিকটিকি, দুটো তিনটে ছেলে একটা ভাঙা ফোয়ারার গর্তে পাথর ছুড়ছে, আর তিনি ভাবছেন কালের প্রবাহ বয়ে চলেছে, আর মনে পড়ছে ডু ক্যাম্পের আঁকা একটি জল-রঙের ছবি, যিনি দু'বছর আগে ফ্লবার্টের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। যখন তাঁর খিদে পেত, উনি লক্ষ করতেন, শহরের এই অঞ্চলের দোকান এবং রেস্তরাঁগুলোয় কত সামান্য খাবার ব্যবস্থা এবং উনি রাস্তার পাশে মালবেরী গাছ থেকে মালবেরী পেড়ে খেতেন, যে মালবেরী গাছ রাস্তায় এনে দিত রং-এর বাহার এবং এত কংক্রিটের বাড়ি সত্ত্বেও, আজও আনে। সামাত্যা এবং বালাত-এর গ্রিক পাড়াগুলো, যাকে 'ইস্তাম্বুলের ঘেট্টো' বলা হয়, সেখানকার গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ ছিল। বালাত-এর বাড়িগুলোর সামনের অংশ ছিল ফাটলে ভর্তি এবং রাস্তাগুলো ছিল নোংরা এবং কর্দমাক্ত, কিন্তু ফেনার-এর গ্রিক অঞ্চলগুলো ছিল সযত্ন-রক্ষিত; যখনই উনি কোনো বাইজান্টাইন দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ অথবা কোনো বড় পয়ঃপ্রণালীর অংশবিশেষ দেখতেন, তিনি বুঝতেন পাথর ও ইঁটের স্থায়িত্বের তুলনায় কাঠের স্থায়িত্ব কত ঠুনকো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ক্লান্তিকর, বিভ্রান্তিমূলক হাঁটার মধ্যে গ্যেটে যখন এই বহুদূরের দরিদ্র, হতশ্রী পাড়াগুলোর ভেতর দিয়ে বাইজান্টাইন ধ্বংসস্তূপের অস্তিত্ব দেখতে পেতেন, তখন তাঁর মন ভরে যেত। গ্যেটে বেশ জোরালো ভাষায় লিখেছেন এই দেওয়ালগুলো কত মোটা এবং কত টেকসই, কীভাবে এগুলো উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, দেওয়ালের ফাটলগুলো এবং তার ওপর সময়ের বিধ্বংসী প্রভাব; উঁচু গম্বুজগুলোর একেবারে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পুরো দৈর্ঘ্য ধরে ফাটল (ছোটবেলায় আমিও এগুলো দেখে ভয় পেতাম), ভাঙা টুকরোগুলো নিচে পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ে আছে (গ্যেটের সময় আর আমাদের সময়ের মাঝখানে, ১৮৯৪ সালের বড় ভূমিকম্পে শহরের দেওয়ালগুলোয় প্রচুর ক্ষতি হয়)। তিনি বর্ণনা করেছেন, ফাটলের মধ্যে গজানো ঘাসের কথা, গজিয়ে ওঠা ডুমুর গাছগুলোর কথা, যার চওড়া সবুজ পাতাগুলো গম্বুজের ওপর দিকটা নরম সবুজ আভায় ভরিয়ে দেয়, সংলগ্ন অঞ্চলগুলোর বিবর্ণতা, ঐসব পাড়ার নীরবতা এবং তাদের ভগ্নপ্রায়, জীর্ণ বাড়িগুলোর কথা। 'বিশ্বাস করা কঠিন যে, এই মৃত গড়ের পেছনে একটা জীবন্ত শহর আছে।' গ্যেটে লিখছেন, 'আমি বিশ্বাস করি না, পৃথিবীতে কোথাও এই রাস্তাটার মতো এত অনাড়ম্বর ও বিষণ্ন রাস্তা আছে, যে তিন মাইলেরও বেশি চলেছে এক পাশে ধ্বংসাবশেষ আর অন্য পাশে সমাধিস্থল নিয়ে।'

ইস্তাম্বুলের 'হুজুন'-এর এত বড় স্বীকৃতি দেখে আমি কী সুখ পেয়েছি? যে শহরে আমি আমার সারা জীবন কাটিয়েছি, সেই শহরের বিষণ্নতা যা আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব করি, তা পাঠকের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এত শক্তি ব্যয় করলাম কেন?

বিগত একশ পঞ্চাশ বছরে (১৮৫০-২০০০), আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, 'হুজুন' কেবল ইস্তাম্বুলের ওপরই তার শাসন কায়েম করেছে, তাই নয়, আশপাশের অঞ্চলগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছি, তা হল আমাদের 'হুজুন'-এর শিকড় কিন্তু ইউরোপিয়ান; ধারণাটা প্রথমে ফরাসিতেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়, প্রকাশ করা হয় এবং কবিতায় ব্যবহৃত হয় (গ্যেটেই এটা করেছিলেন, তাঁর বন্ধু নার্ভালের প্রভাবে)। কাজেই কেন আমরা এত ভাবব– আমার চারজন বিষাদ-বায়ু গ্রস্ত লেখকরাই বা কেন ভাববেন গ্যেটে এবং অন্য পাশ্চাত্ত্য লেখকরা ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে কী বলেছেন, তা নিয়ে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫.
পাশ্চাত্যের নজরে

বিদেশিরা বা বহিরাগতরা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবে, সে সম্বন্ধে আমরা সবাই কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন থাকি। কিন্তু আমাদের দুশ্চিন্তা যদি আমাদের যন্ত্রণা দেয়, বাস্তবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধকে মেঘাচ্ছন্ন করে, এবং বাস্তবের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই সমস্যা হয়। পাশ্চাত্য দৃষ্টি আমার শহরকে কেমন দেখে, সে ব্যাপারে আমার আগ্রহ, অধিকাংশ ইস্তাম্বুলবাসীর মতোই, অত্যন্ত কষ্টদায়ক; অন্য ইস্তাম্বুল লেখকদের মতো, যাদের এক চোখ সর্বদাই পশ্চিমের দিকে, আমিও মাঝে মাঝে মানসিক বিশৃঙ্খলায় কষ্ট পাই।

যখন আহমেদ হামদি তানপিনার এবং ইয়াহিয়া কামাল শহরের একটি মূর্তি এবং একটি সাহিত্যের আধার খুঁজছিলেন, যার মধ্যে ইস্তাম্বুলবাসীরা নিজেদের দেখতে পায়, তখন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নার্ভাল এবং গ্যেটের ভ্রমণের লেখাগুলো পড়েছিলেন। তানপিনার-এর 'ফাইভ সিটিজ'-এর ইস্তাম্বুল অধ্যায়ে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর এই শহরের সম্বন্ধে একজন স্বদেশি ইস্তাম্বুল লেখকের লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা এবং এটাকে নার্ভাল এবং গ্যেটের সঙ্গে কথোপকথন, যা সময়ে সময়ে ঝগড়াতে পর্যবসিত হয়েছে, বলে বর্ণনা করা যায়। একটা জায়গায়, তানপিনার লামার্টিন সম্বন্ধে, যে ফরাসি লেখক ও রাজনীতিবিদও ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন, বলছেন, তাঁর আব্দুল মেসিতের কষ্টকৃত চিত্র দেখার পর এবং লামার্টিনের লেখা 'হিস্ট্রি অফ টার্কি' (আমার দাদাজীর লাইব্রেরিতে খুব সুন্দর আট ভল্যুমের এই বইটা ছিল), বইটি নাকি আব্দুল মেসিত নিজেই খরচা দিয়ে বার করিয়েছিলেন, এই কথা বলার পর, তিনি সাবধান করে দিচ্ছেন যে, নার্ভাল এবং গ্যেটে আব্দুল মেসিত সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা মনের গভীরে প্রবেশ করে না, কারণ তারা ছিলেন সাংবাদিক, যাদের পাঠকবর্গ 'আগেই তাদের মন ঠিক করে নিয়েছিল'; তার ফলে এই দুজন পর্যটকের, তারা যা শুনতে চায়, তা-ই বলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। গ্যেটে যে গর্ব করে বলতেন যে, তার সঙ্গী ইটালিয়ান মহিলার প্রতি সুলতানের আগ্রহ ছিল এবং সুলতানের হারেম নিয়ে তাঁর যে কল্পজগৎ-তানপিনার এগুলোকে (পরবর্তী অনেক পাশ্চাত্য পর্যটকদের লেখার মতো) 'সন্দেহজনক নৈতিকতা' বলে লিখেছেন, যদিও তিনি বলেছেন যে, গ্যেটেকে ঠিক নিন্দা করা যায় না, কারণ হারেম-এর অস্তিত্ব তো সত্যি সত্যিই ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমী লেখকদের লেখাগুলো পড়ার পর সাহিত্যপ্রেমী ইস্তাম্বুলবাসীদের মনের মধ্যে যে বিপরীতধর্মী ক্রিয়া হয়, তা এইসব অস্বস্তিকর ব্যাপারগুলোই বুঝিয়ে দেয়। যেহেতু দেশটা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হওয়ার চেষ্টা করছে, সে জন্যে পশ্চিমী লেখকরা কী বলেন, তা এদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখনই কোনো পশ্চিমী লেখক সীমা অতিক্রম করেন, ইস্তাম্বুল পাঠক, যে কিনা সেই লেখকের সম্বন্ধে এবং তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে খুব পরিশ্রম করেছে, তার তখন মন ভেঙে যায়। অবশ্য কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না সীমা কোথায় এবং কোন্টাকে 'সীমা অতিক্রম করা' বলা হয়। বলা যায়, একটা শহরের চরিত্র নির্ধারিত হয় কিভাবে 'সীমা অতিক্রম করা' হচ্ছে, তার ওপর এবং একজন বাইরের লোক কোনো বিষয়কে যদি অধিক গুরুত্ব দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অতিরঞ্জিত করে, হয়তো দেখা যাবে সেই বিষয়টা দিয়েই শহরের চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্যপন্থী হওয়ার যে প্রচেষ্টা এবং সাথে সাথে তুর্কী জাতীয়তাবাদের যে অভ্যুত্থান, এর ফলে পাশ্চাত্যের নজরের সঙ্গে যে 'ভালোবাসা-ঘৃণা'র সম্পর্ক, সেটা আরো বেশি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের যে পর্যটকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পুরো উনবিংশ শতাব্দী ধরে ইস্তাম্বুলে পা রেখেছেন, তাঁরা যে সব বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়েছিলেন, সেগুলো হল : হারেম, ক্রীতদাসবাজার ('ইনোসেন্টস অ্যাব্রড' বইয়ে মার্ক টোয়েন স্বপ্নকল্পনা করেছিলেন যে, বড় বড় আমেরিকান কাগজগুলোর আর্থিক বিষয়ের পাতায় সদ্য আনা সির্কাশিয়ান এবং জর্জিয়ান মেয়েগুলোর দাম এবং শরীরের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে), রাস্তার ভিখারি, হাম্মালদের পিঠে অকল্পনীয় বিশাল বোঝা (আমার ছোটবেলায়, আমরা খুব অস্বস্তি বোধ করতাম, যখন ইউরোপিয়ান পর্যটকরা, গালাতা সেতু পার হবার সময় পিঠে অনেক মিটার উঁচু টিনের বোঝা বওয়া এই ভয়ঙ্কর কুলিদের ফটো তুলত, অথচ যখন হিলমি সাহেক্ক-এর মতো ইস্তাম্বুলী ফটোগ্রাফার এই একই ছবি তুলত, কেউ সেটা গ্রাহ্যই করত না)। দরবেশদের নিবাস (একজন পাশা তার বন্ধু এবং অতিথি নার্ভালকে বলেছিলেন যে, যে সব রুফাই দরবেশ নিজেদের শরীরে শিক বিঁধিয়ে দৌড়ে বেড়ায়, তারা সব 'পাগল' এবং উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ওদের নিবাসে যাওয়া মানে সময় নষ্ট করা); এবং স্ত্রী-জাতিকে আলাদা করে রাখা। ইস্তাম্বুলের পাশ্চাত্যমনা অধিবাসীরাও এইসব জিনিসের সমালোচনা করত। কিন্তু যদি কোনো পাশ্চাত্য লেখক সামান্য আপত্তি তুলত, তাহলে সেটা তাদের হৃদয় ভেঙে দিত এবং জাতীয়তাবাদের অহঙ্কারকে আঘাত করত।

যে সব পাশ্চাত্যমনা বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিম দুনিয়ার নামকরা লেখক ও প্রকাশকদের কাছ থেকে তাদের ওই পাশ্চাত্য মনোভাবের জন্য প্রশংসা শুনতে চাইত, তারাই এই কুচক্রে ইন্ধন জোগাত। কিন্তু উল্টো দিকে, পিয়ের লোটি-র মতো লেখকরা, বিপরীত কারণে ইস্তাম্বুল ও তার তুর্কী অধিবাসীদের যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসতেন, তা গোপন করতেন না; তাদের প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করার জন্য এবং যা কিছু পাশ্চাত্য তার বিরোধিতা করার জন্য। যে সময় পিয়ের লোটি, তাদের চিরাচরিত স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলার জন্য ইস্তাম্বুলীদের সমালোচনা করছিলেন, সে সময় তুরস্কে তার অনুগামীরা ছিল সংখ্যায় নগণ্য, আর তাদের বেশির ভাগই, মজার কথা, পাশ্চাত্যপন্থী সংখ্যালঘু। কিন্তু দেশ যখনই কোনো আন্তর্জাতিক বিবাদে জড়িয়ে পড়ত, তখন এই পাশ্চাত্যপন্থী সাহিত্যের কর্ণধাররা পিয়ের লোটির অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও বিদেশি লেখার 'টার্কোফিলিজম'-এর সঙ্গে একটা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের শান্তি স্থাপন করত।

১৯১৪ সালে আন্দ্রে জিদে-র তুরস্কের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণের বৃত্তান্ত এই তুর্কী প্রেমের সর্বরোগহর ওষুধ পেশ করে না। বরং ঠিক উল্টো : যখন উনি বলেন যে, তুর্কীদের ঘৃণা করেন, তখন কিন্তু উনি তদানীন্তন অহঙ্কারী জাতীয়তাবাদীর মতো কথাটা ব্যবহার করেননি, উনি ওটা করেছিলেন জাত তুলে নিন্দা করে; তুর্কীরা যে পোশাক পরে, তা কুৎসিত, কিন্তু এই জাতটা এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্যই নয়। তিনি গর্ব করে বলেন যে, তার এই ভ্রমণ তাকে শিখিয়েছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা, বিশেষ করে ফরাসি সভ্যতা, অন্য সব সভ্যতার চাইতে অনেক উচ্চ স্তরের। যখন 'মার্চে টার্ক' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনকার সবচেয়ে অগ্রগন্য তুর্কী কবি, ইয়াহিয়া কামাল অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, কিন্তু একজন লেখক বর্তমান কালে যা করতেন, সে রকম জনপ্রিয় কাগজে কোনো প্রতিবাদী লেখা প্রকাশ করার বদলে তিনি এবং অন্য বুদ্ধিজীবী তুর্কীরা একটা অপরাধী গোপনীয়তার মতো তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষতকে লুকিয়ে রেখে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখভোগ করতেন। এর থেকে এটাই বোঝায় যে, তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তারা ভয়-ভীত ছিলেন যে, জিদে-র এই অপমান হয়তো সত্যি। জিদের বই প্রকাশিত হবার এক বছর পর, আতাতুর্ক, যিনি সকলের চেয়ে বেশি পাশ্চাত্য অনুগামী ছিলেন, পোশাকের ব্যাপারে একটা বিপ্লব আনেন এবং যে সব কাপড়চোপড় পশ্চিম দেশীয় নয়, সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেন।

পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকরা যখন শহরটিকে হেয় করেন, তখন প্রায়শই আমি তাতে একমত হই, তাদের ঠান্ডা মাথার এই অকপটতাকে আমি, পিয়ের লোটি যে বরাবর ইস্তাম্বুলের সৌন্দর্য, তার অপূর্ব অনন্যতাকে এক ধরনের দাক্ষিণ্যযুক্ত শ্রদ্ধা করেন, তার চাইতে বেশি আনন্দ পাই। বেশির ভাগ পাশ্চাত্য পর্যটকরা শহরটিকে তার সৌন্দর্যের জন্য এবং শহরের অধিবাসীদের তাদের মনোহারিত্বের জন্য প্রশংসা করেন, কিন্তু এতে কিছুই বোঝায় না; আমাদের জানা দরকার, তারা যা দেখেন, তার মধ্যে কী দেখতে পান। মধ্য উনবিংশ শতাব্দীতে, ফরাসি এবং ইংরাজি সাহিত্যে ইস্তাম্বুলের আরো সমৃদ্ধ ভাবমূর্তির উপস্থাপনা হয়। দরবেশদের নিবাসস্থল, আগুন, সমাধিস্থলগুলোর সৌন্দর্য, প্রাসাদ ও তার হারেম, ভিখারি, শহরে ঘুরে বেড়ানো কুকুরের দল, মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ, স্ত্রী জাতিকে আলাদা সরিয়ে রাখা, শহরের রহস্যময়তা, বসফোরাস ভ্রমণ এবং শহরের দিগ্বলয়ের সৌন্দর্য– এই জিনিসগুলো শহরটিকে অদ্ভুত আকর্ষণীয় করে তোলে এবং যেহেতু যে সব লেখকেরা প্রায়ই আসতেন, তারা একই জায়গায় থাকতেন এবং একই পথ-প্রদর্শককে সঙ্গে নিতেন বলে, তারা তাদের মোহভঙ্গ হতে পারে, এমন অন্য কিছুই দেখেননি। এক নতুন প্রজন্মের পর্যটকরা ধীরে ধীরে সচেতন হলেন যে, অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে এবং সেই জন্যে অটোমান সৈন্যবাহিনীর সাফল্যের পেছনের গোপনীয়তা সম্বন্ধে বা তাদের সরকারের গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাদের কোনো কিছু ভাবার কারণ ছিল না। শহরটিকে ভীতিপ্রদ এবং অভেদ্য হিসেবে দেখার বদলে, তারা এটিকে একটা বিদেশী, আনন্দদায়ক, পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁদের পক্ষে তাঁরা যে এখানে এসেছেন সেটাই যথেষ্ট ছিল। কারণ তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীরা যে বিষয়ে লিখে গেছেন, সেই বিষয়েই লিখেছেন এবং ভ্রমণকে ভ্রমণ হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন এবং বিষয়ের গভীরে যেতে চাননি।

ট্রেন এবং বাষ্পীয় জাহাজ এসে যাওয়ার ফলে, ইস্তাম্বুল পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে এসে গেল এবং তাই হঠাৎ করে বেশি বেশি পাশ্চাত্য পর্যটকদের শহরের পথেঘাটে ঘুরতে দেখা যেতে লাগল, এবং এতে অনেকেই প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে ভাবতে লাগলেন যে, কী তাদের এই ভয়ানক জায়গায় নিয়ে এসেছে। এই সব পর্যটকদের অজ্ঞতা এবং ভান-করা সৃষ্টিধর্মীতা, এরা যা ভাবতেন, তাই লিখতে বাধ্য করত। এবং তাই আঁদ্রে জিদে'র মতো 'শিক্ষিত' লেখকও সংস্কৃতিগত তফাৎকে, স্থানীয় রীতিনীতি ও প্রচলিত প্রথাগুলোর অর্থকে অথবা সামাজিক কাঠামো যা তাদের চেপে রেখেছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে গ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। একজন পর্যটকের, তার নিজের মতে, ইস্তাম্বুল শহরটি আনন্দদায়ক এবং মনোযোগ কাড়ার মতো সুন্দর হোক, তা দাবি করার অধিকার আছে। শহরটি সম্বন্ধে আকর্ষক কিছু বলার নেই বলে, তিনি এবং তাঁর শ্রেণীর লোকেরা তাদের এই বিরক্তিকর, ঘটনাবিহীন বিষয়টিকে নিন্দা করার মতো আত্মবিশ্বাসী এবং তাঁরা আরো বিদগ্ধ পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবিদের কাছ থেকে নিজেদের মিলিটারি ও আর্থিক স্বাদেশিকতা গোপন করার সামান্যতম চেষ্টাও করেন না। তারা মনে করেন, সমস্ত মানবজাতির জন্য পশ্চিমী দুনিয়াই মানটা ঠিক করে।

এই সব পর্যটকেরা এমন একটা সময়ে ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন, যখন ইস্তাম্বুলকে আর বিদেশি বলে মনে হত না, কারণ শহরটির পশ্চিমীকরণ শুরু হয়ে গেছে এবং আতাতুর্কের মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার যুগ এসে গেছে– সুলতানরা নির্বাসিত, হারেমগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, দরবেশদের নিবাসগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কাঠের বাড়িগুলো এবং অন্যান্য পর্যটকদের আকর্ষণগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং অটোমান সাম্রাজ্যের বদলে একটি ছোট, অননুকরণীয় তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ সময় পরে, যখন নামকরা কেউ ইস্তাম্বুলে আসেননি, এবং স্থানীয় সাংবাদিকরা হিলটন হোটেলে যে কোনো বিদেশি এলেই তার সাক্ষাৎকার নিত, রাশিয়ান-আমেরিকান কবি জোসেফ ব্রডস্কি 'ফ্লাইট ফ্রম বাইজানটিয়াম' নামে একটি লম্বা লেখা 'নিউ ইয়র্কার' -এ প্রকাশ করেন।

হয়তো, তাঁর যে বইটিতে তিনি তাঁর আইসল্যান্ডের ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন, সেটি অডেন নির্দয়ভাবে পর্যালোচনা করায়, তিনি তখনো রাগে ফুঁসছিলেন, সেই কারণে ব্রডস্কি ইস্তাম্বুলে কেন এসেছেন (উড়োজাহাজে), তার একটা দীর্ঘ তালিকা দিয়ে শুরু করেছেন। সেই সময়ে আমি শহর থেকে দূরে থাকতাম এবং শহর সম্বন্ধে ভালো ভালো কথা পড়তে চাইতাম এবং তাই তাঁর বিদ্রূপ আমাকে পীড়া দিয়েছিল। তবুও আমি আনন্দ পেয়েছিলাম যখন ব্রডস্কি লিখলেন, 'এখানকার জিনিসগুলো সব কেমন সময় দ্বারা চিহ্নিত। পুরোনো নয়, প্রাচীন নয়, পুরাতন সংগ্রহশালায় রাখবার জিনিস নয়, এমনকি পুরোনো ঢং-এরও নয়, শুধু সময়-চিহ্নিত!' তিনি ঠিক বলেছেন। যখন সাম্রাজ্যের পতন হল, নতুন প্রজাতন্ত্র তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু নিজের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না; এর প্রতিষ্ঠাতারা ভেবেছিলেন, উন্নতির একটিই পথ, তা হচ্ছে তুরস্কবাসীত্বের একটা নতুন বোধ জাগরিত করা এবং এটা করতে গেলে বাকি পৃথিবী থেকে একটা স্বাস্থ্যকর বেড়ার আড়াল দিতে হবে। সুলতানদের যুগের যে নানা জাতি সম্মিলনের, নানা সংস্কৃতির মহামিলনের ইস্তাম্বুলের অস্তিত্ব ছিল, তার শেষ হয়ে গেল; শহরটি আবদ্ধ জলার মতো হয়ে গেল, খালি হয়ে গেল, আর একটা একঘেয়ে, একভাষী, সাদা-কালোর শহরে পর্যবসিত হল।

আমার ছেলেবেলায় আমি যে নানা জাতির শহর ইস্তাম্বুলকে দেখেছিলাম, আমি যখন সাবালক হলাম, ততদিনে তা একদম উবে গেছে। ১৮৫২তে, গ্যেটে, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়কার অন্যান্য অনেক পর্যটকের মতো মন্তব্য করেছিলেন যে, ইস্তাম্বুলের রাস্তায় টার্কিশ, গ্রিক, আর্মেনিয়ান, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি ভাষা শোনা যায় (শেষ দুটো ভাষার যে কোনো একটির চেয়ে বেশি শোনা যায় ল্যাডিনো ভাষা, যে সব ইহুদিরা ধর্মীয় বিচারসভায় পরে ইস্তাম্বুলে এসেছিল, তাদের মধ্যযুগীয় স্প্যানিশ ভাষা); উনি লক্ষ করেছিলেন যে, এই 'টাওয়ার অফ ব্যাবেল'-এ অনেক লোকই একাধিক ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে। মনে হয় তার অন্যান্য সতীর্থদের মতো, তিনিও নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না বলে একটু লজ্জিত ছিলেন।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং তুর্কীকরণের হিংস্র অভ্যুত্থানের পর, সংখ্যালঘুদের ওপর রাজ্যের সরকারি বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার পর– কেউ কেউ এই সব ব্যবস্থা নেওয়াকে শহর 'বিজয়ের' শেষ ধাপ বলে এবং অন্যরা বলে শহরকে আদিবাসীমুক্ত করা– এই সমস্ত ভাষার অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমি শিশু বয়েসে এই সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতা প্রক্রিয়ার সাক্ষী ছিলাম, কারণ যখনই কেউ রাস্তায় গ্রিক বা আর্মেনিয়ান ভাষায় জোরে কথা বলত (ওই সময়ে কুর্দ-দের জনসাধারণ্যে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করতে প্রায় শোনাই যেত না), কেউ না কেউ চিৎকার করে উঠত, 'হে নাগরিক, দয়া করে তুর্কী ভাষায় কথা বলুন!' সর্বত্রই এই নিষেধবাণীটি লিখিত ভাবেও ঝোলানো থাকত।

যে পাশ্চাত্য পর্যটক-লিখিয়েদের ওপর কোনোভাবেই নির্ভর করা যেত না, তেমন লেখকের ওপরও আমার যন্ত্রণাময় আগ্রহ কিন্তু আমার ভালোবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক-সঞ্জাত নয়। সরকারি নথিপত্র ছাড়া এবং কয়েকজন শহরের সাংবাদিক কলাম-লিখিয়ে, যারা ইস্তাম্বুলীদের রাস্তাঘাটে চলার সময়কার কুশ্রীতা নিয়ে বকাবকি করতেন, এ ছাড়া বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত, ইস্তাম্বুলীদের ভেতর খুব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম লোকই নিজের শহর নিয়ে লিখেছেন। একটা সজীব, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া শহর– তার রাস্তাঘাট, তার আবহাওয়া, তার গন্ধ, তার দৈনন্দিন জীবনের মহান বৈচিত্র্য– এগুলো এমন কিছু, যা সাহিত্যই বর্ণনা করতে পারে এবং বোঝাতে পারে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী আমাদের এই শহর যে সাহিত্যের প্রেরণা-স্বরূপ, সেই সাহিত্য এসেছে কেবলমাত্র পশ্চিমী লেখকদের কলম থেকে। ১৮৫০ সালে ইস্তাম্বুলের রাস্তাঘাট কেমন ছিল এবং অধিবাসীরা কী ধরনের কাপড়চোপড় পরত, সেটা দেখতে গেলে আমাদের অবশ্যই দু'ক্যাম্প-এর ফটোগ্রাফগুলো এবং পশ্চিমের শিল্পীদের খোদাই চিত্রগুলো দেখতে হবে। আমি যদি জানতে চাই আমার জন্মের একশ বছর, দু'শ বছর বা চারশ' বছর আগে, যে শহরে আমি আমার সারা জীবন কাটিয়েছি, সেই শহরের রাস্তাঘাট, রাজপথ এবং স্কোয়ারগুলোতে কী হত; যদি আমি জানতে চাই, কোন্ স্কোয়ারটা খোলা ময়দান ছিল, আর আজকের খোলা ময়দানগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলোতে বাড়িঘর ছিল; যদি আমি বুঝতে চাই সে সময় লোকেরা কেমন জীবন কাটাত– যদি আমি অটোমান সংগ্রহশালাগুলোর গোলোকধাঁধায় বছরের পর বছর না ঘুরতে চাই, তাহলে আমি আমার উত্তর পেয়ে যাব কেবল পশ্চিমী লেখকদের লেখায়, তা সে খানিকটা প্রতিসরিত হোক না কেন।

'দ্য রিটার্ন অব দ্য ফ্ল্যানেউর' বইতে ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ফ্রাঞ্জ হেসেলের 'বার্লিন ওয়াকস'-কে এইভাবে তুলে ধরেন যে, যদি আমরা শহরগুলোর বর্ণনামূলক লেখাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করি, লেখকদের জন্মস্থান অনুযায়ী, আমরা দেখব যে, সেই শহরের আদি বসবাসকারী লেখকরা যেগুলো লিখে গেছেন, তা সংখ্যায় নগন্য। বেঞ্জামিন-এর মতে, বাইরে থেকে কোনো শহরকে দেখার যে উৎসাহ তা শহরটি বিদেশি এবং ছবির মতো সুন্দর বলে। শহরের আদি বাসিন্দার কাছে শহরের সাথে যোগাযোগটা কেবল স্মৃতির মাধ্যমে তৈরি হয়।

আমি যা বলতে চাইছি, তা শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তা নয়। তবে সারা পৃথিবীর পশ্চিমীকরণের সাথে সাথে এটা বোধহয় অবশ্যম্ভাবী। হয়তো সেই জন্যেই আমি পশ্চিমী লেখকদের লেখাগুলো কখনো কখনো অন্য লোকের অদ্ভুত স্বপ্নকাহিনী মনে করে দূর থেকে পড়ি, তা নয়, বরং যেন আমার নিজের স্মৃতিকাহিনী, এইভাবে খুব কাছ থেকে পড়ি। হয়তো ছোটখাটো কোনও জিনিস, যেটা আমার নজরে এসেছে, কিন্তু তা নিয়ে কিছু লিখিনি, কারণ আমার জানা অন্য কেউই তা নিয়ে লেখেননি, সেই রকম জিনিসের ওপরে কোনো লেখা আমার খুব ভালো লাগে। যে গালাতা সেতু আমি ছোটবেলা থেকেই জানি, সেই গালাতা সেতুর যে বর্ণনা ন্যুট হ্যামসুন দিয়েছিলেন, গাধা বোটগুলোর ওপরে বানানো সেতু, আর তার ওপর দিয়ে যানবাহন, লোকজন চলাচলের সময় দোলে, তা পড়তে আমার দারুণ ভালো লাগে– যেমন ভালো লাগে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের, সমাধিস্থলগুলোর চারপাশে লাগানো সাইপ্রেস গাছগুলোর 'অন্ধকারাচ্ছন্নতা'র বর্ণনা। একজন বিদেশির চোখ দিয়ে ইস্তাম্বুলকে দেখা, আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় আনন্দ দেয়, কারণ সেই ছবি আমার সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং দেশের উপযুক্ত হবার জন্য যে চাপ, তাকে সরিয়ে রাখে। হারেম সম্বন্ধে তাদের প্রায়শঃ সঠিক বর্ণনা (কাজে কাজেই অস্বস্তিকরও), অটোমানদের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা এবং অটোমানদের রীতিনীতির বর্ণনা, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এত আলাদা যে, আমার বোধ হয়, তারা হয়তো আমার শহরকে বর্ণনা করছেন না, অন্য কোনো শহরকে বর্ণনা করছেন। এই পশ্চিমীকরণ আমাকে এবং লাখ লাখ ইস্তাম্বুলবাসীকে, আমাদের অতীতকে বিস্ময়পূর্ণ বলে ভাবতে সাহায্য করে, অতীতের চিত্রকল্পকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শহরটিকে দেখা এবং তার সঙ্গে আমার যোগাযোগের পথ সজীব রাখার জন্য আমি মাঝে মাঝে নিজেকেই বোকা বানাই। কখনো কখনো এমনও হয় যে, অনেক দিন বাড়ির বাইরে যাওয়া হয়নি, বা সেই যে অন্য একটা বাড়িতে অন্য এক ওরহান ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষায় থাকে, তার কথা চিন্তাই করা হয়নি, তখন মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা হয় যে, এই জায়গার প্রতি, বাড়ির প্রতি এই যে আমার আসক্তি, এতে আমার মস্তিষ্ক জড়ত্ব প্রাপ্ত হবে, কিংবা এই নিঃসঙ্গতা আমার দৃষ্টিতে যে ইচ্ছার প্রকাশ থাকে, তাকে মেরে ফেলবে। তখন আমি নিজেকে এই বলে খুশি হই যে, পশ্চিমী পর্যটকদের লেখাগুলো দিনের পর দিন পড়ার ফলে শহরটিকে আমি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি, তার মধ্যে খানিকটা বিদেশি বিদেশি ভাব এসে গেছে। মাঝে মাঝে যখন আমি কোনো জিনিসের ব্যাপারে পড়ি, যার কখনো পরিবর্তন হয় না— যেমন বেশ কয়েকটি প্রধান রাস্তা এবং পাশের গলি, এখনো কোনোরকমে খাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকা কাঠের বাড়িগুলো, রাস্তার ফেরিওয়ালারা, খালি পড়ে থাকা জায়গাগুলো এবং সেই 'হুজুন,' জনসংখ্যা দশগুণ বাড়লেও যেগুলো এখনো সেই একই আছে,– তখন আমি বহিরাগত পশ্চিম দুনিয়ার লোকদের লেখাকে নিজেরই স্মৃতিকথা ভেবে নিজের মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।

যদি পশ্চিমী পর্যটকরা ইস্তাম্বুলের চারপাশে, কল্পনার জগৎ, প্রাচ্য সম্বন্ধে কল্প-কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদির জাল বোনেন, তাতে শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলের কোনো ক্ষতি করা হয় না– আমরা তো কোনোদিন পাশ্চাত্ত্য উপনিবেশ ছিলাম না। কাজেই যদি গ্যেটে লেখেন যে, যখন কোনো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তুর্কীরা কাঁদে না, তারা– ফরাসিদের মতো নয়, যারা এইসব ব্যাপারে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করে– দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বিপদের মুখোমুখি হয়, কারণ তারা অদৃষ্টে বিশ্বাস করে– আমি তখন তিনি যা লিখেছেন, তার সঙ্গে একদম একমত হতে পারি না, কিন্তু তবুও আমার মনে হয় না, তিনি কিছু অন্যায় লিখেছেন। অন্যায়টা হয় অন্যত্র। যে কোনো ফরাসি পাঠক, যারা বিনা বাক্যে গ্যেটের লেখা মেনে নেয়, তারাও কিন্তু হতবাক হয়ে যায় যে, ইস্তাম্বুলবাসীরা কেন তাদের 'হুজুন'-কে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

আমি যখন ইস্তাম্বুলের ওপর পশ্চিমী পর্যটকদের লেখা পড়ি, তখন আমার মনে যে অভিযোগের উদয় হয় তা হল পশ্চাৎ-দৃষ্টি সম্পর্কে। এই পর্যবেক্ষকরা, যাদের মধ্যে অনেকেই বড় লেখক, অনেক স্থানীয় বিষয় নিয়ে লিখেছেন এবং অতিরঞ্জিতও করেছেন, আর সেই বিষয়গুলো, লেখা প্রকাশ হওয়ার পরপরই শহর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এটা একটা নিষ্ঠুর মিথ্যেকথিত্ব; পশ্চিমী পর্যবেক্ষকরা ইস্তাম্বুলকে যে সব জিনিস মহার্ঘ্য এবং অ-পশ্চিমী বানিয়েছে, সেগুলোকে চিহ্নিত করতে ভালোবাসেন, অথচ আমাদের ভেতরের পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন সত্তা, সেই একই জিনিসকে বাধা বলে মনে করে এবং চায় যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাধাগুলোকে শহরের বুক থেকে মুছে ফেলা হোক।

একটা ছোট তালিকা দেওয়া হল :

পাহারাদারী, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য পর্যটকদের কাছে খুব আগ্রহের জিনিস, সর্বপ্রথম ভেঙে ফেলা হয়। ক্রীতদাস বাজার, পাশ্চাত্ত্য ঔৎসুক্যের আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু, তারা এ সম্বন্ধে লেখা শুরু করবার পরই, বন্ধ হয়ে যায়। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই রুফাই দরবেশরা, তাদের উঁচানো শিকগুলো নিয়ে এবং মেভলেভি দরবেশদের নিবাসগুলো সব বন্ধ হয়ে যায়। আঁদ্রে জিদে অভিযোগ জানানোর পরই অটোমান পোশাক-পরিচ্ছদ, যা বহু পাশ্চাত্ত্য চিত্রশিল্পী এঁকেছিলেন, নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। আরেকটা জনপ্রিয় ব্যাপার, হারেম– সেও শেষ হয়ে গেল। ফ্লবার্ট তার প্রিয় বন্ধুকে বলেছিলেন যে, তিনি ক্যালিগ্রাফি-তে তাঁর নাম লেখানোর জন্যে বাজারে যাচ্ছেন– তার পঁচাত্তর বছর পরে সমগ্র তুরস্ক আরবিক থেকে ল্যাটিন অক্ষরে চলে আসে, সাথে সাথে এই আনন্দও শেষ হয়ে গেল। এই সমস্ত ক্ষতিগুলোর মধ্যে আমার মনে হয়, ইস্তাম্বুলবাসীদের কাছে সবচেয়ে কষ্টকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাগান এবং স্কোয়ারগুলো থেকে কবর এবং সমাধিস্থলগুলোর অপসারণ করে ভীতিজনক উঁচু প্রাচীর ঘেরা জমিতে নিয়ে যাওয়া, যেখানে সাইপ্রেস গাছও নেই, কিছু দেখাও যায় না। প্রজাতন্ত্রের যুগের অনেক পর্যটকের দেখা 'হামাল'রা, ব্রডস্কির দেখা পুরোনো আমেরিকান মোটর গাড়িগুলোর মতোই, বিদেশিরা তাদের লেখায় উল্লেখ করার পরপরই শহর থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

শহরের কেবল একটিই মুদ্রাদোষ পশ্চিমী নজর সত্ত্বেও হারিয়ে যায়নি; কুকুরের দল এখনো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। পশ্চিমী মিলিটারি শৃঙ্খলা ও অনুশাসন না মানার দরুন পাহারাদারিগুলো নিষিদ্ধ করে দেবার পর, মাসুদ২ শহরের কুকুরগুলোর

দিকে মনোযোগ দেন। এই কাজে অবশ্য তিনি অকৃতকার্য হন। সংবিধানসম্মত রাজতন্ত্রের পর, আরও একবার 'সংস্কার' করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, এবারে জিপসিরা সাহায্য করেছিল, কিন্তু যে কুকুরগুলোকে একটা একটা করে ওরা শিভ্রিয়াদা-তে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে তারা বিজয়ীর মতো বাড়ি ফিরে আসে। ফরাসিরা ভাবত এই কুকুরের দলগুলো অনুপম; শিভ্রিয়াদাতে সমস্ত কুকুরকে ঠেসে রাখাটাও ওরা অপুর্ব মনে করত– সার্ত্রে তার 'এজ অফ রিজন' উপন্যাসে অনেক বছর পরে এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোস্টকার্ড শিল্পী ম্যাক্স ফ্রুকটারম্যান, কুকরদের এই বেঁচে থাকবার বিস্ময়কর ব্যাপারটাকে চিনতে পেরেছিলেন; বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি ইস্তাম্বুলের দৃশ্যের যে ধারাবাহিক প্রকাশ করেছিলেন, তাতে তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে যত দরবেশ, সমাধি স্থল ও মসজিদ দেখিয়েছেন, তত সংখ্যক কুকুরও দেখিয়েছেন।

Les chiens des rues.
Le déjeuner.
Souvenir de

Photogr. Abdullah.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬.
ধ্বংসাবশেষের 'হুজুন' : শহরের দরিদ্র পাড়ায় তানপিনার এবং ইয়াহিয়া কামাল

তানপিনার এবং ইয়াহিয়া কামাল ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে গরীব পাড়াগুলোর মধ্যে দিয়ে একসঙ্গে দীর্ঘ পথ হাঁটতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি একা যখন সেই অঞ্চলগুলোয় দ্বিতীয়বার হেঁটে বেড়িয়েছেন, তখন তানপিনার মনে করেছেন, প্রথমবার এই কোকামুস্তাফাপাশা ও শহরের প্রাচীরের মধ্যেকার বিশাল গরীব পাড়াগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় তিনি কত কিছু শিখেছিলেন। ১৮৫৩ সাল নাগাদ শহরের ওপর যে বিষণ্নতা নেমে এসেছিল, গ্যেটে এই অঞ্চলগুলোয় ঘুরবার সময় সেই বিষণ্নতা অনুভব করেছিলেন। তানপিনার ও ইয়াহিয়া কামাল অপমানজনক 'সন্ধিচুক্তির' বছরগুলোতে তাদের ভ্রমণ শুরু করেছিলেন।

যখন এই দুই বরেণ্য তুর্কী লেখক তাঁদের প্রথম সফরে বের হন, ততদিনে দুই ফরাসি বন্ধু নার্ভাল এবং গ্যেটে-র, যাঁদের লেখা এঁরা এত শ্রদ্ধা করতেন, এই অঞ্চল ভ্রমণের পর সত্তর বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্য তার বলকান-এর এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত অধিকৃত অঞ্চলগুলোর অধিকার হারিয়েছে এবং ক্রমাগত ছোট থেকে আরো ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে; ইস্তাম্বুলকে যে অর্থাগম পালন-পোষণ করত, সেই অর্থাগমের উৎস শুকিয়ে গেছে; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মৃতের সংখ্যা অনেক লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে এবং নতুন বলকান প্রজাতন্ত্রের আদিবাসী বিশুদ্ধিকরণের দরুণ মুসলিম বাস্তহারাদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবাহ সত্ত্বেও, শহরের জনসংখ্যা এবং ধনসম্পদ অত্যন্ত কমে যায়। ওই একই সময়ে ইউরোপ এবং পাশ্চাত্য, দুই-ই ধনবান হতে থাকে, তার জন্যে বিশাল কারিগরি অগ্রগতিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ইস্তাম্বুল যত দরিদ্র হতে থাকল, পৃথিবীতে তার গুরুত্বও কমে গেল এবং বিরাট সংখ্যার বেকারের বোঝা নিয়ে পৃথিবীর একটি দূরতম স্থান হয়ে গেল। আমার শিশু বয়েসে পৃথিবীর একটা মহান রাজধানীতে বাস করার কোনো বোধ ছিল না বরং একটা গরীব প্রাদেশিক শহরে বাস করছি, সেই বোধটাই ছিল।

যখন তানপিনার 'এ স্ট্রোল থ্রু দ্য সিটিজ পুওর নেইবারহুড' লিখেছিলেন, তিনি কেবল তাঁর নিজের বর্তমান ভ্রমণ এবং পূর্বেকার ভ্রমনের কথাই বর্ণনা করেননি; শহরের সবচেয়ে গরীব লোকদের সঙ্গে এবং ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে দূরের অঞ্চলগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে পুনর্বার পরিচিত হওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল না– এই ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে একটা গরীব দেশে বসবাস করার যে সত্যতা, তার সঙ্গে একাত্ম করার প্রচেষ্টা করেছিলেন, যে শহরটার পৃথিবীর চোখে কোনো মূল্যই নেই। সেই সময়ে গরীব পাড়াগুলোকে ভূদৃশ্য হিসাবে পর্যটন করার অর্থ হচ্ছে ইস্তাম্বুল আর তুরস্ক নিজেরাই যে গরীব দেশ, এই বাস্তবকে মেনে নেওয়া। তানপিনার দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ণনা লিখেছেন, পুড়ে যাওয়া রাস্তাঘাট, ধ্বংসস্তূপ এবং ভেঙে পড়া দেওয়ালগুলো নিয়ে, যা শিশু বয়েসে আমার পরিচিত দৃশ্য। পরে, হাঁটতে হাঁটতে তিনি 'আব্দুল হামিদের' সময়কার একটা বড় কাঠের তৈরি প্রাসাদের, যেটা তখনো কোনো রকমে আস্ত থাকতে পেরেছে, ভেতর থেকে মেয়েদের গলার স্বর শুনতে পান (অভ্যাসবশত; তানপিনার এটাকে 'হারেমের কলকাকলি' বলে বর্ণনা করেন), কিন্তু তাঁর নিজেরই আরোপ করা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি মেনে, তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই শব্দগুলো অটোমান শব্দ নয়, বরং এগুলো গরীব মেয়েলোকদের কথাবার্তার শব্দ, যারা শহরের নতুন কুটির শিল্পগুলোয় কাজ করে 'একটা মোজা তৈরির কারখানা, বা তাঁতশালা।' প্রত্যেক পাতায় তানপিনার পুনঃ পুনঃ একই কথা বলছেন, 'যেমন আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানি'; তিনি 'রাসিম' নামে একটা পাড়ার বর্ণনা দিয়েছেন, যার কথা একবার খবরের কাগজের কলামে প্রকাশিত হয়েছিল, 'একটা লতা-গুল্ম বা আঙুরের লতায় ছাওয়া ফোয়ারা, রোদে ঝোলানো কাপড় শুকোচ্ছে, বিড়াল, কুকুর, ছোট ছোট মসজিদ এবং সমাধিস্থল'। এইসব গরীব পাড়াগুলো, ধ্বংসাবশেষ, ভাঙাচোরা আবাসিক অঞ্চলগুলো এবং শহরের ভগ্নপ্রায় দেওয়াল যার সম্বন্ধে নার্ভাল এবং গ্যেটে মন-কাড়া বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে তানপিনার প্রথম যে বিষণ্ণতার বোধ আবিষ্কার করেন, সেটাকেই তিনি দেশীয় 'হুজুনে' পরিবর্তিত করেন যার মধ্যে দিয়েই স্থানীয় ভূদৃশ্যাবলী এবং বিশেষ করে আধুনিক কাজ-করা মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনের ছবি উপলব্ধি করতে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা জানি না, উনি সচেতনভাবে এটা করেছিলেন কিনা। কিন্তু তিনি সচেতন ছিলেন যে, পুড়ে-যাওয়া অঞ্চলগুলো, কারখানা, ডিপো এবং ভাঙা-চোরা কাঠের প্রাসাদগুলো যেগুলো তিনি ভগ্নপ্রায় ও বিস্মৃত এই নির্জন অঞ্চলের ফাঁকা রাস্তাগুলোয় দেখেছিলেন, সেগুলো একটা বিশেষ সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব বহন করে। কারণ ওই একই রচনায়, তানপিনার লিখছেন:

> এই ধ্বংসপ্রাপ্ত পাড়াগুলোর অভিযানকে আমি প্রতীকি মনে করি। কেবল মহাকাল ও ইতিহাসের সজোর ধাক্কাই একটা পাড়াকে এমন চেহারা দিতে পারে। আমাদের সামনে এই যে দৃশ্য, একে সৃষ্টি করতে এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের কত জয়, কত পরাজয়, কত দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে?

এখন আমরা একটা উত্তর দিতে পারব, যেটা হয়তো ইতিমধ্যেই পাঠকের মনে বাসা বেঁধেছে। যদি ওরা অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারেই ব্যস্ত থাকত এবং একদিকে ইউরোপিয়ানদের চোখে ইস্তাম্বুলের ক্রমাবনতি এবং অন্যদিকে বিষণ্ণতার 'হুজুন' যা বড় বড় পরাজয়ের থেকে উদ্ভূত, তাই নিয়েই ব্যাপৃত থাকত, তাহলে কেন তারা তাদের নার্ভালিয়ান কষ্টবোধকে 'বিশুদ্ধ কবিতা'য় রূপান্তরিত করল না, যা অত্যন্ত মানানসই হত? নার্ভালের 'অরেলিয়া'-তে, যখন তিনি তাঁর প্রেমকে হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার বিষণ্ণতা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তাঁর দাবি যে, জীবনে আর কিছু নেই, কেবল অশ্লীল মানসিক কৈবল্য ছাড়া, বুঝতে পারি। নার্ভাল ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন, যাতে তাঁর বিষণ্নতাকে তিনি পেছনে ফেলে আসতে পারেন। (গ্যেটে কিন্তু না জেনে এই বিষণ্নতাকে নিজের লেখার মধ্যে ঢুকে যেতে দিয়েছিলেন।) যখন তানপিনার, তুরস্কের বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং ইয়াহিয়া কামাল, তুরস্কের বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি, একসঙ্গে

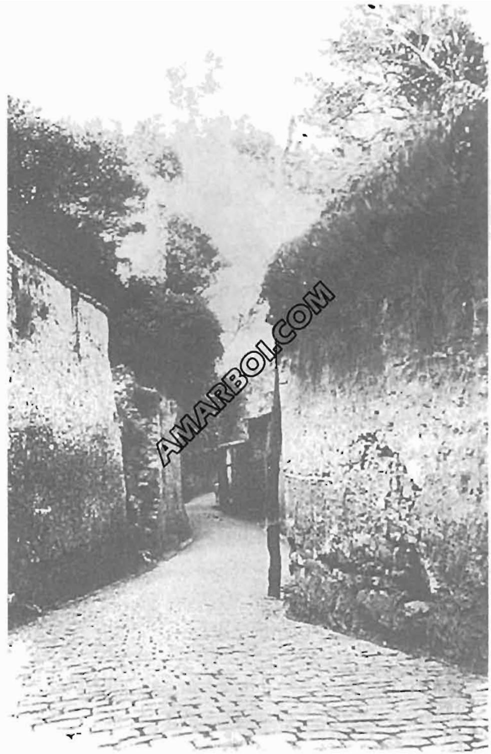

শহরের দরিদ্র পাড়াগুলো পরিভ্রমণ করতেন, তাঁরা নিজেদের ক্ষতি এবং বিষণ্নতা আরো নিবিড়ভাবে অনুভব করার জন্যই এটা করতেন। কেন?

তাঁদের একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল। তাঁরা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা নতুন তুর্কী রাষ্ট্র, একটা নতুন তুর্কী জাতীয়তাবাদ-এর চিহ্ন খুঁজতেন; অটোমান সাম্রাজ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতন হতে পারে, কিন্তু তুরস্কের অধিবাসীরা, যারা একে মহান সাম্রাজ্য বানিয়েছিল (রাজ্যের মতো, এই দুজনও গ্রিক, আর্মেনিয়ান, ইহুদি, কুর্দ এবং আরো অনেক সংখ্যালঘুদের অবদান ভুলে গিয়ে খুশি হতেন), এঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, যদিও বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন, তবুও তারা তখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের আদর্শের মতো নয়, যারা নিজেদের দেশপ্রেমকে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ

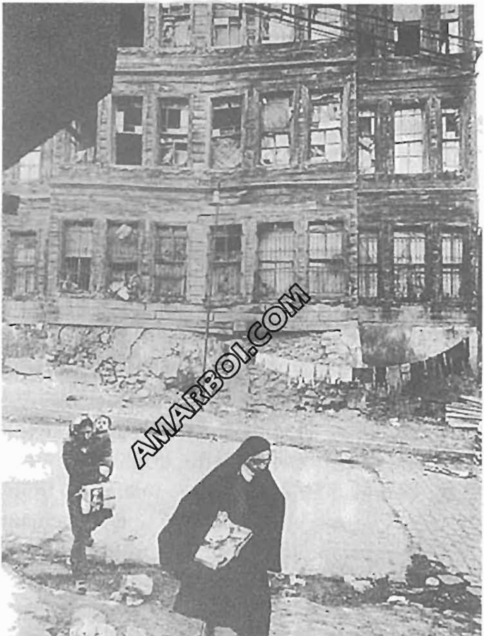

করেছিলেন, যা সরকারি ফরমান বা জবরদস্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইয়াহিয়া কামাল ফরাসি কবিতা পড়ার জন্য দশ বছর প্যারিসে কাটিয়েছিলেন এবং 'একজন পশ্চিমীর মতো চিন্তা করে' তিনি একটা পশ্চিমী ধাঁচের মূর্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা জাতীয়তাবাদকে 'দেখতে আরো সুন্দর' করে তুলবে।

যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্য পরাভূত হল আর মিত্রপক্ষ ইস্তাম্বুল অধিকার করল এবং ফরাসি ও ইংরাজ যুদ্ধজাহাজগুলো ডোলমাবাহ্যাস প্রাসাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে বসফোরাসের বুকে বসে রইল, তখন নানা রাজনৈতিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, যাতে তুর্কী পরিচয়কে সামনে আনা হয়নি। আনাতোলিয়াতে গ্রিক সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলছে, ইয়াহিয়া কামাল, যিনি যুদ্ধের রাজনীতির বা সেনাবাহিনীর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, আঙ্কারা ছেড়ে দূরে অন্য জায়গায় থাকতেন। তিনি ইস্তাম্বুলে 'অপ্রকাশ্যে' থাকাটাই বেছে নিয়েছিলেন এবং সেখানেই অতীত তুর্কী বিজয়াভিযান সম্পর্কে কবিতা লেখায় এবং একটা 'তুর্কী ইস্তাম্বুল'-এর ভাবমূর্তি তৈরির কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

তাঁর সফল রাজনৈতিক কর্মসূচির সাহিত্যিক দিকটা ছিল প্রচলিত কবিতার ধারা এবং পরিমাপ নীতি (আরুজ) এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে কথ্য তুর্কী ভাষার রচনাশৈলী এবং আবহ এনে ফেলা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রতিপন্ন করা যে, তুর্কীরা এমন একটা জাতি যারা বড় বড় যুদ্ধ জয়ও দেখেছে এবং মহান লেখাও লিখেছে। ইস্তাম্বুলকে এখানকার লোকেদের সবচেয়ে বড় শিল্পকীর্তি হিসেবে উপস্থাপনা করাতে, তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিল : যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, যুদ্ধবিরতির বছরগুলোতে, ইস্তাম্বুল পশ্চিমের উপনিবেশ হয়ে পড়ে, তাহলে ঔপনিবেশকারীদের কাছে এটা ব্যাখ্যা করা জরুরি যে, এই শহরটা কেবলমাত্র হাঘিয়া সোফিয়া এবং এর গির্জাগুলোর জন্যই স্মরণীয় নয়; তাদেরকে শহরের 'তুর্কী পরিচয়' সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। এবং স্বাধীনতার যুদ্ধের ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে ইয়াহিয়া কামালের ইস্তাম্বুলের তুর্কীত্বের ওপর জোর দেওয়াতে 'একটা নতুন দেশ তৈরি করার' ঘোষণা কার্যকর হয়। দুজন লেখকই বড় বড় নিবন্ধ লেখেন, যাতে ইস্তাম্বুলের বহুভাষী, বহুধর্মী উত্তরাধিকারকে উপেক্ষা করে তার তুর্কীত্বকে সমর্থন করা হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তানপিনার এই ব্যাপারটা স্মরণ করেছিলেন বহু বছর পরে তাঁর একটি লেখায়, যার নাম ছিল 'আমরা যুদ্ধবিরতির যন্ত্রণাময় দিনগুলোতে আমাদের অতীতের মহান কীর্তিগুলোকে কেমনভাবে আলিঙ্গন করেছিলাম'। একটা রচনায় যার নাম ছিল, 'ইস্তাম্বুলের শহরের প্রাচীরগুলোতে,' ইয়াহিয়া কামাল বর্ণনা করেছেন, কেমন করে তিনি এবং তার ছাত্ররা টোপকাপিতে ট্রামে চড়তেন এবং মারমারা থেকে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত প্রাচীরের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন, যে প্রাচীরের 'টাওয়ারগুলো এবং কামান ছুড়বার ছিদ্রগুলো যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে থাকত' এবং ভেঙে-পড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীরের বড় বড় টুকরোর ওপর বসে বিশ্রাম নেবার জন্য থামতেন। এটা যে একটা তুর্কী শহর, সেটা প্রমাণ করবার জন্য, এই দুই লেখক জানতেন যে, পশ্চিমী পর্যটক ও লেখকদের খুব প্রিয় শহরের দিগন্ত রেখা অথবা শহরের মসজিদ ও গির্জাগুলোর ছায়া বর্ণনা করাই যথেষ্ট নয়। লামার্টিন থেকে লে কর্বুসিয়ের, প্রতিটি পশ্চিমী পর্যবেক্ষক হাঘিয়া সোফিয়া শোভিত ইস্তাম্বুলের দিগন্তরেখা দেখলেও সেটা তুর্কী ইস্তাম্বুলের জাতীয় ভাবমূর্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারেনি– এই ধরনের সৌন্দর্য বড় বেশি আন্তর্জাতিক। ইয়াহিয়া কামাল ও তানপিনারের মতো জাতীয়তাবাদী ইস্তাম্বুলী দরিদ্র, পরাজিত ও বঞ্চিত মুসলিম জনসংখ্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া পছন্দ করতেন, এটা প্রমাণ করতে যে, তারা তাদের পরিচিতি একটুও হারায়নি এবং একটা বিষাদাচ্ছন্ন সৌন্দর্য, যা ক্ষতি এবং পরাজয়ের বোধ প্রকাশ করে, তা পাওয়ার আকাঙ্খাকে সন্তুষ্ট করতে। এই কারণেই তারা দরিদ্র পাড়াগুলোতে হাঁটতে যেতেন, সন্ধান করতেন সেই সুন্দর দৃশ্যাবলীর, যা এই শহরের অধিবাসীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অতীতের 'হুজুন' এনে দিয়েছে; তাঁরা গ্যেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তা পেয়েওছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদীতা সত্ত্বেও, তানপিনার কখনো কখনো 'ছবির মতো সুন্দর' এবং 'পেসেজ' এই ধরনের কথাগুলো ব্যবহার করতেন; এই পাড়াগুলো প্রচলিত, অবিকৃত এবং পশ্চিমী দুনিয়ার স্পর্শ-বিরহিত, বোঝাতে তিনি লিখেছিলেন যে, 'এরা ধ্বংস হয়ে গেছে, এরা গরীব এবং দুর্দশাগ্রস্ত', কিন্তু তবুও 'নিজেদের ধরনধারণ এবং নিজেদের জীবনধারণ প্রণালী' বজায় রেখেছে।

কাজেই এইভাবেই ইস্তাম্বুলবাসী দুই বন্ধু– একজন কবি, একজন গদ্য লেখক– প্যারিসের দুই বন্ধুর রচনা থেকে রসদ সংগ্রহ করেছিলেন, একজন কবি, আরেকজন গদ্য লেখক এবং অটোমান রাজতন্ত্রের পতন থেকে, প্রথম দিকের প্রজাতন্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয়তাবোধ থেকে, এর ধ্বংসাবশেষ থেকে, এর পশ্চিমীকরণের প্রকল্প থেকে, এর কবিতা এবং এর ভূদৃশ্যাবলী থেকে, একটি গল্প বুনতে পেরেছিলেন। এই জড়ানো-মড়ানো গল্পের ফল হল একটি ভাবমূর্তি, যার মধ্যে ইস্তাম্বুলীরা নিজেদের দেখতে পাবে এবং একটি স্বপ্ন, যা তারা পেতে চাইবে। আমরা এই স্বপ্নকে, যা বন্ধ্যা, নিঃসঙ্গ, দুর্দশাগ্রস্ত, শহরের প্রাচীরের বাইরের পাড়াগুলো থেকে জন্ম নিয়েছে, 'ধ্বংসের বিষণ্ণতা' বলতে পারি এবং যদি কেউ এই দৃশ্যাবলীকে কোনো বাইরের লোকের চোখ দিয়ে দেখে (যেমন তানপিনার দেখেছিলেন), হতে পারে এগুলোকে ছবির মতো সুন্দর দেখবে। এই ছবির মত সুন্দর ভূদৃশ্যাবলীকে সৌন্দর্য হিসাবে প্রথমবার দেখার পর শতাব্দীগত পরাভব ও দারিদ্র্য ইস্তাম্বুলবাসীদের ওপর যে দুঃখ এনে দিয়েছে, তা প্রকাশ করতে বিষণ্ণতাবোধও আসবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭.

ছবির মতো সুন্দর বাইরে ছড়িয়ে থাকা পাড়াগুলো

'সেভেন ল্যাম্পস অফ আর্কিটেকচার' বইতে জন রাস্কিন 'মেমারি' নামক অধ্যায়ের বেশির ভাগ অংশই ব্যয় করেছেন ছবির মতো দৃশ্যের সৌন্দর্য বোঝাতে, এই ধরনের স্থাপত্যে এই বিশেষ সৌন্দর্যের ভূমিকা এবং তার দুর্ঘটনাজনিত প্রকৃতি বোঝাতে (সুপরিকল্পিত উচ্চাঙ্গের নির্মাণশৈলীর উল্টো)। কাজেই যখন তিনি কোনো কিছুকে 'ছবির মতো' বলে বর্ণনা করেন, তখন তিনি একটা স্থাপত্যকর্মের দৃশ্যকে বর্ণনা করছেন, যা দীর্ঘ সময় পরে, তার স্রষ্টা কখনো যা দূরদর্শিতায়ও দেখতে পাননি, তেমনি সুন্দর হয়ে ওঠে। রাস্কিনের মতে, কোনো বাড়ি 'কয়েকশ' বছর দাঁড়িয়ে থাকলে, তার আইভি লতায় ঢাকা অবয়ব,তার চারধার ঘিরে থাকা বুনো ঝোপঝাড়, ঘাসের মাঠ, দুরের পাথর, টিলা, আকাশের মেঘ ও ঢেউ-ভাঙা সমুদ্র ইত্যাদি খুঁটিনাটির মধ্যে থেকে ছবির মতো সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। কাজেই একটা নতুন বাড়িতে ছবির মতো কিছুই নেই, যা তার নিজের যোগ্যতায় দেখার বস্তু হয়ে ওঠার দাবি করতে পারে; ওটা তখনই ছবির মতো হয়ে উঠবে, যখন ইতিহাস তাকে সময়-আরোপিত সৌন্দর্য দেবে এবং আমাদের একটা সৌভাগ্যমূলক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেবে।

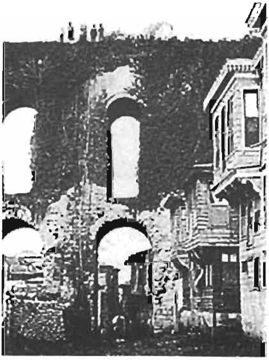

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলেমানিয়া মসজিদে আমি যে সৌন্দর্য দেখি, তা মসজিদের গঠনরেখায়, তার ডোমগুলোর নীচের মনোরম অংশগুলোতে, তার পাশের ডোমগুলোর ছড়ানো বিন্যাসে, তার দেওয়াল ও খোলা জায়গার সমানুপাতে, তার সন্নিহিত টাওয়ারগুলোর এবং ছোট আর্চগুলোর সাযুজ্যতে, তার ধবধবে সাদা রঙ এবং তার ডোমগুলোর মাথায় বসানো সিসের বিশুদ্ধতায়– এর মধ্যে কোনোটাকেই আলাদা করে 'ছবির মতো' বলা যাবে না। এটা নির্মাণ করার চারশ বছর পরেও, আমি যখন সুলেমানিয়ার দিকে তাকাই, আমি একটা মসজিদ তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই, যেমন ও শুরুতে ছিল। ইস্তাম্বুলের দিগন্ত রেখায় কেবলমাত্র একটি স্মৃতিস্তম্ভই প্রাধান্য বিস্তার করে না; এই দিগন্তরেখার অনুপম সৌন্দর্য কেবলমাত্র সুলেমানিয়া মসজিদের জন্যই নয়, হাঘিয়া সোফিয়া, বেয়াজিৎ এবং ইয়াবুজ সুলতান সেলিম ও শহরের অন্তঃস্থলের অন্যান্য বড় মসজিদগুলো, তার সঙ্গে সুলতানদের বৌ-ছেলেমেয়েদের তৈরি ছোট ছোট মসজিদগুলো এবং অন্য আরো সব রাজসিক পুরোনো বাড়িগুলো যেগুলোতে এখনো, তাদের স্রষ্টা স্থপতিরা যা করতে চেয়েছিলেন, সেই নান্দনিক আদর্শগুলোর প্রতিফলন হয়, এই সবও মাথা উঁচু করে দিগন্তরেখাকে অনুপম সৌন্দর্য দান করে। যখন এই সব বাড়িগুলোকে আমরা রাস্তার কোনো ফাঁক দিয়ে অথবা ডুমুর গাছের সারি বসানো কোনো গলি থেকে দেখি অথবা যখন আমরা এই বাড়ির কোনো দেওয়ালের ওপর সমুদ্র থেকে আসা কোনো আলোর খেলা দেখি, তখনই কেবল আমরা ছবির মতো সৌন্দর্য দেখার আনন্দ পেয়েছি বলে দাবী করতে পারি।

ইস্তাম্বুলের গরীব পাড়াগুলোতে যদিও সৌন্দর্য সম্পুর্ণভাবে ভেঙে-পড়া শহরের প্রাচীরে, ঘাসে, আইভি লতাগুলো এবং গাছগুলোতেই দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলোকে আমি রুমেলিহিসারি ও আনাদোলুহিসারির দুর্গপ্রাসাদগুলোর সৌধচূড়া ও প্রাচীরে গজিয়ে উঠতে দেখেছি বলে মনে পড়ে। একটা ভাঙা ফোয়ারার সৌন্দর্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা পুরোনো জরাজীর্ণ প্রাসাদের, একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত একশ বছরের পুরোনো গ্যাসের কারখানার, একটা পুরোনো মসজিদের ভেঙে-পড়া দেওয়ালের, একটা কাঠের বাড়ির পুরোনো কালো হয়ে যাওয়া দেওয়ালকে ছায়াচ্ছন্ন করে রাখা আঙুর লতা ও প্লেন গাছগুলোর জড়াজড়ির সৌন্দর্য দুর্ঘটনা প্রসূত। কিন্তু যখন শিশুবয়েসে আমি শহরের পেছনের রাস্তাগুলো দেখেছিলাম, এই অঙ্কনযোগ্য ছবির মতো দৃশ্যগুলো এত অসংখ্য ছিল যে, এগুলোকে মানুষের অনিচ্ছাকৃত বলে ভাবা কঠিন ছিল; এই দুঃখজনক, বর্তমানে লুপ্ত ধ্বংসাবশেষগুলো ইস্তাম্বুলকে তার আত্মা দিয়েছিল। কিন্তু শহরের আত্মাকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কার করতে হলে, এই ধ্বংসাবশেষগুলো শহরের নির্যাসকে প্রকাশ করছে ভাবতে গেলে, অতি অবশ্যই ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা ছড়ানো দীর্ঘ, সর্পিল পথ ধরে ভ্রমণ করতে হবে।

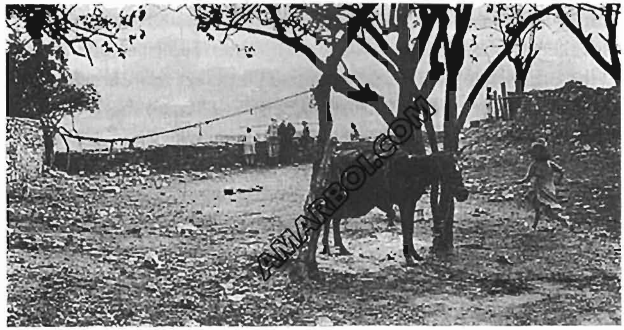

ইস্তাম্বুলের পেছনের রাস্তাগুলোকে উপভোগ করতে গেলে, এর ধ্বংসস্তূপকে যে আঙুর লতার ঝোপ আর গাছগুলো দুর্ঘটনাজনিত সৌন্দর্য প্রদান করেছে, তার প্রশংসা করতে গেলে, আপনাকে প্রথমেই এগুলোর কাছে একজন 'বিদেশি' হতে হবে। একটা ভেঙে-পড়া দেওয়াল, একটা কাঠের ঠেক– বাতিল, পরিত্যক্ত এবং এখন একেবারে অবহেলিত– একটা ফোয়ারা, যার নলগুলো থেকে কোনো জলই উৎসারিত হয় না, একটা কারখানা যেখানে গত আশি বছরে কিছুই উৎপাদিত হয়নি, একটা ভেঙে-পড়া বাড়ি– এক সারিতে অনেক বাড়ি, গ্রিক, আর্মেনিয়ান আর ইহুদিদের পরিত্যক্ত, যখন জাতীয় সরকার সংখ্যালঘুদের দমন করেছিল, একটা একপাশে হেলেপড়া বাড়ি, এখনো কি করে দাঁড়িয়ে আছে, যুক্তির বাইরে, দুটো বাড়ি পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেমনটি কার্টুনিস্টরা আঁকতে ভালোবাসে, ছাদ ও ডোম-এর ভেঙে-পড়া স্তূপ, এক সারি বাড়ি, টেরাবেঁকা জানালার ফ্রেম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে– এই সব জিনিসগুলো, যারা এরই মধ্যে বসবাস করে তাদের কারো কাছে সুন্দর লাগে না; বরং তাদের কাছে এগুলো জঞ্জাল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহায়, আশাহীন কদর্য অবহেলা। যারা দারিদ্র্যের ও ঐতিহাসিক মৃত্যুর দুর্ঘটিত সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পায়, আমরা যারা ধ্বংসস্তূপের ভেতর ছবির মতো সৌন্দর্য দেখি, তারা অতি অবশ্যই বাইরের লোক। (উত্তর ইউরোপিয়ানরাও একইভাবে রোমান ধ্বংসস্তূপগুলো আঁকতে ভালোবাসত, যখন রোমানরা নিজেরা এগুলো অবজ্ঞা করত) কাজেই, যখন ইয়াহিয়া কামাল এবং তানপিনার 'বিশুদ্ধ এবং বহুদূরের ইস্তাম্বুল'-এর পেছনের রাস্তাগুলোকে দেখতেন, যেখানে বসবাসকারী লোকেরা পুরোনো ধ্যান-ধারণাকে তখনো আঁকড়ে থাকত এবং ওই সব পাড়াগুলোর সৌন্দর্যের প্রতি কাব্যিক সুবিচার করার জন্য চেষ্টা করতেন এবং চিন্তিত হতেন এই ভেবে যে, তাদের 'বিশুদ্ধ' সংস্কৃতি পশ্চিমীকরণের সাথে সাথে লোপ পেয়ে যাবে– তখন তাঁরা চমৎকার একটি গল্প বানিয়ে ফেললেন যে, এই পাড়াগুলোতে পুরোনো দিনের মানুষদের নৈতিকতা বজায় আছে, আমাদের সম্মানীয়, কঠোর পরিশ্রমী

'পিতা ও পূর্বপুরুষগণ'-এর প্রদত্ত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সৎগুণগুলো এই পাড়াগুলোকে অলঙ্কৃত করে রয়েছে– ইয়াহিয়া কামাল নিজে তখন বাস করতেন পেরা-তে, যে জায়গাটা সম্বন্ধে তিনি এক সময় বলেছিলেন, 'একটা অঞ্চল যেখানে কেউ কখনো আজানের ডাক শুনতে পায় না', আর তানপিনার বাস করতেন আরো আরামের জায়গা বিওগলু-তে, যে জায়গাটি সম্পর্কে তিনি কখনো কখনো প্রায় ঘৃণার সঙ্গে বিদ্রূপ করতেন।

প্রসঙ্গত, স্মরণ করতে পারি, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বলেছিলেন যে, বহিরাগত লোকেরাই কোনো শহরের বিদেশি ও ছবির মতো চেহারা দেখার জন্য উৎসাহী হয়। এই দুজন জাতীয়তাবাদী লেখক শহরের কেবল সেই সব অঞ্চলেই 'সৌন্দর্য'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছিলেন, যেখানে তাঁরা নিজেরাই ছিলেন বহিরাগত। জাপানের একজন বড় ঔপন্যাসিক তানিজাকি সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায়, যিনি চিরাচরিত জাপানি বাড়িগুলোর সৌন্দর্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার এবং বাড়িগুলোর গঠন সম্বন্ধে ভালো ভালো কথা বলার অনেকদিন পরে নিজের স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, উনি নিজে কখনোই এ রকম বাড়িতে বাস করবেন না, কারণ এই ধরনের বাড়িতে পশ্চিমী আরাম-দায়ক ব্যবস্থাগুলো থাকে না।

ইস্তাম্বুলের শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে এই যে, এই শহরের অধিবাসীরা শহরটিকে পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য, দুই নজরেই দেখতে সমর্থ। ইস্তাম্বুলের ছাপাখানায় স্থানীয় ইতিহাসের

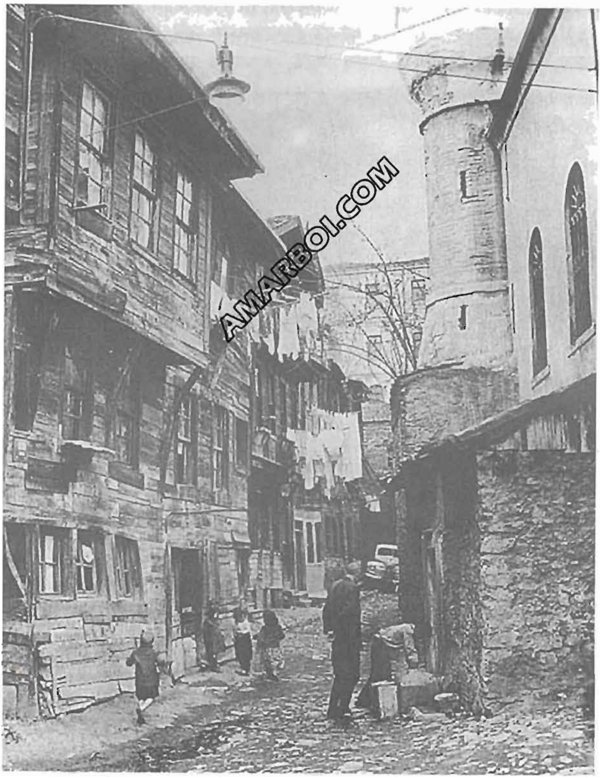
AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে প্রথম রচনাগুলো ছাপা হয়েছিল, সেগুলো ছিল অতিরঞ্জিত, এই জাতীয় লেখা রিচার্ড বার্টন এবং নার্ভাল পছন্দ করতেন, ফরাসিরা যে ধরনের লেখাকে 'বিজারেরিস' বলে। কোকু অবশ্য নিশ্চিতভাবেই অদ্ভুত, উল্টোপাল্টা সব ঘটনার মাধ্যমে শহরের ইতিহাসকে উপস্থাপিত করায় কুশলী ছিলেন এবং তার দ্বারা পাঠকের বোধ হত যেন সে একটা দূরের কোনো অজানা দেশের সভ্যতার কথা পড়ছে। এমনকি, আমি যখন ছোট ছিলাম আর শহরটা ছিল সবচেয়ে অধ:পতিত অবস্থায়, তখন ইস্তাম্বুলের নিজস্ব অধিবাসীরাও অর্ধেক সময় নিজেদের বহিরাগত-র মতো মনে করত। তারা কী রকম দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছে, তার ওপর নির্ভর করে, তারা শহরটাকে কখনো অতিরিক্ত প্রাচ্য, কখনো বা অতিরিক্ত পাশ্চাত্য মনে করত এবং তার ফলে যে অস্বস্তিতে ভুগত, তাতে ওরা চিন্তায় পড়ে যেত যে তারা আদৌ এই শহরের বাসিন্দা কিনা।

যখন ইয়াহিয়া কামাল ও তানপিনার শহরের একদিকে বাস করতেন (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পেরা), তখন তারা শহরের অন্য আর একটি অংশের (দরিদ্র পাড়াগুলো) সুন্দর, জাতীয়তাবোধসম্পন্ন, বিষাদাচ্ছন্ন, ছবির মতো দৃশ্যগুলো থেকে রসদ সংগ্রহ করতেন, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য 'পুরোনো ইস্তাম্বুলের' একটা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করার জন্য। এই স্বপ্নের পাড়াগুলো প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে, রক্ষণশীল পত্রিকায় এবং খবরের কাগজে, সাথে ছিল পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীদের আঁকা ভূদৃশ্যাবলীর স্থূল নকল। এই দৃশ্যগুলো ছিল অনামা– কারণ, কখনোই স্পষ্ট বোঝা যেত না ছবিগুলো আসলে কে এঁকেছিলেন, অথবা ছবিগুলো কোথায় ছিল বা এমনকি,

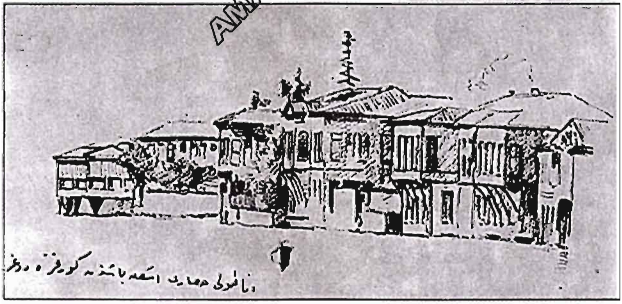

কোন্ শতাব্দীর দৃশ্য এগুলো– বেশির ভাগ খবরের কাগজের পাঠকদের ধারণাই ছিল না যে, এগুলো পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী বোঝাচ্ছে। ওইসব নকলগুলো ছিল গরীব পাড়াগুলোর স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা সাদা কালো স্কেচ অথবা তাদের পেছনের রাস্তাগুলোর রেখাচিত্র। আমার বিশেষ করে ভালো লাগত হোকা আলি রিজা-র আঁকা রেখাচিত্রগুলোর পুনর্মুদ্রণ, ওগুলো ছিল এই প্রজন্মের সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং সবচেয়ে কম বিদেশিয়ানা-সম্পন্ন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওগুলো সত্যিই ছিল খুব জনপ্রিয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসব পর্যটক ইস্তাম্বুলে এসেছিলেন, তারা শহরের অনুপম দিগন্তরেখা এবং সমুদ্র এবং মসজিদের ওপর আলোর খেলা, এগুলো খুব প্রশংসা করতেন, সেই সময় শিল্পী হোকা আলি রিজা পেছনের রাস্তাগুলোর স্কেচ করছিলেন, যেখানে দ্রুত পশ্চিমীকরণ এবং আধুনিকীকরণ মাঝ পথেই পরিত্যক্ত হয়েছিল; এবং এই বিশেষত্ব আরা গুলের-এর ফটোগ্রাফগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। আরা গুলের-এর ফটোগ্রাফগুলো ইস্তাম্বুলকে এমন একটা স্থান হিসাবে দেখায়, যেখানে সব কিছু সত্ত্বেও চিরাচরিত জীবন যাপনই চলে আসছে, যেখানে পুরোনো, নতুনের সাথে মিলে এমন একটা মধুর মৃদু সঙ্গীত সৃষ্টি করে, যা ধ্বংস ও দারিদ্র্যের কথা বলে এবং যেখানে শহরের মানুষের চোখে মুখে যত, শহরের দৃশ্যগুলোতেও তত বিষণ্নতা ছেয়ে থাকে; বিশেষ করে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে, যখন রাজকীয় শহরের উজ্জ্বল অবশেষগুলো, ব্যাঙ্ক, 'হ্যানস' এবং অটোমান পাশ্চাত্যপন্থীদের সরকারি বাড়িগুলো– তাঁর চারপাশে ভেঙে ভেঙে পড়ছিল, তিনি সেই ধ্বংসলীলার ভেতরের কবিতাকে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর 'ভ্যানিশ্‌ড ইস্তাম্বুল' বইয়ে, আমার ছোটবেলার চেনা-জানা বিওগলুর অপূর্ব ফটোগ্রাফগুলোসহ– তার ট্রামওয়ে, পাথর বসানো বড় বড় রাস্তাগুলো, দোকানের সাইনবোর্ডগুলো, তার ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, সাদা কালো 'হুজুন'-পল্লীর ছবির মতো দৃশ্যাবলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর অপূর্ব ব্যবহার করেছিলেন।

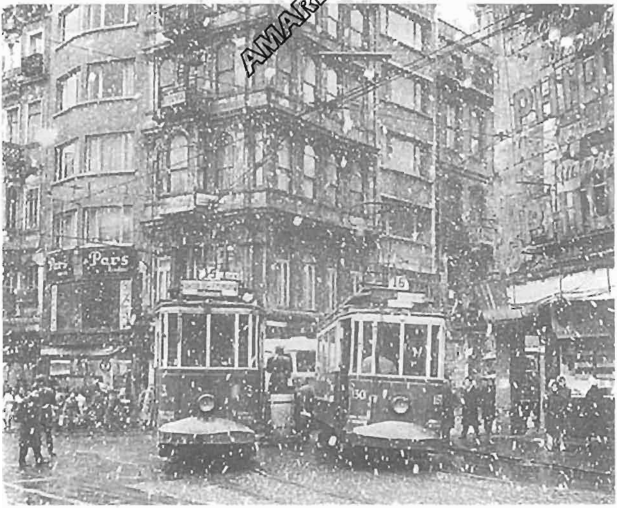

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

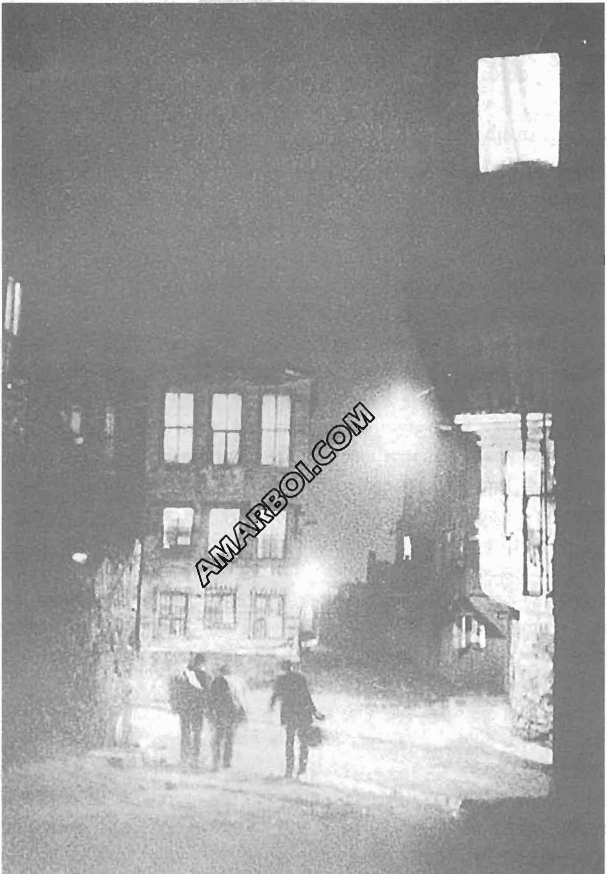

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে সাদা-কালো, জরাজীর্ণ, দূরবর্তী পাড়াগুলো, 'যেখানে সকলেই গরীব, কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং নিজের পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল', তার সেই ভাবমূর্তি রমজানের সময় বিশেষ করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যখন খবরের কাগজে তাদের অতীত ইতিহাস এবং ইস্তাম্বুল-সম্বন্ধীয় কলামে পুরোনো খোদাই চিত্র ও রেখাচিত্রগুলোর নতুন পুনমুর্দণ দিয়ে শোভিত করা হয়। প্রত্যেক বছরে এই চিত্রগুলো ক্রমশ আরো অমার্জিত হতে থাকে। এই সম্পূরক শিল্পের ওস্তাদ ছিলেন রেস্যাত এক্রেম কোকু যিনি তাঁর ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপিডিয়া এবং তাঁর জনপ্রিয় ইতিহাসের ওপর খবরের কাগজের কলামগুলো অজানা শিল্পীর খোদাই চিত্রের পুনর্মুদ্রণ দিয়ে বর্ণনা করতেন না, বরং ওই সব খোদাই চিত্রের মোটা হাতের স্কেচ করিয়ে নিয়ে ছাপতেন (এতে সুবিধা ছিল : একটা সূক্ষ্ম খোদাই চিত্রের সম্পূর্ণ ছবি থেকে একটা কি দুটো প্রয়োজনীয় অংশকে আলাদা করে ছাপা খুব খরচ-সাপেক্ষ এবং টেকনিক-এর দিক থেকেও খুব কঠিন ছিল)। বেশির ভাগ খোদাই চিত্রগুলো আবার পাশ্চাত্য শিল্পীদের আঁকা জলরঙের ছবির নকল ছিল, কিন্তু যখন জনপ্রিয় শিল্পীরা এই বানানো সাদা কালো খোদাইগুলোকে নিজেদের লেখার সঙ্গে ছবি হিসেবে ছাপার জন্য ব্যবহার করতেন (কাদার মতো রঙ-এর খারাপ কাগজের ওপর ছাপা হত), তখন কিন্তু কোনো সময়েই ছবির নিচে আসল শিল্পীর নাম দেখা যেত না বা যিনি আসল ছবি থেকে কপি করেছিলেন তাঁর নামও পাওয়া যেত না; শুধু একটা ছোট্ট নোট থাকত যে, এটা একটা 'খোদাই চিত্র' থেকে নেওয়া। 'পুরোনো ইস্তাম্বুলের' কল্পকাহিনীতে প্রচলিত পরিচয়কে সংরক্ষিত করার জন্য দারিদ্র্যকে মর্যাদা দেওয়া হত এবং সেই কারণেই এটা আধা পশ্চিমী, পুরো জাতীয়তাপ্রেমী, খবরের কাগজ-পড়া কায়েমী স্বার্থান্বেষী উচ্চ মধ্যবিত্তদের কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠত, কারণ তাদের শহুরে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। পুরোনো ইস্তাম্বুলের স্বপ্ন যখন শুধু ইস্তাম্বুলের দরিদ্র পাড়াগুলোই নয়, শহরের সমগ্র অংশের, দিগ্বলয় রেখা ছাড়া, সংজ্ঞা হয়ে উঠতে আরম্ভ করল, তখন এই বিশিষ্টতা ভরে তুলবার জন্য একটা সাহিত্যের উদ্ভব হল।

যখন তাঁরা এই দরিদ্র, কিন্তু ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যপন্থী হতে থাকা পাড়াগুলোর তুর্কী অথবা মুসলিম অংশের ওপর জোর দিতে চাইতেন, তখন সেই রক্ষণশীল লেখকরা একটা কল্পজগতের অটোমান স্বর্গ সৃষ্টি করতেন যেখানে কেউ পাশার ক্ষমতা বা বৈধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলত না, যেখানে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবেরা আচার অনুষ্ঠান ও প্রচলিত মূল্যবোধের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখত (এই মূল্যবোধগুলো ছিল, বিনয়, বাধ্যতা এবং নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্টি)। অটোমান সংস্কৃতির যে ব্যাপারগুলো পাশ্চাত্যপন্থী মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে আঘাত করে,– হারেম, বহু বিবাহ, পাশার মানুষকে শারীরিক অত্যাচার করার অধিকার, রক্ষিতা– সেগুলোকে সমিহা আয়ভার্দির মতো দক্ষিণপন্থী লেখকরা বেশ হালকা নরম করে লিখতেন, পাশা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাতেন কত আধুনিক (যা তারা মোটেই নয়)। আহমেদ কুট্সি টেসের-এর অতি জনপ্রিয় নাটক 'স্ট্রীটকর্নার' শহরের উপকণ্ঠে একটা দরিদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল্লীর একটা কফি হাউসে ঘটছে (রুস্তম পাশার ওপর ভিত্তি করে); কারাগোজ ছায়া-নাটকে যেমন হয়ে থাকে, তেমনিভাবে শহরের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একত্র হয়ে আমাদের আনন্দ দিচ্ছেন, শহরের রূঢ় কর্কশ বাস্তব থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে দিচ্ছেন আর দুহাত বাড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পের লেখক ওরহান কামাল-এর সঙ্গে এর বহু তফাৎ। উনি এক সময় সিবালি-র পেছন দিকের রাস্তায় বাস করতেন (সেখানে তার স্ত্রী তামাক কারখানায় কাজ করতেন); ওই একই পেছনের রাস্তার কথা উনিও লিখেছেন,– এমন জায়গা, যেখানে জীবন ধারণের লড়াই এতই তীব্র যে, বন্ধুরা পর্যন্ত পরস্পরের সঙ্গে ঘুষোঘুষিতে লিপ্ত হয়। আমার কাছে একটা দরিদ্র পল্লীর প্রিয় স্বপ্ন অবয়ব পেয়েছে উগুরলু গিলার পরিবার দ্বারা, যাদের ছোট ছোট অভিযানগুলো প্রতি সন্ধ্যায় রেডিওতে আমার এত ভালো লাগত; এই পরিবারটি বড়, ভীড়-ঠাসা এবং আধুনিক, আমাদের পরিবারের মতো (কিন্তু এরা একটা বড় সুখী পরিবার, আমাদের পরিবারের মতো নয়), তাদের গরীবি সত্ত্বেও একজন কালো 'আয়া' রাখতে পেরেছিল।

এই ছবির মতো দৃশ্যে, ধ্বংসস্তূপের বিষণ্নতায় এর শিকড় থাকলেও পুরোনো ইস্তাম্বুলের ওপর লেখাগুলো এর তলায় অন্ধকার অশুভ কিছুর লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনার খোঁজই করতে চায়নি। এটা যাই হোক, একটা জাতীয়তাবাদী সাহিত্য, যা পরিবারের বিনোদনের উপযোগী ঐতিহ্যের নির্দোষ বর্ণনা দিয়েছে। কাজেই কেমালেত্তিন টুগকু-র লেখা বইগুলোতে যে গরীব, স্বর্ণ-হৃদয়ের অনাথ শিশুদের গল্প রয়েছে, যে গল্পগুলো আমার যখন দশ বছর বয়েস, তখন পড়তে এত ভালবাসতাম, তাদের থেকে যে বক্তব্যটা বেরিয়ে আসে, তা হল এটাই যে, এই সব দরিদ্র পল্লীর দরিদ্রতম ছেলেমেয়েরাও কঠিন পরিশ্রম এবং সততা দিয়ে (মনে রাখতে হবে, তারা এমন একটা পল্লীতে বাস করে যেটা সর্বোচ্চ জাতীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের উৎসস্থল) একদিন সুখী হতে পারে; অথচ লেখক এই বার্তা দিচ্ছিলেন সত্তর-এর দশকে, যখন আমাদের চারপাশে শহরটা প্রতিদিন গরীব থেকে আরো গরীব হচ্ছিল।

রাস্কিন মন্তব্য করেছেন যে, যেহেতু এটা দুর্ঘটনা প্রসূত, তাই 'ছবির মতো'কে বরাবর সংরক্ষিত রাখা যায় না। আসলে দৃশ্যটিকে সুন্দর বানায় স্থপতির ইচ্ছা নয়, সেটার ধ্বংস হওয়া। এতেই বোঝা যায়, কেন এত সংখ্যায় ইস্তাম্বুলীরা পুরোনো কাঠের প্রাসাদগুলোর পুনর্নির্মাণ পছন্দ করে না। যখন কালো-হয়ে-যাওয়া, পচন-ধরা কাঠ উজ্জ্বল রঙ-এর তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়, যাতে ওগুলোকে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌরব ও উন্নতির শীর্ষে থাকাকালীন সময়কার মতো নতুন মনে হয়, তখন তাদের অতীতের সঙ্গে মনোরম জীর্ণ যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। গত শতাব্দী ধরে ইস্তাম্বুলীরা তাদের সঙ্গে শহরের যে ভাবমূর্তি বয়ে নিয়ে চলেছে, তা হল দারিদ্র্যের সন্তান, পরাভব ও ধ্বংসের সন্তান-এর ভাবমূর্তি। আমার যখন পনেরো বছর বয়েস, এবং আমি নিজেই ছবি আঁকছি, সেই সময়, বিশেষ করে শহরের পেছনের রাস্তাগুলো আঁকার সময়, আমার অস্বস্তি হত এই ভেবে যে, আমাদের এই বিষণ্নতা বোধ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮.
ইস্তাম্বুলকে আঁকা

আমি যখন পনেরো, তখন আমি ঝোঁকের মাথায় ছবি আঁকা শুরু করি, শহরের প্রতি বিশেষ ভালোবাসায় নয়। স্থির চিত্র বা প্রতিকৃতি সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না এবং তা শেখারও কোনো ইচ্ছা ছিল না, কাজেই আমার কাছে একটিই রাস্তা খোলা ছিল, আমার জানালা দিয়ে যেমন দেখি, ইস্তাম্বুলের তেমনি ছবি আঁকা, অথবা যখন রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, সেই রকম আঁকা।

আমি দু'ভাবে শহরের ছবি আঁকতাম।

বসফোরাস-এর দৃশ্যগুলো আঁকতাম শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া সমুদ্র এবং পশ্চাৎপটে দিগন্ত রেখা দিয়ে। সাধারণত এই দৃশ্যগুলো বিগত দুশো বছরে পাশ্চাত্য পর্যটকদের আঁকা 'মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো' দৃশ্যাবলীর কাছে যথেষ্ট ঋণী। আমি আমাদের সিহাঙ্গির-এর বাড়ি থেকে অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে,

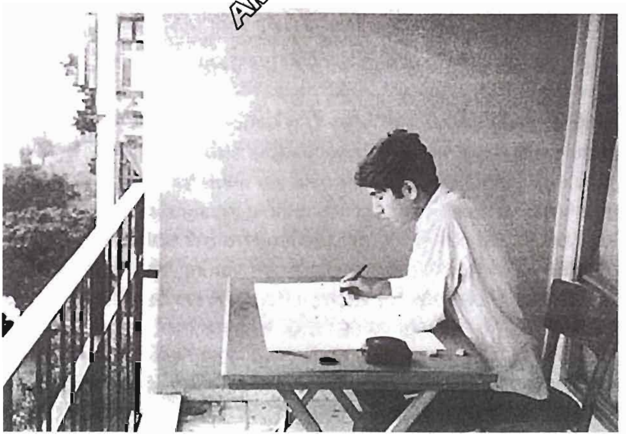

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিজকুলেসি, ফিন্দিক্লি এবং উসকুদার-কে পশ্চাৎপটে রেখে, বসফোরাসকে যেমন দেখতাম, তেমনি আঁকতাম। পরবর্তীকালে, বেসিকতাস সেরেনসেবেই-এর উঁচুতে আমাদের পরবর্তী বাড়ি থেকে বসফোরাসকে যেমন দেখা যেত– বসফোরাসের উৎসমুখ, সরায়বুর্নু, টোপকাপি প্রাসাদ এবং পুরোনো শহরের ছায়াছবি, সব কিছুর একটা বিস্তৃত, ছড়ানো দৃশ্য, সেসব আঁকতাম; বাড়ি থেকে না বেরিয়েই আমি এই ছবিগুলো আঁকতাম। আমি যে উপকথার প্রসিদ্ধ 'ইস্তাম্বুল দৃশ্য' আঁকছি, সেটা আমি কখনো ভুলতাম না। সকলেই ইতিমধ্যে আমার বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং যেহেতু এটা ছিল একদম বাস্তব, আমি জিজ্ঞাসাই করতাম না, যে কেন এটা এত সুন্দর। ছবি আঁকা শেষ করে আমি যখন নিজেকে এই একই প্রশ্ন করতাম, যে প্রশ্ন আমার সারা জীবন আমার চারপাশের সকলকে আমি হাজার হাজার বার জিজ্ঞাসা করেছি, 'এটা কি সুন্দর?' 'আমি কি এটা সুন্দর করে আঁকতে পেরেছি?' তখন আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার বেছে নেওয়া বিষয়বস্তুটা নিজেই 'হ্যাঁ' উত্তরের দায়বদ্ধতা বহন করছে।

সুতরাং, এই ছবিগুলো নিজেরাই নিজেদের এঁকেছে বলে মনে হয় এবং আমার আগে পাশ্চাত্য শিল্পীরা যে এই ছবি এঁকেছেন, তাঁদের সমান সমান হবার কোনো প্রয়োজন আমি অনুভব করতাম না। আমি জেনেশুনে তাদের কারো অনুকরণ করতাম না, কিন্তু তাদের ছবি থেকে আমি যে সব জিনিস বুঝেছিলাম, সেগুলো আমার অনেক তুলির টানে আমি ব্যবহার করেছি। বসফোরাসের ঢেউগুলো আমি এমনভাবে আঁকতাম, দেখে মনে হবে যেন কোনো বাচ্চা ছেলে এঁকেছে, ডুফি'র অঙ্কন রীতি মেনে। ম্যাটিসের অঙ্কন রীতিতে আমি মেঘ আঁকতাম : যে সব জায়গা আমি বিশদে রঙ করতে পারিনি, সেই জায়গাগুলো ঢাকতাম রঙের বিন্দু দিয়ে, ইমপ্রেশনিস্টদের মতো। কখনো কখনো আমি পোস্টকার্ড এবং ক্যালেন্ডার থেকে দৃশ্যগুলোও ব্যবহার করতাম। আমার আঁকা ছবিগুলো তুর্কী ইমপ্রেশনিস্টদের আঁকা ছবির থেকে বেশি অন্য রকম হত না, তারা (ফরাসি শিল্পী প্রথম শুরু করার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর) তাদের ইস্তাম্বুল দৃশ্যের দারুণ দারুণ ছবিগুলো আঁকতে ইমপ্রেশনিস্ট অঙ্কনশৈলী ব্যবহার করতেন।

যেহেতু আমি এমনকিছুর ছবি আঁকছিলাম যেটা সকলের মতেই সুন্দর এবং যেহেতু এর ফলে আমাকে নিজের কাছে এবং অন্যদের কাছেও এটা প্রমাণ করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না যে আমি সুন্দর আঁকছিলাম, কাজেই আঁকাটা আমার কাছে চিত্তবিনোদনের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। যখন ভেতর থেকে একটা গভীর তাগাদা অনুভব করতাম, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতাম, কিন্তু আমার রঙ, তুলি, ক্যানভাস, যা আমায় অন্য একটা জগতে নিয়ে যাবে, গোছানোর সময়ও প্রায়ই আমার কোনো ধারণাই থাকত না যে আমি কী ছবি আঁকব। অবশ্য এতে কিছুই যেত আসত না, কারণ ছবি আঁকাটা ছিল কোনো কিছু শেষ করার পথ; আমার গর্বিত উল্লাসে, আমাদের বাড়ির কোনো জানালা দিয়ে দেখা যে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোস্টকার্ড দৃশ্যতেই আমার কাজ চলে যেত। এই যে একই দৃশ্য একশ'বার করে একই ভাবে আমি এঁকে যেতাম, এতে আমার একদম একঘেয়েমি আসত না। আসল ব্যাপারটা ছিল আঁকার খুঁটিনাটির মধ্যে ডুবে গিয়ে অন্য জগতে চলে যাওয়া। বসফোরাসের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া একটা জাহাজকে এমনভাবে ছবির মধ্যে বসানো, যাতে দৃশ্যটা মানানসই হবে (মেলিং-এর সময় থেকেই সব শিল্পীদের, যারা বসফোরাসকে এঁকেছেন, তাদের সকলেরই এই একই মূল মানসিকতা); পেছনের মসজিদের কালো ছায়া অবয়বের খুঁটিনাটির ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলা, একদম সঠিকভাবে সাইপ্রেস গাছগুলো আর মোটরকার পারাপারের ঘাটগুলো আঁকা, মসজিদের গোল গম্বুজগুলো সময় নিয়ে আঁকা, সরায়বুরনুর বাতিঘর এবং পাড়ে মাছ ধরতে বসা লোকগুলোকে মনোযোগ দিয়ে আঁকা, এর মধ্যে দিয়ে অনুভব করতাম যেন আমি যেগুলো আঁকছি, তার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ছবি আঁকাটা আমাকে নিজের আঁকা ক্যানভাসের ছবির মধ্যে ঢুকতে দিত। এটা ছিল আমার কল্পনার দ্বিতীয় জগতে ঢুকবার নতুন রাস্তা এবং যখন আমি সেই জগতের সবচেয়ে সুন্দর অংশতে ঢুকে যেতাম– যখন আঁকা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে– তখন একটা অদ্ভুত ভাবাবেশ আমাকে আচ্ছন্ন করত; ছবির দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে আলোর মতো কাঁপতে কাঁপতে আসত মনে হত; আমি ভুলে যেতাম যে আমি একটা বসফোরাসের দৃশ্য এঁকেছিলাম, যেটা যে কেউ জানে এবং ভালোবাসে; আমার মনে হত, এটা আমার কল্পনায় সৃষ্ট একটা অত্যাশ্চর্য জিনিস। ছবি আঁকা শেষ হলে আমার আনন্দোচ্ছ্বাস এত প্রবল হত যে, আমি ছবিটা হাত দিয়ে ছুঁতে চাইতাম, ছবির কিছু বিশেষ অংশকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে চাইতাম, এমনকি মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে চাইতাম, কামড়াতে চাইতাম, খেতে চাইতাম। যদি কোনো কিছু আমার এই উদ্ভট কল্পনাবিলাসে বাধা হয়ে দাঁড়াত, যদি আমি নিজের ছবির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলতাম, যদি (যেটা প্রায়ই ঘটত) এই বাস্তব জগৎ আমার এই ছেলেমানুষী খেলায় হস্তক্ষেপ করে নষ্ট করে দিত, তখন হস্তমৈথুন করার একটা প্রবল তাগিদ আমাকে গ্রাস করে ফেলত।

এই প্রথম ধরনের ছবি আঁকাকে কবি শিলার বলতেন, 'ছেলেমানুষি সরল কবিতা।' আমার বিষয়বস্তুর চয়ন আমার কাছে আমার অঙ্কন শৈলী বা অঙ্কন চাতুর্যের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সবার ওপরে, আমি বিশ্বাস করতে চাইতাম যে, আমার অঙ্কন শিল্প ছিল আমার অন্তরের কোনো কিছুর একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই সরল সাদাসিধে, আনন্দময়, রঙিন নিশ্চিন্ত জগৎ, যা আমার ছবিগুলো প্রকাশ করত, সত্যি সত্যিই খুব ছেলেমানুষী সরল বলে মনে হতে লাগল এবং এর উপভোগ্যতা আমার কাছে কমে আসতে লাগল। আমার ছেলেবেলার অনেক প্রিয় খেলনাগুলোর মতো– ছোট ছোট খেলনা গাড়িগুলো, যেগুলো আমি দাদীমার ঘরে কার্পেটের ওপর সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখতাম, কাউবয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দুকগুলো, ফ্রান্স থেকে বাবা যে খেলনা রেলগাড়িটা এনে দিয়েছিলেন, সেটা, এই চকচকে ছেলেমানুষী ছবিগুলো আমার প্রতিদিনের জীবনের একঘেয়েমি থেকে আমাকে আর উদ্ধার করতে পারত না। কাজেই আমি তখন শহরের বিখ্যাত দৃশ্যাবলীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, শান্ত চুপচাপ পাশের রাস্তাগুলো, বিস্মৃত স্কোয়ারগুলো, পাথর-বসানো গলিপথগুলো (পাহাড় থেকে নিচে বসফোরাস-এর দিকে চলে যাওয়া, সমুদ্র, কিজকুলেসি এবং এশিয়ান উপকূল পশ্চাৎপটে রেখে) এবং গোল গম্বুজওয়ালা কাঠের বাড়িগুলো আঁকতাম। এই কাজগুলো, যার মধ্যে কিছু ছিল সাদা কালো ড্রইং, আর কিছু ছিল ক্যানভাস বা কার্ডবোর্ডের ওপর তেল রঙা ছবি, অবশ্য রঙ এর ব্যবহার খুবই কম, সাদার ভাগটাই বেশি, দুটো আলাদা প্রভাবের ফলে তৈরি হয়েছিল।

দরিদ্র পল্লীগুলোর বর্ণনামূলক সাদা-কালো ছবিগুলো, যা প্রায়ই খবরের কাগজের এবং পত্রিকাগুলোর ইতিহাস কলামে প্রকাশিত হত, সেগুলো আমার ওপর প্রচুর প্রভাব ফেলেছিল এবং আমি সেই সব দরিদ্র পল্লীর নি:শব্দ বিষাদের কবিতা ভালোবাসতাম। সেইজন্যে আমি আঁকতাম ছোট ছোট মসজিদগুলো, জীর্ণ দেওয়ালগুলো, এক কোণায় দৃশ্যমান বাইজান্টাইন আর্চ, গোল গম্বুজওয়ালা কাঠের বাড়িগুলো এবং সদ্য শেখা সমানুপাতিকের নিয়ম মেনে দরিদ্র বাড়িগুলোর লম্বা সারি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয় প্রভাবটি ছিলেন উত্রিলো, যার কাজ আমি দেখেছিলাম তার ছবির পুন:প্রকাশগুলোতে আর জেনেছিলাম তার জীবনের ওপর লেখা একটা উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় উপন্যাস থেকে। যখন আমি উত্রিলোর কায়দায় কোনো ছবি আঁকতে চাইতাম, আমি বিওগলু, তার্লাবাসি কিংবা সিহাঙ্গির-এর কোনো পেছন দিকের রাস্তা বেছে নিতাম, যেখানে খুব কমই মসজিদ বা মিনার থাকত। যখন অদম্য ইচ্ছা হত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবি আঁকার, তখন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার সময় যে সব ফটো তুলেছিলাম, তার কিছু প্রিন্ট বার করে, বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে আমি হয়তো কোনো বিওগলু দৃশ্য আঁকতে বসে যেতাম এবং যদিও ইস্তাম্বুলে খুব কমই দেখা যেত, আমার ছবির অ্যাপার্টমেন্টগুলোর জানালায় আমি উত্রিলোর আঁকার মত শার্শী আঁকতাম। ছবিটা শেষ হলে একটা স্বর্গীয় আনন্দ আমাকে ছেয়ে ফেলত, যেমন কিনা আগে আমি যখন আরো ছোট ছিলাম, তখন হত– মনে হত যে দৃশ্যটা আমি আঁকলাম, সেটা আমারই সৃষ্টি, কিন্তু বাস্তবও। যে দৃশ্যটা আঁকলাম, তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার পরও আমি কেমন যেন নিরাসক্ত বোধ করতাম। আমার চরম প্রাপ্তির জন্য– নিজেকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্য,– আমার আঁকা ছবির জগতের সঙ্গে শিশুসুলভ একাত্ম বোধটাই আর যথেষ্ট ছিল না; আমাকে একটা গোলমেলে কিন্তু চতুরতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক লাফ দিতেই হত; আমি উত্রিলো নামের একজন মানুষ হয়ে যাব, যে এক সময় প্যারিসে এই ছবিগুলোর মতোই ছবি আঁকত। আসলে কিন্তু আমি এসব বিশ্বাস করতাম না: এমন কি, আমি যখন বসফোরাসের ছবি আঁকছি, তখনো অর্ধেকটা বিশ্বাস করতাম যে, আমি আমার ছবির জগতে ঢুকে গেছি, অর্ধেকটা বিশ্বাস করতাম যে, আমিই হচ্ছি উত্রিলো। তবে এই নতুন খেলাটা কাজের ছিল, বিশেষ করে যখন আমি একটা অবোধ্য নিরাপত্তার অভাবে ভুগতাম, অথবা সদ্য সমাপ্ত আমার একটা ছবির গুণমান সম্বন্ধে সন্দিহান হতাম, বা অন্যরা আমার ছবিকে 'সুন্দর' বলুক বা 'অর্থবহ' বলুক, এটা শোনার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতাম। উল্টো দিকে যখন দৃশ্যটা অতিরিক্ত বাস্তব হয়ে উঠত, আমি আমার সীমানা ছোট হয়ে আসছে, বুঝতে পারতাম। সে ক্ষেত্রে আমি একটা বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতাম, যেটা পরে যখন আমার জীবনে নারী এসে গেল, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনন্দিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল– যেমন আমি একটা ছবি আঁকা শেষ করতাম, একটা উল্লাসের ঢেউ আমার ওপর আছড়ে পড়ত আর আমি আমার অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলতাম, এর ফলে আসত বিষণ্নতা ও বিশৃঙ্খলা, আর যখন ঢেউ সরে যেত, আমি

একটু বিশ্রাম নিতাম।

আমার তোলা ফটোগ্রাফ থেকে তাড়াতাড়ি করে আঁকা, তখনো ভিজে ছবিটা নিয়ে আমি চোখের উচ্চতায় ছবিটাকে দেওয়ালে টাঙাতাম আর চেষ্টা করতাম ওটাকে এমনভাবে দেখার যেন ছবিটা অন্য কারো আঁকা। যদি ছবিটা আমার ভালো লাগত, একটা প্রফুল্লতার ও নিরাপত্তার বোধ আমাকে ছেয়ে ফেলত। আমি দারুণভাবে সফল হয়েছি, পেছনের রাস্তাগুলোর বিষণ্নতাকে ঠিক মতো ধরতে পেরেছি। কিন্তু যদি– যেটা প্রায়ই ঘটত– আমার বিচারে ছবিটায় কিছু ঘাটতি থাকত, আমি তখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটাকে পরীক্ষা করতাম, দূরে সরে গিয়ে, বা খুব কাছে এসে, কখনো বা দু'একটা তুলির আঁচড় দিয়ে আশাপ্রদ ভাবে চেষ্টা চালিযে শেষ পর্যন্ত আমি যা এঁকেছি সেটাকেই মেনে নেবার জন্য নিজের সঙ্গে লড়াই চালাতাম। এতক্ষণে আমি যে উত্রিলো নই, তা বুঝে যেতাম, আমার আঁকা ছবিতে যে তাঁর কিছুই নেই, তাও বুঝে যেতাম। তাই পরবর্তীকালে নারীসঙ্গ করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর আমি যা করতাম, সেই ভাবেই, আমি হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তাম– যে দৃশ্যটি এঁকেছি, তাতে ঘাটতি কিছু নেই, যা আছে তা আমার আঁকায়। আমি উত্রিলো নই, আমি অন্য আরেকজন, যে উত্রিলোর মতো ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিল।

AMARBOI.COM

একটা দাগের মতো ছড়িয়ে পড়া গভীর বিষণ্নতাকে আমি প্রতিরোধ করতে পারতাম না; পুরো নয়– প্রায় লজ্জাজনক সত্যটা হল যখন আমি নিজেকে অন্য লোক বলে ভাবতাম, তখনই কেবল আমি ছবি আঁকতে পারতাম। আমি একটা অঙ্কন শৈলীকে নকল করেছিলাম, আমি নকল করেছিলাম (কথাটা কোনোদিন প্রকাশ্যে ব্যবহার করিনি) একজন শিল্পীকে যার একান্ত নিজস্ব একটা দর্শন ছিল, নিজস্ব একটা অঙ্কন-ধারা ছিল। এবং এতে লাভও ছিল, কারণ আমি যদি কোনো রকমে অন্য আরেকজন হয়ে যেতে পারতাম, তাহলে আমারও একটা নিজস্ব অঙ্কন শৈলী এবং পরিচিতি থাকত। তাহলে আমারও এতে হাল্কা গর্ববোধ হত। এই প্রথম একটা ব্যাপার ঘটল, যেটা পরে আমাকে অনবরত খোঁচা মারবে, আত্মঅস্বীকার– পশ্চিমীরা যাকে বলে বৈপরীত্য– যে আমরা অপরকে নকল করেই নিজের পরিচিতি তৈরি করি। অন্য একজন শিল্পীর প্রভাবে থাকার জন্য আমার যে অস্বস্তিবোধ, সেটা ছিল মৃদু; আমি তখনো ছোটই ছিলাম আর নিজেকে আনন্দ দেবার জন্যই ছবি আঁকতাম। আরেকটা সান্ত্বনা, যদিও সরল, তা হচ্ছে এই যে, যে শহরকে আমি এঁকেছি, যে ইস্তাম্বুলের আমি ফটো তুলেছি, সেই ইস্তাম্বুলই আমার ওপরে অন্য যে কোনো শিল্পীর চাইতে অনেক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সব দিনে যখন আঁকার মধ্যে দিয়ে আমি পালিয়ে যেতে চাইতাম, তখন হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ত, আর আমার বাবা ঘরে ঢুকে পড়তেন; যদি উনি দেখতেন আমি সৃষ্টির উত্তেজনায় ডুবে গেছি, তাহলে উনি একদম আমার সামনাসামনি বেশ সম্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন, যেমন দাঁড়াতেন উনি আমার শিশুকালে যখন আমি নিজের লিঙ্গ হাতে নিয়ে খেলতাম; একদম কোনো ভনিতা না করে উনি শুধোতেন, 'তাহলে আজ আমরা কী করছি উত্রিলো?' অন্তর্নিহিত ঠাট্টাটা আমাকে মনে করিয়ে দিত যে, আমি এখনো অন্যকে নকল করেও ধরা না পড়ার মতো শিশুই আছি। আমি তখন ষোলো, যখন আমার মা, আমি আঁকা সম্বন্ধে কত আন্তরিক তা জানতেন বলে আমাকে স্টুডিও হিসেবে সিহাঙ্গির অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন, যেখানে আমরা এক সময় থাকতাম আর যেখানে বর্তমানে আমার মা ও দাদীমা পুরোনো আসবাবপত্র মজুত করে রেখেছিলেন। সপ্তাহান্তে এবং কখনো কখনো বিকেলে, রবার্ট আকাদেমি থেকে বের হয়ে আমি চলে যেতাম সেই ঠান্ডা, ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে; তারপর স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেকে গরম করে নিয়ে আমি যে সব ফটোগ্রাফ নিয়ে যেতাম, তার থেকে একটা কি দুটো বেছে নিতাম আর হঠাৎ আসা অনুপ্রেরণায় একটা কি দুটো বিশাল বিশাল রঙিন ছবি আঁকতাম, তারপর ক্লান্ত, নিঃশেষ হয়ে একটা অদ্ভুত বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি ফিরতাম।

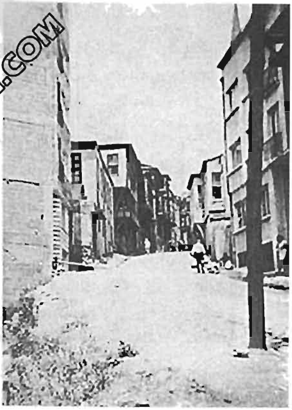

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯.

ছবি আঁকা ও পারিবারিক সুখ

আমার মা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে আমি সিহাঙ্গির-এর অ্যাপার্টমেন্টটা স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। যখনই আমি সিহাঙ্গির অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতাম, আমি হাঁফফাঁস করতে করতে আগে গ্যাস স্টোভটা জ্বালাতাম। (যখন আমার এগারো বছর বয়েস, আর এই অ্যাপার্টমেন্টেই আমাদের পরিবারের সঙ্গে থাকতাম, তখন আমি একেবারে পাক্কা আগুন লাগানোর ওস্তাদ ছিলাম– যেখানে সেখানে যখন তখন আগুন জ্বালাতাম– কিন্তু এখন লক্ষ্য করছি যে, আগুন জ্বালানোর আনন্দটা কবে যেন আমায় উড়ে চলে গেছে, বিদায় না জানিয়েই।) যতক্ষণে উঁচু ছাদের অ্যাপার্টমেন্টটা গরম হত আর আমার হাত থেকে কনকনে ঠান্ডা ভাবটা চলে যেত, আমি আমার রঙ-ছিটকানো ছবি আঁকার জামাটা পরে নিতাম– অন্য কিছুর চাইতে, ওটাই বোঝাত যে, আমি ছবি আঁকি। দুঃখের ব্যাপার ছিল এই যে, আমি ছবি এঁকে কাউকে, সঙ্গে সঙ্গে কেন, দু'চারদিন পরেও দেখাতে পারতাম না। আমি অ্যাপার্টমেন্টটাকেই একটা ছবির গ্যালারিতে পরিণত করতাম; আমার ছবিগুলো সব দেয়ালেই ঝোলানো থাকতো, কিন্তু কেউ– আমার মা, এমন কি আমার বাবাও,– কখনো এসে আমার ছবি দেখে প্রশংসা করতেন না। এই অ্যাপার্টমেন্টেই আমি আবিষ্কার করলাম যে, সবাই আমার ছবি দেখুক, বা আমি যখন ছবি আঁকি, যারা পরে আমার ছবির বিচার করবে, তারা সবাই আমার চারপাশে ঘিরে থাকুক, এই প্রয়োজনটা আছে। একটা ঠান্ডা, স্যাঁতসেতে পুরোনো আসবাবপত্রে ঠাসা, ধুলো আর ছাতা-পড়ার গন্ধে ভরা বিষণ্ন অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইস্তাম্বুলের দৃশ্যের ছবি আঁকতে আঁকতে আমিও বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে যেতাম।

ষোলো থেকে সতেরো বছর বয়সের মধ্যে বাড়িতে যে সব ছবি আমি এঁকেছিলাম, টলস্টয়ের ভাষায় 'পারিবারিক সুখ'-এর ছবি, আজ তার কয়েকটাও যদি পেতাম, আমি তার জন্য অনেক কিছু দিতে পারতাম (ছবিগুলো সব হারিয়ে গেছে)। এই ছবিগুলো আমার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ– পাশের ছবিটা যেটা একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার বাড়িতে এসে তুলেছিল যখন আমার বয়স ছিল সাত বছর, দেখলেই বোঝা যাবে যে, 'সুখী পরিবার' ভঙ্গিটা ধরে রাখা মাঝে মাঝে আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াত। সচরাচর আমি যে ইস্তাম্বুলের আর পেছনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তাগুলোর দৃশ্য আঁকতাম, সেটা ছেড়ে দিয়ে আমি তখন 'আমাদের' ছবি আঁকতাম, যখন বাবা-মা ঘরের মধ্যে আমার আশে পাশে ঘুরতেন, নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতেন। যখন আমার বাবা-মার মধ্যে মানসিক চাপ খানিকটা নরম থাকত, যখন কেউ কারোকে খোঁচা মারত না, এবং সকলেই ঢিলেঢালা, আয়েসি অবস্থায় থাকত, পেছনে রেডিও বা টেপ রেকর্ডার বাজত, রান্নাঘরে কাজের লোক আমাদের রাতের খাবার রান্না করায় ব্যস্ত থাকত, অথবা আমরা সবাই মিলে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ঠিক আগে,– হঠাৎ করে কোনো অনুপ্রেরণায় আমি এই ছবিগুলো আঁকতাম।

বসার ঘরে সোফার ওপর সাধারণত বাবা লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতেন; যখন বাড়িতে থাকতেন, তখন বেশির ভাগ সময়ই উনি ওইখানে শুয়ে খবরের কাগজ, পত্রিকা বা বই (তার যৌবনের পছন্দের সাহিত্যের উপন্যাস নয়, তাসের ব্রিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলার ওপর লেখা বই) পড়তেন, অথবা অন্যমনস্ক ভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যদি কখনো ভাল মুডে থাকতেন, তাহলে টেপে ব্রাম-এর ফার্স্ট সিম্ফনির মতো কোনো যন্ত্র সঙ্গীত চালিয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে সঙ্গীতের পরিচালকের মতো হাত নাড়াতেন, আমার মনে হত যেন রাগ, অধৈর্য আর আবিষ্টতা ওঁকে ঘিরে রয়েছে। বাবার পাশে আরামকেদারায় মা বসে থাকতেন, খবরের কাগজ পড়তেন বা উল বুনতেন আর চোখ তুলে মুখে হাসি নিয়ে তাকাতেন, আমার মনে হত সেই হাসিতে কিছুটা করুণা, কিছুটা ভালোবাসা মিশে রয়েছে।

এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু নেই, কোনো আলোচনা বা কথাবার্তা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও, এটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করত। যখন হঠাৎ কখনো এই দৃশ্য আমার চোখে পড়ত, আমি ফিসফিস করে বলতাম, 'আমি এখন ছবি আঁকব,' খানিকটা ঠাট্টার সুরে, খানিকটা বা লজ্জা লজ্জা করে, যেন আমি আমার ভেতরে বাসা করে আছে এমন একটা জিন-এর সঙ্গে কথা বলছি; তারপরেই দৌড়ে চলে যেতাম আমার ঘরে, আর আমার আঁকার সরঞ্জামগুলো– আমার তেল-রঙ, বা আমার বাবা ইংল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছিলেন যে ১২০ গীটার প্যাস্টেল, সেগুলো আর আমার প্রত্যেক জন্মদিনে চাচীর দেওয়া বহু বর্ণের স্কোলার কাগজ-এর কয়েকটা পাতা নিয়ে বসার ঘরে চলে আসতাম আর বাবার ডেস্কের ওপর সব কিছু এমনভাবে সাজাতাম যাতে বসে বসে বাড়ির মধ্যেকার ছবি আঁকার সময় যেন বাবা ও মা, দুজনকেই দেখতে পাই।

এত কিছু ঘটার সময়, মা কিংবা বাবা, কেউই কোনো কথা বলতেন না, আর যেহেতু তাঁরা দুজনেই স্বাভাবিকভাবে আমার হঠাৎ আসা, অদম্য ছবি আঁকার ইচ্ছাতে সাড়া দিতেন, আমার মনে হত যেন ঈশ্বর আমার জন্যই সময়কে থামিয়ে দিয়েছেন। (আমার নিজস্ব কোনো আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও, আমি তখনো বিশ্বাস করতাম যে, গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করতেন)। অথবা হয়তো আমার মা ও বাবাকে সুখী দেখাত, কারণ ওরা কথা বলতেন না। আমার মনে হত, পরিবার হচ্ছে একদল লোক, যারা ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এবং শান্তি, আরাম ও নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের ভেতরকার জিন ও শয়তানগুলোকে চুপ করিয়ে রাখত এবং এমন ভান করত, যেন তারা সুখী। কিন্তু কিছুক্ষণ এই সুখী পরিবার ভানটা ধরে রাখবার পর, তারা বুঝতে পারত যে, ভেতরকার জিন বা শয়তানকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়নি, তখন আমার বাবার দৃষ্টি বই-এর পাতা থেকে সরে যেত, মা তাঁর উল বোনা হাল-ছাড়া ভাবে চালিয়ে যেতেন, এবং বাবা জানালা দিয়ে দূরে বসফোরাসের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, যেন ওর সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছেন না, নিজের ভাবনাতেই নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। বাবা ও মা দুজনেই হাত পা ছড়িয়ে আরাম করতেন, একটা জাদুকরী নৈঃশব্দ্য ঘরের মধ্যে নেমে আসত, বাবা-মা কেউই কথা বলতেন না, একদম চুপচাপ, মনে হত যেন নীরবে কোনো মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন; সত্তর-এর দশকে, যখন দেশের আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলের মতো, আমরাও একটা টেলিভিশন কিনলাম, যখন তাঁরা ভীরুর মতো এর বিনোদনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, তখন থেকে আর কোনো জাদুকরী নৈঃশব্দ্য থাকত না, আর আমারও ওদের ছবি আঁকার ইচ্ছা একদম নষ্ট হয়ে গেল। কারণ আমার কাছে সুখের সংজ্ঞা হল, যখন আমার ভালোবাসার লোকেরা নিজেদের ভেতরকার শয়তানকে দমিয়ে রাখতে পারত এবং আমি সহজভাবে খেলতে পারতাম।

যদিও তাঁরা ফটো তোলার মতো পোজ দিতেন, শরীরের একটা পেশীও নড়ত না, আর আমার হাত দ্রুত এঁকে যেত এই সুখী পরিবার দৃশ্যটি। তবুও কখনো কখনো তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথাও বলতেন। কেউ একজন কাগজের কোনো খবরের উল্লেখ করতেন, আর একজন দীর্ঘ নৈঃশব্দ্যের পর হয়তো কোনো বিশ্লেষণী মন্তব্য করতেন, অথবা কিছুই বলতেন না। কখনো আমি ও মা কথা বলতাম, আর আমার বাবা, যিনি সারাক্ষণ সোফায় শুয়ে আমাদের কথাবার্তায় কোনো আগ্রহই দেখাতেন না, হঠাৎ উঠে পড়ে কিছু বলে উঠতেন, যেন উনি সারাক্ষণই আমাদের কথা শুনছিলেন। কখনো, কেউ হয়তো আমাদের এই বেসিকটাস সেরেন্‌সেবে অ্যাপার্টমেন্টের চওড়া জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসফোরাসের বুকে একটা অদ্ভুত, ভীতিজনক সোভিয়েত জাহাজ আসছে দেখতে পেত, কিংবা যদি বসন্তকাল হত, এক সারি সারসকে আফ্রিকা থেকে উত্তরে উড়ে যেতে দেখত, তখন সেই দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য কোনো ছোট্ট কথায় ভেঙে যেত, 'ওগুলো সারস!' যখন আমরা নিজেদের ছোটো ছোটো জগতে নিমজ্জিত থাকতাম, তখন আমাদের বসার ঘরে নেমে আসা এই সব নৈঃশব্দ্যকে যতই ভালোবাসি না কেন, আমি মা ও বাবার মধ্যে এই শান্তি ও সুখের ক্ষণকালীনতা বুঝতে পারতাম। আমার আঁকা ছবিতে শেষ তুলির টান দিতে দিতে আমি আমার বাবা-মা'র শরীরের কিছু ভীতিপ্রদ খুঁটিনাটি দেখতে পেতাম আমার শিল্পীর চোখ দিয়ে, যা আমার আগে চোখে পড়েনি। আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখতাম, চোখে চশমা, মুখে অর্ধেকটা সুখ, অর্ধেকটা আশা মাখানো, মায়ের হাতের বোনার কাঁটা থেকে উল ঝুলছে, খানিকটা মায়ের কোলের ওপর, খানিকটা আরো নীচে পায়ের ওপর, সেখান থেকে প্লাস্টিক ব্যাগের ভেতর, যেখানে উলের গোলাটা রয়েছে। ওই স্বচ্ছ ব্যাগটার পাশে, মায়ের চটি পরা পা, বাবার সঙ্গে কথা বলার সময়, কিংবা যখন চিন্তার গভীরে হারিয়ে গেছেন, তখনো একদম স্থির এবং আমি খুব মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মায়ের পা-টা দেখতাম, শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা কাঁপুনি বয়ে যেত। মানুষের হাত, পা, এমনকি মাথাতেও কিছু একটা আছে, যা একেবারে প্রাণহীন, যেমন ওই ফুলদানি, যাতে মা টাটকা ডেইজি ফুল বা কোকিনস্ (জিপসিদের 'হোলি') ফুল রাখতেন, অথবা একেবারে জড় বস্তুর মতো, যেমন মায়ের পাশে রাখা ছোট্ট টেবিলটা বা দেওয়ালে টাঙানো ইজ্‌নিক প্লেটগুলো। যদিও আমরা সবাই মিলে একটা সুখী পরিবারের দৃশ্যপট তৈরি করতাম এবং যদিও, আমি আমার অবিশ্বাসকে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হতাম, তবুও এমন কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ছিল, যাতে, আমরা তিনজন যখন নিজের নিজের কোণায় বসে থাকতাম, মনে হত আমরা তিনজন যেন আরো তিনটে আসবাব, আমার দাদীমা তাঁর মিউজিয়াম ঘরে ঠেসে রেখেছেন।

এই তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া নৈঃশব্দতে আমি খুব আনন্দ পেতাম, এগুলো এত বিরল ও দামী ছিল যেন, 'যাজক মশাই পালিয়ে গেছেন' এই বিশেষ বিশেষ সময়ের খেলার মতো এবং আমাদের নববর্ষের 'লোট্টো' খেলার মতো। আমি যখন রঙ দিয়ে কাগজটা ভরিয়ে দিতাম, ভাবতাম এটা 'ম্যাটিসে'-র দ্রুত তুলি চালানোর মতো, কার্পেট ও পর্দাগুলো একই রকমের ছোট ছোট বক্রতায় ও আরবীয় নকশায় বিন্দু দিয়ে ভরিয়ে দিতাম, যেমন বনার্ড তার ঘরের আভ্যন্তরীণ সজ্জা আঁকার সময় ব্যবহার করতেন, ততক্ষণে বাইরের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসত এবং আমি লক্ষ করতাম, বাবার পাশে রাখা তিন পায়া বাতিটার আলো ক্রমশ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যখন একেবারে সন্ধে ঘনিয়ে আসত এবং আকাশ ও বসফোরাস নিজেদের নিবিড়, মহার্ঘ ধূসর রঙ-এ ঢেকে নিত এবং বাতির আলোটা কমলা রঙ-এর হয়ে উঠত, আমি দেখতাম যে, জানালাগুলো আর বসফোরাস, বা মোটরকার ফেরী, বা বেসিকটাস থেকে উসকুদার-এ যাওয়া জাহাজগুলো বা জাহাজের চিমনি থেকে বেরোনো ধোঁয়া, দেখাতে পারত না, পরিবর্তে ঘরের ভেতর আমাদের ওপরে প্রতিফলিত হতো।

সন্ধ্যেবেলায় যখন রাস্তায় হাঁটতাম কিংবা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতাম, আমি কিন্তু তখনো রাস্তার বাতির কমলা রঙ-এর আলোর আভার মধ্যে দিয়ে অন্য লোকের বাড়ির ভেতরটা দেখতে ভালোবাসতাম। কখনো দেখতাম একজন স্ত্রীলোক তার ঘরের টেবিলে, একা বসে নিজের ভাগ্য রেখা দেখছে, ঠিক তেমনই ভঙ্গীতে, যেমন ভাবে আমার মা দীর্ঘ শীত-সন্ধ্যায়, যখন আমার বাবা বাড়ি ফেরেননি, সিগারেট খেতে খেতে ধৈর্য সহকারে একা একা বসে পেসেন্স খেলতেন। কখনো বা আমি কোনো গরীবের ছোট একতলার অ্যাপার্টমেন্ট ঘরে উঁকি মেরে দেখতাম একটা পরিবার রাত্রের খাবার খেতে বসেছে এবং সকলে একই সঙ্গে কথা বলছে, সেই একই কমলা রঙ-এর আলোর তলায়, যেমন আমাদের ঘরেও থাকত এবং বাইরে থেকে ওদের একদৃষ্টিতে দেখে আমি সরল মনে ভেবে নিতাম যে, ওরা নিশ্চয়ই সুখী। জানালা দিয়ে দেখা সুখী পরিবার– এই ছবিগুলোই আমাদের শহর সম্বন্ধে বলে; কিন্তু ইস্তাম্বুলে, যেখানে– বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন বহিরাগতদের বাড়ির বৈঠকখানা ঘর ছাড়া অন্য ঘরে খুব কমই ঢুকতে দেওয়া হত, বিদেশীরা প্রায়ই কী দেখছে, তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০.

বসফোরাসের ওপর জাহাজ থেকে বেরোনো ধোঁয়া

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, বাষ্পচালিত জাহাজ সমুদ্র যাত্রায় বিপ্লব নিয়ে এল, ইউরোপের শহরগুলোকে কাছাকাছি নিয়ে এল; এর ফলে অল্প সময়ের জন্য ইস্তাম্বুল ভ্রমণও সম্ভব হল। সময়ের সাথে সাথে, কিছু ব্যক্তি, যারা নিজেদের অভিজ্ঞতা কাগজে লিখে রাখত, সেই রকম কিছু স্থানীয় লেখক ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে নতুন ধারণার সৃষ্টি করল। কিন্তু এই বাষ্পীয় জাহাজগুলো আসার সাথে

AMARBOI.COM

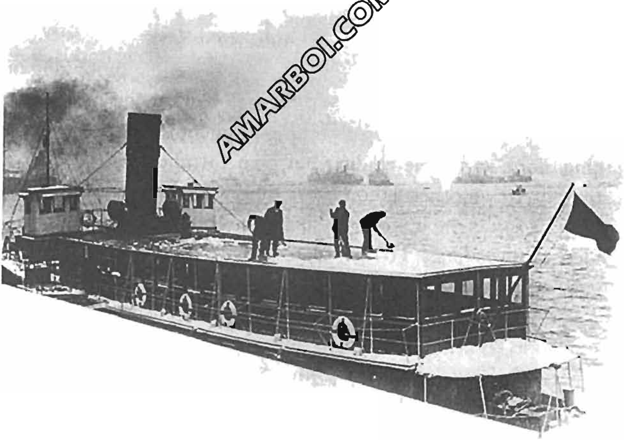

সাথেই শহরকে একটা নতুন চেহারা দিল। একটা কোম্পানি, যারা প্রথমে সির্কেতি হেরিয়ে নামে এবং পরে সেহির হাতলারি (সিটি লাইনস) নামে ব্যবসা চালাত, তার প্রতিষ্ঠা হল এবং তড়িঘড়ি প্রত্যেক বসফোরাস গ্রাম নিজেদের জাহাজ ভিড়বার স্টেশন বানিয়ে ফেলল; ফেরীগুলো যখন প্রণালীর মধ্যে দিয়ে চলা শুরু করল, তখন শহরটার চেহারায় একটা হালকা ইউরোপীয়ান ভাব এসে গেল। (আমাদের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখতে হবে যে, বাষ্প কথাটার ফরাসি শব্দ হল ভেপিউর, সেই শব্দটা ইস্তাম্বুলের তুর্কী ভাষায় এবং প্রতিদিনকার জীবনে ঢুকে গিয়ে হয়ে গেল ভেপুর, আমাদের জাহাজের প্রতিশব্দ। ফেরী যে সব পরিবর্তন আনল, তার মধ্যে ছিল ব্যস্ত 'মেদান', যেগুলো বসফোরাসের এবং গোল্ডেন হর্ন-এর জাহাজ ভিড়বার স্টেশনগুলোর আশপাশে গজিয়ে উঠল এবং দ্রুত বেড়ে ওঠা এই সমস্ত গ্রাম, যেগুলো খুব শিগগিরই আসল শহরের অংশ হয়ে গেল। (ফেরী আসার আগে পর্যন্ত, এই সমস্ত গ্রামগুলোতে যোগাযোগের কোনো রাস্তাই ছিল না।)

যখন এই ফেরী বসফোরাসের ওপর দিয়ে যাত্রী বহন করে যাওয়া আসা করতে লাগল, তখন তারা ইস্তাম্বুলীদের কাছে কিজকুলেসি, হাঘিয়া সোফিয়া, রুমেলিহিসারি এবং গালাতা সেতুর মতোই পরিচিত হয়ে উঠল; অতি শিগগিরই তারা এমন ভাবে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠল, যে তারা প্রায় টটেমিক গুরুত্ব পেয়ে গেল। সুতরাং, অন্যেরা যেমন ভেনিসের ভেপোরেট্টোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেগুলোর বিভিন্ন আকৃতি ও মডেল সম্বন্ধে নিজেদের জ্ঞান লোককে দেখাতে ভালোবাসে, তেমনি ইস্তাম্বুলীরাও সিটি লাইনের মালিকানায় চলা প্রতিটি ফেরী সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ রাখে। একটা গোটা বইও আছে, ফেরীগুলোর ছবি ও বর্ণনা দিয়ে। গ্যেটে

AMARBOI.COM

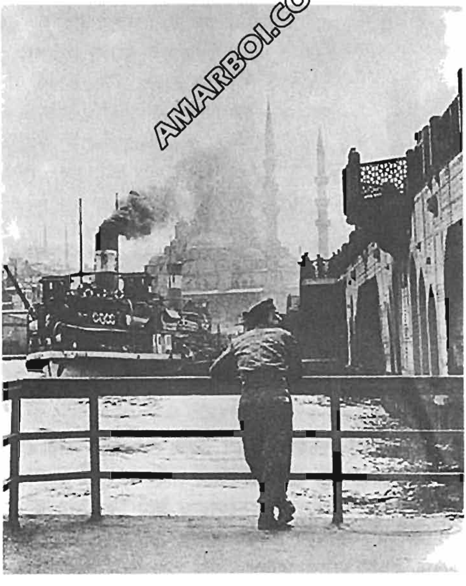

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলেন যে, ইস্তাম্বুলে প্রতিটি নাপিত নিজের দোকানে একটা না একটা ফেরীর ছবি টাঙিয়ে রাখে। আমার বাবা, তার ছেলেবেলায় যে সব ফেরী চলত, তার সিল্যুট ছবি দেখেই প্রত্যেকটিকে চিনতে পারতেন এবং যদি সঙ্গে সঙ্গে মনে নাও পড়ত, এক মুহূর্ত বাদেই তিনি নামগুলো আবৃত্তি করতেন, আমার কাছে সেটা কবিতার মতো মনে হত : '৫৩ ইনসিরা, ৬৭ ক্যালেন্ডার, ৪৭ তার্জ-ই-নেভিন, ৫৯ ক্যামার...'

যখন আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করতাম একই রকম দেখতে জাহাজগুলোকে তিনি কীভাবে আলাদা আলাদা করে চিনতেন, তখন তিনি প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যগুলো বলতেন– যেমন, আমরা যখন বসফোরাসের উপকূল ধরে গাড়ি নিয়ে বেড়াতাম, অথবা ট্রাফিক-এর জন্য বেরোনো সম্ভব না হলে, বেসিকটাসে আমাদের বসার ঘরে : কিন্তু উনি প্রত্যেকটি জাহাজের অনন্যতা ব্যাখ্যা করার পরেও– এটার একটা জায়গা কুঁজ মতো, ওটার একটা অতিরিক্ত লম্বা চিমনি আছে, আরেকটার নাকটা হুকের মতো বাঁকা, অথবা পেছন দিকটা ফোলা মতো, বা তীব্র স্রোতে এটা একদিকে একটু কাত হয়ে যায়– আমি কিছুতেই, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার পরও, একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করতে পারতাম না। কিন্তু আমি তিনটে ফেরীকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাদা করে চিনতে পারতাম,– দুটো ইংল্যান্ডে তৈরি আর তৃতীয়টা ইটালির ট্যারান্টোতে, ১৯৫২ সালে, আমার জন্মের বছরে তৈরি– যেগুলোকে বাগানের নামে নামকরণ করা হয়েছিল; ওগুলোর আকৃতি এবং চিমনির প্রস্থ দেখে আমি শেষ পর্যন্ত বলতে পারতাম কোনটা ফেনারবাহ্‌স, কোনটা ডোলমাবাহ্‌স আর কোনটা পাসাবাহ্‌স, শেষেরটাকে আমার সৌভাগ্যের জাহাজ বলে মনে করতাম এবং যখনই আমি আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে শহরের রাস্তায় হাঁটতাম এবং কোনো গলিপথের নিচের দিকে কিংবা কোনো জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে যদি ওই জাহাজটা চোখে পড়ত, আমার মনটা যেন একটু ওপরে উঠে যেত, যা আমার এখনো হয়।

দিগন্ত রেখায় ফেরীর বড় অবদান ছিল তার ফানেল থেকে বেরোনো ধোঁয়া। ওদের ওই কয়লা কালো ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে, যেটা ফেরীর বসফোরাসের বুকে অবস্থান ও সেটা কোথায় তৈরি, বসফোরাসের স্রোত এবং অবশ্যই বাতাসের গতিপথ অনুযায়ী এদিক-ওদিক হত, আমি ছবি আঁকতে ভালোবাসতাম। ফানেল থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, সেটা আমার চ্যাতলানো তুলি দিয়ে আঁকার আগে, ছবিটা অবশ্যই আঁকা শেষ হত, এমনকি অর্ধেক শুকিয়েও যেত। ছবির নিচে ডানদিকের কোণায় আমার সইটা বসানোর মতো, ফেরীর একটা বিশেষ ফানেল থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, সেটা ওই ফেরীর বিশেষ ছাপ বলে আমি মনে

করতাম। যখন ধোঁয়া ঘন হয়ে মেঘের মতো হত, বিশেষ করে যখন গালাতা সেতুর কাছে নোঙর করা সমস্ত জাহাজগুলোর সমস্ত ফানেল থেকে বেরোত, তখন মনে হত আমার পৃথিবীটা বুঝি একটা কালো ওড়না দিয়ে ঢেকে ফেলা হচ্ছে। বসফোরাসের উপকূল ধরে হাঁটার সময় অথবা একটা ফেরীতে ভ্রমণের সময়, কোনো অনেকক্ষণ-আগে-চলে-যাওয়া জাহাজের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার তলা দিয়ে যেতে আমার খুব ভালো লাগত। যদি বাতাস ঠিক থাকত, লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট কালো গুঁড়োর শুকনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি আমার মুখে ঝরে পড়ত মাকড়সার জালের মতো, আর পোড়া খনিজের গন্ধ ছাড়ত।

প্রায়ই একটা ছবিকে সুন্দরভাবে শেষ করার পরে আর ফেরীর ফানেলগুলো থেকে সঠিক পরিমাণ ধোঁয়া ছবিতে আঁকার পরে (কখনো কখনো বেশি ধোঁয়া এঁকে ফেলতাম আর ছবিটা নষ্ট হয়ে যেত) আমি ভাবতাম আমি তো দেখেছি, আরো কতরকম ভাবে ধোঁয়া বের হয়, কুণ্ডলী পাকায়, ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর এই সব ভাবনার ছবিগুলো মনের মধ্যে জমিয়ে রাখতাম ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু ছবিতে তুলির শেষ টান দেবার পরে, আমার সামনের ক্যানভাসটা এমনভাবে একটা নিজস্ব বাস্তবতা অর্জন করত যে, আমি নিজের চোখে কী দেখেছি, তা ভুলে যেতাম, ধোঁয়া সত্যি সত্যি স্বাভাবিক অবস্থায় কেমন দেখায়, তা ভুলে যেতাম।

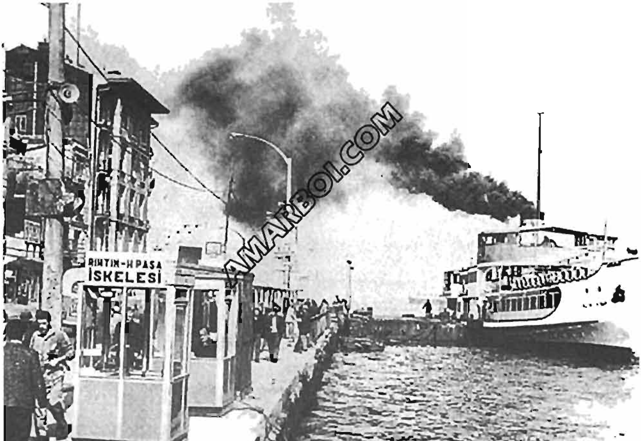

AMARBOI.COM

একটু হালকা বাতাস উঠলে ধোঁয়ার স্তম্ভ নিখুঁত হত আর কিছুক্ষণ ধরে ধোঁয়া পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে ওঠার পর, আকৃতি পরিবর্তন না করে জাহাজের সমান্তরালে চলতে থাকত, মনে হত যেন কেউ ফেরীর চলার পথ নির্দেশ করার জন্য আকাশে একটা সুষ্ঠু লাইন টেনে দিয়েছে। বায়ুহীন দিনে একটা নোঙর করা ফেরী থেকে কয়লার মতো কালো পাতলা ধোঁয়ার রেখা উঠলে, আমার মনে পড়ত কোনো ছাউনির ছোট চিমনি থেকে বেরোনো ধোঁয়ার কথা। যখন ফেরী ও বাতাস সামান্য একটু দিক পরিবর্তন করত, তখন ফানেল থেকে বেরোনো ধোঁয়া বসফোরাসের ওপরে আরবী লিপির মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে নামত, ঘুরপাক খেত। কিন্তু আমি যখনই সিটি লাইন ফেরীসহ বসফোরাসের কোনো ছবি আঁকতাম, আমার ধোঁয়া দরকার হত দৃশ্যটার বিষণ্নতা বোঝাতে, কাজেই এই যে মজার মজার আনন্দদায়ক ধোঁয়ার আকৃতিগুলো হত, সেগুলোকে আমার ভালো লাগলেও, আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। বায়ুহীন কোনো দিনে, যখন কালো ধোঁয়া ফানেল থেকে প্রবল ভাবে বেরিয়ে এসে আকাশ ছেয়ে থাকত, সেটা হত একটা

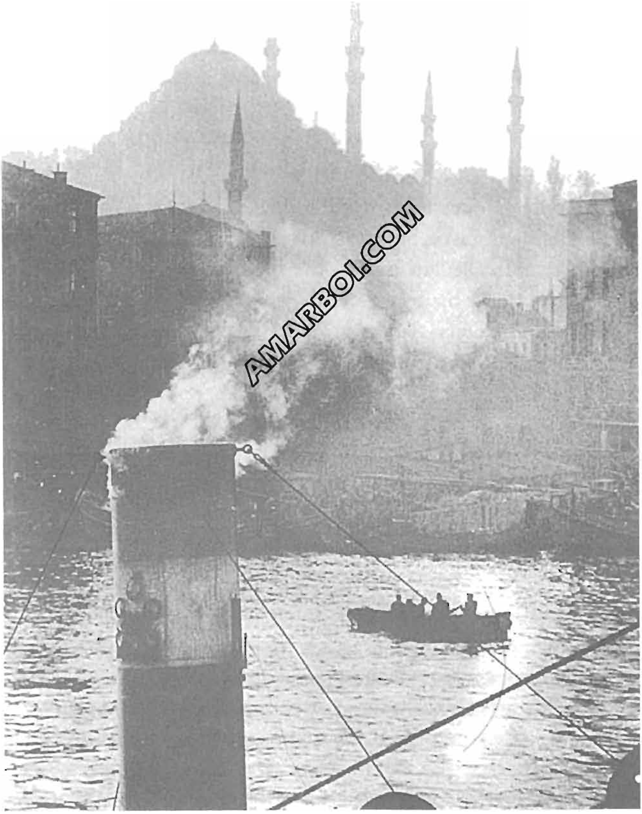
AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনস্বীকার্য বিষণ্নতার রেকর্ড, যা ফেরীটা উপকূল থেকে উপকূলে যাবার পথে পেছনে ফেলে রেখে যেত। টার্নার-এর ছবিতে যেমন থাকে, তেমনি ঘন কালো মেঘ দিগন্তে জমে রয়েছে আর পেছনের ঘনায়মান মেঘের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে, এগুলো দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। কিন্তু তবুও যখন এক বা একাধিক ফেরী থেকে ধোঁয়া উঠছে, এ রকম একটা ছবি আঁকা শেষ করার সময়, ফেরী থেকে ওঠা ধোঁয়ার রঙ-এর মাত্রা আমার মাথায় থাকত না, আমি ভেবে নিতাম মনেট, সিসলে এবং পিসারো-র ছবিতে যেমন ধোঁয়া আঁকা থাকত, তার কথা– মনেটের 'গেয়ার সেন্ট লাজারে' ছবিতে নীলচে ধোঁয়া, বা ডুফি-র সম্পূর্ণ আলাদা জগতের সুখী সুখী আইস ক্রীমের স্কুপের মতো মেঘ-এবং আমি ওই গুলোই আঁকতাম।

'এ সেন্টিমেন্টাল এডুকেশন'– বই এর প্রথম লাইনে ফ্লবার্ট ধোঁয়ার আকৃতি পালটানোর একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন এবং এটাও একটা কারণ যে, আমি তাঁকে পছন্দ করি (অন্য কারণও আছে)। এইখানে আমি ধোঁয়ার প্রতি স্তবগান শেষ করব; ঐতিহ্যিক অটোমান সঙ্গীতে যাকে 'আরা টাকসিম' বলে, এই রচনাটিকে পরবর্তী সুরের জন্য সেতু হিসেবে ব্যবহার করে, সেটাই আমি করেছি। 'টাকসিম' শব্দটি বোঝাতে পারে, ভাগ করা, জড় করা, অথবা জলকে পথ করে দেওয়া এবং সেইজন্যে যে বিশাল ময়দানে নার্ভাল, ফেরিওয়ালা ও সমাধিস্থল দেখেছিলেন (যেটা জল বিতরণের কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করত), সেটাকে ইস্তাম্বুলীরা 'টাকসিম' বলে। তারা এখনো ওটাকে ওই নামেই ডাকে এবং আমি সারা জীবন এরই আশেপাশে কাটিয়েছি। কিন্তু ফ্লবার্ট ও নার্ভাল যখন এখান দিয়ে গিয়েছিলেন, তখন পর্যন্ত এই জায়গাটাকে 'টাকসিম' বলে জানা যেত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১.
ইস্তাম্বুলে ফ্লবার্ট : প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং সিফিলিস

১৮৫০ সালের অক্টোবর মাসে, নার্ভালের ইস্তাম্বুল ভ্রমণের সাত বছর পর, গুস্তাভ ফ্লবার্ট তাঁর লেখক ও ফটোগ্রাফার বন্ধু ম্যাক্সিম দু ক্যাম্পকে সঙ্গে নিয়ে ইস্তাম্বুলে পৌছন; এবং অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর সিফিলিস রোগ, যেটায় তিনি বেইরুটে সংক্রামিত হয়েছিলেন। তিনি এখানে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ছিলেন এবং যদিও তিনি এথেন্স থেকে লুই বোইলে-কে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন যে, 'অন্তত ছ'মাস থাকা উচিত [ইস্তাম্বুলে]', আমরা তাঁর কথায় কোনো গুরুত্ব দেব না, কারণ ফ্লবার্ট এমন একটা মানুষ, যিনি পেছনে ফেলে আসা সব কিছুই হারিয়েছিলেন। যে সব চিঠিতে তারিখের পাশে 'কনস্তান্তিনোপল' লেখা আছে, সেগুলো থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে, তিনি পর্যটনে বেরোনোর পর থেকে যেটা সবচেয়ে বেশি করে অভাব অনুভব করতেন, তা হলো রোয়েন-এ তাঁর বাড়ি, তাঁর পড়ার ঘর এবং তাঁর প্রিয় মা, যিনি তাঁর চলে যাবার সময় প্রচুর কেঁদেছিলেন এবং তাঁর তীব্র আকাঙ্খা ছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফেরা।

নার্ভালের ভ্রমণ সূচি অনুসরণ করে, ফ্লবার্ট কায়রো, জেরুজালেম এবং লেবানন হয়ে ইস্তাম্বুলে এলেন। নার্ভালের মতোই তিনিও এই সব জায়গায় প্রাচ্য দেশের যে কর্কশ, ভীতিপ্রদ কুশ্রীতা, অতীন্দ্রিয়বাদের উদ্ভট রহস্যময়তা, তা দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, নিজের কল্পজগতের ভাবনায় ইতিমধ্যেই একঘেয়েমি বোধ করেছিলেন এবং তাঁর স্বপ্নের চেয়ে বেশি প্রাচ্য জগতের বাস্তবতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনি ইস্তাম্বুলের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাননি। (তাঁর প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল এখানে তিন মাস থাকা।) আসলে তিনি যা দেখতে চাইছিলেন, সেই প্রাচ্য দেশ ইস্তাম্বুল নয়। লুই বোইলেকে লেখা আরেকটি চিঠিতে তিনি লর্ড বায়রণের পশ্চিম আনাতোলিয়া ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেন। বায়রনের কল্পনাকে আকৃষ্ট করেছিল যে প্রাচ্য দেশ, তা হল 'তুর্কী প্রাচ্য দেশ, বাঁকা তলোয়ার-এর প্রাচ্য দেশ, অ্যালবেনিয়ার পোশাক এবং নীল সমুদ্রের দিকে মুখ করা গরাদ দেওয়া জানালা।' কিন্তু ফ্লবার্ট পছন্দ করতেন বেদুইনদের রোদে পোড়া প্রাচ্য দেশ, মরুভূমি, আফ্রিকার সিঁদুরে গভীরতা, কুমীর, উট, জিরাফ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই উনত্রিশ বছর বয়স্ক লেখক তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণে যতগুলো দেশ দেখেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল ঈজিপ্ট, তাঁর সারা জীবন ধরে। যেমন তিনি তাঁর মাকে এবং বোইলেকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, এখন তার মন রয়েছে ভবিষ্যতে এবং তিনি যে বইগুলো লিখতে চান, তার ওপর। (যেসব বই তিনি ভেবে রেখেছিলেন, তাঁর মধ্যে একটি উপন্যাস ছিল, 'হারেল বে', যাতে একজন সভ্য পশ্চিম দেশীয় মানুষের এবং একজন প্রাচ্যদেশীয় অসভ্য লোকের চেহারা ধীরে ধীরে অবিকল একই রকম হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা একজন আরেকজনের জায়গা দখল করবে।) তিনি মা-কে যা লিখেছিলেন, তার থেকে এটা পরিষ্কার যে, যে সমস্ত জিনিস দিয়ে ফ্লবার্ট সম্বন্ধীয় অতিকথা তৈরি হয়েছিল, যেমন– তিনি শিল্প ছাড়া আর কোনো কিছুতেই গুরুত্ব দিতেন না, কায়েমি স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য ঘৃণা, বিবাহকে ঘৃণা, ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করা,– এ সবই ততদিনে তাঁর চরিত্রে এসে গিয়েছিল। আমার জন্মের একশ বছর আগে, যখন তিনি সেই সব রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যেখানে আমি আমার জীবন কাটাব, তাঁর মনে একটা চিন্তা এল, যা তিনি পরে কাগজে লিখে রাখবেন, এবং সেটি আধুনিক সাহিত্যের একটি মূল নৈতিক আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হবে. 'আমি পৃথিবীর কিছুই গ্রাহ্য করি না, ভবিষ্যৎকে গ্রাহ্য করি না, লোকে কী বলবে গ্রাহ্য করি না, কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার গ্রাহ্য করি না, অথবা সাহিত্যিক খ্যাতিও গ্রাহ্য করি না, যার জন্য অতীতে এক সময় আমি রাতের পর রাত জেগে স্বপ্ন দেখতাম। আমি এই রকমই, আমার চরিত্রও এই রকম।' (ফ্লবার্টের মা-কে লেখা চিঠি, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫০, ইস্তাম্বুল)।

এই পাশ্চাত্য পর্যটকদের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে কেন? তাঁরা এই শহরে বেড়াতে এসে কী কী করেছেন, তাঁদের মায়ের কাছে চিঠিতে কী লিখেছেন, এইসব চিন্তা কেন? এটা খানিকটা আমি যে নিজেকে এদের অনেকের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি (নার্ভাল, ফ্লবার্ট, দ্য অ্যামিসিস) তার জন্য এবং যেমন আমি একবার ইস্তাম্বুলকে আঁকার জন্য উত্রিলোর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলাম– এটা হয়েছে আমার ওপর তাঁদের প্রভাব পড়েছে তাই এবং তাদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে তর্কাতর্কি করে আমি আমার পরিচয় জাল করেছিলাম বলে। আরও একটা কারণ হচ্ছে এই যে, নিজের শহরের ওপর মনোযোগ দেওয়ার মতো স্থানীয় লেখক ইস্তাম্বুলে এত কম, তাই।

একে আমরা যাই বলি না কেন– মিথ্যা সচেতনতা, কল্পনার জাল বোনা বা পুরোনো ধরনের আদর্শবাদ– আমাদের প্রত্যেকের মাথার মধ্যে একটা অল্পবোধ্য, অর্ধ গোপনীয় কাহিনী আছে, যা আমরা জীবনে যা কিছুই করছি, তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য বোধগম্যতা এনে দিচ্ছে। এবং ইস্তাম্বুলে আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকরা আমাদের সম্বন্ধে কী বলেছেন, তার দিকেই এই কাহিনীর একটা বড় অংশ ঝুঁকে রয়েছে। কারণ আমার মতো লোকের কাছে, নিজের সংস্কৃতিতে এক পা, আর অন্য সংস্কৃতিতে আরেক পা রাখা ইস্তাম্বুলীদের কাছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮১

‘পাশ্চাত্ত্য পর্যটক’ প্রায়ই একজন সত্যি মানুষ নন, তিনি আমার কল্পনাসৃষ্ট হতে পারেন, আমার কল্প-রাজ্যের, এমনকি আমার নিজের প্রতিফলনও হতে পারেন। কিন্তু আমার কাহিনীর জন্য কেবলমাত্র ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করতে অসমর্থ হওয়ায়, আমি কিন্তু একজন বহিরাগতের প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ সে আমাকে একটা পরিপূরক কাহিনী দিতে চাইছে– সেটা একটা লেখা, একটা চিত্র, বা একটা ফিল্মও হতে পারে। কাজেই আমি যখনই পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টির অনুপস্থিতি বোধ করি, আমি আমার নিজের পাশ্চাত্ত্য পর্যটক হয়ে যাই।

ইস্তাম্বুল কখনোই কোনো পশ্চিমীদের উপনিবেশ ছিল না, যারা এর সম্বন্ধে লিখেছে, একে এঁকেছে, একে নিয়ে ফিল্ম করেছে এবং তাই পাশ্চাত্ত্য পর্যটকরা আমার অতীত এবং আমার ইতিহাসকে তাদের উদ্ভট কাহিনী সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছে বলে আমি একদম বিচলিত হইনি। প্রকৃতপক্ষে তাদের ভীতি, তাদের স্বপ্নকে আমার ছলনাময় মনে হয়,– আমার কাছে সেটা বিদেশী, যেমন আমাদেরটা তাদের কাছে এবং আমি তাদের দিকে বিনোদনের জন্য তাকাই না, বা তাদের চোখ দিয়ে শহরটাকে দেখতে চাই না, কিন্তু তাদের সৃষ্ট সম্পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করতে চাই। বিশেষ করে উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য পর্যটকদের লেখা পড়ার পর–কারণ হয়তো তারা পরিচিত জিনিসগুলো নিয়ে এমন শব্দ ব্যবহার করে লিখেছিল, যা আমার কাছে সহজবোধ্য ছিল– আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, ‘আমার’ শহরটা সত্যি সত্যিই আমার নয়। যখন আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইস্তাম্বুলের দিগন্ত রেখার কথা ভাবতে থাকি, গালাতা এবং সিহাঙ্গির থেকে, যেখানে বসে আমি এখন এই লেখা লিখছি,– সেই রকমই, এটাও, যখন আমি যে সব পাশ্চাত্ত্য পর্যটকরা আমার আগেই এই শহরের দৃশ্যগুলো দেখেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

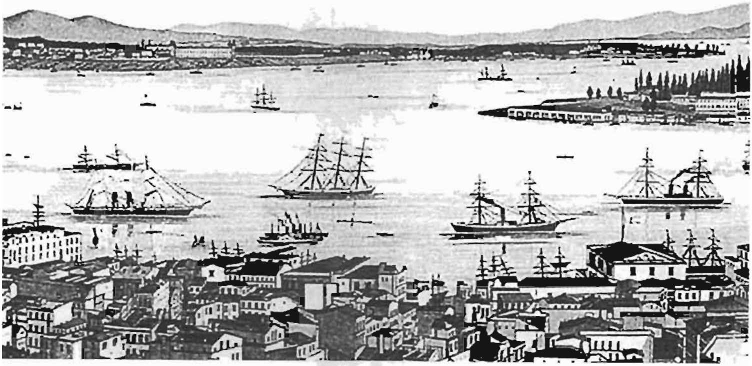

তাদের লেখা এবং সৃষ্ট শহরের কল্পমূর্তির মধ্যে দিয়ে শহরটাকে দেখি; এই রকম সময়ে আমি শহরটার সম্বন্ধে এবং সেখানে আমার দুর্বল অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হই। প্রায়ই বোধ করি যেন আমি পাশ্চাত্ত্য পর্যটকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি, তার সঙ্গেই জীবনের টানাপোড়েনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, গুণছি, ওজন করছি, শ্রেণী বিভাগ করছি, বিচার-বিশ্লেষণ করছি এবং এই সব করতে গিয়ে তাদের স্বপ্ন চুরি করছি। একই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টির দ্রষ্টব্য এবং দ্রষ্টা হয়ে যাচ্ছি। যেমন আমি সামনে পেছনে যাচ্ছি, শহরটাকে কখনো ভেতর থেকে, কখনো বাইরে থেকে দেখছি, রাস্তায় হাঁটার সময় পিচ্ছিল, পরস্পরবিরোধী চিন্তার স্রোতে আটকে পড়ছি, এই জায়গায় থাকছিও না, আবার বহিরাগতও নই, এই রকম অনুভব করি। ইস্তাম্বুলের বাসিন্দারা গত একশ পঞ্চাশ বছর ধরে এই রকমই বোধ করেছে।

এই ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন, ফ্লবার্টের পুরুষাঙ্গ সম্বন্ধে একটা গল্প দিয়ে, যেটা ইস্তাম্বুলে থাকার সময় তাঁর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর ইস্তাম্বুলে আসার দ্বিতীয় দিনে, লুই বোইলে-কে লেখা একটা চিঠিতে আমাদের দুঃখী লেখক স্বীকার করেছিলেন যে, বেইরুটে তিনি সিফিলিস সংক্রমিত হবার পর তার লিঙ্গে যে সাতটি ফোড়ার মতো হয়েছিল, সেগুলো মিলে গিয়ে এখন একটায় দাঁড়িয়েছে। 'প্রত্যেকদিন রাত্রে এবং সকালে আমি আমার দুর্দশাগ্রস্ত লিঙ্গটা পরিস্কার করে ওষুধ লাগাই!' উনি লিখেছেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে, একজন ম্যারোনাইটের কাছ থেকে তিনি সিফিলিসের সংক্রমণ পেয়েছিলেন অথবা 'হয়তো এক ছোটখাটো তুর্কী মহিলা। তুর্কী, না, ক্রিশ্চান?' তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, এবং সেই একই ব্যাঙ্গাত্মক সুরে আবার বলছেন, 'সমস্যা! চিন্তার বিষয়! এটা 'প্রাচ্য প্রশ্নের' একটা দিক, যা 'রেভ্যু দ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

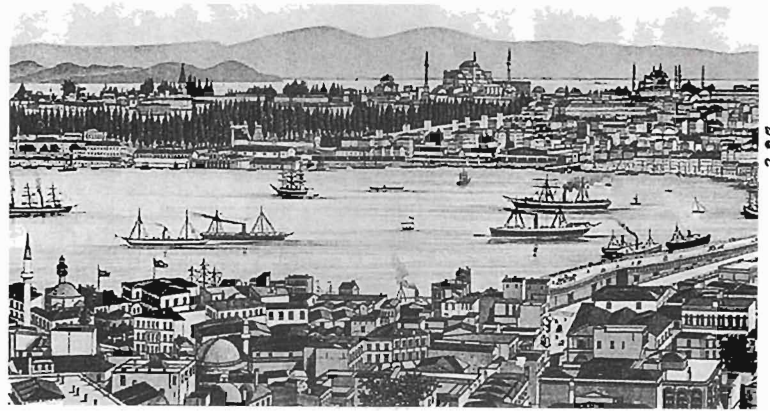

ডিউক্স মভেস' স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি!' এই রকম সময়েই তিনি মা-কেও একটা চিঠিতে লিখছেন যে, তিনি কখনোই বিয়ে করবেন না, অবশ্য সেটা তাঁর অসুস্থতার জন্য নয়।

যদিও এই সময়টা তিনি সিফিলিসের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন, যেটাতে তাঁর হঠাৎ করে এত চুল উঠতে আরম্ভ করেছিল যে তিনি ফিরে গেলে তার মা অব্দি তাকে চিনতে পারতেন না। তার মধ্যেও ফ্লবার্ট ইস্তাম্বুলের বেশ্যা পাড়ায় গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন একজন ড্রাগোম্যান (প্রদর্শক-দোভাষী) যে সব সময় পাশ্চাত্ত্য পর্যটকদের একই জায়গায় নিয়ে যেত, ফ্লবার্টকে নিয়ে গিয়ে গালাতায় এমন একটা জায়গা দেখাল, যেটা 'নোংরা' আর মেয়েলোকগুলো 'এত কুৎসিত' যে, ফ্লবার্ট সঙ্গে সঙ্গে ওই জায়গা ছেড়ে চলে আসতে চান। ফ্লবার্টের কথায়, 'মাদাম' তখন তাকে শান্ত করার জন্য তার নিজের মেয়েকে দিতে চায়, একটা ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে, যাকে দেখে ফ্লবার্টের খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা ফ্লবার্টের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে। ওই বেশ্যা বাড়ির অন্য বাসিন্দারা জোর করে ঠেলেঠুলে মেয়েটাকে ফ্লবার্টের কাছে পাঠায়, পাঠকরা ভাবুক কীভাবে এটা সম্ভব হল; শেষ পর্যন্ত যখন ওরা দুজন একা হলেন, তখন মেয়েটা ফ্লবার্টকে ইটালিয়ান ভাষায় জিজ্ঞাসা করল যে, ফ্লবার্ট তার পুরুষাঙ্গটি মেয়েটিকে দেখাবেন কিনা, যাতে সে বুঝতে পারে তিনি রোগগ্রস্ত কিনা। 'যেহেতু আমার লিঙ্গের গোড়ার দিকটায় তখনো একটু ঘা মতো ছিল আর আমি ভয় পাচ্ছিলাম যদি ও ওটা দেখে ফেলে, তাই আমি ভদ্রলোক সেজে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে চিৎকার করে বললাম যে, ও আমাকে অপমান করছে, কোনো ভদ্রলোক এ রকম ব্যবহার বরদাস্ত করবে না; এবং আমি চলে এলাম...' ফ্লবার্ট লিখছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন তাঁর ভ্রমণের শুরুতে কায়রো হাসপাতালের একজন ডাক্তার একটা ভঙ্গী করে দেখালেন যে, তিনি কেমন করে রোগীদের প্যান্ট খুলতে আদেশ করতেন, যাতে পশ্চিমী ডাক্তাররা তাদের পুরুষাঙ্গ দেখতে পারে, তখন ফ্লবার্ট সেই সব রোগীদের নিখুঁতভাবে দেখতেন এবং তাদের সম্বন্ধে নিজের নোট বই-এ মনোযোগের সঙ্গে নোট লিখে রাখতেন এবং খুব সন্তুষ্ট চিত্তে মন্তব্য করতেন– যেমন তিনি করতেন যখন টোপকাপি রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে বেঁটে বামনদের উচ্চতা, ভঙ্গী ও পরিধান সম্বন্ধে বর্ণনা করতেন–

যে, তিনি আরও একটি প্রাচ্য উদ্ভট জিনিস দেখলেন, আরো একটা নোংরা প্রাচ্য প্রথা। তিনি যদি প্রাচ্য দেশে সুন্দর সুন্দর, ভোলা যায় না এমন দৃশ্য দেখতে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন, তাঁর আবার অদম্য ইচ্ছাও ছিল প্রাচ্য দেশের রোগ-অসুখ এবং উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতি দেখার। তবুও তাঁর কিন্তু নিজের রোগ বা নিজের উদ্ভট অভ্যাসগুলোকে প্রকাশ্যে আনার কোনো ইচ্ছা ছিল না। এডওয়ার্ড সৈদ, তার অপূর্ব 'ওরিয়েন্টালিজম'-এ নার্ভাল ও ফ্লবার্টকে বিশ্লেষণ করার সময় কায়রো হাসপাতালের প্রথম দৃশ্যটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু ওই নাটক যেখানে শেষ হয়, সেই ইস্তাম্বুলের বেশ্যাপট্টি সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই করেননি। যদি করতেন, তাহলে অনেক ইস্তাম্বুলীয় পাঠককেই জাতীয়তাবাদী মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার লেখাকে ব্যবহার করা থেকে বিরত করতে পারতেন অথবা প্রাচ্য দেশ অপূর্ব জায়গা হত যদি পাশ্চাত্য দেশ মাঝখানে না আসত, এই ধরনের ভাবনা থেকে বিরত করতে পারতেন। হয়তো সৈদ ও কথা লিখতে চাননি, কারণ ইস্তাম্বুল কখনোই পশ্চিমের উপনিবেশ ছিল না, কাজেই এ ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। যদিও জাতীয়তাবদী তুর্কীরা পরে দাবি করেছিল যে, আমেরিকা থেকেই এই রোগটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমী পর্যটকরা সিফিলিসকে বলত' ফেঙ্গি' (অথবা 'ফ্রেঞ্চ'), তারা জানত যে ফরাসিরাই এই সংক্রামক রোগটিকে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে বয়ে নিয়ে গেছে। ফ্লবার্টের ইস্তাম্বুল ভ্রমণের পঞ্চাশ বছর পরে, সেমসেট্টিন সামি, যে অ্যালবেনিয়ান প্রথম তুর্কী অভিধান বার করেন, খালি লিখেছিলেন যে, 'ফেঙ্গি আমাদের দেশে ইউরোপ থেকে এসেছে।' কিন্তু ফ্লবার্ট তার 'ডিকশনারি অব অ্যাকসেপটেড আইডিয়াজ' বইটিতে সেই মত প্রকাশ করেছেন যা তিনি নিজেকে প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন করে তাঁর এই রোগটি হল– কোনো রকম প্রাচ্য-পাশ্চাত্য হাসি-ঠাট্টা না করেই, তিনি এই বলে শেষ করেছিলেন যে, এই রোগটি প্রায় সবাইকেই সংক্রামিত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভট বিদেশী, ভীতিপ্রদ, নোংরা কুৎসিত এবং নপুংসকের প্রতি তাঁর আগ্রহ স্বীকার করতে কোনো রকম দ্বিধা না করে ফ্লবার্ট লিখছেন তার চিঠিতে 'সমাধিস্থলের বেশ্যাদের' কথা (যারা রাত্রিবেলা সৈন্যদের সুখ দিত), সারসদের শূন্য বাসার কথা, ঠান্ডা, সাইবেরিয়ান বাতাস কৃষ্ণ সাগর থেকে ছুটে আসার কথা এবং শহরের প্রচণ্ড জনতার ভীড়ের কথা। আরো অনেক পর্যটকের মতে, তাঁরও শহরের সমাধিস্থানগুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল; তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন যে, এই যে সমাধির প্রস্তর ফলকগুলোকে সারা শহরে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, এগুলো সেই সব মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবার মতো, ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে পুরোনো হয়ে বৃদ্ধ হয়ে মাটিতে বসে যাচ্ছে, ঢুকে যাচ্ছে, আর খুব শিগগিরই কোনো রেশ না রেখে লুপ্ত হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩২.

দাদার সঙ্গে লড়াই

আমার ছয় থেকে দশ বছর বয়েসের মধ্যে দাদার সঙ্গে আমি অনবরত লড়াই করতাম এবং সময়ের সাথে সাথে দাদার আমাকে মারধর করাটা খুব হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আমাদের দুজনের মধ্যে বয়েসের তফাৎ ছিল মাত্র আঠারো মাস, কিন্তু দাদা ছিল লম্বায় চওড়ায় বড় আর বেশি শক্তিশালী আর যেহেতু দুই ভাই-এর মধ্যে মারামারি, ঘুষোঘুষিকে খুব স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হত (হয়তো এখনো তাই হয়), তাই কেউ আমাদের মারামারি থামানোর প্রয়োজন অনুভব করত না। আমি মার খেয়ে ভাবতাম এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা, তার জন্যে দায়ী আমার দুর্বল শরীর এবং ঠিক মতো মারপিট করতে না পারা; প্রথম কয়েক বছর, যখন আমার দাদা আমাকে রাগাত, বা আমাকে অপমান করত, আমিই ওকে প্রথমে মারতাম এবং ভাবতাম যে আমাকে মার খেতেই হবে, অবশ্য আমি আদর্শগতভাবে হিংস্রতাকে চ্যালেঞ্জ করতাম না। যদি কখনো আমাদের লড়াই-এর শেষে দেখা যেত, ভাঙা কাচ, জানালার শার্শী ভাঙা ছড়িয়ে পড়ে আছে, আর আমার সারা গায়ে মারের দাগ, রক্ত পড়ছে, তখন মা শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করলেও, তাঁর অভিযোগ ছিল যে, আমরা ঘরদোর অগোছালো করেছি, কাচ, জানালা ভেঙেছি এবং যেহেতু আমরা নিজেদের মতান্তর শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নিতে পারিনি, প্রতিবেশীরা আবার হৈ চৈ গণ্ডগোল করার জন্য নালিশ জানাবে, কিন্তু মা কখনোই আমরা যে পরস্পরকে মেরেছি, আর আমি যে এত মার খেয়েছি, সে সম্বন্ধে কোনো কথাই বলতেন না।

AMARBOI.COM

অনেক পরে যখন আমি এই সব মারামারির কথা মনে পড়িয়ে দিতাম, মা আর দাদা, দুজনেই বলত যে, তাদের কিছু মনে নেই এবং আরো বলত যে, আমি এসব কল্পনা করেছি, লেখার রসদ সংগ্রহ করার জন্যে, যাতে আমি একটা বেশ নাটকীয়, রঙিন অতীতের ছবি আঁকতে পারি। ওরা এত আন্তরিকভাবে বলত যে, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে মেনে নিত হত যে, আমি বাস্তব ঘটনার চাইতে কল্পনার জগতেই বাস করছি। কাজেই আমার এই লেখা যারা পড়ছে, তারা যেন মনে রাখে, যে আমি কোনো কোনো ব্যাপারকে অতিরঞ্জিত করে থাকি। কিন্তু কোনো চিত্রকরের কাছে জরুরি হচ্ছে, কোনো জিনিসের আকৃতি, তার বাস্তবতা নয়, আর একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঔপন্যাসিকের কাছে জরুরি হচ্ছে ঘটনা প্রবাহ নয়, ঘটনা ঘটানো, আর একজন স্মৃতিকথা লেখকের পক্ষে জরুরি হচ্ছে, ঘটনার সত্যতা নয়, ঘটনার সমানুপাতিত্ব।

কাজেই যে পাঠক লক্ষ করেছেন যে, আমি নিজেকে বর্ণনা করার সময় ইস্তাম্বুলকে কেমন বর্ণনা করেছি, অথবা ইস্তাম্বুলকে বর্ণনা করার সময় নিজেকে বর্ণনা করেছি, তিনি ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন যে, আমি এই সব ছেলেমানুষি নিষ্ঠুর ঝগড়াগুলোর গল্প করছি, অন্য কিছুর জন্য জমি প্রস্তুত করব বলে। বাচ্চাদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে হিংস্রতার মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করা, ছেলেরা তো ছেলেই হয়। কত খেলা ছিল, আমরা নিজেদের জন্য তৈরি করেছিলাম, সাধারণ খেলা, কিন্তু নিয়মগুলো বিশেষভাবে তৈরি। আমাদের অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন বাড়ির ভেতর আমরা খেলতাম লুকোচুরি, রুমাল-চোর, সাপ, সমুদ্রের ক্যাপ্টেন, হপ্‌স্কচ, অ্যাডমিরাল ডুবে গেছে, শহরের নাম বল, নাইনস্টোন, স্কেয়ার, চেকারস, দাবা, টেবিল টেনিস (বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা টেবিলে) এবং টেবিল বল (আমাদের ভাঁজ করা যায় খাবার টেবিলে), এ রকম আরো অনেক খেলা ছিল। যখন মা বাড়ি থেকে বাইরে যেতেন, আমরা খবরের কাগজের গোল্লা পাকিয়ে সারা বাড়িতে ফুটবল খেলতাম, যতক্ষণ না ঘেমে নেয়ে একসা হতাম এবং প্রায়ই এই খেলা মারামারিতে পরিণত হত।

• প্রায় সারা বছর ধরেই আমরা 'মার্বল ম্যাচ' খেলতাম, পুরুষদের খেলা ফুটবলের কলাকৌশল এবং কাহিনীগুলো এতে প্রতিধ্বনিত হত। আমরা ব্যাকগ্যামন খেলার ঘুঁটিগুলোকে খেলোয়াড় বানাতাম আর ফুটবল খেলার নিয়ম মেনে মাঠের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের সাজাতাম, তারপর আসল ফুটবল খেলাতে যেমন দেখতাম, তেমনি ভাবে নকল করে আমাদের আক্রমণ এবং রক্ষণভাগকে রাখতাম আর আমরা যত বেশি পটু হয়ে উঠতে লাগলাম, ততই আমাদের খেলা উজ্জীবিত হয়ে উঠতে লাগল। ঘরের কার্পেট হত আমাদের খেলার মাঠ আর আমরা ব্যাকগ্যামনের ঘুঁটি দিয়ে দুটো দল তৈরি করে সাজাতাম আর দীর্ঘদিনের শয়ে শয়ে মারামারির পর আমরা যে সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র নিয়মকানুন বানিয়েছিলাম, তা অনুসরণ করে আমরা আমাদের ছুতোর দিয়ে বানানো গোলপোস্টের মধ্যে বল মারতাম। কখনো কখনো এই ঘুঁটি বা মার্বলগুলোকে তখনকার দিনের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম দিতাম। লোকে যেমন নিজেদের ডোরাকাটা বিড়ালের বাচ্চাগুলোকে চিনতে পারে, আমরাও তেমনি একপলক দেখেই আমাদের মার্বলগুলোকে চিনতে পারতাম। তখনকার দিনের সেরা ক্রীড়া ভাষ্যকার হালিত কিভাঙ্ক-এর নকল করে আমরা কাল্পনিক জনতার উদ্দেশে ম্যাচের ধারাবিবরণী দিতাম আর যখন গোল করতাম, তখন সত্যিকারের ম্যাচে গ্যালারির দর্শকরা যেমন চিৎকার করে, তেমনি ভাবে 'গো-ও-ও-ল' বলে চিৎকার করতাম, তারপরেই জনতার হর্ষধ্বনিকে নকল করতাম। আমরা আমাদের ধারাবিবরণীতে, ফুটবল ফেডারেশনের, খেলোয়াড়দের, সংবাদ মাধ্যমের, এমনকি ফুটবলপ্রেমীদের মন্তব্যও জুড়ে দিতাম (কিন্তু রেফারির মন্তব্য কখনো নয়); এবং শেষ পর্যন্ত আমরাও ভুলে যেতাম যে খেলা হচ্ছে খেলাই, আর প্রচণ্ড মারপিট শুরু করে দিতাম। বেশির ভাগ সময়েই প্রথম কিলচড় খেয়েই আমি শুয়ে পড়তাম।

প্রথম দিকের এই লড়াইগুলো শুরু হত হেরে যাওয়া দিয়ে, অতিরিক্ত বিরক্ত করা এবং ঠকানো দিয়ে, কিন্তু দুজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল আসল আগুন। কে ঠিক বা কে ভুল, সেটা নির্ণয় করার জন্য মারপিটটা হত না, সেটা হত কে বেশি শক্তিমান, বেশি দক্ষ, বেশি জানে বা বেশি চালাক, সেটা ঠিক করতে। এবং এটা প্রকাশ করত আমাদের দুশ্চিন্তা যে, আমরা এই খেলার নিয়ম, এই জগতের নিয়ম শিখতে চাই, যাতে দরকার হলে এক নিমেষে আমরা আমাদের কার্যক্ষমতা এবং মানসিক ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সেই সংস্কৃতির ছায়া রয়েছে যা আমার চাচাকে, আমরা যখনই তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতাম, আমাদের হয় শব্দজব্দ বা অন্য গাণিতিক সমস্যা দিয়ে আক্রমণ করতে প্রণোদিত করত; সেই একই সংস্কৃতি, যা আমাদের বাড়িটার বিভিন্ন তলায় পরস্পরের মাঝে আধা-আন্তরিক অংশ নেওয়াত, প্রত্যেক তলা একটি আলাদা আলাদা ফুটবল দলকে সমর্থন করত এবং যা আমরা আমাদের পড়ার বই-এ পেতাম, যেখানে অটোমান তুর্কীদের জয়কে অতিরঞ্জিত করে লেখা হয়েছিল এবং এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ডিসকভারিজ অ্যান্ড ইনভেনশনস-এর মতো বইগুলোতে, যেগুলো আমরা উপহার হিসাবে পেয়েছিলাম।

আমার মায়েরও এই ব্যাপারে হয়তো হাত ছিল, কারণ হয়তো নিজের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে একটু সহজ করে তুলতে তিনি সব কিছুকেই প্রতিযোগিতায় পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন। 'যে পায়জামা পরে নিয়ে সবচেয়ে আগে বিছানায় যাবে, সে একটা চুমু পাবে', আমার মা বলতেন। 'যে সারা শীতকালটা ঠান্ডা লাগাবে না বা অসুস্থ হবে না, তাকে আমি একটা উপহার কিনে দেবো।' 'যে জামার ওপর কোনো খাবারের ছিটে-ফোঁটা না ফেলে আগে খাবার খেয়ে নেবে, তাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসব।' মায়ের এই প্ররোচনাগুলো দুই ছেলেকে আরো বেশি সৎ ছেলে, ঠান্ডা ছেলে আর বাধ্য ছেলে বানাবার কায়দা ছিল।

কিন্তু দাদার সঙ্গে আমার এই অসহায় লড়াইগুলোর পেছনে ছিল আমার নায়কদের দৃঢ় প্রতিযোগিতা, যারা সব সময়েই জেতে, সবার ওপরে থাকে, তা সে ফলাফল যতই অসম্ভব হোক না কেন। কাজেই স্কুলে ক্লাসে যেমন আমরা হাত তুলতাম এটা প্রমাণ করবার জন্য যে, আমরা অন্য ছেলেদের মতো গাধা নই, তেমনি আমি এবং দাদা পরস্পরকে হারানোর এবং পিষে ফেলার জন্য সব কিছু দিতে পারতাম, নিজেদের বুকের ভেতরের অন্ধকার কোণায় যে ভয় লুকোনো থাকত, ইস্তাম্বুলের লজ্জাজনক অদৃষ্টের অংশীদার হবার যে নিরানন্দ বিষণ্নতা, সেই ভয়কে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য। ইস্তাম্বুলীরা অনুভব করে যে, তাদের অদৃষ্ট শহরের অদৃষ্টের সাথে জড়িয়ে আছে এবং তাই যখন তারা একটু বয়স্ক হয়, তখন তারা এই বিষণ্নতার আবরণকে স্বাগত জানায় কারণ সেটা তাদের জীবনে পরিতৃপ্তি এনে দেয়, একটা আবেগের গভীরতা এনে দেয় এবং সেটা প্রায় সুখের মতোই মনে হয়। সেটা না হওয়া পর্যন্ত, তারা তাদের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে।

আমার দাদা স্কুলে আমার চাইতে ভালো ছাত্র ছিল। ও সকলের ঠিকানা জানত, ওর মাথার মধ্যে একটা গোপন সুরের মতো, অঙ্কের রাশি, টেলিফোন নম্বর, অঙ্কের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফর্মুলা সব ধরে রাখতে পারত (যখনই আমরা এক সঙ্গে বাইরে যেতাম, আমি সময় কাটাতাম, দোকানের জানালায়, আকাশে তাকিয়ে, বা যা কিছু চোখে ভালো লাগত, তা দেখে এবং দাদা তাকাত রাস্তার নম্বরগুলোর দিকে, অ্যাপার্টমেন্টগুলোর নামের দিকে); ও ভালোবাসত, ফুটবলের নিয়মকানুনগুলো আবৃত্তি করতে, ম্যাচের ফলাফল, রাজধানীগুলোর নাম, খেলার পরিসংখ্যান এইসব বলতে, যেমন এখন চল্লিশ বছর পরেও, ও ভালোবাসে নিজের শিক্ষকতার জগতের সতীর্থ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কী কী অসম্পূর্ণতা আছে, সেগুলো একের পর এক বলে যেতে এবং উল্লেখযোগ্যদের সূচিতে তাদের নামের পাশে কত কম লেখা আছে, সেটা বলতে। ছবি আঁকায় আমার আগ্রহ এসেছিল খানিকটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে একা সময় কাটানোর ইচ্ছা থেকে, আর খানিকটা ছিল যেহেতু দাদার ছবি আঁকায় কোনো আগ্রহ ছিল না বলে।

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি আঁকার পরেও, আমি যে সুখ খুঁজছিলাম, সেটা যদি না পেতাম এবং যখন মোটা মোটা পর্দা ঢাকা, আসবাবপত্রে ঠাসা ঘরের অন্ধকার আমার মনের মধ্যেও ঢুকে যেত, তখন অন্যান্য ইস্তাম্বুলীদের মতো আমিও জয় হাসিল করবার একটা দ্রুত পথ খুঁজতাম আর একটা প্রতিযোগিতায় নামতাম, যেটা আমার জয়ী হওয়াটা সম্ভব করলেও করতে পারে; সেই মুহূর্তে যে খেলাটায় আমাদের দুজনেরই সর্বাধিক উৎসাহ সেটা মার্বেল ম্যাচ, দাবা, বুদ্ধির খেলা, যাই হোক না কেন, আমি দাদাকে সেই খেলাটা খেলবার জন্য প্ররোচিত করতাম।

দাদা বই থেকে মাথা তুলে বলত, ‘তোর হারবার জন্যে পিঠ চুলকোচ্ছে, না?’ দাদা খেলাটার কথাই বলত, যেটায় আমি অনেকবার হেরেছি, তারপরের মারপিটের কথা নয়। ‘হেরো পালোয়ান লড়াই করতে ক্লান্ত হয় না।’ দাদা বলত, ‘আর এক ঘণ্টা কাজ করব, তারপর খেলব।’ দাদা আবার বইয়ে মন দিত।

ওর পড়ার টেবিলটা ছিল ঝকঝকে পরিষ্কার, গোছানো, আর আমারটা ছিল এমন অগোছালো যেন ওখানে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে।

আমাদের প্রথম দিককার লড়াইগুলো যদি আমাদের দুনিয়াদারীর রাস্তা দেখিয়ে থাকে, পরবর্তী ঝগড়াগুলো কিন্তু সে তুলনায় খুবই ক্ষতিকর। এক সময়ে আমরা ছিলাম দু'ভাই, মা-য়ের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখের সামনে বড় হচ্ছিলাম, সব সময় মা-য়ের ধমকধামক খেতাম। মা চেষ্টা করছিলেন বাবার শূন্যস্থানটা পূর্ণ করতে, কারণ বাবা তো বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে থাকতেন না। মা আশা করতেন যে, যদি তিনি এই শূন্যস্থানটা অস্বীকার করতে পারেন, তাহলে হয়তো কোনো রকমে শহরের বিষণ্ণতাকে বাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া থেকে আটকে রাখতে পারবেন। কিন্তু এখন আমরা দুজন অবিবাহিত ছেলের মতো ব্যবহার করতে শুরু করলাম, প্রত্যেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিজের নিজের জায়গা কায়েম করতে। এত বছর ধরে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে আমরা যে সমস্ত নিয়ম কানুন চালু করেছিলাম সেগুলো, যেমন– আলমারির কোন জায়গাটা কার, কোন বইটা কার, কে গাড়িতে বাবার পাশে বসবে এবং কতক্ষণ বসবে, রাত্রে শোবার সময় কে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করবে, কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাঘরের আলো নেভাবে এবং যখন হিস্ট্রি পত্রিকার শেষ সংখ্যাটা আসবে তখন কে প্রথমে ওটা পড়বে– এমনকি সব ঠিক করে রাখা আদব-কায়দাগুলো পর্যন্ত আমাদের তর্কাতর্কি, অপমান, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং শাসানির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। একটা মাত্র অধৈর্য মন্তব্য যেমন 'ওটা আমার, হাত দিবি না', বা 'সাবধান, কপালে দুঃখ আছে'– একটা লড়াই-এ, হাত মুচড়িয়ে দেওয়াতে, ঘুষি মারাতে, মারধোর করাতে, হিংসাতে, পর্যবসিত হত। আত্মরক্ষার জন্যে, আমি হাতের কাছে যা পেতাম, কাঠের হ্যাঙ্গার, আগুন খোঁচানোর চিমটে, ঝাঁটা, তুলে নিয়ে তলোয়ারের মতো ব্যবহার করতাম।

AMARBOI.COM

এক সময়ে আমরা বাস্তবে যেমন খেলা দেখতাম (যেমন ফুটবল ম্যাচ), মার্বলগুলো দিয়ে তেমনি খেলা নকল করতাম; গর্ব ও সম্মানের প্রশ্ন এলে আমরা লড়াই করে ওসবের মীমাংসা করতাম ঠিকই, কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য ছিল খেলা। আর এখন আমরা ওসব অজুহাত ছুড়ে ফেলে দিয়ে গর্ব ও সম্মানের প্রশ্নে বাস্তব জীবনের মতো সোজাসুজি লড়াই-এ নেমে পড়ি। আমরা পরস্পরের দুর্বলতাগুলো জানি এবং সেগুলোর সুযোগ নেওয়া শুরু করি। এক কথায় আমাদের লড়াইগুলো এখন আর রাগ থেকে উৎপন্ন হওয়া এবং হিংসায় শেষ হওয়া লড়াই নয়, এখন ওগুলো ঠান্ডা মাথার পরিকল্পিত আক্রমণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার যখন দাদা আমার হাতে মার খেয়েছিল, দাদা বলেছিল, 'আজ রাতে, বাবারা সিনেমায় গেলে, তোকে মেরে শেষ করে দেব।' সেদিন রাতে খাবার টেবিলে বাবা-মাকে খুব বলেছিলাম সিনেমায় না যেতে, দাদা যে আমাকে মারবে বলে শাসিয়েছে, তাও বলেছিলাম, বাবা-মা আমার কথা শোনেননি, সিনেমায় চলে গিয়েছিলেন, অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরা দুই যুযুধান ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়ার সুষ্ঠু সমাধান করে দিয়েছেন।

কখনো, যখন আমরা দুজন বাড়িতে একা– তখন প্রচণ্ড লড়াই-এ দুজনেই সর্বশক্তি দিয়ে লড়তাম, সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে– এমন সময় দরজার ঘন্টি বাজত,– আমরা দুজন যেন স্বামী-স্ত্রী, ঝগড়ার সময় প্রতিবেশীদের হাতে ধরা পড়ে গেছি, এমনি ভাবে আমাদের জ্বোরো উন্মাদনা স্থগিত রেখে সেই প্রতিবেশী, অবাঞ্ছিত অতিথিকে ঘরে ঢোকাতাম, যথাবিহিত ভদ্রতার বুলি আওড়াতাম, 'দয়া করে ভেতরে আসুন, দয়া করে বসুন', নিজেদের মধ্যে চোখ মারামারি করতাম, মুখে হাসি, আর বলতাম, মা শিগগিরই ফিরে আসবেন। তারপর আবার যখন একা হতাম, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার লড়াই শুরু করতাম না, বরং এমন ভাব করতাম যেন কিছুই হয়নি, আর নিজের নিজের কাজে মন দিতাম। কখনো কখনো খুব বেশি মার খেলে আমি কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়তাম। দাদার মানবতা বা সদ্‌বুদ্ধি আমার চেয়ে মোটেই কম নয়, তাই নিজের টেবিলে খানিকক্ষণ কাজ করার পর আমার জন্যে ওর কষ্ট হত; তারপর আমাকে জাগিয়ে দিয়ে জামা-প্যান্ট পালটে বিছানায় শুতে যেতে বলত। তারপর ও যখন আবার ওর টেবিলে ফিরে যেত, আমি উঠে, জামা প্যান্ট না পালটেই বিছানায় শুয়ে পড়তাম আর অন্ধকারে নিজের ওপর করুণায়, লজ্জায় কাঁদতে থাকতাম।

যে বিষণ্নতার জন্য আমি উসখুস করতাম এবং পরে পেয়েও ছিলাম, সেই মনোবৃত্তি, যা আমাকে, পরাজয়, বিলুপ্তি আর অবমাননার কথা বলত– সেই বিষণ্নতাই আমাকে,– শিক্ষনীয় সমস্ত নিয়ম-কানুন থেকে, সমাধান করতে হবে এমন সব গাণিতিক সমস্যা থেকে, মুখস্থ করতে হবে এমন সব 'কার্লোউইচ চুক্তি'র ধারাগুলো থেকে মুক্তি দিয়েছিল। পরাজিত ও অপমানিত হওয়ার অর্থ নিজেকে মুক্ত ভাবা। এমন সময় আসত, যখন আমি মার খেতে চাইতাম, যেটা আমার দাদা বুঝতে পেরে বলত, 'আমার গা চুলকোচ্ছে মার খাবার জন্য।' কখনো দাদা এটা বুঝত বলে, আর ও আমার চেয়ে বেশি চালাক আর গায়ে বেশি জোর বলে, আমি মারামারি করতে চাইতাম আমার সারা শক্তি দিয়ে এবং ফলে, মার খেতাম।

প্রত্যেকবার মার খাওয়ার পর বিছানায় একা শুয়ে আমার মনের মধ্যে একটা অন্ধকার অনুভূতি নেমে আসত আর নিজেকে অপদার্থ, দোষী ও আল্‌সে বলে গাল দিতাম। আমার মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠত, 'কী হয়েছে?' আমি বলতাম, 'আমি বাজে ছেলে।' এক মুহূর্তেই আমার এই উত্তর আমাকে একটা ঘোর লাগা স্বাধীনতা দিত; আমার সামনে এক উজ্জ্বল নতুন জগৎ খুলে যেত। আমি যদি যতটা সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজে ছেলে হয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি যা খুশি তাই আঁকতে পারি, স্কুলের কাজ ভুলে যেতে পারি, জামা প্যান্ট পরেই বিছানায় শুতে পারি। একই সঙ্গে, আমার হার হলে হাত-পায়ের আঘাতগুলো থেকে, ফাটা ঠোঁট থেকে, রক্তাক্ত নাক থেকে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি লাভ করতাম: আমার মার খাওয়া শরীরটা প্রমাণ করত যে, আমি ভালো করে লড়তেও পারি না, যে আমার হেরে যাওয়া, অপমানিত হওয়া, পিষে যাওয়াটাই আমার পক্ষে উপযুক্ত। এই সব চিন্তা যখন আমার মাথায় ঘুরত, বোধহয় তখনই আমার মাথার মধ্যে গ্রীষ্মকালীন হাওয়ার মতো উজ্জ্বল দিবাস্বপ্নগুলো বয়ে যেত আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভাবতাম যে, একদিন আমি বড় কিছু একটা করব। যে হিংসা এবং আহত অহংকার থেকে এই স্বপ্নগুলোর উৎপত্তি, তার একটা ক্ষমতা ছিল এগুলোকে দমিয়ে দেওয়ার। যে দ্বিতীয় জগৎটা আমার সামনে উদ্ভাসিত, আমাকে নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তা সম্ভব হয়েছে, আমি যে মারধোর খেয়েছি তার জন্য এবং তাই আমার সব কল্পনাকে আরো উজ্জীবিত, আরো বাস্তব করে তুলছে। যখন আমি অনুভব করতাম, শহরের বিষণ্ণতা 'হুজুন' আমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে, সেই সময় হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম যে, এই রকম সময়ে যখন আমি কাগজের ওপর পেন্সিল চালাই, তখন যা বেরিয়ে আসে, সেটা আমার দারুণ ভালো লাগে; এই সময়ে যখন আমি পৃথিবীটাকে ভুলে যেতাম এবং আমার বিষণ্ণতাকে নিয়ে খেলা করতাম, তখন তার সকল অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩.

একটি বিদেশী স্কুলে একজন বিদেশী

প্রিপারেটরি স্কুলে ইংরাজি শিখতে আমি যে এক বছর কাটিয়েছিলাম, সেটা ধরলে আমি রবার্ট অ্যাকাদেমিতে মোট চার বছর কাটিয়েছি। এই সময়েই আমার শিশুকাল শেষ হয় এবং আমি আবিষ্কার করি যে, পৃথিবীটা বড়ই গোলমেলে, দুরধিগম্য এবং হতাশাজনকভাবে সীমাহীন, যা আমি আগে কখনো ভাবিনি। আমি আমার সমস্ত শিশুকাল কাটিয়েছি একটা বাড়ির ভেতর একটা ছোট ঠাসবুনোট পরিবারে, একটা রাস্তায়, একটা পাড়ায়, যেটা আমার কাছে ছিল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। বড় স্কুল শুরু করার আগে পর্যন্ত আমার যা শিক্ষা ছিল, তাতে এই বুঝতাম যে, আমার ব্যক্তিগত এবং ভৌগোলিক বিশ্বের কেন্দ্রস্থল এই শহর বাকি পৃথিবীর মান ঠিক করে দেয়। এখন বড় স্কুলে এসে আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি মোটেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে বাস করি না এবং যে জায়গায় আমি বাস করি, খুব যন্ত্রণাময় কথাটা, সেটা মোটেই পৃথিবীকে আলো দেখায় না। পৃথিবীতে আমার বসবাসের জায়গার ভঙ্গুরতা এবং পৃথিবীর বিশালতা আবিষ্কার করবার পর (আমেরিকান ধর্মনিরপেক্ষ প্রটেস্ট্যান্টরা, এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং লাইব্রেরিটা তৈরি করিয়েছিল, সেই লাইব্রেরির নীচু ছাদের গলিঘুঁজিতে হারিয়ে যেতে আমার ভালো লাগত, পুরোনো কাগজের সোঁদা সোঁদা গন্ধ শুঁকতাম) আমি আগের চেয়ে আরো বেশি একা ও দুর্বল বোধ করতাম।

একটা ব্যাপার ছিল এই যে, আমার দাদা কিন্তু আর এখানে থাকত না। আমার যখন ষোল বছর বয়েস, তখন দাদা আমেরিকায় চলে যায়, ইয়েলে পড়াশুনো করতে। আমরা সব সময় লড়াই করতাম ঠিকই, কিন্তু আমরা পরস্পরের আত্মার আত্মীয় ছিলাম– আমাদের চারপাশের পৃথিবীর সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতাম, বিচার বিশ্লেষণ করতাম, ভালোমন্দ বিচার করে রায় দিতাম– এবং আমার দাদার সাথে আমার বন্ধনটা, মা বা বাবার সাথে বন্ধনের চাইতেও জোরালো ছিল। দিনরাতের মারপিট, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে, যদিও এগুলো আমার কল্পনা শক্তিকে এবং আল্‌সেমিকে বাড়িয়ে তুলত, আমার অভিযোগ করার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু তবুও যখন আমার ওপর বিষণ্ণতা নেমে আসত, আমি ওর সাহচর্যের খুব অভাব বোধ করতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হত, আমার ভেতরে কোনো কেন্দ্রস্থল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মাথায় কিছুতেই এটা আসত না, যে এই কেন্দ্রস্থলটি কোথায়। আমি যে আমার রোজকার লেখাপড়ায়, হোম-ওয়ার্কে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারতাম না, তার কারণ বোধহয় এটাই। কখনো কখনো আমার বুক ভেঙে যেত, যে, বিশেষ ভাবে চেষ্টা না করলে আমি ক্লাসে সবচেয়ে ওপরে থাকতে পারতাম না, আবার এটাও হয়েছিল যে, কোনো কিছুতেই আমি যেন ভেঙে পড়ার ক্ষমতা বা বেশি আনন্দ পাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার শিশুকালে আমি নিজেকে সুখী ভাবতাম, জীবনটাকে ভাবতাম ভেলভেটের মতো নরম আর রূপকথার গল্পের মতো মজাদার। আমার তেরো কি চোদ্দ বছর বয়স হতে হতে এই গল্প ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সময়ে সময়ে আমি এক আধটা টুকরোতে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম; তখন প্রতিজ্ঞা করতাম যে, এতে আমি মনপ্রাণ সমর্পন করব, কিন্তু আবার আমি এর থেকে সরে যেতাম– যেমন প্রত্যেক বছর স্কুল শুরু হবার সময়, আমি স্থির করতাম যে আমাকে ক্লাসে প্রথম হতেই হবে, কিন্তু সেটা হত না। কখনো মনে হত, পৃথিবীটা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; এই বোধটা তখনই হত যখন আমার গায়ের চামড়া, আমার মন, আমার বুদ্ধি অত্যন্ত সজাগ থাকত।

এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল অনন্ত যৌন কল্পনা, দ্বিতীয় জগতের স্মরণিকা, যেখানে আমি সব সময় আশ্রয় নিতে পারতাম। আমি জানতাম যৌনতা এমন একটা জিনিস, যা অন্য কারো সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না, বরং ওটা নিজেরই সৃষ্ট একটা স্বপ্ন মাত্র। যখন আমি পড়তে শিখছিলাম, তখন মাথার মধ্যে একটা যন্ত্র ছিল, যেটা আমাকে প্রত্যেকটা অক্ষর বলে দিত, তেমনি এটাও একটা নতুন যন্ত্র যেটা একটা যৌন স্বপ্ন বার করে আনত, বা একটা ক্ষণস্থায়ী পুলক, যা যে কোনো জিনিস থেকেই পাওয়া যেত এবং বহু রঙে রঞ্জিত একটা গা-গরম করা দৃশ্য, একেবারে নিখুঁত পরিষ্কার দেখতে পেতাম। কিছুই পবিত্র নয়, গোপন নয়, যন্ত্রটা আমি যাদের জানতাম, তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কাজ করত, খবরের কাগজে, পত্রিকায় যত ছবি দেখতাম, সব এবং যখন সে সব কেটে ছেঁটে দরকারী খুঁটিনাটিগুলো একটা যৌন কল্পনার জগতে এনে ফেলত, আমি নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিতাম।

পরে যখন অপরাধবোধে জর্জরিত হতাম, তখন আমার পুরোনো মিড্‌ল স্কুলের দুই সহপাঠীর সঙ্গে কথাবার্তাগুলো মনে পড়ত। একজন ছিল খুব মোটা, আরেকজন ছিল তোতলা। অনেক কষ্টে কথা খুঁজে তোতলা আমাকে জিজ্ঞেস করত, 'তুই কখনো করেছিস?' হ্যাঁ, আমি মিড্‌ল স্কুলে ইতিমধ্যেই এটা করতাম, কিন্তু আমার লজ্জা ছিল এত বেশি যে, আমি অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে একটা উত্তর দিতাম, যেটা হ্যাঁ-ও হতে পারত, কিংবা না-ও হতে পারত। 'ওঃ, এসব করবি না, কখনো না।' তোতলা জোরে জোরে বলত, ওর মুখ লাল হয়ে যেত এটা ভেবে যে, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো একজন বুদ্ধিমান, ঠান্ডা, পরিশ্রমী ছেলে এত নীচে নামতে পারে। 'হস্তমৈথুন একটা খারাপ অভ্যাস, একবার শুরু করলে, কখনো থামা যায় না।' এই সময়ে আমার মনে পড়ে, আমাদের মোটা বন্ধুটা আমার দিকে বিষণ্ণ ব্যথিত ভাবে তাকিয়ে আছে– যদিও ও-ও আমাকে ফিসফিস করে হস্তমৈথুন ছাড়তে বলছে (অথবা 'একত্রিশ', আমাদের মধ্যে এই কথাটারই চল ছিল) কারণ সে-ও এই অভ্যাসে পরিণত হওয়ার নেশাটা আবিষ্কার করেছে। ও এখন বিশ্বাস করে যে, ও নরকের পাপী, যেমন ও জানে যে, ও মোটাই থাকবে, কাজেই ওর মুখের ভাবটা এমন যেন ও ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করেছে।

এই বছরগুলোর স্মৃতির সঙ্গে আরো কিছু মিশে আছে, যা আমার মধ্যে একই অপরাধবোধ ও একাকীত্বের জন্ম দেয় এবং যেটা আমি স্থাপত্য পড়ার জন্য টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও করতে থাকি। কিন্তু এটা নতুন কোনো অভ্যাস নয়; আমি প্রাথমিক স্কুলে থাকতেই ক্লাশ ফাঁকি দিতাম।

প্রথম দিকে এটা হত একঘেয়েমির থেকে, বা কোনো কল্পিত ত্রুটি যা অন্য কারো নজরে আসেনি, তার লজ্জা থেকে, অথবা একটা অতি সাধারণ বোধ থেকে যে, আমি যদি সেদিন স্কুলে যাই, আমাকে অনেক কিছু করতে হবে। যে কারণগুলো আমি খুঁজে বার করতাম, স্কুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। বাবা মার মধ্যে কোনো তর্কাতর্কি, খাঁটি আলসেমি বা দায়িত্ববোধহীনতা, কোনো অসুস্থতা, যখন আমাকে একেবারে বাচ্চার মতো শুইয়ে রাখা হত। একটা কবিতা, যা মুখস্থ করতে হবে, একজন সহপাঠী আমাকে মারবে, সেই সম্ভাবনা এবং (স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) আমার গভীর একঘেয়েমি, আমার বিষণ্ণতা, আমার অস্তিত্বের বিপন্নতা– এগুলোও অজুহাত হিসাবে কাজ করত। কখনো কখনো আমি স্কুলে যেতাম না, কারণ আমি ছিলাম বাড়ির আদুরে ছেলে, কারণ– যখন আমার দাদা একা স্কুলে যেত,– আমার নিজের ঘরের নির্জনতায় আমি যা কিছু করতাম, তা ভালোভাবে করতাম, তাছাড়া আমি বহুদিন থেকেই জানতাম যে, আমি দাদার মতো ভালো ছাত্র হতে পারব না। কিন্তু এসবের চাইতেও গভীরে আরো কিছু ছিল এবং সেটাও ওই একই উৎস থেকে উৎপন্ন যেখান থেকে বিষণ্ণতার উৎপত্তি।

আমার বাবা তাঁর বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছিলেন, তা যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন আমার বাবা জেনেভাতে একটা কাজ পেয়ে যান। সে বছরের শীতকালে তিনি মাকে নিয়ে জেনেভাতে চলে যান, আমাদের রেখে যান দাদীমার তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর মেরুদন্ডহীন তত্ত্বাবধানের সময়ই আমি স্কুল পালানো শুরু করি। আমার তখন বয়স আট বছর; প্রতিদিন সকালে ইসমাইল এফেন্দি আমাদের স্কুলে নিয়ে যাবার জন্য ঘন্টি বাজাত, আমার দাদা তার বই-এর ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ত, আর আমি দেরি করার জন্য কিছু একটা অজুহাত দিতাম; যেমন আমার ব্যাগ এখনো গোছানো হয়নি, কী যেন ভুলে গিয়েছিলাম, তা এইমাত্র মনে পড়ল, (দাদীমা কি আমাকে একটা লিরা দেবেন?) এবং আমার পেট ব্যথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

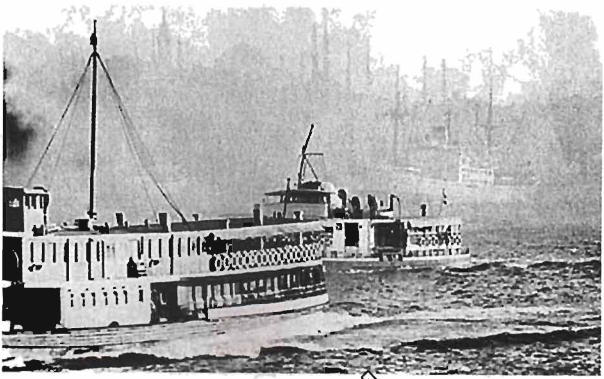

করছে, জুতো ভিজে, জামা পাল্টাতে হবে। দেদা পুরো ব্যাপারটা জানত যে আমি কী করতে যাচ্ছি এবং নিজে স্কুলে লেট হবে না বলে, বলত, 'ইসমাইল, চল আমরা যাই। তুমি পরে এসে ওরহানকে নিয়ে যেও।'

বাড়ি থেকে আমাদের স্কুল ছিল চার মিনিটের হাঁটা পথ। ইসমাইল দাদাকে স্কুলে ছেড়ে দিয়ে যখন আমাকে নিতে বাড়ি আসত, ততক্ষণে ক্লাস শুরু হতে চলেছে। আমি আরো দেরি করতাম, কিছু খুঁজে পাচ্ছি না বলে অন্য কাউকে দায়ী করতাম, ভান করতাম যে আমার দারুণ পেটব্যথা হচ্ছে, তাই ইসমাইলের ঘন্টি বাজানো শুনতে পাইনি। এতক্ষণে, এত মিথ্যা কথা বলার দরুণ আর ওই জোর করে গেলানো প্রায় ফুটন্ত বাজে দুধটা খাওয়ার দরুন আমার সত্যি সত্যিই একটু একটু পেট ব্যথা শুরু হয়ে যেত। আর কিছুক্ষণ পরেই আমার দাদীমার মন নরম হয়ে যেত, আর বলতেন, 'ঠিক আছে ইসমাইল, অনেক দেরি হয়ে গেছে, স্কুলের ঘন্টা মনে হয় অনেকক্ষণ আগে বেজে গেছে। যাক আজ ও বাড়িতেই থাক।' তারপর ভুরু তুলে আমার দিকে ফিরে বলতেন, 'শোন, কাল কিন্তু স্কুলে যেতেই হবে, বুঝতে পারছ? যদি না যাও, তাহলে কিন্তু পুলিশ ডাকব। আমি তোমার বাবা-মাকে চিঠি লিখছি।'

অনেক বছর পরে যখন আমি উঁচু স্কুলে, আর আমার গতিবিধি নজর করবার কেউ নেই, তখন স্কুল পালানো খুব মজার ছিল। শহরের পথে পথে ঘোরার সময় প্রতিটি পদক্ষেপে আমার অপরাধের জন্য মূল্য দিতে হত বলে, আমার অভিজ্ঞতার ভালোভাবে কদর করতে পারতাম এবং এমন সব জিনিস দেখতে পেতাম, যা একটা সত্যিকারের উদ্দেশ্যহীন আলসে ভবঘুরেই লক্ষ্য করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে; ওপাশে ওই মেয়ে লোকটা একটা চওড়া, কোনাচে টুপি পরে আছে, একটা ভিখারির পোড়া মুখ, যা আমি প্রতিদিনই ওর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় খেয়াল করিনি, নাপিত আর তার সহকারীদের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়া, রাস্তার ওপাশে অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটার দেওয়ালে মারমালেড-এর বিজ্ঞাপনের মেয়েটা, টাকসিম স্কোয়ার-এর ঘড়িটার নড়াচড়া, যে ঘড়িটার আকৃতি একটা পিগি ব্যাঙ্ক-এর মতো, আর আমার একদম চোখেই পড়ত না, যদি না পাশ দিয়ে যাবার সময় ওটা সারানো হচ্ছিল বলে,– ফাঁকা হ্যামবার্গার-এর দোকানগুলো, সিহাঙ্গির-এর পেছনের রাস্তার তালা সারাইওয়ালা, কাবারিওয়ালা, আসবাবপত্র সারাই-এর ছুতোর মিস্ত্রি, মুদি দোকানগুলো, টিকিট বিক্রেতা, গানের দোকান, পুরোনো বই-এর দোকান, সিল তৈরি করনেওয়ালা, উক্সেক্কালডিরাম-এর টাইপরাইটারের দোকান– সবকিছুই এত বাস্তব এবং সুন্দর, এত আকর্ষণীয়, যেমন ছিল আমার ছেলেবেলায়, যখন আমি মায়ের সঙ্গে এই সব রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। রাস্তাগুলো ভরা থাকত, 'সিমিট' বিক্রি করা, ভাজা মাসেলস, পিলাফ, চেস্টনাট, গ্রীল করা মাংসের বল, মাছের পুর দেওয়া পাঁউরুটি, ডাফবল্স, আয়রান (একটা দই-এর সরবৎ), অন্য সরবৎ ইত্যাদির ফেরিওয়ালাতে এবং আমার যা মন চাইত, তাই কিনতাম। রাস্তার এক কোণায় দাঁড়াতাম, হাতে থাকত সোডার বোতল, এক দঙ্গল ছেলে ফুটবল খেলছে, দেখতাম (ওরা-ও কি আমার মতো স্কুল পালিয়েছে, নাকি আদৌ স্কুলেই যায় না?), এমন একটা গলি দিয়ে হাঁটতাম, যে পথে আগে কোনোদিন আসিনি আর নিজেকে খুব সুখী মনে হত; কোনো কোনো সময়ে হাতের ঘড়িতে চোখ চলে যেত, আর ভাবতাম, এই মুহূর্তে স্কুলে কী হচ্ছে, আর আমার অপরাধ আমার বিষণ্ণতাকে আরো বাড়িয়ে তুলত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঁচু স্কুলের বছরগুলোতে, আমি বেবেক এবং ওর্তাকোয়-এর পেছন রাস্তাগুলো, রুমেলিহিসারির চারপাশের পাহাড়গুলো এবং রুমেলিহিসারি, এমিরগ্যান ও ইস্তিনিয়ে-র ফেরীঘাটগুলো, যেগুলো তখনো ব্যবহার হত এবং মেছুড়েদের কফি হাউস আর চারপাশের দাঁড় টানা নৌকোগুলোর নোঙর করার ঘাটগুলো, এই সব জায়গায় ঘুরতাম আর খুঁজে বেড়াতাম; ফেরীতে উঠে, যত জায়গায় ফেরীগুলো যায়, সব জায়গায় যেতাম, বসফোরাসের ওপর অন্য শহরগুলোতেও যেতাম আর ফেরীতে যত আরামের উপকরণ পাওয়া যেত, সব উপভোগ করতাম,– বয়স্কা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিলারা তাদের বাড়ির জানালায় বসে ঢুলছে, সুখী বিড়ালগুলো, এবং সেই সব পেছনের রাস্তাগুলো, যেখানে তখনো পুরোনো গ্রিকদের বাড়ি দেখা যেত, যার দরজা সকালেও তালা দেওয়া থাকত না।

অপরাধ করে ফেলার পর আবার আমি প্রায়ই ঠিক করতাম যে, এবার থেকে আমি সোজা পথে চলব আর ভালো হব; ভালো ছাত্র হব, নিয়মিত ছবি আঁকব, আমেরিকায় যাব, আর্ট নিয়ে পড়াশুনো করব, আমার আমেরিকান শিক্ষকদের পেছনে লাগা বন্ধ করে দেব, তারা সব সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, এক একজন হাস্যকর জীবে পরিণত হয়েছে, আমার কুঁড়ে, বদমায়েসি বুদ্ধিওয়ালা তুর্কী শিক্ষকদের আমাকে বিরক্ত করার জন্য আর বিরক্ত করব না। কিছু দিনের মধ্যেই আমার অপরাধ আমাকে একজন গোঁড়া আদর্শবাদীতে পরিণত করত। সেই সময়ে বয়স্কদের মধ্যে যে অন্যায়গুলো সাধারণ ছিল– যে অন্যায়গুলো আমি একদম ক্ষমা করতে পারতাম না সেগুলো হল অসাধুতা এবং আন্তরিকতার অভাব। যেভাবে তারা পরস্পরের ভালো থাকা নিয়ে প্রশ্ন করত, তা থেকে, তারা ছাত্রদের যেভাবে শাসানি দিত সে পর্যন্ত, তাদের বাজার-দোকানে কেনাকাটা করার অভ্যাস থেকে তাদের রাজনৈতিক বোলচালগুলো পর্যন্ত, মনে হত তাদের জীবনের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যেই দ্বিমুখীতা, দ্বি-চারিতা, আর তারা যে সব সময়েই বলত 'জীবনের অভিজ্ঞতা', যা নাকি আমার নেই, সেটা আমার মনে হত, একটা বয়সের পরে, কোনো রকম চেষ্টা ছাড়াই, ভন্ডামি এবং নিজের কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং তার পরে চুপ করে বসে পড়ে নির্দোষ সাজার কায়দা। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমিও অনেক ছল-চাতুরি করেছি, লোক বুঝে গল্প বলেছি, পাল্টেছি, প্রচুর মিথ্যা কথা বলেছি, কিন্তু পরে আমার এত প্রচণ্ড অপরাধবোধ, মানসিক বিশৃঙ্খলা এবং সবাই জেনে যাবে এই ভয় হয়েছে যে, এক সময় মনে হয়েছে, আমি আবার সুস্থ, স্বাভাবিক হতে পারব কি; এটা আমার মিথ্যাগুলোকে এবং ভানগুলোকে একটা পরিণতি দিয়েছে। তখন আমি ঠিক করেছি যে, আর মিথ্যা বলব না এবং ভণ্ড হওয়াও বন্ধ করে দেব– আমার বিবেক না বলছে বলে নয়, বা আমি যে ভেবেছি মিথ্যা কথা বলা এবং দ্বিমুখী হওয়াটা একই ব্যাপার, তার জন্যেও নয়, কারণ হচ্ছে আমার পাপকর্মের ফলে যে মানসিক বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়েছিল, তা আমাকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

এই যন্ত্রণাগুলো, গভীর যন্ত্রণাগুলো আমি কপটতা করার পরেই যে আসত, তা নয়– এগুলো যে কোনো সময় আমাকে আঘাত করত; হয়তো কোনো বন্ধুর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছি, কিংবা বিওগলুতে সিনেমার লাইনে একাই দাঁড়িয়ে আছি, একটু আগেই দেখা একটা সুন্দরী মেয়ের হাত ধরে, সেই রকম সময়ে। একটা মস্ত বড় চোখ কোত্থেকে যেন উদয় হয়ে আমার সামনে বাতাসে ভেসে থাকত এবং একটা গোপন ক্যামেরার মতো আমি যা কিছু করছি (সিনেমার বুথ-এ মেয়ে লোকটাকে টিকিটের টাকা দিচ্ছি, বা সুন্দরী মেয়েটার হাত ধরার পর কী বলব, মনে মনে তাই খুঁজছি) এবং যা কিছু তুচ্ছ, কপট বোকার মতো কথা বলছি ('ফ্রম রাশিয়া উইথ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ' সিনেমাটার জন্য মাঝখানের রো-য়ে একটা টিকিট', কিংবা 'তুমি কি এই প্রথম এ রকম কোনো পার্টিতে এলে?') সব নির্দয়ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখত। আমি যেন একই সঙ্গে কোনো ফিল্মের পরিচালক এবং অভিনেতা, আবার দূর থেকে যেন সব কিছু লক্ষ্য করছি। যখন এই রকম কোনো দৃশ্যে নিজেকে দেখতাম, আমি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ধরে রাখতে পারতাম, তারপরেই একটা গভীর এবং গোলমেলে মানসিক যন্ত্রণা আমাকে ছেয়ে ফেলত, আমার লজ্জা হত, ভয় পেতাম, আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম, কেউ আমাকে বিদেশী ভাবতে পারে ভেবে। যেন কেউ আমার আত্মাটাকে একটার পর একটা ভাঁজ করে করে এক টুকরো কাগজের মতো নিজের ওপর জড়িয়ে নিচ্ছে এবং আমার বিষণ্নতা যতই গভীর হত, আমি বুঝতে পারতাম যে, আমার ভেতরটা দুলতে শুরু করেছে।

যখন এরকম হত, তখন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। আমি শুয়ে পড়তাম আর নিজের ভণ্ডামি পর্যালোচনা করতাম, আমার লজ্জাজনক, তুচ্ছ, অসার উক্তিগুলো আবার আবৃত্তি করতাম, বার বার। কেবল কাগজ কলম জোগাড় করে লিখে কিংবা কোনো কিছু এঁকে আমি এই ফাঁসের বাইরে আসতে পারতাম এবং যদি কোনো রকমে কোনো ছবি আঁকতে পারতাম বা কিছু লিখতে পারতাম, তাহলে আমি 'স্বাভাবিক' অবস্থায় ফিরে আসতাম।

কখনো কখনো আমি কিছু বাজে কাজ না করলেও হঠাৎ মনে হত যে আমি একটা জালি লোক। কোনো দোকানের জানালায় নিজের চেহারার এক ঝলক চোখে পড়লে বা বিওগলুতে শহরের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা হ্যামবার্গার ও স্যান্ডউইচ-এর দোকানের এক কোণায় বসে, ফিল্ম দেখার পর একটা সসেজ স্যান্ডউইচ খেতে খেতে উল্টোদিকের দেওয়ালের আয়নায় নিজেকে দেখলে মনে হত আমার চেহারার প্রতিফলনটা বড় বাস্তব, অসহ্য রকমের স্থূল। এই মুহূর্তগুলো এমন বেদনাদায়ক যে মরে যেতে ইচ্ছে করত, কিন্তু তবুও মানসিক যন্ত্রণায় স্যান্ডউইচটা গোগ্রাসে খেয়ে যেতাম, লক্ষ্য করতাম, গোয়া-র দৈত্যের সঙ্গে আমার কত সাদৃশ্য, যে দৈত্য তার নিজের ছেলেকে খেয়েছিল। আয়নার প্রতিফলনটা আমার অপরাধ ও পাপের স্মারক, আমি যে একটা ঘৃণ্য ব্যাঙ, তারই স্বীকৃতি। এটা এ জন্য নয় যে, বিওগলু-র পেছনের রাস্তার বেআইনি বেশ্যা বাড়িগুলোর বসবার ঘরের দেওয়ালে একই রকম বড় বড় ফ্রেম-করা আয়না ঝোলানো থাকত; আমার নিজের ওপর বিরক্তি হত, কারণ আমার চারপাশের সব কিছু, আমার মাথার ওপরের ঝোলানো নগ্ন বাল্বটা, চটচটে দেওয়ালগুলো, যে কাউন্টারে বসে আছি, সেটা, কাফেটেরিয়ার দেওয়ালের অসুস্থ রঙ– এ রকম অবহেলা, এ রকম কুশ্রীতার কথা বলত। আর আমি জানতাম যে, কোনো সুখ, ভালোবাসা বা সাফল্য আমার জন্য অপেক্ষা করছে না। আমাকে একটা দীর্ঘ, বিরক্তিকর, সম্পূর্ণ অনুল্লেখনীয় জীবন কাটাতে হবে– একটা বিরাট সময়, যেটা ইতিমধ্যেই আমার চোখের সামনে মরে যাচ্ছে, আমি তাকে সহ্য করে যাচ্ছি, তাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপে, আমেরিকায় সুখী লোকেরা কেমন, একটু আগে আমার দেখা একটা হলিউড ফিল্মের মতো, সুন্দর, অর্থবহ জীবন কাটায়; বাকি পৃথিবীতে, আমাকে ধরে, আমাদের সকলকে নোংরা, ভেঙে পড়া, বিশ্রিভাবে রঙ করা, ধ্বংসপ্রাপ্ত সস্তা জায়গাতে আমাদের জীবন কাটানোর জন্য ঠেলে দেওয়া হয়েছে; একটা গুরুত্বহীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর, অবহেলিত অস্তিত্ব আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন কিছু কখনো করতে পারব না, যা বাইরের পৃথিবীর লোকেরা দেখার উপযুক্ত মনে করবে; এই রকম অদৃষ্টের জন্যই আমি নিজেকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার সঙ্গে তৈরি করছি। কারণ ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে ধনী লোকেরা পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেদের মতো জীবন কাটাতে পারে, তা-ও অসহ্য হৃদয়হীনতা ও কৃত্রিমতার মূল্যে, সে জন্য আমি পেছনের রাস্তার বিষণ্নতা ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম; আমি শুক্রবার ও শনিবারের সন্ধ্যাগুলোয় এইসব রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়াতাম এবং সিনেমায় যেতাম।

এই একই সময়ে যখন আমি নিজের জগতে বাস করছিলাম, বই পড়তাম, কারো সঙ্গে ভাগ করতাম না, ছবি আঁকতাম, পেছনের রাস্তাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতাম– সেই সময় আমার কিছু বাজে বন্ধুও হয়েছিল। আমি এক 'সেট' ছেলেদের দলে যোগ দিয়েছিলাম, যাদের বাবারা ছিলেন বস্ত্র শিল্পে, খনি শিল্পে বা অন্য কোনো শিল্পে। এই বন্ধুরা তাদের বাবাদের মার্সিডিস গাড়ি চালিয়ে রবার্ট অ্যাকাডেমিতে আসত যেত আর ওরা যখন বেবেক এবং সিসলি-র মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেত, কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই গাড়ি আস্তে করে দিত, তারপর তাকে গাড়িতে উঠতে আমন্ত্রণ জানাতো আর যদি মেয়েটাকে 'তুলে নিতে' পারত, ওরা এই ভাবেই ব্যাপারটা বোঝাত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার সঙ্গে কী রকম যৌন সংসর্গ করবে, সেই দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করত। এই ছেলেগুলো ছিল বয়েসে আমার চেয়ে বড়, কিন্তু একদম মাথা-মোটা। ওরা সপ্তাহান্ত কাটাত মাকা, হারবিয়ে, নিশান্তাসি এবং টাকসিমে ঘুরে ঘুরে আর গাড়িতে আরো বেশি বেশি মেয়ে তুলতে; প্রত্যেক শীতকালে ওরা উলুডাগ-এ গিয়ে দিন দশেক স্কি করত, সঙ্গে থাকত বিদেশী বেসরকারি উঁচু স্কুলের ছাত্ররা এবং গ্রীষ্মকালে ওরা সেই সব মেয়েগুলোর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করত, যারা সুয়াদিয়ে এবং এরেনকয়-তে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাত। কখনো সখনো আমিও ওদের সঙ্গে শিকারে বেরোতাম এবং আমি রীতিমত ধাক্কা খেতাম, যখন দেখতাম কিছু কিছু মেয়ে আমাদের চাউনি দেখেই বলে দিতে পারত যে, আমরা ওদের মতোই, ক্ষতিকারক নই এবং তারপরেই নির্ভয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ত। একবার আমি যে গাড়িতে ছিলাম, তাতে দুটো মেয়ে উঠে পড়েছিল আর এমন ভান করছিল যেন রাস্তা দিয়ে যাওয়া কোনো অচেনা লোকের বিলাস বহুল সেডান গাড়িতে উঠে পড়াটা পৃথিবীর অতি সাধারণ ব্যাপার। আমি ওদের সঙ্গে যা মনে আসে তাই কথাবার্তা বললাম, তারপর সবাই এক সঙ্গে একটা ক্লাবে গিয়ে লেমনেড আর কোকাকোলা খেয়ে যে যার পথে চলে গেলাম। এই বন্ধুগুলো, যারা আমার মতো নিশান্তাসিতে বাস করত, এবং যাদের সঙ্গে আমি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

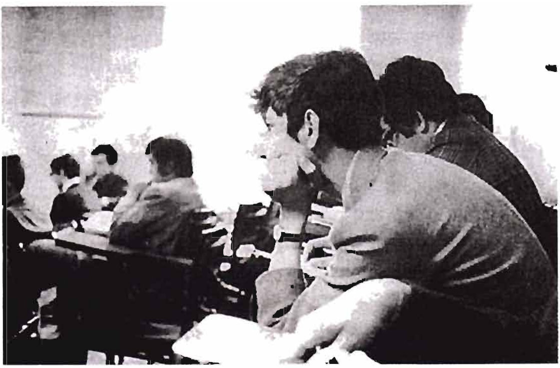

নিয়মিত পোকার খেলতাম, এরা ছাড়া আমার আরো কয়েকজন বন্ধু ছিল, যাদের সঙ্গে আমি কখনো কখনো দাবা, পিংপং খেলতাম, কিংবা আঁকা এবং অঙ্কন শিল্প নিয়ে আলোচনা করতাম। কিন্তু আমি কখনোই এদেরকে একজনকে আরেকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিইনি বা দেখা করিয়ে দিইনি।

এই সব বন্ধুদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি এক একজন আলাদা মানুষ, আলাদা রসবোধ, আলাদা কণ্ঠস্বর, আলাদা নৈতিকতার মান। কিন্তু আমি কখনোই বহুরূপী হতে চাইনি; কোনো চালাকি বা দুরভিসন্ধি ছিল না। বেশির ভাগ সময়েই আপনা থেকেই আমি পাল্টে যেতাম, যখন আমি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতাম এবং ওরা যা কিছু বলত, তা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠতাম। যত সহজে আমি ভালোর সঙ্গে ভালো, মন্দের সঙ্গে মন্দ এবং অদ্ভুত-এর সঙ্গে অদ্ভুত হয়ে যেতাম, তাতে আমার অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে যেমন দেখেছি, তেমন আনুগত্যহীনতা আমার হত না– যতদিনে আমি কুড়ি বছর বয়েসে পড়লাম, এটা আমার নৈরাশ্য থেকে আমাকে মুক্ত করেছিল। যখনই কোনো জিনিস আমাকে আগ্রহান্বিত করত, আমার একটা অংশ তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করত।

এই গভীর আগ্রহ কিন্তু আমাকে, মানুষকে এবং সব কিছুকে ব্যঙ্গ করার প্রবণতা থেকে আরোগ্য করতে পারেনি। রবার্ট অ্যাকাডেমিতে আমার সহপাঠীরা যখন শিক্ষকের পড়ানোর চাইতে আমার ফিসফিস করে বলা মশলাদার হাসির গল্পগুলোতে বেশি আগ্রহ দেখাত, ওতে আমি একজন ভালোগল্প বলিয়ে প্রমাণ হওয়াতে আনন্দ পেতাম। আমার হাসির গল্পগুলোতে, প্রধান আক্রমণ করতাম একঘেয়ে তুর্কী শিক্ষকদের, যাদের মধ্যে কেউ কেউ আমেরিকান স্কুলে পড়ানোর ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করতেন এবং ভয় পেতেন যে আমাদের মধ্যে যারা গুপ্তচর, তারা এঁদের সম্পর্কে আমেরিকানদের কাছে খবরাখবর দিচ্ছে। অন্য তুর্কী শিক্ষকরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লম্বা লম্বা জাতীয়তাবাদ সূচক ভাষণ দিতেন এবং যেহেতু আমেরিকানদের সঙ্গে তুলনায়, এঁরা ছিলেন উদাসীন, ক্লান্ত, বয়স্ক এবং বিষাদগ্রস্ত, তাই আমরা মনে করতাম এঁরা যেমন নিজেদের, বা জীবনকে পছন্দ করেন না, তেমনি আমাদেরও পছন্দ করেন না। বন্ধু-মনোভাবাপন্ন এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন আমেরিকান শিক্ষকদের মতো নয়, এঁদের প্রথম কাজই হত আমাদের পাঠ্যবই মুখস্থ করানো আর যদি না পারতাম, তাহলে শাস্তি দেওয়া এবং আমরা এদের এই চাকুরে মনোভাবের জন্য ঘৃণা করতাম।

আমেরিকানরা বেশির ভাগ ছিলেন কমবয়েসি, তুর্কী ছাত্রদের শিক্ষাদান করবার উৎসাহে আমাদের ভাবতেন নিরীহ, বড় বড় চোখ করে তাকানো গোবেচারা, যা আমরা মোটেই ছিলাম না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্ময়গুলো তাঁরা যে রকম প্রায় ধর্মীয় উন্মাদনায় বর্ণনা করতেন, তাতে আমাদের হাসিরও উদ্রেক হত আবার হতাশও হতাম। এদের কেউ কেউ তুরস্কে এসেছিলেন গরীব তৃতীয় বিশ্বের অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করবার সদিচ্ছা নিয়ে। বেশির ভাগই ছিলেন বামপন্থী, ১৯৪০-এর দশকে জন্ম এবং আমাদের ব্রেখট থেকে পড়ে শোনাতেন এবং শেকসপীয়রের মার্কসপন্থী বিশ্লেষণ বোঝাতেন। যখন তাঁরা আমাদের সাহিত্য পড়াতেন, তাঁরা প্রমাণ করতে চাইতেন যে, সমস্ত অমঙ্গলের উৎস হচ্ছে সেই সমাজ, যা ভালো লোকেদের দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু তারা ভুল পথ গ্রহণ করেছে বলে। একজন শিক্ষক, যিনি একজন ভাল লোকের, যে লোক সমাজের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছে, অদৃষ্ট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রায়ই একটা বাক্য ব্যবহার করতেন, 'ইউ আর পুশ্‌ড'; ক্লাসের কয়েকজন জোকার ছেলে খালি বলত, 'হ্যাঁ স্যার, ইউ আর পুশ্‌ড', আর শিক্ষক একেবারে জানতেনই না যে, একটা তুর্কী শব্দ একদম 'পুশ্‌ড' কথাটার মত শুনতে, কিন্তু মানেটা হচ্ছে সমকামী; যখন পুরো ক্লাস হি হি হা হা করত, আমরা তাঁকে কিন্তু অপমান করতাম না, কিন্তু আমাদের আমেরিকান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লুকোনো বিদ্বেষ আমাদের সকলের মধ্যেই ছিল। আমাদের ভীরু আমেরিকান বিরোধিতা, আমাদের সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী মনোভাবেরই পরিচায়ক এবং এতে স্কুলের উজ্জ্বল আনাতোলিয়ান বৃত্তি-ধারী ছেলেদের খুব দুশ্চিন্তা হত। তারা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়ে এই স্বতন্ত্র স্কুলে পড়বার অধিকার অর্জন করেছে এবং ওরা বেশির ভাগই দরিদ্র প্রাদেশিক পরিবার থেকে আসা উজ্জ্বল মেধাবী ও কঠোর পরিশ্রমী ছেলে এবং ওরা আমেরিকান সংস্কৃতি আর মুক্ত দেশের স্বপ্ন দেখে বড় হয়েছে– ওরা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবার আশা করে এবং হয়তো আমেরিকাতেই স্থায়ী বসবাস করতে চায়– ওরা ভিয়েতনামের যুদ্ধ নিয়ে শঙ্কিত এবং তাই বিদ্বেষ থেকে একেবারে মুক্ত নয় এবং মাঝে ম্যাঝেই ওদের মধ্যেও আমেরিকার বিরুদ্ধ ক্রোধ জেগে ওঠে। ইস্তাম্বুলের কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন উচ্চ মধ্যবিত্তরা এবং আমার বড় লোকের সন্তান বন্ধুরা এ সবে বিশেষ গা করত না; তাদের কাছে রবার্ট অ্যাকাডেমি হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদক্ষেপ, যে ভবিষ্যৎ তাদের, দেশের সবচেয়ে বড় বড় কোম্পানিগুলোর ম্যানেজার বা মালিক হিসেবে বা বড় বড় বিদেশি কোম্পানির তুর্কী এজেন্ট হিসেবে পাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি যে কী হব, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম না, তবে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম, আমি ইস্তাম্বুলেই থাকব আর স্থাপত্যবিদ্যা পড়ব। এটা আমারই ইচ্ছা ছিল, তাই নয়– আমার পরিবারও কিছুদিন আগে এই ব্যাপারে একমত হয়েছিল। যেহেতু আমার দাদাজী, বাবা ও চাচার মতো আমারও মাথা ভালো ছিল, তাই ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব, এটাই ঠিক ছিল, কিন্তু যেহেতু আমার

আঁকার দিকে প্রবল ঝোঁক ছিল, তাই এটাই স্থির করা হয়েছিল যে, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য বিদ্যা পড়াই আমার পক্ষে ঠিক হবে। ঠিক মনে পড়ে না, আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করতে কে প্রথম এই যুক্তিজাল খাড়া করেছিল, তবে যতদিনে আমি রবার্ট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়েছি, ততদিনে এটা একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল এবং আমিও এটাকে নিজের করে নিয়েছিলাম। এই শহর ছেড়ে যাবার কথা আমি কোনো সময়েই চিন্তা করিনি। এটা যে আমার বাসস্থানের প্রতি আমার দারুণ ভালোবাসার জন্য, তা মোটেই নয়, বরং এটা আমার অভ্যাস এবং বাড়ি ছাড়তে হবে এই মনোভাবের প্রতি ভেতরের একটা প্রচণ্ড অনাগ্রহ, যা আমাকে নতুন কিছু করবার ব্যাপারে অতিরিক্ত আলসে বানিয়ে দিয়েছে। আমি তখনই আবিষ্কার করেছিলাম যে, আমি এমন একটা লোক যে কিনা সব সময় একই কাপড়চোপড় পরে থাকতে পারি, একই খাবার খেয়ে যেতে পারি এবং একশ বছর একঘেয়েমির ক্লান্তিতে না ভুগে কাটাতে পারি, যদি আমার কল্পনার নিজস্বতায় আমি বন্য স্বপ্নে মগ্ন থাকতে পারি।

ওই সময়, আমার বাবা তুরস্কের অগ্রণী প্রপেন কোম্পানি 'আয়গাজ'-এর সর্বময় কর্তা ছিলেন, কাজেই মাঝে মাঝে তিনি বলতেন যে, তাঁকে কয়েকটা তেলের ডিপো বা তেল ভরার স্টেশন, যেগুলো আম্বার্লিতে তৈরি হচ্ছিল, সেগুলো পরিদর্শন করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইয়ুক্চেক্মেসে যেতে হয়। আমরা গাড়ি নিয়ে রবিবার সকালে সেখানে ঘুরতে যেতাম, অথবা বসফোরাসে চলে যেতাম, কিংবা কোনো কেনাকাটা করতে বা দাদীমাকে দেখতে চলে যেতাম– যে কারণই থাক না কেন, বাবা আমাকে গাড়িতে বসিয়ে (জার্মান ফোর্ড গাড়ি, ১৯৬৬ টাউনুস) রেডিও চালিয়ে দিতেন, তারপর অ্যাক্সিলারেটর-এ পা চাপতেন। এই ধরনের রবিবার সকালের বেড়ানোর সময় আমরা জীবনের অর্থ কী এবং আমি আমার জীবন নিয়ে কী করবো, এই সব আলোচনা করতাম।

১৯৬০ বা ১৯৭০-এর প্রথম দিকটায়, রবিবারের সকালে ইস্তাম্বুলের প্রধান সড়কগুলো ফাঁকা থাকত, আর আমরা এমন সব পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতাম, যেখানে আগে কখনো আসিনি আর 'হালকা পাশ্চাত্য সংগীত' (দ্য বিটলস, সিলভি ভারতান, টম জোনস এবং এই ধরনের) শুনতাম এবং বাবা আমায় বলতেন যে, নিজের মতো করে বাঁচাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিনিস, টাকাটাই সব কিছু নয়, কিন্তু যদি সুখ টাকার ওপরই নির্ভর করে, তাহলে সেটা হবে ধ্বংসের পথ; অথবা তিনি গল্প করতেন, একবার প্যারিসে গিয়ে তিনি হোটেলের ঘরে বসে অনেক কবিতা লিখেছিলেন এবং ভ্যালেরির কবিতা তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু কয়েক বছর বাদে যখন উনি আমেরিকায় ভ্রমণ করছিলেন, তখন যে সুটকেশে তিনি তাঁর সব কবিতা এবং অনুবাদগুলো রেখেছিলেন, সেটা চুরি হয়ে যায়। গাড়ির ভেতরের সঙ্গীত যেমন দ্রুত লয়ে বাজত আর শহরের রাস্তার সঙ্গে ছন্দে বাজত, বাবাও তেমনি তার গল্পগুলোকে সঙ্গীতের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। আমি জানতাম যে বাবা আমাকে যা কিছু বলতেন,– ১৯৫০ সালে প্যারিসের রাস্তায় জাঁ পল সাত্রের সঙ্গে বহুবার দেখা হওয়া, নিশান্তাসিতে পামুক অ্যাপার্টমেন্ট কীভাবে তৈরি হল, ওঁর প্রথম ব্যবসায়ের একটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনি কেমনভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন– এসব আমি কোনোদিন ভুলব না। মাঝে মাঝেই বাবা গাড়ি থামিয়ে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী দেখে অথবা ফুটপাথে সুন্দরী মহিলাদের দেখে প্রশংসা করতেন এবং আমি, তাঁর জ্ঞানের কথা বা উপদেশগুলো যখন উনি মৃদুভাষণে বলতেন, শুনতে শুনতে গাড়ির সামনের কাঁচের মধ্যে দিয়ে সরে সরে যাওয়া শীতের সকালের দৃশ্যগুলো দেখতাম। যখন আমি গাড়িগুলোকে গালাতা সেতু পার হতে দেখতাম, পেছন দিকের পাড়াগুলো দেখতাম যেখানে তখনো কিছু কাঠের বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলো, ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাওয়া জনতার ভিড়, বা সরু চিমনিওয়ালা গাধাবোটগুলোকে বসফোরাসের বুকে কয়লার বার্জগুলো টেনে নিয়ে যেতে দেখতাম, তখন বাবার জ্ঞানগর্ভ কণ্ঠস্বর শুনতাম, বাবা আমাকে বলতেন যে, প্রতিটি মানুষের তার নিজের সহজাত বোধ এবং আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ; যে, আসলে জীবন কত ছোট এবং যদি কোনো লোক জানে যে, সে জীবনে কী করতে চায়, সেটা কত ভালো; যে, প্রকৃতপক্ষে যে লোক সারাটা জীবন ছবি এঁকে, রঙ করে এবং লিখে কাটায়, সে কেমন গভীর এবং মহার্ঘ জীবন উপভোগ করতে পারে এবং আমি যখন তাঁর এই বাণী আকণ্ঠ পান করতাম, সেগুলো আমি চলতে চলতে যা কিছু দেখতাম, তার মধ্যে মিশে যেত।

আর দেখতে দেখতে, ওই সঙ্গীত, চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া দৃশ্যগুলো, আমার বাবার কণ্ঠস্বর ('এখানে গাড়ি ঘোরাব?' বাবা জিজ্ঞাসা করতেন) এবং সঙ্কীর্ণ পাথুরে রাস্তা, সব মিলেমিশে এক হয়ে যেত, আর আমার মনে হত, যে যদিও আমরা কখনোই এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাব না, তবুও প্রশ্ন করাটা উচিত; যে, প্রকৃত সুখ এবং জীবনের অর্থ এমন জায়গায় থাকে, যা কখনোই খুঁজে পাওয়া যায় না এবং বোধহয় পেতে চাইও না– কিন্তু আমরা প্রশ্নের উত্তরের পেছনে দৌড়চ্ছি, না, ক্ষুদ্র সুখ আর আবেগের পেছনে, যাই হোক না

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন, দৌড়নোটা পাওয়ার চাইতে কম নয়, প্রশ্ন করাটা সমান গুরুত্বপূর্ণ, যেমন গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যগুলো, বাড়ি, ফেরী ইত্যাদি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবন– গান, শিল্প, গল্পের মতো– উঠবে, পড়বে, শেষ পর্যন্ত শেষও হবে, কিন্তু অনেক বছর পরেও এই শহরের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর, যা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, মধ্যে আজও সেই সব জীবন রয়ে যাবে, যেমন স্বপ্নের ভেতর থেকে তুলে আনা স্মৃতিরা থাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৪.

অসুখী হওয়ার অর্থ নিজেকে এবং নিজের শহরকে ঘৃণা করা

কখনো কখনো নিজের শহরকেও বিদেশী বলে মনে হয়। যে রাস্তাগুলোকে নিজের বাড়ি বলে মনে হয়, সেগুলোও হঠাৎ হঠাৎ রঙ বদলায়। আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সব সময়ের রহস্যময় ভীড় দেখতে দেখতে হঠাৎ করে মনে হয়, এই ভীড় এইখানে কত শত বছর ধরে রয়েছে। এই শহরটা, তার কর্দমাক্ত পার্ক, পরিত্যক্ত খোলা জায়গাগুলো, বিদ্যুতের খুঁটি এবং স্কোয়ারগুলোয় সাঁটা ইশতিহারগুলো এবং এর কংক্রীটের দৈত্যগুলোকে নিয়ে আমার আত্মার মতো, দ্রুত একটা ফাঁকা– অত্যন্ত ফাঁকা স্থানে পরিণত হয়েছে। পাশের রাস্তাগুলোর নোংরা জঞ্জাল, খোলা জঞ্জালের বিনগুলো থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধ, ফুটপাথের উঁচু নিচু ভাঙাচোরা, গর্ত, এই সব বিশৃঙ্খলা এবং চরম দুর্দশা, ধাক্কা, ঠেলাঠেলি, যা একে এই রকম শহর তৈরি করেছে– আমি ভাবি, শহরের জঞ্জালের মধ্যে নিজেকে গুঁজে দেওয়ার জন্য, এই শহরে থাকার জন্য, শহর কি আমাকে শাস্তি দিচ্ছে? যখন এর বিষণ্ণতা আমার মধ্যে ঢুকে পড়ে, কিংবা আমার বিষণ্ণতা ওর মধ্যে ঢুকে পড়ে আমি ভাবতে শুরু করি যে, আমি কিছুই করতে পারব না; এই শহরের মতো আমিও জীবন্ত মৃতদের দলে, আমি একটা মৃতদেহ যেটা এখনো শ্বাস নিচ্ছে, একটা হতভাগ্য, যেটাকে শহরের রাস্তায় এবং ফুটপাথে হাঁটার জন্য পাঠানো হয়েছে, যেটা আমাকে আমার ভেতরের আবর্জনা ও আমার পরাজয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। যখন আমি বীভৎস নতুন অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলোর (প্রত্যেকটা বাড়ি আমার আত্মাকে পিষে মারে) ফাঁক দিয়ে উঁকি মারি, আর সিল্কের ওড়নার মতো ঝলকানো বসফোরাসের একটা টুকরো দেখতে পাই, তখনো আশা আমার কাছে ধরা দেয় না। বহু দূরের দৃষ্টির বাইরের রাস্তাগুলো থেকে অন্ধকারতম, খুনী এবং খাঁটি বিষণ্ণতার একটা রেশ ঢুকে পড়ে, আমি তার গন্ধ পাই, যেমন একজন অভিজ্ঞ ইস্তাম্বুলী কোনো শরৎ সন্ধ্যায় শ্যাওলা আর সমুদ্রের নরম নরম গন্ধ থেকে টের পায় যে, দক্ষিণা বাতাস ঝড় নিয়ে আসছে: অন্য কোনো লোক যেমন সেই ঝড় থেকে, সেই ভূমিকম্প থেকে, সেই মৃত্যু থেকে আশ্রয় পাবার জন্য বাড়িমুখো দৌড়য়, আমিও তেমনি আমার চার দেওয়ালের মাঝে পালানোর জন্য ব্যগ্র হই।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসন্ত কালের সেই সব বিকেল, যখন সূর্য হঠাৎ আকাশে পুরো তেজে বেরিয়ে আসে, নিষ্ঠুরভাবে সমস্ত দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলা এবং ব্যর্থতাকে আলোকিত করে তোলে, সেগুলোকে আমি দারুণ অপছন্দ করি। 'হালাস্‌কার গাজি' নামে যে বড় রাস্তা, যেটা টাকসিম থেকে হারবিয়ে ও সিসলি হয়ে একদম 'মেসিডিয়েকোয়' পর্যন্ত চলে গেছে, সেটাকেও আমি পছন্দ করি না। আমার মা, যিনি এক সময় এই এলাকায় ছেলেবেলায় বাস করতেন, এই রাস্তার দু'পাশে লাইন করে লাগানো মালবেরী গাছগুলোর কথা খুব বলতেন; আর এখন এই রাস্তার দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি, যেগুলো ষাট এবং সত্তর দশকে 'আন্তর্জাতিক স্টাইলে' তৈরি করা হয়েছিল। এগুলোর রয়েছে বিশাল বিশাল জানালা, আর দেওয়ালগুলো মোজাইক টাইলস দিয়ে ঢাকা। এখন সিসলি (পাঙ্গাল্‌টি)-তে, নিশান্তাসি (টোপাগাচি)-তে এবং টাকসিম (টালিম্‌হানে)-তে কতকগুলো পেছনের রাস্তা রয়েছে, যেগুলো দেখলে আমার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে আসতে ইচ্ছা করে; এই জায়গাগুলো, কোনো সবুজ থেকে বহু দূরে, বসফোরাসের দৃশ্য থেকে বঞ্চিত, পারিবারিক ঝগড়া যেখানে ছোট ছোট প্লটগুলো আরো ছোট ছোট টুকরো করে বিক্রি করে দিয়েছে আর সেগুলোতে বক্কিম কার্পণ্যে অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি উঠে গেছে।

যে সময়ে আমি এই হাওয়া-বিহীন মন-খারাপ-করা রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতাম, আমার মনে হত যেন জানালা থেকে নিচের দিকে তাকানো প্রত্যেকটি চাচি এবং প্রত্যেকটি বুড়ো গোঁফ-ওয়ালা চাচা, আমাকে ঘেন্না করছে এবং মনে হয়, ঠিকই করছে। নিশান্তাসি ও সিস্‌লির মধ্যেকার পেছনের রাস্তাগুলো এবং তাদের কাপড়ের দোকানগুলো, গালাতা ও টেপেবাসির মধ্যেকার রাস্তাগুলো, তাদের বাতি ও ঝাড়বাতির দোকানগুলো, টাকসিম তালিমহানের চারপাশের এলাকা, যেখানে এখনো বেশির ভাগ মোটর পার্টস-এর দোকান, এইসব আমি ঘৃণা করি। (সেই ওঠা- পড়ার দিনগুলোতে, যখন আমার বাবা ও চাচা, আমার দাদাজীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মহোল্লাসে একটার পর একটা ফালতু ব্যবসায়ে খাটাচ্ছেন, সেই সময় তাঁরা এই অঞ্চলে এ রকম একটা দোকান খুলেছিলেন, কিন্তু দোকান চালাতে না পেরে, তাঁরা মোটর পার্টস-এর কথা ভুলে গিয়ে হাসি ঠাট্টা করে মজা করতেন, কাজের লোককে 'তুরস্কের প্রথম টিনে প্যাক-করা টম্যাটো জুস'-এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গোল মরিচ-এর গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়াতেন।) সুলেমানিয়ার চারপাশের রাস্তাগুলো যে বাসন তৈরির দোকানগুলো অধিকার করে ব্যবসা চালাচ্ছিল, দিনরাত হাতুড়ির শব্দ আর মেশিন-প্রেস যন্ত্রের আওয়াজ তুলত, সেগুলোকেও আমি ঘৃণা করতাম। সেই রকম ঘৃণা করতাম সেই সব ট্যাক্সি আর ট্রাকগুলোকে, যেগুলো এই রাস্তায় ভাড়া খাটত আর ট্রাফিক জ্যাম করে তুলত। এইগুলো দেখতাম আর ভেতরে রাগে ফুলে ফুলে উঠে শহরটাকে আরও ঘৃণা করতাম, নিজেকেও ঘৃণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতাম, আরও এই জন্যে যে, আমি দেখতাম বিশাল বিশাল উজ্জ্বল রঙে লেখা সাইন বোর্ড, যাতে শহরের ভদ্রলোকরা নিজেদের নাম, ব্যবসা, চাকরি, পেশা এবং সফলতা, বিজ্ঞাপিত করতেন। সব অধ্যাপক, ডাক্তার, সার্জন, আর্থিক পরামর্শদাতা, কোর্টের উকিল, সুখী ডোনার দোকান, মুদিখানা এবং কৃষ্ণসাগর ফুড স্টোর; সব ব্যাংক, বীমার এজেন্সি, কাপড় ধোয়ার পাউডারের পণ্যশ্রেণী, খবরের কাগজের নাম, সিনেমা এবং জিনস-এর দোকান, নরম পানীয়-র বিজ্ঞাপন দেওয়া পোস্টার; সেই সব দোকান, যেখানে ফুটবল পুলের জুয়ার টিকিট, লটারির টিকিট এবং পানীয় জল কিনতে পাওয়া যায়; সেই সব দোকান, যেগুলো দোকানের নামের সাইন বোর্ডের ওপরে বড় বড় অহঙ্কারী অক্ষরে নিজেদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরো বিক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করে– এই সমস্ত কিছুর থেকে জানতে পারি যে, আমার মতোই, বাকি শহরটাও উদভ্রান্ত এবং অসুখী, যে এই গোলমাল এবং এই লেখাগুলো আমাকে নিচে টেনে নামানোর আগেই একটা অন্ধকার কোণায়, আমার ছোট্ট ঘরে, আমার পালিয়ে যাওয়া দরকার।

একে ব্যাংক মর্নিং ডোনার শপ ফ্যাব্রিক গ্যারান্টি
ড্রিংকইট হিয়ার ডেইলি সোপ সাইড টাইম ফর জুয়েলস
নুরিবাইয়ার লইয়ার পে ইনস্টলমেন্টস

সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমি ভীতি উদ্রেককারী জনতার কাছ থেকে পালাবো, এই সীমাহীন গণ্ডগোল থেকে পালাবো, এই দুপুরের সূর্য, যা শহরের প্রতিটি কুৎসিত জিনিসকে স্পষ্ট করে তোলে, তার কাছ থেকে পালাবো। কিন্তু আমি যদি ইতিমধ্যেই ক্লান্ত, বিষাদগ্রস্ত হই, আমার মাথার মধ্যেকার পড়বার যন্ত্রটা প্রত্যেক রাস্তার প্রত্যেক লেখাগুলো মনে রাখবে আর একটা তুর্কী শোকগাথার মতো টানা বলে যাবে।

স্প্রিং সেলস সেলামি বাস্কেট পাবলিক টেলিফোন স্টার বিওগলু
নোটারি পাবলিক ইপিইয়েল ম্যাকারনি, অ্যান আঙ্কারা মার্কেট
শো হেয়ার ড্রেসার হেলথ অ্যাপ্‌ট রেডিও অ্যান্ড ট্রানজিস্টরস

বিলবোর্ড আর পোস্টারের, দোকানের সাইনবোর্ডের, পত্রিকার এবং ব্যবসায়ের ফরাসি ও ইংরাজি শব্দগুলো গোনা যাক; এই শহরটা সত্যিই পশ্চিমমুখো চলেছে, কিন্তু শহরটা যত দ্রুত কথা বলে, তত দ্রুত বদলাচ্ছে না। আবার তেমনি শহরটা তার মসজিদের, মিনারের, আজানের, নিজের ইতিহাসের ঐতিহ্যকেও সম্মান দেখাচ্ছে না। সব কিছুই যেন অর্ধেকটা তৈরি হয়েছে, বেখাপ্পা, ময়লা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেজরস পিন্নজ প্রোসিড অ্যাট লাঞ্চ টাইম ফিলিপস লাইসেন্সি
ডক্টর ডিপো ফোল্ড দি কারপেটস পোরসিলিন ফাহির
অ্যাটর্নি অ্যাট ল

এই দো-আঁশলা অক্ষরযুক্ত নরক থেকে পালানোর জন্য আমি একটা স্বর্ণযুগ বানিয়ে নিই, একটা শুদ্ধ এবং উজ্জ্বল মুহূর্ত যখন শহর 'নিজের সঙ্গে শান্তিতে' ছিল, যখন এই শহরটা ছিল একটা 'সুন্দর পূর্ণতা'। মেলিং-এর, নার্ভাল, গ্যেটে এবং দ্য অ্যামিসিস-এর মতো পাশ্চাত্য পর্যটকদের ইস্তাম্বুল। কিন্তু আমার যুক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেও, আমার মনে পড়ে যায় যে, আমি এই শহরকে তার কোনো বিশুদ্ধতার জন্যই ভালোবাসি না, বরং তার দুঃখজনক বিশুদ্ধতার অভাবের জন্যই ভালোবাসি। এবং সেই একই আমার ভেতরের যুক্তিবাদী, যে আমার সব ত্রুটিই ক্ষমা করবে, আমাকে, শহরের ওপরে ঝুলে থাকা 'হুজুন' সম্পর্কে সাবধান করে, তার টেলিগ্রাফের টরে টক্কা আমার মাথার মধ্যে এখনো বেজে চলেছে।

স্ট্রীট ইওর মানি ইওর ফিউচার ইনসিওরেন্স সান বাস্কেট
রিং দি বেল নোভা ওয়াচেস আর্ট ইন স্পেয়ার পার্টস ভোগ
বালি ভিজোন স্টকিংস

AMARBOI.COM

আমি কোনোকালেই পুরোপুরি এই শহরের ছিলাম না এবং হতে পারে সেটাই বরাবর আমার সমস্যা ছিল। দাদীমার অ্যাপার্টমেন্টে বসে, একটা ছুটির দিনের ভোজের শেষে পরিবারের সঙ্গে বিয়ার ও লিকার খেতে খেতে অথবা কোনো শীতের দিনে আমার বড়লোক, প্লে-বয় হতে-যাওয়া রবার্ট অ্যাকাডেমির বন্ধুদের সঙ্গে তাদের বাবার গাড়িতে চেপে শহরে ঘুরতে ঘুরতে, আমি আজও কোনো বসন্ত অপরাহ্নে শহরের রাস্তায় হেঁটে বেড়ালে যে অনুভূতি হবে, সেই একই রকম অনুভব হত; ভেতর থেকে একটা ধারণা উঠে আসত যে, আমি একটা অপদার্থ এবং কোথাও আমার ঠাঁই নেই, যে, এই সব লোকের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে কোনো কোণায় লুকিয়ে থাকা দরকার– প্রায় একটা জান্তব সহজাত প্রবৃত্তির মতো– কিন্তু এই যে মানব-গোষ্ঠী, যারা আমাকে দুহাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছে, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার এই যে ইচ্ছা, এটা সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের ক্ষমাপ্রসন্ন দৃষ্টি, এগুলোই আমার মধ্যে তীব্র অপরাধ বোধের জন্ম দেয়।

যখন আমি উঁচু স্কুলে পড়াশুনো শুরু করি, তখন একাকীত্ব বোধকে সাময়িক মনে হয়েছিল,– আমি তখনো এটাকে আমার অদৃষ্ট বলে দেখার মতো সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইনি। আমি স্বপ্ন দেখতাম, একজন ভালো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাব, বিরতির সময় অলস, একা, দাঁড়িয়ে থাকার দুশ্চিন্তা থাকবে না। আমি স্বপ্ন দেখতাম, একদিন আমার সঙ্গে বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সংস্কৃতি-মন্য লোকেদের সঙ্গে দেখা হবে, যাদের সঙ্গে আমি যে সব বই পড়েছি, আমি যে সব ছবি এঁকেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও আমার মনে হবে না যে, আমি নকল। একদিন যৌন কামনাও একা একা পূরণ করা বন্ধ হয়ে যাবে; আমার একজন সুন্দরী প্রেমিকা হবে, যার সঙ্গে আমি নিষিদ্ধ আনন্দ ভাগ করে নেব। যদিও এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার মতো বয়েস আমার তখন হয়েছিল, কিন্তু কামনা, লজ্জা ও ভয়, এই সব মিলে আমাকে পঙ্গু করে রেখেছিল।

তখনকার দিনে, দুর্দশা মানে, নিজের বাড়িতে, নিজের পরিবারে এবং নিজের শহরেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারার অনুভূতি। এটা হচ্ছে বড় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, যেখানে অপরিচিত লোকেও তোমাকে দাদা বলে সম্বোধন করে, যেখানে প্রত্যেকটি লোক বলে 'আমরা,' যেন সমস্ত শহরটাই একই ফুটবল ম্যাচ দেখছে, আর এই সবের থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে রাখি। এই রকম অবস্থাই শেষ পর্যন্ত আমার জীবন যাপনের ধরন হয়ে যাবে, এই ভয়ে আমি অন্য লোকদের মতো হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার দেরি করে আসা বয়ঃসন্ধিতে আমি এমন এক ধরনের মিশুক যুবক হয়ে উঠলাম, যে কিনা রসিকতা করতে কোনো সময়েই পিছ-পা নয়, যে সকলের বন্ধু, স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক। আমি অনবরত রসিকতা করতাম, ছোট ছোট কাহিনী বলতাম, শিক্ষকদের নকল করে ক্লাসের সবাইকে হাসাতাম; আমার রঙ্গ কৌতুক পারিবারিক কাহিনীতে পরিণত হত। যখন আমি এই খেলায় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলতাম, তখন আমি হয়ে উঠতাম একজন করিৎকর্মা কূটনীতিবিদ, অত্যন্ত মন্দ কাজগুলোকে কোমল মিষ্টি কথায় একদম মর্যাদাময় করে তুলতাম। কিন্তু পরে, নিজেকে যখন আমার ঘরে বন্ধ করে রাখতাম, তখন পৃথিবীর এই ছলনা থেকে এবং আমার নিজের কপটতা থেকে পালানোর যে একমাত্র পথ আমি জানতাম, তা হচ্ছে হস্তমৈথুন করা।

বন্ধুত্বের যে ছোটখাট আচার আচরণ, তা অন্য সকলের চাইতে আমার কাছেই বা এত কঠিন কেন? সাধারণ মিষ্টি কথাবার্তা বলতেই বা আমার দাঁত কিড়মিড় করতে হয় কেন এবং পরে নিজেকে এর জন্য ঘেন্না করা এবং কেন, কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে, আমার মনে হত যেন আমি অভিনয় করছি? কোনো কোনো সময় এই ভূমিকাটা আমি এমন উন্মাদের মতো আবেগে জড়িয়ে নিতাম যে, আমি ভুলেই যেতাম যে আমি অভিনয় করছি। কিছু সময়ের জন্য, অন্য সকলের মতো আমিও উপভোগ করতাম, কিন্তু তারপরেই, কোথা থেকে জানি না, একটা বিষণ্ণতার হাওয়া বয়ে যেত, আর আমার নিজেকে কুঁকড়ে-মুকড়ে কোনো কোণায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে করত, বাড়ি ফিরে যাবার, আমার ঘরে, আমার নিজস্ব অন্ধকার জগতে ফিরে যাবার ইচ্ছে হত। আমার বিদ্রূপ দৃষ্টি আমি যতই নিজের ভেতরে ফেলতাম, ততই সেটা চলে যেত আমার মা, আমার বাবা, আমার দাদা এবং সমস্ত আত্মীয়দের দিকে– বড় কঠিন হয়ে পড়ত, এদের আমার পরিবার বলে ডাকতে, আমার স্কুলের বন্ধুদের, অন্য অনেক পরিচিতদের, সমস্ত শহরকে ডাকা কঠিন হয়ে পড়ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বুঝতে পারতাম যে, আমার এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্যে দায়ী ইস্তাম্বুল নিজেই। কেবল মাত্র বসফোরাস বা জাহাজ, বা অত্যন্ত পরিচিত রাত্রি, আলো এবং জনতা নয়, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আরো কিছু একটা ছিল, যা এর অধিবাসীদের একত্রে বেঁধে রাখত, তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ, ব্যবসা করা, এক সঙ্গে বসবাস করাকে সহজ করে তুলত এবং আমি, সোজা কথায়, এর সঙ্গে নিজেকে মিল খাওয়াতে পারতাম না। এই যে 'আমাদের' জগৎ, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে, তার ভালো দিকটা, তার সাধ্যের সীমা এবং সকলেই একটা সাধারণ পরিচিতির ভাগীদার, এরা বিনয়, ঐতিহ্য, আমাদের গুরুজনদের, আমাদের পিতৃপুরুষদের, আমাদের ইতিহাস, আমাদের অতীত কাহিনী, এই সব কিছুকে শ্রদ্ধা করে, সেই পৃথিবীতে আমি 'আমার মতো' হয়ে থাকতে পারব না। যেখানে আমি অভিনেতা, দর্শক নই, সেখানে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারি না। উদাহরণ হিসেবে, কোনো জন্মদিনের পার্টিতে, কিছুক্ষণ পরে আমি মুখে ভালোমানুষী হাসি নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হয়তো জিজ্ঞাসা করতাম, 'কেমন চলছে?' এবং লোকেদের পিঠে আলতো চাপড় দিতাম, অথচ আমি তখন বাইরে থেকে নিজেকে দেখতে শুরু করেছি, যেন স্বপ্নের মধ্যে, এবং আমি ওই ভান-সর্বস্ব মূর্খটিকে দেখে শিউরে উঠতাম।

বাড়ি ফেরার পরে, আমার কপটচারিতার ওপর কিছুক্ষণ চিন্তা করার পরে (তুই নিজের ঘর সব সময় তালাবন্ধ রাখিস কেন?' মা জিজ্ঞাসা করতেন) আমি বুঝে যেতাম যে, এই ত্রুটি, ঠকানোর এই ক্ষমতা, কেবল আমার মধ্যেই আছে তা নয়, পুরো গোষ্ঠীর আত্মার মধ্যেই রয়েছে; এটা ওই 'আমাদের' মধ্যেই রয়েছে– এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি, যে নিজের বাইরে থেকে শহরটাকে দেখার মতো পাগল, সেই বুঝতে পারবে যে, এটা শহরের 'সাম্প্রদায়িক আদর্শবাদ।' কিন্তু এইসব কথা একজন পঞ্চাশ বছর বয়েসি লেখকের কথা, যিনি বহুদিন আগেকার এক বয়:সন্ধিক্ষণের কিশোরের মনের এলোমেলো চিন্তাভাবনাকে আকার দিয়ে একটা মজাদার গল্পে পরিণত করতে চাইছেন। কাজেই এগোনো যাক : ষোল থেকে আঠারো বছর বয়েসের মধ্যে আমি শুধু নিজেকেই ঘেন্না করতাম, তাই নয়, আমার পরিবার, আমার বন্ধুরা এবং তাদের সংস্কৃতি, সরকারি এবং বেসরকারি রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো যেগুলো ব্যাখ্যা করতে চাইত, আমাদের চার পাশে কী ঘটছে, খবরের কাগজের শিরোনাম, আমরা নিজেরা যা, তার চেয়ে অন্য রকম কিছু কিভাবে লোককে দেখানো যায়, সব ঘেন্না করতাম এবং আদতে নিজেদের বুঝতেই পারতাম না। রাস্তার সব সাইন বোর্ড আর বিলবোর্ড-এর অক্ষরগুলো আমার মাথায় দপদপ করত। আমি আঁকতে চাইতাম, যে সব ফরাসি চিত্রকরদের কথা বইয়ে পড়েছিলাম, তাদের মতো করে থাকতে চাইতাম, কিন্তু ইস্তাম্বুলে ওই রকম একটা জগৎ তৈরি করার ক্ষমতা আমার ছিল না, বা ইস্তাম্বুলও এ রকম একটা ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইত না।

তুর্কী ইমপ্রেশনিস্টদের সবচেয়ে খারাপ ছবিগুলো,– তাদের আঁকা মসজিদের, বসফোরাসের, কাঠের বাড়িগুলোর, বরফ ঢাকা রাস্তার দৃশ্যগুলো– আমার ভালো লাগত, ছবি হিসেবে নয়, ইস্তাম্বুলের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে। যদি কোনো ছবি একদম ইস্তাম্বুলের মতো দেখতে হত, তাহলে সেটা ভালো ছবি নয়; যদি ওটা ভালো ছবি হত, তাহলে সেটা যথেষ্ট ইস্তাম্বুলের মতো দেখতে হত না। বোধহয় এর থেকে বোঝা যায় যে, আমি শহরটাকে ছবি হিসেবে বা নৈসর্গিক দৃশ্য হিসেবে দেখতে চাইতাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোলো থেকে আঠারো বছরের ভেতরে, আমার একটা অংশ, একজন গোঁড়া পাশ্চাত্যবাসীর মতো, শহরটাকে পুরো পাশ্চাত্য শহর হিসেবে দেখতে চাইত। আমার নিজের সম্বন্ধেও আমি একই আশা পোষণ করতাম; কিন্তু আমারই আর একটা অংশ, যে ইস্তাম্বুলকে আমি সহজাত প্রবৃত্তিতে, অভ্যাসে এবং স্মরণে ভালোবেসে বড় হয়েছি, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চাইত। যখন আমি শিশু ছিলাম, আমি এই দুটো ইচ্ছাকে আলাদা আলাদা রাখতে পারতাম (একটা শিশুর একই সঙ্গে ভবঘুরে হওয়ার এবং একজন বড় বৈজ্ঞানিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে কোনো বাধা নেই) কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, আমার এই ক্ষমতা কমে আসতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মার ভেতরে ঢুকে পড়ে সেই বিষণ্ণতা, যার প্রতি এই শহর মাথা নোয়ায় এবং একই সঙ্গে তাকে গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করে।

কিন্তু এর উৎস হয়তো দারিদ্র্য নয়, কিংবা 'হুজুন' এর ধ্বংসাত্মক বোঝাও নয়। যদি আমি মাঝে মাঝে একটা মুমূর্ষু জন্তুর মতো একলা একটা কোণায় কুঁকড়ে থাকতে চাইতাম, সেটা হয়তো আমার ভেতর থেকে উৎপন্ন কোনো বিমর্ষতাকে পুষে রাখার জন্যও হতে পারে। তাইলে এটা কোন জিনিস, যেটা হারানোর জন্য আমার এত দু:খ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫.
প্রথম প্রেম

যেহেতু এটা একটা স্মৃতিচারণ, তাই তার নামটা আমাকে গোপন রাখতেই হবে এবং যদি তার নামটা বলতে গিয়ে আমি দিওয়ান কবিদের মতো একটা সংকেত দিই, সেক্ষেত্রে আমাকে বলতেই হবে যে, এই সংকেত, বাকি গল্পের মতোই, ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। পারসী ভাষায় তার নামের মানে হল কালো গোলাপ। কিন্তু আমি যত দূর জানতে পেরেছি, যে উপকূল থেকে সে মহানন্দে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল সেখানকার কেউ, বা ফরাসি উঁচু স্কুলের তার কোনো সহপাঠীই এ সম্বন্ধে কিছু জানত না। কারণ তার লম্বা চকচকে চুল কালো ছিল না, ছিল চেস্টনাট রঙ-এর আর ওর বাদামি চোখ, কেবল আরও একধাপ গাঢ় ছিল। আমি যখন চালাকি করে ওকে এই সব কথা বলেছিলাম, ও হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেলে যেমন করত, তেমনিভাবে ভুরু তুলে আর ঠোঁট দুটো একটু বাইরে ঠেলে, বলেছিল যে, তার নামের কী অর্থ, তা সে জানত এবং তার অ্যালবেনিয়ান দাদীমার নামে তার নামকরণ করা হয়েছিল।

আমার মা'র কথায়, মেয়েটির মা'র (ওকে আমার মা 'সেই মেয়ে লোকটা' বলতেন) নিশ্চয়ই খুব অল্প বয়েসে বিয়ে হয়েছিল, কারণ আমার দাদার বয়স যখন পাঁচ আর আমার তিন, এবং মা আমাদের শীতের সকালে নিশান্তাসিতে মাকা পার্ক-এ নিয়ে যেতেন, তখন বাচ্চাটাকে আর তার মাকে দেখেছিলেন, যাকে একটা বাচ্চা মেয়ের মতোই দেখতে লাগছিল, বাচ্চাকে একটা মস্ত বড় প্যামের মধ্যে শুইয়ে ঠেলে বেড়াচ্ছিল এবং ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। মা একবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ওই অ্যালবেনিয়ান দাদীমা-টি একজন পাশার হারেম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং সেই পাশা, হয় সন্ধিচুক্তির সময় কোনো গর্হিত কাজ করেছিলেন, না হয়, আতাতুর্কের বিরোধিতা করে নিজের মর্যাদা খুইয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় আমাদের চারপাশের পুড়িয়ে ফেলা অটোমান প্রাসাদগুলোর ব্যাপারে, কিংবা সেই সব প্রাসাদের একদা বাসিন্দা পরিবারগুলো সম্পর্কে কোনো আগ্রহই ছিল না, কাজেই আমি ওই সব গল্প ভুলেই গেছি। ইতিমধ্যে আমার বাবা আমায় বলেছিলেন যে, ওই ছোট্ট কালো গোলাপের বাবা, সরকারি মহলের কিছু পরিচিত প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে কয়েকটা আমেরিকান ও ডাচ কোম্পানির এজেন্ট হয়েছিলেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতারাতি বড়লোক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে বাবার কণ্ঠস্বরে এই ব্যাপারটা ভালো লাগেনি, এমন কিছু ছিল না।

আমাদের পার্কে দেখা হওয়ার আট বছর পরে, আমাদের পরিবার যখন 'বেরামগ্‌লু' মহল্লায় একটা বাড়ি কিনেছিল, শহরের পূব দিকে একটা গ্রীষ্মাবাস, ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে এক সময় নতুন বড়লোকদের মধ্যে এটা একটা ফ্যাশন ছিল, তখন আমি ওকে বাইসাইকেলে চড়ে যেতে দেখতাম। রমরমার সময়ে, শহরটা তখন ছোট ছিল আর ফাঁকা ফাঁকা ছিল, আর আমি তখন সময় কাটাতাম সমুদ্রে সাঁতার কেটে, নৌকো নিয়ে বেরিয়ে মাছ ধরে, ম্যাকারেল মাছ ধরতাম, ফুটবল খেলে এবং গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় আমার ষোল বছর বয়স হয়ে গেলে, মেয়েদের সঙ্গে নেচে। পরে অবশ্য, উঁচু স্কুল শেষ করার পর এবং স্থাপত্যবিদ্যা পড়া শুরু করবার পর, আমি নিজেদের বাড়ির একতলায় বসে ছবি আঁকা এবং বই পড়া পছন্দ করতাম। আমার বড়লোক-বাপের-ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কতটুকু সম্পর্ক আছে, যারা, স্কুলের বই ছাড়া অন্য কোনো বই পড়লে, তাদের বলত, 'বুদ্ধিজীবী' অথবা 'মানসিক জটিলতায় ভোগা' অন্ধকার জগতের লোক? এই শেষোক্ত কলঙ্ক তারা যখন তখন যাকে তাকে দিত– তার অর্থ এই যে, হয় তোমার মানসিক সমস্যা আছে, অথবা টাকা পয়সা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা আছে। আমাকে 'বুদ্ধিজীবী' বললে আমার বেশি দুশ্চিন্তা হত, কাজেই আমি যে একটা অক্ষম পা-চাটা লোক নই, এটা বিশ্বাস করানোর জন্য আমি বলতে আরম্ভ করতাম যে, আমি উল্‌ফ্‌, ফ্রয়েড, সার্ত্রে, মান, ফকনার, এদের বইগুলো পড়তাম কেবল 'মজা পাবার জন্যে,' যদিও বন্ধুরা জিজ্ঞেস করত, আমি কিছু কিছু লেখা দাগ দিই কেন।

এক গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে আমার এই কুখ্যাতি কালো গোলাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যদিও সেই গ্রীষ্মকাল এবং তার আগের গ্রীষ্মকালগুলোতেও আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে প্রচুর সময় কাটিয়েছি। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে নজর করেও দেখিনি। যখন আমার বন্ধুরা আর আমি মধ্য রাত্রে একটা বড় সুখী দল হিসেবে ডিসকোতে যেতাম, আমাদেরই কারো মার্সিডিজ, মুস্তাং বা বিএম ডব্লু গাড়ি নিয়ে বাগদাৎ অ্যাভিনিউয়ে (তখন এর নাম ছিল এশিয়ান শহরের পার্ক অ্যাভিনিউ, এবং মাত্র আধঘন্টার রাস্তা) রেস করতাম (কখনো ধাক্কাও মারতাম), অথবা এদেরই কারো স্পীড বোট নিয়ে চলে যেতাম কোনো নির্জন খাড়ির মুখে পাহাড় চুড়োয়, খালি সোডার আর মদের বোতল সার দিয়ে সাজিয়ে ওদেরই কারো বাবার শৌখিন শিকার করার বন্দুক নিয়ে গুলি মারতাম, মেয়েগুলো ভয় পেত আর যখন ওরা চিৎকার করত, আমরা ছেলেরা ওদের চুপ করাতাম; যখন আমরা পোকার আর মনোপোলি খেলতে খেলতে বব ডিলান আর বিটলদের গান শুনতাম, তখনো কালো গোলাপ আর আমি পরস্পরের প্রতি কোনো আগ্রহই দেখাইনি।

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে আসত, আর এই হৈ চৈ করা অল্প বয়েসিদের দলটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ত, এবং তারপরে আসত 'লোডোস' ঝড়, যেটা প্রত্যেক বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই উপকূলে আছড়ে পড়ত, সব সময়েই একটা কি দুটো দাঁড়টানা নৌকো ভেঙে ফেলত আর ওদের বিলাস ভ্রমণের বড় নৌকো আর স্পীডবোটগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বনাশের মুখে পড়ত। যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়েই চলত, তখন সতেরো বছরের কালো গোলাপ আমার সেই ঘরে আসতে শুরু করল, যেখানে বসে আমি ছবি আঁকতাম আর খুব আন্তরিকভাবে বলতাম আমার 'স্টুডিও'। আমার সব বন্ধুরাই মাঝে মাঝে এই ঘরে আসত, আমার কাগজ আর তুলি নিয়ে আঁকার চেষ্টা করত অথবা সন্দেহ নিয়ে আমার বইগুলো দেখত, কাজেই এই ঘরে কারো আসাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তুরস্কের বেশির ভাগ লোক, তা সে বড়লোকই হোক, বা গরীবই হোক, পুরুষ কিংবা মেয়ে যাই হোক, তাদের সকলের মতো কালো গোলাপেরও সময় কাটানোর জন্যে গল্প করার প্রয়োজন হত।

শুরুর দিকে আমরা বিগত গ্রীষ্মকালের গল্পগুলো করতাম– কে কার প্রেমে পড়েছিল, কে কাকে ঈর্ষ্যান্বিত করেছিল। যদিও সেবারের গ্রীষ্মকালে আমি এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিইনি। কারণ আমার হাতে লেগে থাকত রঙ, তাই ও কখনো কখনো আমাকে চা বানাতে বা কোনো রঙের টিউব খুলতে সাহায্য করত, তারপর ঘরের এককোণায় নিজের জায়গায় চলে যেত, পায়ের জুতো লাথি মেরে খুলে সোফাতে লম্বা হত, নিজেরই একটা হাতকে বালিশ বানাত। একদিন ওকে কিছু না বলে, আমি ওর সোফায় গা-এলানো ভঙ্গীর স্কেচ করেছিলাম। দেখলাম, এতে ও খুশি হল, তাই পরের দিন ও এলে, আমি আর একটা স্কেচ করলাম। আরেকবার, আমি যখন বললাম যে, ওর একটা ছবি আঁকব, ও জিজ্ঞাসা করল, 'কীভাবে বসব?' একজন ছোটখাটো অভিনেতা, যে কখনো ক্যামেরার সামনে আসেনি, যে কিনা খুব রোমাঞ্চিত হয়েছে, অথচ ঠিক করতে পারছে না হাত-পা কোথায় রাখবে, সেই রকমভাবে বসল।

আমি যখন ওর লম্বা, পাতলা নাকটা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলাম যাতে আমি ওটা ঠিকঠাক আঁকতে পারি, তখন ওর ছোট্ট মুখে একটা হালকা হাসির রেখা ফুটে ওঠে; ওর কপাল ছিল চওড়া, ও ছিল লম্বা, সূর্য-করে বাদামি হয়ে যাওয়া লম্বা পা, কিন্তু ও যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, ও পরেছিল একটা সুন্দর লম্বা, আঁটো স্কার্ট, ওর দাদীমার দেওয়া, কাজেই আমি ওর ছোট্ট ছোট্ট সোজা পায়ের পাতা দেখতে পাচ্ছিলাম। স্কেচ করার সময় যখন আমি ওর ছোট্ট স্তন দুটির আঁকবাঁক এবং ওর লম্বা গলার অতিরিক্ত ধবধবে সাদা চামড়া পর্যবেক্ষণ করতাম, ওর মুখের ওপর দিয়ে একটা লজ্জার ছায়া ভেসে যেত।

ওর প্রথম দেখা করার দিনগুলোতে, আমরা খুব কথা বলতাম, বেশির ভাগ কথা ও-ই বলত। আমি ওর চোখে আর ঠোঁটে দুশ্চিন্তার মেঘ দেখতে পেয়ে ওকে বলেছিলাম, 'এ রকম মন খারাপ করে থেকো না।' ও তখন আমায় বলেছিল, এমন সোজাসুজি বলেছিল যা আমি ভাবতেই পারিনি, ওর বাবা মার মধ্যে ঝগড়ার কথা, ওর ছোট চার ভাই-এর মধ্যে দিনরাত মারামারির কথা; ও বলেছিল, ওর পরিবার মাঝে মাঝে ওর বাবার শাস্তি হলে কীভাবে সামলাত-গৃহবন্দী হওয়া, স্পীডবোট চালানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া, গোটা কয়েক চড় চাপড়– এবং ওর বাবা অন্য মেয়েলোকের পেছনে দৌড়ত বলে ওর মা কীরকম দুঃখ পেত; ও আমাকে আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিল, যেহেতু আমাদের মায়েরা ব্রিজ খেলার পার্টনার ছিলেন এবং একজন আরেকজনকে মনের কথা খুলে বলতেন, তাই ও জানতে পেরেছিল যে, আমার বাবাও আমার মায়ের সঙ্গে এই রকমই করতেন– যখন ও আমাকে এই সব কথা বলেছিল, একদম সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল।

ধীরে ধীরে আমরা নিস্তব্ধতায় ডুবে গেলাম। ও আসত, নিজের জায়গাটায় চলে যেত, অথবা ও ছবি আঁকার জন্যে পোজ দিত (বনার্ড-এর দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত), অথবা ধারে কাছে পড়ে থাকা কোনো বই খুলে বসত আর একই ডিভানে বসে পড়তে শুরু করত, নানা রকম ভঙ্গী করে। পরে আমি ওকে আঁকি বা না আঁকি, আমাদের একটা নিয়মিত রুটিন হয়ে গিয়েছিল; ও আসবে, দরজায় শব্দ করবে, কিছু না বলে ঘরে ঢুকবে, কোণায় রাখা ডিভানটাতে শুয়ে পড়বে, বই পড়তে পড়তে পোজ দেবে, বা কখনো, ওর চোখের কোণ দিয়ে দেখবে যে আমি ওর স্কেচ করছি। প্রত্যেক দিন সকালে, কিছুক্ষণ কাজ করবার পরে আমার মনে আছে, আমি ভাবতে শুরু করতাম যে ও কখন আসবে, আর মনে পড়ে যে, ও আমাকে কখনোই বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাতো না, এবং ও মুখে সেই লজ্জার হাসি নিয়ে প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকে, নিজের বরাবরের জায়গায় শুয়ে পড়ত।

আমাদের যে সামান্য কথাবার্তা হত, তার একটা বিষয় ছিল, ভবিষ্যৎ। ওর মতে, আমি খুব মেধাবী, পরিশ্রমী এবং একদিন পৃথিবী বিখ্যাত চিত্রকর হয়ে যাব, এটাই আমার অদৃষ্ট– অথবা , ও কি বলেছিল, বিখ্যাত তুর্কী চিত্রকর?– এবং ও আমার ছবির প্যারিসের ভীড়-ঠাসা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওর ফরাসি বন্ধুদের নিয়ে আসবে আর গর্বভরে সবাইকে বলবে যে ও আমার 'ছেলেবেলার বন্ধু।'

একদিন সন্ধে বেলায় পরিষ্কার আকাশ দেখব বলে আর ঝড় বৃষ্টির পর উপত্যকার অপর দিকে আকাশে যে রামধনু উঠেছে, সেটা দেখব বলে আমরা দুজনে আমার অন্ধকার স্টুডিও থেকে এই প্রথমবার এক সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। এক সঙ্গে অনেক দূর হাঁটলাম। মনে আছে, আমরা কোনো কথা বলিনি,কিন্তু দুশ্চিন্তা ছিল, যদি কোনো চেনা জানা লোক, যে দু'চারজন এখনো ওই আধা খালি আবাসগুলোয় রয়ে গেছে, আমাদের দেখে ফেলে, তাছাড়া একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হয়তো আমাদের মায়েদের সঙ্গেও রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এই হাঁটাটা সম্পূর্ণ 'ব্যর্থ' হয়ে গেল, এ জন্য নয় যে, আমরা দেখতে পাওয়ার আগেই রামধনু মিলিয়ে গিয়েছিল, বরং আমাদের দুজনের মধ্যে যে লুকোনো মানসিক চাপ ছিল, সে জন্য। এই হাঁটার সময়ই আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম, ওর গলা কত লম্বা আর ওর হাঁটাটা কী মনোহারী।

আমাদের শেষ শনিবারের সন্ধ্যাবেলায় আমরা ঠিক করলাম এক সঙ্গে বাইরে যাব এবং তখনো আমাদের আবাসে থাকা কিছু কৌতূহলী ও সাধারণ বন্ধুদের কিছু না বলে আমরা দেখা করলাম। আমি বাবার গাড়িটা নিয়ে এসেছিলাম এবং প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলাম। ও মুখে মেকআপ করেছিল আর একটা খুব ছোট্ট স্কার্ট পড়েছিল আর গায়ে দিয়েছিল একটা অনবদ্য সুগন্ধী, যার গন্ধ অনেক পরেও গাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে ছিল। কিন্তু আমরা যে বিনোদনের জায়গায় যাবার জন্য বেরিয়েছিলাম, সেখানে পৌঁছানোর আগেই আমি সেই ভুতটাকে অনুভব করলাম, যে আমাদের আগের হাঁটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। সেই অর্ধেক খালি কিন্তু তবুও হট্টগোলে ভরা ডিসকথেক-এ, আমাদের স্টুডিওতে যে লম্বা শান্তিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ভোগ করতাম, তা ফিরিয়ে আনবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়, আমি আবিষ্কার করলাম যে, সেই নিস্তব্ধতা কত গভীর ছিল এবং তারপরে আমরা খানিকটা ধাতস্থ হলাম।

কিন্তু তবু আমরা ধীরলয়ের সংগীতের সঙ্গে নাচলাম। যেহেতু আমি অন্যদের করতে দেখেছি তাই আমিও ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সহজাত প্রেরণায় কাছে টানলাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, ওর চুলে বাদামের গন্ধ। ও যখন খাচ্ছিল, তখন ওর ঠোঁটের ছোট ছোট নড়াচড়াগুলো আমার খুব ভালো লাগছিল আর ও যখন দুশ্চিন্তা করছিল, তখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা কাঠবিড়ালী।

ওকে বাড়ি নিয়ে যাবার পথে গাড়িতে আমি নৈঃশব্দ্য ভাঙলাম, বললাম, 'এখন ছবি আঁকার মানসিকতা আছে কি?' বেশি উৎসাহ না দেখিয়ে ও রাজী হল কিন্তু আমরা যখন হাতে হাত ধরে আমাদের অন্ধকার বাগানে এলাম আর দেখলাম যে আমার স্টুডিও ঘরে আলো জ্বলছে– কেউ ভেতরে আছে কি?– ও তখন মত বদলাল।

পরের তিনদিন, ও প্রতিদিন আমার কাছে এল, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আমার আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে, হাতের বইটার দিকে তাকিয়ে, বাইরে সমুদ্রের ছোট ছোট বাঁকা ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে, তারপর যেমনি এসেছিল, তেমনি অগোচরে চলে গেল।

সে বছরের অক্টোবর মাসে ওর সাথে ইস্তাম্বুলে দেখা করার কথা আমার মাথায় আসেনি। আমি যে সব বই মর্মান্তিক আবেগে পড়তাম, তাড়াহুড়োতে যে সব ছবি আঁকতাম, আমার গোঁড়া বামপন্থী বন্ধুরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিন্দে পরস্পরকে খুনোখুনি করা মার্কসবাদীরা, জাতীয়তাবাদীরা এবং পুলিশরা– এই সব, আমাকে আমার গ্রীষ্মের বন্ধুদের এবং তাদের বেড়া দেওয়া গেট এবং রক্ষিবাহিনীওয়ালা বড়লোকি আবাসগুলো সম্বন্ধে লজ্জিত করে তুলেছিল।

কিন্তু নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যাবেলায়, ঘর গরম করার সুইচ দেওয়ার পর, আমি ওর বাড়িতে ফোন করলাম। যখন ওর মা ফোন তুললেন, আমি চুপচাপ ফোন রেখে দিলাম। পরের দিন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলাম কেন আমি ওই হাস্যকর ফোনটা করেছিলাম। আমি তখনো বুঝতে পারিনি যে, আমি প্রেমে পড়ে গেছি এবং তখনো আবিষ্কার করতে পারিনি যে, কী জিনিস আমাকে বার বার শিখতে হবে, যতবারই আমি প্রেমে পড়ব; আমার ওপর ভর হয়েছিল।

এক সপ্তাহ পরে, আরেকটা ঠান্ডা, অন্ধকার সন্ধ্যায় আমি আবার ফোন করলাম। এবার ও ফোন ধরল। আগে থেকেই কী বলব ঠিক করে রেখেছিলাম, তাই বারবার আউড়ানো স্বতঃস্ফূর্ততায় আমি বললাম ওর কি মনে আছে গ্রীষ্মকালের একদম শেষ দিকে যে ছবিটা আমি শুরু করেছিলাম, তার কথা? এখন ওটা শেষ করতে চাইছি, তাই ও কি যে কোনো বিকেলে আমার এখানে এসে পোজ দিতে পারবে?

'আমি কি সেই একই পোশাক পরব?' ও জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ওটা ভাবিনি। যাই হোক, আমি বললাম, 'হ্যাঁ, একই পোশাক পরে এস।'

কাজেই পরের বুধবার আমি ডেম দ্য সিঁয়ন-এর গেটে গেলাম, এখানে আমার মাও- এক সময়ে ছাত্রী ছিলেন, ওকে নেবার জন্যে। মা, বাবা, রাঁধুনি ও পরিচারক, যারা দরজার কাছে অপেক্ষা করছে, তাদের ভিড় থেকে দূরে সরে দাঁড়ালাম, আরো কয়েকটা যুবক দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের সঙ্গে পাশের গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম। গেট দিয়ে শয়ে শয়ে মেয়ে বেরিয়ে আসছে, সকলের পরনে ফরাসি ক্যাথলিক স্কুলের পোশাক- নেভি ব্লু স্কার্ট আর সাদা শার্ট- আর যখন ও ভীড় থেকে বের হয়ে এল, দেখে মনে হল যেন ও ছোট হয়ে গেছে, ওর চুল পেছন দিকে টেনে বাঁধা, দুহাতে স্কুলের বই, আর একটা প্লাস্টিক ব্যাগ যার মধ্যে করে ও পোজ দেবার পোশাক নিয়ে এসেছে।

যখন ও জানতে পারল যে, আমি ওকে আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি না, যেখানে আমার মা ওকে চা ও কেক খাওয়াতে পারতেন, বরং আমি ওকে সিহাঙ্গিরের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে মা সব আসবাবপত্র মজুত করে রাখতেন আর আমাকে স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করতে দিতেন, তখন ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু আমি ওখানে স্টোভটা জ্বালানোর পর আর গ্রীষ্মাবাস-এর মতো একটা ডিভান টেনে বার করে পেতে দেবার পর ও বুঝল যে আমি আঁকার ব্যাপারে খুব আন্তরিক, তখন ও সহজ হল, লজ্জিতভাবে পোষাক ছেড়ে লম্বা গ্রীষ্মকালীন পোশাকটা পড়ল আর সোফাতে এলিয়ে শুল।

এই রকম ভাবে এবং এটা যে একটা প্রেমের ব্যাপার এটা ঘোষণা না করে, একজন উনিশ বছর বয়েসি শিল্পীর এবং তার আরও ছোট বয়েসের মডেলের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা একটা অদ্ভুত সংগীতের সঙ্গে তালে তালে নাচতে লাগল। এ সংগীতের সুর বুঝি না, কিন্তু প্রাণের ভেতর বেজে যায়। শেষ্ট্রার দিকে ও সিহাঙ্গির-এর স্টুডিওতে পনেরোদিনে একদিন আসত। পরে সপ্তাহে একদিন। আমি একই রকমের অন্য ছবিও আঁকতে লাগলাম (সোফাতে শোয়া একটা অল্পবয়েসি মেয়ে)। এই সময় আমরা আরো কম কথা বলতাম। আমার আসল জীবনটা ছিল ঠাসা, স্থাপত্য কলেজে আমার পড়াশুনো, আমার বই, আমার চিত্রশিল্পী হবার পরিকল্পনা; আমি এই দ্বিতীয় জগতের পবিত্রতার মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে ভয় পেতাম, যদি এটা ধ্বংস হয়ে যায়, তাই আমি আমার প্রতিদিনের দুঃখকষ্টের কথা আমার দুঃখী সুন্দরী মডেলের সঙ্গে আলোচনা করতাম না। এই নয় যে, ও বুঝবে না- আমি শুধু আমার দুটো জগৎকে আলাদা রাখতে চাইতাম। আমার গ্রীষ্মকালীন বন্ধুদের এবং উঁচু স্কুলের সহপাঠীদের সম্বন্ধে আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম কারণ, তারা তাদের বাবাদের কারখানা ইত্যাদিতে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু- এখন আর আমি নিজের কাছ থেকেও লুকোতে পারছি না- সপ্তাহে একদিন কালো গোলাপের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমাকে সুখী করে তুলেছিল।

বৃষ্টির দিনে, ঠিক যখন আমি এই একই সিহাঙ্গির অ্যাপার্টমেন্টে আমার চাচিজীর অতিথি হয়ে থাকতাম, সেই রকমই পিক-আপ ট্রাকগুলো আর আমেরিকান গাড়িগুলো 'মুরগি উড়তে পারে না' গলি দিয়ে লড়াই করতে করতে ওপরে ওঠার বা নিচে নামার সময় রাস্তার পাথরে চাকা পিছলে যেত, আমরা সে আওয়াজ শুনতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যখন আঁকতাম, তখন আমাদের মধ্যেকার দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু ভালো-লাগা নৈঃশব্দের মাঝে কখনো কখনো আমাদের চোখে চোখ পড়ত। প্রথম দিকে ও তখনো খানিকটা বাচ্চা ছিল বলে, ও পোজ দেবার সময় হাসত, তারপরই ভয় পেয়ে যেত যে হয়তো পোজটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি ঠোঁট দুটো আবার বন্ধ করে আগেকার পোজে চলে যেত আর ওর গাঢ় বাদামি চোখের দৃষ্টি আমার চোখের ওপর রেখে দীর্ঘ নৈঃশব্দে ডুবে থাকত। এই সব দীর্ঘ নৈঃশব্দের শেষের দিকে, যখন আমি ওর মুখটা পর্যবেক্ষণ করতাম, ও আমার মুখ দেখে বুঝতে পারত যে, ওর মুখশ্রী আমার ওপর কী প্রভাব ফেলেছে, তাই, আমি যতক্ষণ ওর চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, ওর ঠোঁট আস্তে আস্তে বেঁকে গিয়ে একটা হাসি ফুটে উঠছে দেখতে পেতাম আর বুঝতাম যে, এই যে আমি দীর্ঘ সময় ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, এতে ও খুশিই হয়েছে। একবার যখন ও এই রকম, অর্ধেক সুখী, অর্ধেক বিষণ্ন হাসি হাসছে, আমার ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠছে (আমার হাতের তুলি লক্ষ্যহীনভাবে ক্যানভাসের ওপর ভাসছে) তখন ওই সুন্দরী মডেল, ও কেন হাসছে, সেটা আমাকে জানানোর অদম্য ইচ্ছায় নিজের পোজ নষ্ট করে বলল–

'তুমি যখন আমার দিকে এ রকম করে তাকিয়ে থাক, আমার দারুণ ভাল লাগে।'

আসলে, এর থেকেই বোঝা যায় যে ও কেন এসেছিল, শুধু তাই নয়, ও কেন প্রতি সপ্তাহে সিহাঙ্গির-এর এই ধূলি-ধূসরিত অ্যাপার্টমেন্টে আসত। কয়েক সপ্তাহ পরে আমি যখন আবার ওই একই হাসি ওর ঠোঁটে ফুটে উঠতে দেখলাম, আমি তুলি রেখে দিয়ে ওর পাশে সোফায় গিয়ে বসলাম আর কয়েক সপ্তাহ ধরে যা করার জন্য স্বপ্ন দেখেছিলাম, সাহস করে ওকে চুমু খেলাম।

আকাশটা ছিল কালো, অন্ধকার ঘরে আরাম ছিল, দেরিতে আছড়ে পড়া ঝড় আমাদের বিনা বাধায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। ডিভানে শুয়ে শুয়ে বসফোরাসের কালো জলের ওপর দিয়ে চুপিসারে বেয়ে যাওয়া নৌকোগুলোর সার্চলাইট আর অ্যাপার্টমেন্টের দেওয়াল চোখে পড়ছিল।

আমাদের দেখা হওয়া চলতেই থাকল। এখন আমি আমার মডেলকে নিয়ে খুব সুখী, কিন্তু আমি আমার ভেতরের ইচ্ছাগুলোকে কেন দমন করে রেখেছি, যে সব আবেগ আমি ভবিষ্যতে এই রকম অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করেছি– মিষ্টি মিষ্টি অর্থহীন কথা, ঈর্ষ্যার জ্বলুনি, ভয়, গোলমাল করে ফেলা এবং অন্য আবেগ-ঘটিত কাজ কারবার, আবেগের বাড়াবাড়ি? কারণ, এসব ব্যাপার তখন আমার বোধের বাইরে। হয়তো এই কারণে যে, আমাদের শিল্পী-মডেল সম্পর্কে,– যার জন্য আমরা একে অপরকে লক্ষ করেছিলাম এবং যে সম্পর্ক এখনো আমাদের এক সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, নৈঃশব্দের প্রয়োজন ছিল। অথবা হয়তো এই কারণে যে, আমার মনের কোনো গোপন কোণায়, অল্প বয়সের লজ্জায় আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছিলাম। যদি আমি কোনোদিন ওকে বিয়ে করি, তাহলে আমাকে শেষ পর্যন্ত কারখানার মালিক হতে হবে, শিল্পী নয়।

এইভাবে নীরব আঁকা আর নীরব প্রেমের মধ্যে দিয়ে নটা বুধবার কেটে গেল। তারপর এল সুখী শিল্পী আর তার মডেল-এর মধ্যে একটা অতি সরল দুশ্চিন্তার ঢেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মা, যিনি নিজের ছেলে কী করছে তা না দেখে বেশি দিন থাকতে পারতেন না, সিহাঙ্গির-এ আমার স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে এলেন, এখানে তিনি পুরোনো আসবাবপত্র মজুত করে রাখতেন। আমার আঁকা ছবিগুলো দেখতে দেখতে, বোনার্ডের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, তিনি আমার সুন্দরী মডেলকে চিনে ফেললেন। যখনই আমি একটা ছবি আঁকা শেষ করতাম, আমার বাদামি-চুলো প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করে আমার বুক ভেঙে দিত, 'এটা কি আমার মতো দেখতে হয়েছে?' (সেটা কোনো জরুরী ব্যাপার নয়, জ্ঞানী ছেলেটি জবাব দিত), কাজেই আমার মা ছবির মধ্যে দিয়ে ওকে চিনতে পেরেছেন জেনে হয়তো আমাদের দুজনেরই আনন্দ হয়েছিল– ও ওর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল– কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের চিন্তা হল যে, আমার মা ওর মাকে টেলিফোন করবেন এবং আমরা দুজনে কত ঘনিষ্ঠ হয়েছি, তাই নিয়ে হয়তো বকবক করবেন। কালো গোলাপের মা জানতেন যে তার মেয়ে প্রতি বুধবার ফরাসি দূতাবাসে নাটকের ক্লাশ করতে যায়। ওর মেজাজী বাবার সম্বন্ধে কোনো কথা না বলাই ভালো।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুধবারের দেখা করাটা বন্ধ করে দিলাম। কিছুদিন পরে আমরা অন্যদিনে দেখা করতে লাগলাম, সেই সব বিকেলে, যখন ওর স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যেত, অথবা সেই সব সকালে, যখন আমি ক্লাশ পালাতাম। যেহেতু আমার মা-র হানাদারি অব্যাহত ছিল, আর আমাদের ছবি আঁকার ও দীর্ঘ নৈঃশব্দ উপভোগ করার মতো যথেষ্ট সময় ছিল না, আর যেহেতু আমার এক স্কুলের সহপাঠীকে, যাকে কোনো একটা রাজনৈতিক অপরাধের জন্য পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমাদের সিহাঙ্গির অ্যাপার্টমেন্টে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আমরা ওখানে যাওয়া ছেড়েই দিলাম। তার বদলে আমরা ইস্তাম্বুলের রাস্তায় রাস্তায় হাঁটা শুরু করলাম, নিশান্তাসি, বিওগলু, টাকসিম এবং অন্যান্য জায়গাগুলো, যেখানে পরিচিত লোকদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, সেই জায়গাগুলো থেকে দূরে; আমরা টাকসিমে দেখা করতাম, হারবিয়ে-র ডেম দ্য সিঁয়ন থেকে মাত্র চার মিনিটের হাঁটা পথ আর আমার টাস্‌কিস্‌লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অতটাই দূর, তারপর একটা বাসে উঠে আরো দূরে কোথাও চলে যেতাম।

আমরা বেয়াজিৎ স্কোয়ার দিয়ে শুরু করলাম, যেখানে সিনারাল্‌তি কাফে তার পুরোনো চেহারা বজায় রেখেছে (ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের গেটে রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কাফে-র ছোকরা ওয়েটারগুলো নিজেদের স্বাভাবিক আদব-কায়দা বজায় রেখেছিল); বেয়াজিৎ জাতীয় গ্রন্থাগারের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি গর্ব করে বলতাম যে, এই গ্রন্থাগারে তুরস্কে প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের একটি করে কপি আছে; আমি ওকে সাহাফ্লার পুরোনো বই-এর বাজারে নিয়ে গেলাম, যেখানে খুব ঠান্ডার দিনে দোকানদাররা তাদের ছোট ছোট দোকানে গ্যাস আর ইলেকট্রিক স্টোভের চারপাশে ঘিরে বসে থাকত; আমি ওকে ভেজ্‌নেসিলার-এর রঙ না করা কাঠের বাড়িগুলো, বাইজান্টাইন ধ্বংসস্তূপ আর ডুমুর গাছের সারি দেওয়া রাস্তাগুলো দেখালাম; এবং আমি ওকে 'ডেফা বোজা, দোকানে নিয়ে গেলাম, যেখানে শীতের সন্ধ্যায় আমার চাচা কখনো কখনো আমাদের নিয়ে যেতেন, ওখানকার বিখ্যাত ঘোলের সরবৎ চাখাবার জন্য এবং যেখানে আমি ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখালাম, আতাতুর্কের নিজস্ব 'বোজা' গ্লাস, এখন দেওয়ালে একটা ফ্রেমের মধ্যে রাখা আছে। এই যে একটা ধনী, প্রায় ইউরোপীয়ান হয়ে যাওয়া নিশান্তাসি-র মেয়ে, যে কিনা বেবেক ও টাকসিমের সমস্ত ফ্যাশন-দুরস্ত দোকান ও রেস্তরাঁগুলো জানে, সে কিনা আমার দেখানো সব কিছুর মধ্যে থেকে ইস্তাম্বুলের গোল্ডেন হর্ন পেরিয়ে একটা গরীব, পুরোনো বিষণ্ণ পেছনের রাস্তায়, একটা 'বোজা' গ্লাস, যা কিনা গত পঁয়ত্রিশ বছরে একবারও ধোয়া হয়নি, তার প্রতি এত অখণ্ড মনোযোগ দেবে, এটায় কিন্তু আমি অবাক হইনি। আমি আমার সঙ্গিনীকে নিয়ে খুশিই ছিলাম, ও আমারই মতো দুহাত কোটের পকেটে গুঁজে, আমারই মতো তাড়াতাড়ি হাঁটা পছন্দ করে আর সব জিনিসের দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে, যেমন আমি দু'তিনবছর আগে একা একা এই সব জায়গায় ঘোরার সময় করতাম। আমার নিজেকে আগের চেয়ে ওর আরো কাছাকাছি এসেছি বলে মনে হল, আমার পেটের ভেতর কেমন জানি এক ধরনের ব্যথা হচ্ছিল, যেটা প্রেমে পড়ার আর একটা চিহ্ন, যা আমি তখনো আবিষ্কার করতে পারিনি।

আমারই মতন, ও-ও প্রথমদিকে, সুলেমানিয়ার এবং জেইরেক-এর দারিদ্র্য-পীড়িত পেছনের রাস্তাগুলোর শতাব্দী-প্রাচীন কাঠের বাড়িগুলো দেখে কষ্ট পেয়েছিল, বাড়িগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, সামান্য একটু ভূ-কম্প হলেই বাড়িগুলো ধবসে পড়বে। ওর স্কুলের উল্টোদিকে 'ডোলমাস' বাসস্টপ থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের দূরত্বে মিউজিয়াম অব পেন্টিং অ্যান্ড স্কাল্প্চার-এর শূন্যতা দেখে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। গরীব মহল্লাগুলোর অব্যবহার্য ফোয়ারাগুলো, কাফেতে বসে রাস্তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সাদা দাড়িওয়ালা, মাথায় সেঁটে-বসা টুপি পরা বুড়ো মানুষগুলো, জানালায় বসে থাকা বুড়ি চাচিরা, যারা প্রত্যেকটি পথচারীর দিকে এমনভাবে তাকায় যেন তারা দাস-ব্যবসায়ী হলেও হতে পারে, মহল্লার লোকেরা, যারা আমাদের শোনানোর মতো উঁচু গলায় নিজেদের মধ্যে আমরা কে, তা আন্দাজ করার চেষ্টা করে (এই দুজনকে দেখে কী মনে হয়, বড় ভাই?– ওরা ভাই-বোন, দেখতে পাচ্ছ না?-দেখ, ওরা ভুল রাস্তায় মোড় নিয়েছে)– এই সবকিছু ওর মধ্যে, ঠিক আমার মতোই একই লজ্জা আর বিষণ্ণতা জাগিয়ে তুলেছিল। বাচ্চারা রাস্তায় আমাদের পিছু ধাওয়া করত, টুকটাক ছোটখাট জিনিস বিক্রি করার জন্য, অথবা শুধুই কথা বলার জন্য (ট্যুরিস্ট, ট্যুরিস্ট, তোমার নাম কী?) কিন্তু ও তাতে আমার মতো অবাক হয়ে যেত না, বরং জিজ্ঞাসা করত, 'ওরা কেন আমাদের বিদেশি ভাবছে?'– তা সত্ত্বেও, আমরা নুরুওসমানিয়ার ছাদ-ঢাকা বাজার এবং দোকানগুলো থেকে দূরে থাকতাম। যখন আমাদের ইন্দ্রিয় উত্তেজনা অসহ্য হয়ে উঠত, তখনো ও সিহাঙ্গির-এ ছবি আঁকার জন্য যেতে চাইত না, আমরা বেসিকটাস-এ ফিরে যেতাম, আমরা প্রথম ফেরীতে উঠে (৫৩ ইনসিরিয়া) বসফোরাস দিয়ে, যতটা সময় হাতে থাকত, ততক্ষণ চলে যেতাম, পাতাঝরা ঝোপ-ঝাড়গুলো দেখতাম, উত্তুরে বাতাস বইলে 'ইয়ালি'গুলোর সামনের সমুদ্র কেমন কাঁপত দেখতাম, আকাশের মেঘগুলোকে বাতাস একধার থেকে আরেকধারে ঠেলে নিয়ে গেলে দ্রুত বহমান জলের স্রোত কীভাবে রঙ পাল্টায় দেখতাম, আর দেখতাম চারপাশের বাগানগুলো, পাইন গাছে ভরা। অনেক বছর পরে আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি, কেন আমরা এই সব হাঁটার সময়, সমুদ্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরে বেড়ানোর সময় হাত ধরাধরি করে চলিনি; অনেকগুলো কারণ খুঁজে বের করেছি : ১) আমরা ছিলাম দুটি ভীরু বালক-বালিকা, যারা ইস্তাম্বুলের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতাম, আমাদের ভালোবাসাকে অনুভব করতে নয়, গোপন করতে। ২) যে সব প্রেমিক লোকসমক্ষে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ায়, তারা সুখী, আর সবাইকে দেখাতে চায় যে তারা সুখী। কিন্তু আমি, যদিও মানতে রাজী যে আমরাও সুখী ছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা ওপর ওপর লোক-দেখানো মনে হতে পারে, আমার এই ভয় ছিল। ৩) এই ধরনের সুখী ভঙ্গিমা আমাদের বিদেশি পর্যটকে পরিণত করত, যারা এই সব গরীব, ধ্বংসপ্রাপ্ত রক্ষণশীল মহল্লাগুলোয় বেপরোয়া স্ফূর্তির জন্য আসত। ৪) এই গরীব মহল্লাগুলোর, ধ্বংসপ্রাপ্ত, ক্ষতবিক্ষত ইস্তাম্বুলের বিষণ্নতা অনেক দিন আগেই আমাদের গ্রাস করেছিল।

যখন এই বিষণ্নতা আমার ওপর পাথরের মতো চেপে বসত, তখন আমি ছবি আঁকার জন্য সিহাঙ্গির-এ পালিয়ে যেতে চাইতাম, যে ছবি যে কোনোভাবে এই ইস্তাম্বুলের দৃশ্যের সমান্তরাল হবে, অবশ্য সে ছবি কেমন দেখতে হবে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি খুব শিগগিরই আবিষ্কার করলাম যে, আমার সুন্দরী মডেল তার বিষণ্নতার জন্য সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আরোগ্যের রাস্তা খোঁজে এবং সেটাই হল আমার প্রথম স্বপ্নভঙ্গ।

টাকসিমে দেখা হওয়ার পর ও বলল, 'আজকে আমার খুব বাজে লাগছে। চা খেতে হিলটন হোটেলে গেলে তোমার কি খুব খারাপ লাগবে? আজকে কোনো গরীব পাড়ায় গেলে আমার আরো খারাপ লাগবে। অবশ্য, আমাদের হাতে আজ বেশি সময়ও নেই।'

তখনকার দিনে, বামপন্থী ছাত্ররা যে ধরনের সেনাবাহিনীর কোট পরত, আমার পরণে ছিল সেই আর্মি কোট; আমি দাড়ি কামাইনি, আর আমাকে যদি হিলটন হোটেলে ঢুকতেও দেয়, আমার কাছে কি চা খাবার মতো যথেষ্ট টাকা আছে? আমি কিছুক্ষণ টালবাহানা করলাম, তারপর হোটেলে গেলাম। হোটেলের লবিতে বাবার এক ছেলেবেলার বন্ধু আমাদের চিনে ফেললেন। উনি প্রতিদিন বিকেলে এখানে চা খেতে আসেন আর ভান করেন যে, উনি ইউরোপে আছেন। আমার বিষণ্ন প্রেমিকার সঙ্গে করমর্দন করে তিনি আমার কানে কানে বললেন যে, আমার মেয়ে বন্ধুটি অতীব সুন্দরী। ওঁর প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা আমাদের ছিল না।

'আমার বাবা আমাকে স্কুল ছাড়িয়ে সুইজারল্যান্ডে পাঠাতে চান,' আমার প্রেমিকা বলল, ওর বড় বড় চোখের কোণ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে ওর হাতে ধরা চায়ের কাপে পড়ল।

'কেন?'

ওরা আমাদের ব্যাপার জেনে গেছে। জিজ্ঞেস করব কি, ওরা আমাদের বলতে কাদের বোঝায়? আমার আগে যে সব ছেলেকে ও ভালোবেসেছিল, তারাও কি ওর বাবার মধ্যে এই রকম ঈর্ষ্যা আর রাগ উৎপন্ন করেছিল? আমিই বা কেন এত বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ? মনে পড়ে না, এই সব প্রশ্ন করেছিলাম কিনা। ভয় এবং আত্মস্বার্থ আমার হৃদয়কে অন্ধ করে দিয়েছিল, আর আমি নিজেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, ওকে হারাতে হবে– আমার জন্যে যে কি নিদারুণ যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে, কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু আমার রাগও হচ্ছিল, কারণ ও এখন আমার ডিভানে শুয়ে পোজ দিতে অস্বীকার করছে, আমাকে ভালোবাসতে দিতে অস্বীকার করছে।

'বুধবারে আমরা সিহাঙ্গির-এ ভালোভাবে কথাবার্তা বলতে পারি,' আমি বললাম, 'নুরি চলে গেছে, ঘরটা খালি।'

কিন্তু পরের দিন দেখা হতে আমরা সেই মিউজিয়ামেই গেলাম। এটাই আমরা অভ্যাস করে নিয়েছিলাম, কারণ ওর স্কুল থেকে এখানে তাড়াতাড়ি চলে আসাটা খুব সোজা, আর একটা খালি বসবার জায়গা (গ্যালারি) পাওয়াও খুব সোজা, যেখানে বসে আমরা চুমু খেতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে এলে আমরা শহরের ঠান্ডা বিষাদ থেকে রক্ষা পাই। কিন্তু কিছু সময় পরে খালি মিউজিয়াম এবং তার বেশির ভাগ জঘন্য ছবিগুলো আমাদের শহরের চাইতেও শক্তিশালী বিষণ্নতায় ভরিয়ে তোলে। এতদিনে মিউজিয়ামের প্রহরীরাও আমাদের জেনে গেছে এবং এক ঘর থেকে আরেক ঘরে আমাদের অনুসরণ করে এবং যেহেতু এতে আমাদের মধ্যেকার মানসিক চাপ আরো তেতো হয়ে যায়, তাই আমরা মিউজিয়ামে চুমু খাওয়াও বন্ধ করে দিলাম।

আমরা শিগগিরই একটা রুটিন করে ফেললাম, যা এর পরের নিরানন্দ দিনগুলোতে আমাদের সঙ্গেই ছিল। আমরা দুই বুড়ো প্রহরীকে আমাদের ছাত্রের পরিচয়-পত্র দেখাতাম, আর ওরাও ইস্তাম্বুলের মিউজিয়ামের অন্য এই রকম আধিকারিকদের মতো আমাদের দিকে খিটখিটে দৃষ্টিতে তাকাত, যেন জিজ্ঞাসা করবে, 'এই জায়গায় তোমরা কী দেখতে এসেছ?' আমরা মিছিমিছি হাসি খুশি গলায় ওদের জিজ্ঞাসা করতাম, কেমন আছে, তারপরেই সোজা মিউজিয়ামের ছোট বনার্ড এবং খুব ছোট মাতিসে দেখতে চলে যেতাম। শ্রদ্ধার সঙ্গে ওঁদের নামগুলো ফিসফিস করে উচ্চারণ করতাম, তারপরেই তাড়াতাড়ি তুর্কী শিক্ষক চিত্রকরদের যন্ত্রণাময়, প্রেরণাবিহীন ছবিগুলো পার হয়ে যেতাম। যে ইউরোপিয়ান গুরুদের এরা অনুকরণ করেছিলেন, তাদের নামগুলো আবৃত্তি করতাম: সেজান, লেগার, পিকাসো। আমাদের যেটা মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল, সেটা হল এই যে, এই শিল্পীরা, যাদের বেশির ভাগই মিলিটারি স্কুল থেকে এসেছিলেন এবং ইউরোপে পড়াশুনা করেছিলেন, এরা পাশ্চাত্য শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা এই শহরের অনুভব, স্পর্শ, আত্মার খুবই সামান্য অংশ তাদের ছবিতে ধরতে পেরেছিলেন, যে শহরে আমরা এত ভালোবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।

এই মিউজিয়াম বাড়িটা আসলে তৈরি হয়েছিল ডোলমাবাসে রাজপ্রাসাদের যুবরাজের জন্য এবং যে ঘরে আতাতুর্কের মৃত্যু হয়, সেখান থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে-এই জায়গার এত কাছে আমরা চুমু খেয়েছি, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু এই বাড়িতে আমাদের আসার আসল কারণ, গ্যালারি ফাঁকা থাকে বলে নয়, বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্তাম্বুলের ক্লান্তিকর দারিদ্র্যের পরে এই বাড়ির উঁচু সিলিং-এ এবং অপূর্ব পেটা-লোহার ব্যালকনিতে অতীত অটোমান সমৃদ্ধির ছোঁয়া আছে বলে নয়, এবং দেওয়ালের অনেক ছবির চাইতেও অনেক অনেক সুন্দর এই বাড়ির বিশাল বিশাল জানালা দিয়ে বসফোরাসের দৃশ্য দেখা যায় বলে নয়, আমরা যে বার বার ফিরে ফিরে এখানে আসি, তার আসল কারণ হচ্ছে আমাদের প্রিয় একটি ছবি।

এই ছবিটা হচ্ছে হালিল পাশার আঁকা 'রিক্লাইনিং উওম্যান।' হিলটন-এর লবির পর আমাদের প্রথম দেখার দিন, আমরা পুরো মিউজিয়ামের পাশ কাটিয়ে সোজা এই ছবিটার দিকে চলে আসি; এই ছবির মডেল একটা অল্প বয়েসি মেয়ে, যে, আমি প্রথম দিনই এত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, নিজের পায়ের চটিটা লাথি মেরে ছুড়ে একটা নীল রঙের ডিভানে এলিয়ে শুয়ে পড়েছে এবং শিল্পীর দিকে বিমর্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে(ওর স্বামী?), একটা হাতকে বালিশ করেছে, যেমন আমার মডেল অনেক বার করেছে। এই আশ্চর্য সাদৃশ্যই যে এই ছবির দিকে আমাকে টেনে এনেছে, তাই নয়; এই ছোট পাশের গ্যালারিতে যেখানে ছবিটা টাঙানো আছে, আমাদের প্রথম আসার দিনই, এই ছবির মডেলটি আমাদের চুমু খেতে দেখেছে। যখনই আমরা একটা বুড়ো সন্দেহপ্রবণ প্রহরীর নকশা-কাটা কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে হেঁটে আসার শব্দ শুনতে পেতাম, আমরা থেমে গিয়ে সোজা হয়ে বসতাম, এবং ছবিটা নিয়ে খুব গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়তাম; কাজেই ছবিটা সম্বন্ধেও আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব জেনে গিয়েছিলাম। এর সঙ্গে আমরা এনসাইক্লোপিডিয়াতে হালিল পাশা সম্বন্ধে যা পেয়েছিলাম, তা যুক্ত করতাম।

'সূর্য ডোবার পরে মেয়েটার পা নিশ্চয়ই ঠান্ডা হয়ে যায়,' আমি বললাম।

AMARBOI.COM

'খারাপ খবর আছে,' আমার প্রেমিকা বলল। আর আমি যতবারই ছবিটার দিকে তাকাচ্ছি, ততবারই ওকে হালিল পাশার মডেলের মতো দেখতে লাগছে। 'আমার মা একজন ঘটককে ডেকেছে আর আমাকে দেখা করতে বলেছে।'

'তা, তুমি কি দেখা করবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ব্যাপারটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে ছেলেটার কথা বলছে, সে কার না কার ছেলে, আমেরিকায় পড়াশুনো করেছে।' ও বিদ্রূপের স্বরে ফিসফিস করে আমাকে ছেলেটার ধনী পরিবারের নামটা বলল।

'তোমার বাবা ওদের চেয়ে দশগুণ বড়লোক।'

'কেন বুঝছ না? ওরা তোমার কাছ থেকে আমাকে সরানোর জন্যে এই সব করছে।'

'তাহলে তুমি কি ঘটকের সঙ্গে দেখা করবে যখন ও কফি খেতে আসবে?'

'এটা কোনো ব্যাপার নয়। আসলে আমি বাড়িতে অশান্তি চাই না।'

'চল, আমরা সিহাঙ্গির যাই', আমি বললাম। 'আমি তোমার আর একটা ছবি আঁকব। আরেকটা 'রিক্লাইনিং উওম্যান'। আমি তোমাকে চুমু খাব, চুমু খাব।'

আমার প্রেমিকা, আস্তে আস্তে আমার মোহটা বুঝতে পারছে এবং ইতিমধ্যেই আমাকে ভয় পেতে আরম্ভ করেছে, আমাদের দুজনকেই যে প্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছে, সেটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করল, 'আমার বাবা প্রচণ্ড রেগে আছেন, কারণ তুমি শিল্পী হতে চাও,' ও বলল, 'তুমি একটা গরীব, মোদো মাতাল শিল্পী হবে, আর আমি হব তোমার নগ্ন মডেল... উনি এটাই ভয় পাচ্ছেন।'

ও হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। আমাদের প্রহরীকে আস্তে আস্তে নক্সা-কাটা কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে আসতে শুনে আমরা অভ্যাস মতো ঘুরে বসলাম, যদিও আমরা চুমু খাচ্ছিলাম না, আর ওই ছবিটা সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলাম। কিন্তু আমি আসলে জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম, তার মেয়ে যে ছেলে বন্ধুর সঙ্গেই বেরোক, সে ছেলে ভবিষ্যতে কী হবে না হবে আর তোমাকে কখন বিয়ে করবে না করবে সেটা তোমার বাবার জানার কী দরকার? আমি আরও বলতে চাইছিলাম, 'তোমার বাবাকে জানিয়ে দিও যে, আমি একজন স্থপতি হবার জন্য পড়াশুনো করছি।' (যদিও আমি ওর বাবার ভয়ের উত্তর দেবার চেষ্টা করছিলাম, আমি বুঝতে পারছিলাম যে, এটা করা মানে নিজেকে এখন থেকে একটা সপ্তাহান্তের শিল্পী বানিয়ে রাখা।) প্রত্যেক বার আমি ওকে আমার সঙ্গে সিহাঙ্গির-এ আসতে বলতাম আর ও অস্বীকার করত। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই চলল। আমার মাথা আর ঠান্ডা থাকছিল না। মনে হচ্ছিল চিৎকার করে বলি, 'শিল্পী হলে কী ক্ষতি?' কিন্তু উত্তরাধিকারীর জন্যে বানানো এই জাঁকালো অ্যাপার্টমেন্টের খালি ঘরগুলো, এখন তুরস্কের 'ফার্স্ট মিউজিয়াম অব পেন্টিং অ্যান্ড স্কালপচার, তার দেওয়ালে টাঙানো জঘন্য ছবিগুলোর মতোই, আমার প্রশ্নের উত্তর। হালিল পাশার ওপর লেখা একটা বই পড়ে জানতে পারলাম যে, হালিল পাশা ছিলেন একজন সৈনিক এবং বুড়ো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর একটা ছবিও বিক্রি করতে পারেননি এবং তিনি এবং তাঁর দুঃখী স্ত্রী, যিনি এই ছবিটার মডেল, সেনানিবাসেই বাস করতেন আর সেখানকার ক্যান্টিনে মিতব্যয়ী আহার করতেন।

এরপরে আবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হল, আমি ওকে আনন্দ দেবার খুব চেষ্টা করলাম, যুবরাজ আব্দুল মেসিতের গুরুগম্ভীর ছবিগুলো (হারেমে গ্যেটে, হারেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিটোফেন) দেখিয়ে হাসাতে চেষ্টা করলাম। তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমরা কি সিহাঙ্গির-এ যাব?' যদিও আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, বলব না। আমরা হাত ধরাধরি করে চুপ করে বসে রইলাম। 'আমি কি তোমাকে অপহরণ করছি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কদিন আগে দেখা একটা ফিল্মের থেকে ধার করা ভঙ্গীতে।

পরে আরেকবার দেখা করার পর আমরা মিউজিয়ামে বসে ছিলাম 'রিক্লাইনিং উওম্যান'-এর সামনে, তখন আমার দুঃখী সুন্দরী মডেল, দু'গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা বইছে, বলল যে, ওর বাবা নিয়মিত ওর ভাইদের মারধোর করেন, অথচ নিজের মেয়েকে এত ভালোবাসেন যে, কখনো কখনো মনে হয় বিকারগ্রস্ত এবং তিনি অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপ্রবণ, সেই জন্য ও বাবাকে আর তাঁর ঈর্ষ্যাকে খুব ভয় পায় অথচ বাবাকে খুব ভালোও বাসে। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারছে যে, ও নিজের বাবার চাইতেও আমাকে বেশি ভালোবাসে আর তার পরবর্তী সাত সেকেন্ডের মধ্যেই করিডর থেকে প্রহরীর আমাদের ঘরে আসার আগেই আমরা এমন নিবিড়ভাবে এমন আশ্লেষে চুমু খেলাম যে, আগে কখনো আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। চুমু খাবার সময় আমরা পরস্পরের মুখ হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলাম যেন ওগুলো পোর্সিলিনের মতো ভঙ্গুর।

হালিল পাশার স্ত্রী তার চমৎকার ফ্রেমের মধ্যে থেকে আমাদের দিকে বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। যখন প্রহরী দরজায় এসে দাঁড়াল, আমার প্রিয়া বলল, 'তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল।'

'ঠিক আছে, তাই করব।'

আমার দাদীমার কাছ থেকে আমি যে পকেট খরচা পেতাম, সেটা বাঁচানোর জন্য আমি ক'বছর আগে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। রুমেলি এভিনিউ-এ একটা দোকানের এক-চতুর্থাংশের মালিকও আমি, এটা আমার বাবা-মার'র একটা ঝগড়ার পর ঠিক করা হয়েছিল। এছাড়া বেশ কিছু সিকিউরিটিও আমার নামে আছে, যদিও জানি না সেগুলো কোথায়। যদি আমি গ্রাহাম গ্রীনের একটা উপন্যাস দিন পনেরোর মধ্যে অনুবাদ করতে পারি, তা হলে সেটা আমার বন্ধু নুরীর (ওকে এখন আর পুলিশ খোঁজে না) এক প্রকাশক বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি; আমার হিসেব মতো এই অনুবাদের জন্য যে টাকা আমি পাব, তাতে সিহাঙ্গির-এ আমার স্টুডিও-র মতো ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্টের দু'মাসের ভাড়া হয়ে যাবে আর সেখানে আমার সুন্দরী মডেলকে নিয়ে থাকতে পারব। অথবা হয়তো, ওকে অপহরণ করলে, আমার মা (যিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইদানিং কেন আমি দুঃখকষ্টে আছি বলে মনে হচ্ছে) আমাদের ওপর করুণা করে আমাদের সিহাঙ্গির-এর অ্যাপার্টমেন্টটা দিয়ে দেবেন।

এক সপ্তাহ ধরে নানা রকম চিন্তা ভাবনা করার পর একটা বাচ্চা ছেলে যেমন বড় হয়ে দমকল বাহিনীর কর্মী হতে চায়, তার চেয়ে বেশি বাস্তবানুগ একটা সিদ্ধান্তে আসার পর, আমরা টাকসিমে দেখা করার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু এই প্রথমবার ও আসতে পারল না। এবং আমি দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও। সেদিন সন্ধ্যায়, কাউকে না বলতে পারলে আমার মাথার ঠিক থাকবে না ভেবে আমার রবার্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যাকাডেমির বন্ধুদের ডেকে পাঠালাম, যাদের সঙ্গে অনেকদিন আমার দেখা হয়নি। বিওগলুর একটা শুঁড়িখানায় আমাকে একদম মাতাল অবস্থায় দেখে ওরা হাসতে লাগল আবার খুশিও হল এই দেখে যে, আমি প্রেমে পড়েছি, মানসিক যন্ত্রণা পাচ্ছি আর একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছি। ওরা আমাকে মনে করিয়ে দিল যে, আমি ওর বাবার অনুমতি ছাড়া একটা কমবয়েসি মেয়েকে যদি বিয়ে না-ও করি, যদি আমি শুধু ওর সাথে একবাড়িতে বাস করি, তাহলেও আমাকে জেলে ভরে দেবে। এরপরেও আমি যখন জোরে জোরে চেঁচিয়ে আবোল-তাবোল বকতে লাগলাম, তখন ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি যদি লেখাপড়া বিসর্জন দিয়ে ওকে নিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করতে থাকি, তাহলে আমি শিল্পী হবো কী করে– ওরা যখন এসব কথা বলল, তখনো আমার কোনো মানসিক বিপর্যয় হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত, বন্ধুত্বের খাতিরে, ওরা আমাকে একটা অ্যাপার্টমেন্টের চাবি দিল, যেখানে আমি ইচ্ছে করলেই আমার 'এলানো মেয়ে'র সঙ্গে শুতে পারি।

ডেম দ্য সিয়ন-এর গেটে ভীড়ের মধ্যে দু'দিন বাইরে অপেক্ষা করার পর, অবশ্যই একটু দূরে এক কোণায় লুকিয়ে থেকে, আমি শেষ পর্যন্ত আমার উঁচু স্কুলের ছাত্রী প্রেমিকাকে অপহরণ করতে সমর্থ হলাম। আমি ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যদি ও আমার সাথে এই অ্যাপার্টমেন্টে আসে (যেখানে আমি ইতিমধ্যেই গিয়ে কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করেছি) কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না। শেষ পর্যন্ত ওকে বিশ্বাস করাতে সফল হলাম। পরে আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, শুধু আমার সদ্বিবেচক রবার্ট অ্যাকাডেমির বন্ধুই এই কুঠি ব্যবহার করেনি, ওর বাবাও এটা ব্যবহার করত, এবং এটা এমনই একটা ভীতিপ্রদ জায়গা ছিল যে, আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার কালো গোলাপ এখানে কখনোই ছবি আঁকার জন্য পোজ দেবে না, তাতে আমাদের যতই ভালো বোধ হোক না কেন। এই অ্যাপার্টমেন্টের অন্যান্য আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল দেওয়ালে ঝোলানো একটা ব্যাংকের ক্যালেন্ডার, আর একটি তাক, যেখানে দু'বোতল জনি ওয়াকারের মাঝখানে রাখা ছিল এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বাহান্নটা খণ্ড, আর এখানে ছিল একটা বিশাল বিছানা, যেটাতে আমরা তিনবার দুঃখী দুঃখী, রাগী রাগী প্রেম করেছিলাম। যখন আমি দেখলাম যে ও আমাকে, আমি যা ভাবি, তার চাইতেও বেশি ভালোবাসে, যখন দেখলাম ওর সঙ্গে শারীরিক মিলনের সময় ও কেমন শিউরে শিউরে উঠত, যখন দেখলাম যে প্রায়ই কত সহজেই ও কেঁদে ফেলত, আমার পেটের ভেতর যন্ত্রণাটা তীব্র হয়ে উঠত, কিন্তু আমি যখন সেটা সরিয়ে ফেলতে চাইতাম, তখন আগের চেয়ে আরো অসহায় বোধ করতাম। কারণ যখনই ওর সঙ্গে দেখা হত, ও কেবলই বলত যে, ওর বাবা ফেব্রুয়ারি মাসের ছুটিতে সুইজারল্যান্ডে নিয়ে যাবে স্কি করার জন্যে আর ওকে ওখানকার একটা শৌখিন স্কুলে, যেখানে ধনী আরবরা আর পাগল আমেরিকানরা পড়ে, সেখানে ভর্তি করে দেবে। ওর গলায় যে ভয় ফুটে উঠত, আমি সেটা বিশ্বাস করতাম, কিন্তু আমি যখন নিজেকে তুর্কী ফিল্মের একটা শক্ত চরিত্রের নকল করে ওকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করতাম, প্রতিজ্ঞা করতাম যে, ওকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালিয়ে যাব, তখন আমার প্রিয়ার মুখে যে খুশির ছায়া দেখতাম, তাতে আমিও নিজেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে, স্কুলের ছুটি শুরু হওয়ার আগের আমাদের শেষ দেখা হওয়ার দিনে, এগিয়ে আসা বিপর্যয়ের কথা মন থেকে দূর করতে আর চাবিটা দেওয়ার জন্য আমার বন্ধুকে ধন্যবাদ দিতে, আমরা আমাদের সহৃদয় বন্ধুর সাথে দেখা করলাম। আরো কয়েকজন সহপাঠীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং সেই সন্ধ্যাতেই ওরা প্রথম আমার প্রেমিকাকে দেখল। প্রত্যেকটি বন্ধু যখন আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চিমটি কাটতে লাগল, তখনই আমার মনে পড়ল যে কেন আমি সহজাত প্রবৃত্তিতেই বুঝে গিয়েছিলাম, আর তাই, আমার বিভিন্ন বন্ধু চক্রকে একে অপরের সঙ্গে মেশাইনি। যে মুহূর্তেই ওদের দেখা হল, তখন থেকেই আমার কলেজের বন্ধুদের আর কালো গোলাপের মধ্যে ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেল। ওর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্য ওরা আমাকে নিয়ে উপহাস করতে লাগল। কিন্তু ও তাতে যোগ দিল না। পরে ওদের খুশি করার জন্যে, ও ওদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় যোগ দিল বটে, কিন্তু সেগুলো অন্য সময় ভালো লাগলেও তখন একেবারে বোকা বোকা লাগছিল। ওকে যখন ওরা ওর বাবা-মার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিল, ওরা কী করেন এবং কোথায় থাকেন, আর টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন, তখন ও এসব কথা মাঝ পথেই থামিয়ে দিল, বুঝিয়ে দিল যে, ও এই ধরনের কথাবার্তা ঘৃণা করে, ওকে সন্ধ্যাবেলার বাকি সময়টায় বেবেক রেস্তরাঁ থেকে বসফোরাসের দিকে তাকিয়ে এবং ফুটবল সম্বন্ধে বা অন্য কোনো নিত্যব্যবহার্য পণ্য সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে ও সময়টা কাটাল। কেবল একটা ব্যাপারে ও আনন্দ পেল, যেটা হল যখন আমরা বসফোরাসের সঙ্কীর্ণতম জায়গাটায় থামলাম, যে জায়গাটাকে 'এশিয়ান' বলে, সেখান থেকে উল্টোদিকের উপকূলে আরো একটা কাঠের প্রাসাদ জ্বলতে দেখে।

ওটা ছিল কান্দিলি-তে একটা সবচেয়ে সুন্দর দেখতে বসফোরাস 'ইয়ালি', জায়গাটার খুব কাছাকাছি আর ওটা ভালো করে দেখব বলে আমি গাড়ি থেকে নামলাম। আমার প্রিয়া আমার বন্ধুদের আগুন উপভোগ করতে দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, আর তাই ও-ও আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার হাতে ওর হাত রাখল। ওটা ছিল শেষ অটোমান প্রাসাদগুলোর একটা, আর ওটা যখন দাউ দাউ করে জ্বলা শুরু করল, তখন গাড়ি ও মানুষের জমায়েত ভিড়, তাদের চা খেতে খেতে আগুন জ্বলা দেখা থেকে সরে আসার জন্যে, আমরা রুমেলিহিসারির অন্য প্রান্তে হেঁটে গেলাম। আমি তখন ওকে বললাম যে, কলেজে পড়াকালীন আমি কীভাবে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই ফেরীতে চড়ে ওই পাশে চলে যেতাম আর ওদিককার রাস্তাগুলোতেও ঘুরে বেড়াতাম।

সেই অন্ধকার, ঠান্ডা রাত্রে, ছোট্ট কবরখানাটার সামনে দাঁড়িয়ে, আমাদের হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত বসফোরাসের তীব্র স্রোতের প্রচণ্ড শক্তিকে অনুভব করতে করতে, আমার প্রিয়া কানে কানে ফিসফিস করল যে, ও আমাকে কত ভালোবাসে আর আমি বললাম যে, আমি ওর জন্যে সবকিছু করতে পারি, আর তারপর আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা চুমু খেলাম আর যখনই একটু থেমে চোখ খুললাম, উল্টো দিকের জ্বলন্ত আগুনের কমলা রঙ-এর আভা ওর নরম চামড়ার ওপর খেলা করতে দেখলাম।

বাড়ি ফেরার পথে, গাড়ির পেছনের সীটে বসে আমরা হাত ধরাধরি করে রইলাম, কোনো কথা বললাম না। যখন ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছলাম, ও একটা বাচ্চার মতো দরজার দিকে দৌড়ে গেল। ওকে আমার সেই শেষ দেখা। এর পরের ঠিক করা দিনে ও জায়গায় ও আর আসেনি।

তিন সপ্তাহ পরে যখন স্কুলের ছুটি শেষ হয়ে গেল, আমি স্কুলের শেষে ডেম দ্য সিওন-এর গেটে যেতে আরম্ভ করলাম, আর দূর থেকে একটার পর একটা মেয়েকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখতাম আর কালো গোলাপের বেরোনোর জন্যে অপেক্ষা করতাম। দশ দিন পরে আমি মানতে বাধ্য হলাম যে, এ চেষ্টা অর্থহীন এবং আমার থামা উচিত। কিন্তু প্রতিদিন বিকেলে আমার পা আমাকে ওই স্কুলের গেটে টেনে নিয়ে যেত। যেখানে মেয়েদের ভিড় শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতাম। একদিন ওর সবচেয়ে বড় আর প্রিয় ভাইটা ভীড় থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এসে বলল যে, ওর বোন সুইজারল্যান্ড থেকে আমাকে ওর প্রীতি ও ভালোবাসা জানিয়েছে আর আমার হাতে একটা খাম দিল। একটা পুডিং-এর দোকানে বসে সিগারেট খেতে খেতে আমি ওর চিঠিটা পড়লাম। ও লিখেছে যে, ওর নতুন স্কুলে ও এখন খুব সুখী, কিন্তু ও আমার আর ইস্তাম্বুলের কথা খুব মনে করে আর পায় না বলে মন খারাপ হয়।

আমি ওকে ন'টা লম্বা লম্বা চিঠি লিখলাম, তার মধ্যে সাতটা খামে ভরলাম, আর পাঁচটা ডাকঘরে পোস্ট করলাম। আমি একটারও উত্তর পেলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬.
গোল্ডেন হর্নে জাহাজ

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, যখন আমি স্থাপত্যবিদ্যার দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছি, তখন আমি ক্লাশে যাওয়া আস্তে আস্তে কমিয়ে দিলাম। আমার সুন্দরী মডেলকে হারানোর সঙ্গে বা পরবর্তীকালে আমার একাকীত্বের বিষণ্নতায় ডুবে যাওয়ার সঙ্গে এর কতটা সম্পর্ক আছে? কখনো আমি আমাদের বেসিকটাসের বাড়ি থেকে একদম বেরই হতাম না, সারাদিন বই পড়তাম। কখনো একটা মোটা বই (দি পজেসড, ওয়র অ্যান্ড পীস, বাডেন ব্রুকস) নিয়ে ক্লাশে বসে পড়তাম। কালো গোলাপ চলে যাবার পরে ছবি আঁকার আনন্দও কমতে লাগল। ক্যানভাসে বা কাগজে আঁকার সময়, তুলি দিয়ে রঙ লাগানোর সময়, আমি খেলার মতো বোধটা আর পেতাম না, জয়ের সেই বোধটা, যা ছেলেবেলায় ছিল। সুখী ছেলেবেলার আনন্দ হিসেবে ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল এবং এখন

AMARBOI.COM

রহস্যজনকভাবে, আমি সেই আনন্দ হারিয়ে ফেলছি এবং এই শূন্যতা কী দিয়ে ভরাট হবে, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকায়, একটা সন্দেহের ঘন কালো মেঘ আমাকে ছেয়ে ফেলেছিল। ছবি আঁকা ছাড়া বেঁচে থাকা, বাস্তব জগৎ থেকে পালানোর কোনো রাস্তা না থাকা, লোকে যাকে 'জীবন' বলে, আমার সেই জীবন একটা বন্দিশালা হয়ে উঠছিল। যখন আমার ভয় আমাকে চেপে ধরেছিল আর যদি আমি অতিরিক্ত ধূমপানও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ফেলতাম, তাহলে আমি শ্বাসকষ্টে ভুগতাম। সাধারণ জীবনযাপনে যদি এ রকম শ্বাসকষ্ট হয়, আমার মনে হত আমি যেন জলে ডুবে যাচ্ছি। ইচ্ছা হত, নিজেকে আঘাত করি, নিজের কোনো ক্ষতি করি, অথবা ক্লাশ থেকে, স্কুল থেকে পালিয়ে যাই।

তবুও মাঝে মাঝে আমি আমার স্টুডিও-তে যেতাম, আর আমার বাদাম-গন্ধী মডেলকে ভুলে থাকার প্রাণপন চেষ্টা করতাম। অথবা ঠিক উল্টোও করতাম। আরেকটি ছবি এঁকে ওর চেহারাটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছু একটা হারিয়ে গিয়েছিল। আমার একটা ভুল হয়েছিল এই যে, আমি ভাবতাম ছবি আঁকলে আমি ছেলেবেলার মতো সেই আনন্দ পাবো, অথচ আমি তো তখন আর ছেলেমানুষ নই। একটা ছবি আঁকার মাঝখানে, আমি দেখতাম আঁকাটা কোনদিকে যাচ্ছে আর তারপরেই বুঝে যেতাম যে, আঁকাটা ঠিক হচ্ছে না, তখন ছবিটা অর্ধসমাপ্ত করে রেখে দিতাম। এই মনস্থির করতে না পারা থেকে আমি বুঝে গেলাম যে, যদি প্রতিটি নতুন ছবি আমাকে সেই সুখ এনে দেয়, যা আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন পেতাম, তাহলে ছবি শুরু করার আগেই আমাকে উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু এই ভাবে ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কেমন চিন্তা-ভাবনা করব, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কারণ হয়তো এখন পর্যন্ত আমি ছবি আঁকায় সব সময় সুখ পেতাম এবং তাই বুঝতেই পারিনি যে, ছবি আঁকতে গেলে কষ্টও পেতে হয় এবং এই কষ্ট বা যন্ত্রণাই আমার শিল্পকে বিকাশের পথে সাহায্য করবে।

আমার এই অস্থিরতা আমার অন্যান্য আগ্রহের বিষয়ের ওপরও ছড়িয়ে পড়ছে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। অনেক বছর ধরে, স্থাপত্যও এক ধরনের শিল্পকলা, এই দাবি করার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, স্থাপত্যবিদ্যা আমার ছবি আঁকার চাইতে বেশি কিছু দিতে পারবে না। বাচ্চা বয়েসে এতে আমার বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না, অবশ্য যদি না আমরা ছোটবেলায় চিনির কিউব নিয়ে বা কাঠের ব্লক নিয়ে খেলার কথা গণ্য করি। টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রায় অনুপ্রেরণাহীন শিক্ষকদের ছিল ইঞ্জিনিয়ারের চরিত্র, খেলার কোনো বোধই ছিল না আর স্থাপত্য বিদ্যায় কোনো সৃষ্টিকর্মী আনন্দও পেতেন না, কাজেই তাদের ক্লাশ করা আমার কাছে সময় নষ্ট করা মনে হত, আমার যে কাজ করা উচিত, তার থেকে অন্যত্র সরে যাওয়া মনে হত, যে সত্যিকার জীবন আমার বাঁচা উচিত বলে ভাবতাম, তার থেকে সরে যাওয়া মনে হত। যখন এই ধরনের চিন্তা আমার মাথায় আসত, তখন আমার চারপাশের সবকিছু ফ্যাকাশে হয়ে যেত, যে শিক্ষকের ভাষণটা শুনছিলাম, যে ঘন্টাটা বাজানোর ইচ্ছে হত, শিক্ষকেরা নিজেদের ক্লাশরুমে বকবক করতেন, ছেলেরা ঠাট্টা তামাশা করত, আর দুটো ক্লাশের মাঝখানে ধূমপান করত– সব কিছু যেন নিজেদের ভূত বলে মনে হত; এই অর্থহীন, ভুয়ো এবং যন্ত্রণাময় জগতের মধ্যে বন্দী হয়ে রইতাম, যেখান থেকে কেবল নিজেকে ঘৃণা করার এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকার অঙ্গীকার আসত। আমার বোধ হত, আমার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাচ্ছে, আমার ভাগ্য দূরে সরে যাচ্ছে, যেমন আমার প্রায়ই স্বপ্নের মধ্যে হত। এই দু:স্বপ্নকে হটিয়ে দেবার জন্য আমি কিছু লিখতাম, ক্লাশ চলাকালীন নোটবুকে কিছু ড্রইং করতাম। অধ্যাপকদের স্কেচ করতাম, মনোযোগী ছাত্রদের পেছন দিকটা স্কেচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতাম, ব্যঙ্গ-কবিতা লিখতাম, অন্য লেখকের অনুকরণ করে লিখতাম, ছোট ছোট ছন্দ মেলানো ছড়া, ক্লাশে কী হচ্ছে, সব লিখতাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমার দর্শক মন্ডলী তৈরি হয়ে গেল, যারা পরবর্তী খেপে কী লিখব, তার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সময় দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে এই বোধটা এবং আমার জীবন ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়ছে, এই ভয়টা এত শক্তিশালী হয়ে উঠল যে, যদি আমি টাসকিসলা-তে স্থাপত্য বিভাগে সারাদিন কাটাবো ভেবে ঢুকতাম, এক ঘণ্টা পরেই আমি ওই বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতাম, যেন আমার জীবন বিপন্ন (এবং ফুটপাথের পাথরগুলোর মাঝখানের ফাঁকে পা ফেলছি কিনা, সে সম্বন্ধে কোনো চিন্তা না করেই); ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসার পর, আমি ইস্তাম্বুলের রাস্তায় হারিয়ে যেতাম।

টাকসিম আর টেপেবাসি-র মাঝখানে পেছনের রাস্তাগুলো, যার মধ্যে দিয়ে ছোটবেলায় গেছি যখন আমার মা আর আমি 'ডোলমাসে' চড়ে বাড়ি যেতাম এবং তখন একটা ছ' বছর বয়েসি শিশুর কাছে যে জায়গাটা বহু দূরের বলে মনে হত– পেরা মহল্লাগুলো, যেগুলো আর্মেনিয়ানরা পাকা ওস্তাদের মতো বানিয়েছিল এবং এখনো

যেগুলো খাড়া আছে– এই সব জায়গাগুলোয় আমি ঘুরতে আরম্ভ করলাম। কখনো আমি স্থাপত্য বিভাগ থেকে সোজা টাকসিমে চলে যেতাম, তারপর যে কোনো বাসে চড়ে, অথবা আমার পদযুগল যেখানে নিয়ে যেত, সেখানে চলে যেতাম। কাসিম-পাশার বিচ্ছিরি সরু রাস্তাগুলো; বা বালাত, আমার প্রথম যাত্রাতেই যে জায়গাটাকে একটা ফিল্মের সেটের মতো নক্‌লি মনে হয়েছিল; পুরোনো গ্রিক ও ইহুদি পাড়াগুলো, নতুন বহিরাগতরা এবং দারিদ্র্য যে জায়গাগুলোকে বদলে অচেনা করে ফেলেছিল; উসকুদার-এর একদম মুসলিম, অত্যন্ত চকচকে পেছনের রাস্তাগুলো, যেগুলো ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কাঠের বাড়িতে ভরা ছিল; কোকামুস্তাফাপাশার ভূতুড়ে পুরোনো রাস্তাগুলো, চটজলদি বানানো এবং ভয়ানক দেখতে কংক্রীটের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকগুলো যে রাস্তার দৃশ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল; ফতি মসজিদের সুন্দর অঙ্গন, যা আমাকে চিরদিন আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে; বালিক্লি-র চারপাশের অঞ্চল; কুর্তুলুস আর ফেরিকয়-এর পাড়াগুলো, যেগুলো যত গরীব হচ্ছিল, ততই পুরোনো মনে হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল যে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো এখানে হাজার হাজার বছর ধরে আছে, ভাষা, জাতি, ধর্ম সব পরিবর্তন করেছে, যেমনটি একটি অত্যাচারী সরকার করে থাকে (আসলে মাত্র পঞ্চাশ বছর); পাহাড়ের নিচের ঢালু অঞ্চলের আরো গরীব পাড়াগুলো (সিহাঙ্গির, তার্লাবাসি ও নিশান্তাসির মতো)– এই সব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে আমি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতাম। শুরুতে উদ্দেশ্য ছিল কোনো উদ্দেশ্যই না রাখা, সেই জগৎ থেকে পালিয়ে আসা, যেখানে সকলেরই একটা চাকরি, একটা ডেস্ক্, একটা অফিস থাকতে হবে। কিন্তু যেমন আমি এক প্রাচীর থেকে অন্য প্রাচীর, এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা, শহরটায় ঘুরতে শুরু করলাম, আমি আমার ভেতরকার রাগী, অশুভ বিষণ্ণতা এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। এমনকি এখনো, যদি আমি এই একই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, আর পাড়ার একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত ফোয়ারা দেখি, কিংবা কোনো বাইজান্টাইন গির্জার (প্যান্টোক্রেটর, কুচুক আয়াসোফায়া) ভাঙাচোরা দেয়াল দেখি, যেটা, আমার যা মনে আছে, দেখতে তার চাইতেও পুরোনো, অথবা যখন আমি কোনো গলির মধ্যে দিয়ে নিচের দিকে তাকাই আর কোনো একটা মসজিদের দেওয়াল আর কুৎসিৎ মোজেইক টাইলস লাগানো একটা কুশ্রী অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির মাঝখান দিয়ে দূরে গোল্ডেন হর্নকে চকচক করতে দেখি, তখন মনে পড়ে প্রথম যখন আমি এই একই জায়গা থেকে এই একই দৃশ্য দেখেছিলাম, তখন আমার কী রকম কষ্ট ছিল এবং লক্ষ করি, এখন সেই একই দৃশ্য কেমন অন্য রকম লাগছে। আমার স্মৃতি মিথ্যা বলছে তা নয়,– দৃশ্যটা তখন কষ্টকর মনে হয়েছিল কারণ আমি নিজেই মনোকষ্টে ছিলাম। আমি আমার আত্মাকে শহরের রাস্তায় ঢেলে দিয়েছিলাম এবং সেটা এখনো সেখানে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি আমরা কোনো শহরে দীর্ঘদিন বাস করে, আমাদের সত্যিকারের এবং গভীর অনুভবগুলো তার উন্নতির জন্য উজাড় করে দিই, তাহলে একটা সময় আসবে যখন,–

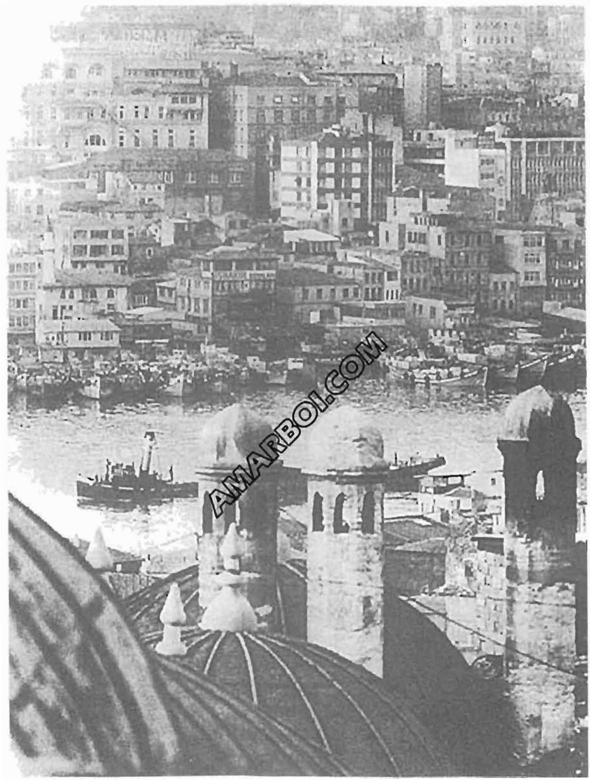

একটা গানের মধ্যে দিয়ে যেমন হারানো প্রেমকে মনে পড়ে যায়– বিশেষ রাস্তা, প্রতিকৃতি এবং দৃশ্য একই কাজ করবে। এটা হতে পারে যে, আমার বাদাম-গন্ধী প্রেমকে হারানোর পর আমি যখন কেবল হেঁটে বেড়াতাম, সেই সময়ে প্রথম আমি এতগুলো পাড়া, পেছনের রাস্তা, এতগুলো পাহাড়ের চূড়ার দৃশ্য দেখেছিলাম, সেই কারণেই ইস্তাম্বুল আমার কাছে এত বিষাদ-গ্রস্ত জায়গা মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন আমার এই ক্ষতিটা নতুন ছিল, আমি সর্বত্রই আমার মন মেজাজের ছাপ দেখতে পেতাম-পূর্ণিমার চাঁদকে মনে হত গোল ঘড়ির মুখ, সব কিছুই কোনোকিছুর প্রতীক, যা পরে স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে যেত। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে আমি একদিন একটা ডোলমাস-এ চড়লাম (যেমন কালো গোলাপকে সাথে নিয়ে চড়েছিলাম), ইচ্ছা

মতন নেমে পড়লাম, তখনকার দিনে এটা সম্ভব ছিল, আর নেমে দেখলাম আমি গালাতা সেতুতে নেমেছি। আকাশটা ছিল নিচু, অন্ধকার, ধূসর রক্তবর্ণ। মনে হচ্ছিল বরফ পড়তে পারে আর সেতুর হাঁটার পথটি ছিল জনশূন্য। সেতুর গোল্ডেন হর্ন-এর পাশটায় একটা কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেয়ে আমি জেটির ওপর নেমে এলাম।

AMARBOI.COM

ওখানে দেখলাম একটা ছোট্ট শহরের ফেরীলঞ্চ, যেটা এখুনি ছাড়বে। ক্যাপ্টেন, মেশিনম্যান, দড়ির লোক, সবাই, সমুদ্রের বড় জাহাজের নাবিকদের মতো, ডেকে দাঁড়িয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছিল আর নিজেদের মধ্যে ধূমপান করতে করতে আর চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প করছিল। যখন আমি লঞ্চে উঠলাম, আমিও আমার নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিলাম, ওদের অভিবাদন জানালাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন এই ক্লান্ত সহযাত্রীরা, তাদের ময়লা কোট, মাথায় সাঁটা টুপি, তাদের গলার স্কার্ফ এবং তাদের সুতোর ব্যাগ নিয়ে, আমার পুরোনো পরিচিত এবং আমিও যেন একজন নিত্যযাত্রী, যে এই ফেরীতে প্রতিদিন গোল্ডেন হর্ন থেকে যাওয়া-আসা করে। যখন ফেরীটা আস্তে আস্তে চলা শুরু করল, আমি একাত্মতা বোধ করলাম, যেন শহরের হৃদয়ে বসে আছি, এমনটা বোধ হল এবং এটা এমন নিবিড় একটা উপলব্ধি যে, আরো অন্য কিছুর বোধও হল; আমাদের মাথার ওপরে, সেতুর ওপর আমি ব্যাংকের বিজ্ঞাপন আর ট্রলিবাসের মাথার ওপরের ডান্ডা দেখতে পাচ্ছিলাম আর শহরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান রাস্তাগুলোয় এখন দুপুর এবং মার্চ ১৯৭২, কিন্তু এখানে, এই নীচের পৃথিবীতে, আমরা একটা প্রাচীন, ছড়ানো, ভারী সময়ের মধ্যে রয়েছি। মনে হচ্ছিল, হঠাৎ চোখে পড়া সিঁড়ি দিয়ে গোল্ডেন হর্নে নেমে এসে আমি যেন তিরিশ বছর পেছনের দিনগুলোতে চলে গেছি, যখন পৃথিবী থেকে ইস্তাম্বুল আরো বিচ্ছিন্ন ছিল, গরীব ছিল এবং নিজের বিষণ্নতার সঙ্গে যেন এক সুরে বাঁধা ছিল।

ফেরী জাহাজের ওপরের ডেকের পেছন দিকের কাঁপতে থাকা জানালাগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি দেখছিলাম, গোল্ডেন হর্নের নামার ঘাটগুলো কেমন ধীরে ধীরে পেছনে সরে যাচ্ছে, এর পুরোনো ইস্তাম্বুলের কাঠের বাড়ি ঢাকা পাহাড়গুলো এবং এর সাইপ্রেস গাছে ভরা সমাধিস্থলগুলো; আর অগুণতি ছোট ছোট কারখানা, দোকান, চিমনি, তামাকের গুদাম, ধ্বংসপ্রাপ্ত বাইজান্টাইন গির্জাগুলো, সবচেয়ে চমৎকার অটোমান মসজিদগুলো,

এর জীর্ণ, সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলোর ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, এর অলি-গলি, অন্ধকার পাহাড়, জাহাজ কারখানা, পুরোনো জাহাজের জং ধরা হাল... জেইরেক-এর প্যান্টোক্রেটর গির্জা, সিবালির বড় বড় তামাকের গুদামগুলো এবং এমনকি, বহুদূরের ফতি মসজিদের ছায়া– জাহাজের ঝাপসা, কাঁপতে থাকা জানালাগুলোর মধ্যে দিয়ে এই দুপুরের দৃশ্যগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, আমি জীর্ণ পুরোনো সিনেমাতে ইস্তাম্বুলের যে দৃশ্য দেখেছি, সেই রকম, মধ্য রাত্রের মতো কালো।

ফেরীর ইঞ্জিনে আমার মা'র সেলাই মেশিনের মতো শব্দ হচ্ছিল, একটা ঘাটের কাছাকাছি এসেই হঠাৎ শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। জানালাগুলোর কম্পন থেমে গেল, গোল্ডেন-হর্ন-এর জলও স্তব্ধ হয়ে গেল, গোটা পঞ্চাশেক ঝুড়ি নিয়ে, মুরগি এবং মোরগ ভর্তি, বুড়ি চাচিরা ফেরীতে উঠল, পুরোনো গ্রিক পাড়ার সরু সরু রাস্তাগুলো, তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে ছোট কারখানা ও গুদামঘরগুলো, ব্যারেল, পুরোনো গাড়ির টায়ার, শহরের রাস্তায় যে সব ঘোড়ায়-টানা গাড়ি চলে সেগুলো,– এই সব কিছু একটা একশ বছরের পুরোনো পোস্টকার্ডে যেমন থাকে, যেন তেমনি নিখুঁত, সূক্ষ্ম, পরিষ্কারভাবে আঁকা আর এগুলো সব মনে হচ্ছিল সাদা কালোয়। যখন ফেরী পার থেকে সরে গেল, আর জানালাগুলোর আবার কাঁপা শুরু হল, যখন আমরা উল্টোদিকের পারে সমাধিস্থলগুলোর দিকে যাচ্ছিলাম, তখন জাহাজের ফানেল থেকে বেরোনো কালো ধোঁয়া দৃশ্যটিকে এমন একটা বিষণ্নতায় ঢেকে দিচ্ছিল, যেন ওটা আরো বেশি ছবির মতো দেখতে লাগছিল। সময়ে সময়ে আকাশটাকে আলকাতরা-কালো মনে হচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই একটা ফিল্মে আগুন লাগলে তার কোণাটা যেমন দেখতে লাগে, তেমনি ভাবে একটা ঠান্ডা বরফের আলো উঠছিল।

এটাই কি ইস্তাম্বুলের গোপন রহস্য যে, এর মহান ইতিহাসের তলায়, এর জীবন্ত দারিদ্র্যের নিচে, এর দৃষ্টিনন্দন স্মৃতিস্তম্ভ এবং স্বর্গীয় নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর আড়ালে, শহরের দরিদ্র অধিবাসীরা তাদের শহরের আত্মাকে একটা ভঙ্গুর জালের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে? তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের একটা পূর্ণ বৃত্ত-পরিক্রমা সমাপ্ত হল, কারণ এই শহরের নির্যাস সম্পর্কে আমরা যাই বলি না কেন, সেটা হবে আমাদের জীবন সম্বন্ধে এবং আমাদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বলা। এই শহরের আমরা ছাড়া আর কোনো কেন্দ্র নেই।

তাহলে সেই ১৯৭২-এর মার্চের একদিন, যখন আমি ক্লাস পালিয়ে গোল্ডেন হর্নে এসে পুরোনো ফেরীতে চড়ে ইয়ুপ গেলাম, তখন আমার ইস্তাম্বুলী ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছিলাম কেন? হয়তো আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলাম যে, আমার শহরের মহান বিষণ্নতার পরে আমার নিজের বুক ভেঙে যাওয়া এবং ছবি আঁকার প্রতি আমার ভালোবাসা হারিয়ে ফেলা, যে ভালোবাসা আমাকে সারা জীবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিলাম, এগুলো মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভেবেছিলাম যে, ইস্তাম্বুলের দিকে তাকিয়ে, এত পরাজিত, এত ধ্বংসপ্রাপ্ত ও দু:খজনক, আমি আমার নিজের বেদনা ভুলে যাব। কিন্তু এসব কথা বলা মানে তুর্কী ভাবপ্রবণ নাটকের ভাষায় কথা বলা, একজন নায়কের মতো, যে ফিল্মের শুরুতেই বিষাদাচ্ছন্ন এবং জীবনে ও প্রেমে হেরে যাবার ভাগ্য নিয়ে এসেছে– এবং আমার নিজের বিষণ্নতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য শহরের বিষণ্নতাকে ব্যবহার করার কোনো মানে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার পরিবারের বা আমার বন্ধু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বান্ধবদের মধ্যে কেউই আমার কবি-চিত্রকর হওয়ার উচ্চাকাঙ্খাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি। শহরের কবি এবং চিত্র শিল্পীদের মধ্যে বেশির ভাগই এমন ভাবে পশ্চিমের দিকে নিজেদের নজর ঘুরিয়ে রেখেছিলেন যে, নিজেদের শহরকে তাঁরা দেখতেই পেতেন না; তাঁরা আধুনিক যুগের লোক হবার জন্য, ট্রলিবাসের এবং গালাতা সেতুর ওপরের ব্যাংকের বিজ্ঞাপনের জগতের অধিবাসী হবার জন্য লড়াই করছিলেন। যে বিষণ্নতা শহরকে মহীয়ান করে তুলেছিল, আমি তখনো তার সঙ্গে নিজের ঐক্যবিধান করতে পারিনি– কারণ আমার মধ্যে ছিল একটা সুখী, ক্রীড়াশীল শিশু, আমি হয়তো এসব থেকে অনেক দূরের মানুষ ছিলাম; এ পর্যন্ত আমার মধ্যে একে আলিঙ্গন করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না; নিজের মধ্যে এই বিষণ্নতার কোনো আভাস পেলেই আমি অন্য দিকে দৌড়ে পালাতাম, ইস্তাম্বুলের 'সৌন্দর্যের' মধ্যে আশ্রয় খুঁজতাম।

আমরা কেন আশা করব যে, একটা শহর আমাদের আধ্যাত্মিক দু:খকষ্টকে ভুলিয়ে দেবে? বোধহয় এই কারণে যে, আমাদের পরিবারকে ভালোবাসার মতোই শহরকে ভালো না বেসে পারি না। কিন্তু তবুও এটা ঠিক করতে হবে, শহরের কোন্ অংশকে আমরা ভালোবাসি এবং ভাবতে হবে, কেন?

ফেরী লঞ্চ হাসকয়-এর কাছাকাছি আসতে আমার এই দু:খজনক মানসিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেই আমার মনে হল যে, আমি যে আমার শহরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ আছি বলে মনে করি, তার কারণ, এই শহর আমাকে কোনো ক্লাসঘরের চাইতে বেশি জ্ঞান ও বোধশক্তি দিতে পারে। জাহাজের কাঁপতে থাকা জানালার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম, ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরোনো, কাঠের বাড়িগুলো, ফেনার-এর পুরোনো গ্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়াগুলো, যেগুলো অদম্য সরকারি অত্যাচারের কবলে পড়ে এখনো অর্ধ-পরিত্যক্ত এবং এইসব ভাঙা, ধ্বসে পড়া বাড়িগুলোর মধ্যে, কালো মেঘের মধ্যে রহস্যময় দেখতে টোপকাপি রাজপ্রাসাদ, সুলেমানিয়া মসজিদ এবং ইস্তাম্বুলের পাহাড়, মসজিদ আর গির্জার ছায়াছবি। এইখানে পুরোনো শিলাখণ্ড এবং পুরোনো কাঠের বাড়িগুলোর মধ্যে, ইতিহাস ধ্বংসের সাথে শান্তিতে রয়েছে; ধ্বংস জীবনকে লালন করে এবং ইতিহাসকে নতুন জীবন দেয়; যদি আমার দ্রুত নিভে আসা ছবি আঁকার প্রতি ভালোবাসা আমাকে আর রক্ষা না করতে পারে, তাহলে শহরের পাড়াগুলো আমার 'দ্বিতীয় জগত' হয়ে উঠবার জন্য তৈরি। এই কবি-সুলভ মানসিক বিভ্রান্তি আমার কত কাম্য! যেমন দাদীমা'র বাড়ি থেকে কিংবা স্কুলের বিরক্তিকর একঘেয়েমি থেকে পালিয়ে নিজের কল্পনার জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তেমনি এখন, স্থাপত্যবিদা পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে, আমি ইস্তাম্বুলের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। এবং তাই শেষ পর্যন্ত আমি গা ছেড়ে দিয়ে 'হুজুন'কে মেনে নিলাম, যা ইস্তাম্বুলকে তার মহান সৌন্দর্য দান করেছে, যে 'হুজুন' এই শহরের নিয়তি।

আমি খুব কমই বাস্তব জগতে খালি হাতে ফিরে আসতাম। আমি হাতে করে বাড়িতে নিয়ে আসতাম একটা খাঁজ কাটা টেলিফোনের টোকেন, যেটা আর চালু ছিল না, অথবা এমন কোনো অজানা জিনিস, যেটা বন্ধুদের দেখিয়ে ঠাট্টা করে বলতাম, এটা জুতো পরার জন্য বা বোতল খোলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপরে হয়তো আমি একটা হাজার বছরের পুরোনো দেওয়াল থেকে খসে পড়া এক টুকরো ইঁট নিয়ে আসতাম; এক তাড়া রাশিয়ান জার-এর আমলের নোট, যেগুলো ওই সময় শহরের সমস্ত কাবাড়িওয়ালার কাছে গাদা গাদা ছিল; অথবা আমি বাড়ি নিয়ে আসতাম একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরিশ বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানির স্ট্যাম্প, রাস্তার ফেরিওয়ালার দাঁড়িপাল্লার বাটখারা, প্রত্যেক সফরের শেষে সাহাফ্লার পুরোনো বই-এর বাজারে গিয়ে সেখান থেকে কেনা সস্তা, পুরোনো বই... আমি ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে যে কোনো বই বা পত্রিকা পাওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে থাকতাম– যে কোনো ধরনের ছাপা বিষয়, কোনো অনুষ্ঠান সূচি, কোনো সময় সারণী, বা টিকিট আমার কাছে দামি বিষয় ছিল আর তাই এসব সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। আমার একটা অংশ জানত যে, এই সব জিনিস আমি চিরকাল ধরে রাখতে পারব না; ওগুলো নিয়ে কিছুদিন খেলা করার পর, আমি ওদের অস্তিত্বই ভুলে যেতাম। কাজেই আমি জানতাম যে, আমি কোনো দিনই সেই সব মোহাবিষ্ট সংগ্রাহকদের মতো হতে পারব না, যাদের কাজ কোনোদিনই শেষ হয় না,– অথবা এমনকি, কোকুর মতো অতৃপ্ত জ্ঞান সংগ্রাহকও হতে পারব না, যদিও প্রথম দিকে আমি নিজেকে বলতাম যে, শেষ পর্যন্ত এসব একটা বিশাল কর্মযজ্ঞের অংশ হবে– একটা বড় ছবি, কিংবা একগুচ্ছ ছবি, অথবা একটা উপন্যাস, যেগুলো আমি তখন পড়ছিলাম, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি এবং মান। কখনো– প্রত্যেকটি অদ্ভুত স্মারক চিহ্ন মনে হত, হারিয়ে যাওয়া রাজসিক মহিমা এবং তার ঐতিহাসিক অবশিষ্টাংশের কাব্যিক বিষণ্নতায় পরিপূর্ণ– আর মনে হত আমিই একমাত্র লোক যে শহরের গোপন কথা জানতে পেরেছে; যখন আমি গোল্ডেন হর্ন ফেরীর জানালা দিয়ে দেখছিলাম, তখনই আমার এই সব কথা মনে হল, আর এখন আমি শহরকে আমার নিজের বলে আলিঙ্গন করেছি– আমি একে এখন যেভাবে দেখলাম, এমনভাবে কেউ আজ পর্যন্ত দেখেনি।

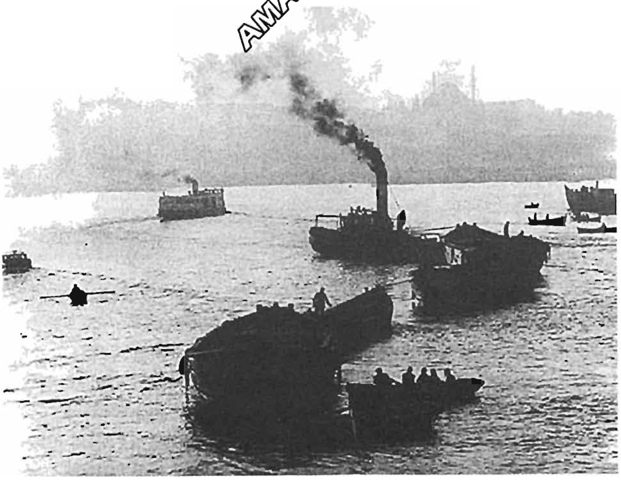

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার যখন এই নতুন কাব্যিক বহির্দৃষ্টিকে আয়ত্ব করলাম, তারপর থেকে আমি অদম্য উৎসাহে শহরের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো জিনিসকেই ঘাঁটতে শুরু করলাম। মনের এই রকম অবস্থায়, যা কিছু স্পর্শ করছি, যে কোনো জ্ঞান, যে কোনো প্রাচীন সামগ্রী, সবই মনে হচ্ছে যেন শিল্পকার্য। আমার মনের এই উচ্চাবস্থা কমে আসার আগেই একটা সাধারণ ব্যাপার বর্ণনা করা যাক, এই কাঁপা কাঁপা জানালাওয়ালা ফেরী লঞ্চটা।

এই লঞ্চটার নাম 'কোকাটাস'। ১৯৩৭ সালে গোল্ডেন হর্ন-এ হাসকয় জাহাজঘাটায় এটিকে, এর সঙ্গিনী আর একটি লঞ্চ 'সারিয়ার'-এর সঙ্গে নির্মাণ করা হয়। এই দুটোতে ১৯১৩ সালে তৈরি দুটি ইঞ্জিন লাগানো হয়, যেগুলো 'নিমেতুল্লা' নামের একটা বিলাসতরী, যার মালিক ছিল 'হিদিভ হিলমি পিসা', থেকে উদ্ধার করা হয়। তাহলে এই কাঁপতে থাকা জানালাগুলো থেকে কি এইটাই বোঝা যায় না যে, লঞ্চটিতে যে ইঞ্জিন লাগানো হয়েছিল, সেটি খাপ খায়নি? এই বিশদ ব্যাপারটা আমাকে একজন সত্যিকারের ইস্তাম্বুলীর বোধ এনে দেয় এবং আমার বিষণ্ণতাকে গভীরতা প্রদান করে। আমাকে ইয়ুপে নামিয়ে দেওয়ার পর, এই ছোট 'কোকাটাস' আরো বারো বছর চলে এবং ১৯৮৪ সালে এটিকে ফেরী সার্ভিস থেকে তুলে নেওয়া হয়।

আমার লক্ষ্যহীন হাঁটা থেকে যে সব জিনিস আমি আনতাম, মানে আমার 'হারিয়ে যাওয়ার' প্রচেষ্টা থেকে,– কয়েকটা পুরোনো বই, একটা নামের কার্ড,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা পুরোনো পোস্টকার্ড অথবা শহর সম্বন্ধে কোনো অদ্ভুত তথ্য,- এগুলো একেবারে অকাট্য প্রমাণ যে আমার হাঁটাগুলো 'বাস্তব' ছিল। কোলরিজের নায়কের মতো, যে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে যে তার হাতে রয়েছে তার স্বপ্নের গোলাপ, আমি জানতাম যে, এই জিনিসগুলো সেই দ্বিতীয় জগতের জিনিস নয়, যেটা আমাকে ছেলেবেলায় অনেক আনন্দ দিয়েছিল, বরং এগুলো বাস্তব জগতের জিনিস, যেটা আমার স্মৃতির সঙ্গে মেলে।

'কোকাটাস' আমাকে যেখানে নামিয়ে দিল, সেই ইয়ুপ-কে নিয়ে মুশকিল হচ্ছে এই যে, গোল্ডেন হর্নের একেবারে শেষে এই নিখুঁত ছোট গ্রামটাকে দেখে মোটেই বাস্তব মনে হয় না। অন্তর্মুখী, রহস্যময়, ধার্মিক, ছবির মতো সুন্দর আর অতীন্দ্রিয়বাদী 'প্রাচ্যে'র ভাবমূর্তি হিসাবে এই গ্রাম এমন নিখুঁত যে মনে হয়, এ যেন অন্য কারো স্বপ্ন, শহরের একধারে বসানো এক ধরনের তুর্কী প্রাচ্য মুসলিম ডিসনেল্যান্ড। এর কারণ কি এই যে, এটা পুরোনো শহরের প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত এবং তাই বাইজান্টাইন প্রভাবের বাইরে, অথবা শহরের অন্যত্র যেমন দেখা যায়, তেমন বহু-স্তরীয় বিভ্রান্তির বাইরে? উঁচু পাহাড়গুলো কি এই জায়গায় তাড়াতাড়ি রাত্রি নিয়ে আসে? অথবা ইয়ুপ কি ধর্মীয় এবং অতীন্দ্রিয় নম্রতায়, তার বুকের ওপরের বাড়িগুলোকে ছোট রাখা এবং ইস্তাম্বুলের বিশালতার এবং তার জটিল ক্ষমতার থেকে দূরে থাকা ঠিক করেছিল, যে ক্ষমতা ইস্তাম্বুল পেয়েছিল তার ধুলো ময়লা, জং, ধোঁয়া, ধ্বংস, ভগ্নদশা এবং তার নোংরা আবর্জনা থেকে? ইয়ুপ-কে যা প্রাচ্যের দেখা পাশ্চাত্যের স্বপ্নের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল এবং সকলকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল, তা হচ্ছে এর পশ্চিমের এবং পশ্চিমপন্থী ইস্তাম্বুলের কাছ থেকে পুরো সুবিধা আদায় করার অবিচ্ছিন্ন ক্ষমতা, কিন্তু একই সাথে নিজেকে কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, আমলাতন্ত্র, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সরকারি আবাসগুলোর থেকে দূরে সরে থাকা। এই জন্য পিয়ের লোটি এই জায়গাকে ভালোবাসতেন, শেষকালে এখানে একটা বাড়ি কিনে চলে এসেছিলেন। কারণ জায়গাটা ছিল অবিকৃত, প্রাচ্যের একটি সুন্দর ভাবমূর্তি এবং নিখুঁত- আর এই একই কারণে জায়গাটাকে আমার বিরক্তিকর লেগেছিল। যখন আমি ইয়ুপে এসে পৌঁছলাম, তখন গোল্ডেন হর্ন, তার ধ্বংসাবশেষ এবং তার ইতিহাস দেখে আমার মধ্যে যে তৃপ্তিদায়ক বিষণ্ণতার আবির্ভাব হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ উবে গিয়েছিল। আমি ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করলাম যে, আমি ইস্তাম্বুলকে ভালোবাসি তার ধ্বংসের জন্য, তার 'হুজুনে'র জন্য, তার সেই সব একদা-পাওয়া এবং পরে-নষ্ট-হওয়া মহিমা-র জন্য। এবং তাই, নিজেকে চাঙ্গা করতে, আমি ইয়ুপ থেকে বেরিয়ে এসে অন্যান্য মহল্লায় ধ্বংসস্তূপের সন্ধানে ঘুরতে শুরু করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৭.
মায়ের সঙ্গে কথোপকথন : ধৈর্য, সাবধানতা এবং শিল্প

অনেক, অনেক বছর ধরে আমার মা, বসার ঘরে একা একা বসে, বাবার অপেক্ষায় সারাটা সন্ধ্যা কাটিয়ে দিতেন। বাবা তাঁর সন্ধ্যা কাটাতেন, তাঁর ব্রিজ ক্লাবে এবং সেখান থেকে তিনি অন্যান্য জায়গায় চলে যেতেন এবং এত দেরি করে ফিরতেন যে, আমার মা ততক্ষণে অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুতে চলে যেতেন। আমার মা আর আমি সামনাসামনি বসে রাতের খাবার খাওয়ার পর (বাবা ততক্ষণে ফোন করতেন; আমি খুব ব্যস্ত, দেরী করে বাড়ি ফিরব, তোমরা খেয়ে নাও), মা ঘি-রংয়ের টেবিল-ঢাকা চাদরের ওপর তাস বিছিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ দেখতেন। বাহান্ন তাসের প্যাকের প্রতিটি তাসকে এক এক করে ওলটাতেন, ওদের কোন সংখ্যার কত মূল্য সেগুলো যেভাবে সাজাতেন। কালোর পরে লাল তাসের মধ্যে ভবিষ্যতের কোনো চিহ্ন দেখার বিশেষ ইচ্ছা থাকত না, অথবা বেশ একটা সুখের ভবিষ্যতের ছবি পাওয়া যাবে, এ রকমভাবে তাসের চিহ্নগুলোকে একটা গল্পের আকারে সাজাতেন না; তাঁর কাছে এটা ছিল ধৈর্যের খেলা। যখন আমি বসবার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করতাম, মা তাঁর ভাগ্য পড়তে পেরেছেন কিনা, উনি সব সময় আমাকে একই উত্তর দিতেন :

'আমি আমার ভবিষ্যৎ পড়ার জন্য এটা করছি না সোনা, আমি সময় কাটানোর জন্য এটা খেলছি। এখন কটা বাজে? আমি আর এক দান খেলব, তারপরই শুতে যাব।'

একথা বলার পর মা আমাদের সাদা-কালো টেলিভিশনের দিকে তাকাবেন, (তুরস্কে এটা নতুন আমদানি) সেখানে তখন একটা পুরোনো সিনেমা দেখানো হচ্ছে, অথবা গত বছরের রমজান সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে (সেই সময়ে, মাত্র একটাই চ্যানেল ছিল এবং তাতে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীটা পাওয়া যেত), তারপর বলবেন, 'আমি দেখব না, ইচ্ছা হলে বন্ধ করে দিতে পার।'

আমি টিভির পর্দায়, যা হচ্ছিল, তা আরো কিছুক্ষণ দেখব– একটা ফুটবল ম্যাচ, বা আমার ছোটবেলার সাদা-কালো রাস্তাগুলো। আমিও এইসব টিভি শো দেখতে বেশি আগ্রহী ছিলাম না, কেবলমাত্র আমার ভেতরের তোলপাড় থেকে আর আমার ঘরের নির্জনতা থেকে একটু মুক্তির জন্য দেখতাম। এবং যতক্ষণ আমি বসার ঘরে থাকতাম, আমি প্রতি রাত্রির মতো মায়ের সঙ্গে গল্প করে কাটাতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গল্পগুলো কখনো কখনো তিক্ত তর্কাতর্কিতে গড়িয়ে যেত। পরে আমি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বই পড়তাম আর সকাল পর্যন্ত নিজের অপরাধবোধের মধ্যে গড়াগড়ি দিতাম। কখনো, মা-র সঙ্গে তর্কাতর্কির পর, আমি ইস্তাম্বুলের ঠান্ডা রাত্রির মধ্যে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম, আর ট্যাকসিম, বিওগলু-র চারপাশে ঘুরে বেড়াতাম, অন্ধকার, অশুভ পেছনের রাস্তাগুলো দিয়ে একটার পর একটা ছেদহীন ধূমপান করতে করতে ঘুরে বেড়াতাম, যতক্ষণ না হাড়ের মধ্যে ঠান্ডা সেঁধিয়ে যেত এবং আমার মা এবং শহরের অন্য সকলেই ঘুমিয়ে পড়ত, তারপর আমি বাড়ি ফিরতাম। আমি সকাল চারটেয় বিছানায় শোবার অভ্যাস করে ফেলেছিলাম এবং দুপুর পর্যন্ত ঘুমোতাম। পরবর্তী কুড়ি বছর আমি এই একই রুটিন চালিয়ে গিয়েছিলাম।

সেই দিনগুলোতে আমি আর মা যে ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করতাম, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো স্বীকার না করে,– তা হচ্ছে আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কারণ ১৯৭২ সালের শীতকালে, স্থাপত্য বিভাগে আমার দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি, আমি প্রায় পুরোপুরিই ক্লাশ করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যে কটা ক্লাশ করলে আমার নাম কাটা যাবে না এবং আমি বহিস্কৃত হব না, সেগুলো ছাড়া আমাকে টাসকিসলা স্থাপত্য বিভাগে দেখা যেত না।

কখনো কখনো আমি নিজেকেই লজ্জা লজ্জা করে বলতাম যে, 'আমি যদি কখনো স্থপতি না-ও হই, আমার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা থাকবে,' একথা আমার বাবা এবং আমার বন্ধুরাও বারে বার বলত এবং ওদের প্রত্যেকেরই আমার ওপর প্রভাব ছিল এবং এতে আমার অবস্থা, অন্তত আমার মায়ের চোখে অত্যন্ত বিপজ্জনক করে তুলেছিল। আমি আমার আঁকার প্রতি ভালোবাসাকে মরে যেতে দেখলাম। তারপরে যে যন্ত্রনাময় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তাও সইলাম এবং তাই আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলতে পারি যে, আমি কোনোদিন স্থপতি হতে পারব না। একই সময়ে এও জানতাম যে, ভোর হওয়া পর্যন্ত বই বা উপন্যাস পড়ে, অথবা সারা রাত্রি টাকসিম, বিওগলু বা বেসিকটাস-এর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আমার চিরদিন চলবে না। কখনো আমার সাংঘাতিক আতঙ্ক হয়ে যেত, আমি লাফ দিয়ে টেবিল থেকে উঠে মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করতে চাইতাম। আমি কেন এ রকম করছি, তা জানতাম না বলে, অথবা মা-কে কোন্ ব্যাপারে রাজী করাবো, সেটাও জানতাম না বলে, কখনো কখনো মনে হত, আমরা দুজন চোখ বেঁধে লড়াই-এর ময়দানে নেমেছি।

মা বলতেন, 'আমিও যখন ছোট ছিলাম, তোমারই মতন ছিলাম,' মনে হয়, আমাকে খোঁচা দেবার জন্যে। 'আমিও জীবনের কাছ থেকে পালিয়ে যেতাম, তোমারই মতো। যখন তোমার মাসিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছে বা পার্টিতে বা বলনাচে, মজা করছে, আমি তোমার মতো ঘরে বসে ইলাসট্রেশন পত্রিকাটা ঘন্টার পর ঘণ্টা বোকার মতো দেখতাম, যে পত্রিকাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার নানাজী খুব পছন্দ করতেন।' মা সিগারেটে একটা টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতেন, ওঁর কথাটা আমার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে কিনা, 'আমিও লাজুক ছিলাম, জীবনকে ভয় করতাম।'

যখন মা একথা বললেন, আমি বুঝতে পারলাম উনি বলতে চাইছেন, 'তোমার মতো' এবং আমার রাগ হয়ে গেল। আমি নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম এই ভেবে যে, মা যে এসব কথা বলছেন, তা 'আমার ভালোর জন্যই' বলছেন। কিন্তু এই যে গভীর, বহু প্রচলিত অভিমত, এটা মা-ও পোষণ করেন জেনে, আমার বুক ভেঙে গেল। টেলিভিশনের পর্দা থেকে বসফোরাসের ওপর ফেরীর সার্চলাইটের আলো দেখতে দেখতে আমি এই গোঁড়ামির কথাগুলো নিজের মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম আর ভাবলাম, এটা আমি কত ঘৃণা করি।

আমি যে মার কাছ থেকেই এটা জানলাম, তাই নয়, কারণ মা এটা কখনো খোলাখুলি বলতেন না, কিন্তু ইস্তাম্বুলের কুঁড়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং একই মনোবৃত্তিসম্পন্ন খবরের কাগজের কলাম লিখিয়েরা, যারা তাদের চরম এবং দুর্বিনীত হতাশাবাদের মুহূর্তে সিদ্ধান্ত করে যে, 'এই রকম একটা স্থান থেকে ভালো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না।'

এই হতাশাবাদ এসেছে এতদিন ধরে শহরের ইচ্ছাশক্তিকে ভেঙে দেওয়া বিষণ্নতা থেকে। কিন্তু এই বিষণ্নতা যদি স্ফূর্তি এবং দারিদ্র্য থেকেই এসে থাকে, তাহলে শহরের ধনীরাও একে গ্রহণ করবে কেন? হয়তো এই জন্যে যে, তারা হঠাৎ বড়লোক হয়েছে। এই জন্যেও হতে পারে যে তারা নিজেরা এমন কিছু দারুণ ব্যাপার সৃষ্টি করেনি যা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, যে সভ্যতার তারা অনুকরণ করতে চায়।

আমার মায়ের ক্ষেত্রে, যদিও, এই ধ্বংসাত্মক, সাবধানী মধ্যবিত্ত নীতিবাক্য, যা তিনি সারা জীবন বলে এসেছেন, তার একটা ভিত্তি আছে। ওঁদের বিয়ের পর আমার দাদা আর আমার জন্ম হবার পর পরই, আমার বাবা নির্দয়ভাবে আমার মার হৃদয় ভাঙতে শুরু করেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতি, পরিবারের ধীরে ধীরে দরিদ্র হয়ে যাওয়া,– যখন মার বিয়ে হয়েছিল, তাঁর সামান্যতম ধারণাও ছিল না যে, তাঁকে এই সব জিনিসের সঙ্গে লড়াই করতে হবে এবং আমার সব সময় মনে হত যে, এই সব দুর্ভাগ্যগুলোর জন্য সমাজের সামনে মা সব সময়ই একটা আত্মরক্ষার ভঙ্গী নিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমাদের ছেলেবেলায় যখন মা দাদাকে আর আমাকে নিয়ে বিওগলুতে কেনাকাটা করতে যেতেন, বা সিনেমায় বা পার্কে যেতেন, এবং লক্ষ্য করতেন যে রাস্তার পুরুষেরা তাঁর দিকে তাকাচ্ছে, তখন মায়ের শক্ত মুখের চেহারা বলে দিত যে তিনি, যারা পরিবারের সদস্য নয়, তাদের সঙ্গে কী রকম চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। যদি দাদা আর আমি রাস্তাতেই কথা কাটাকাটি শুরু করে দিতাম, দেখতাম যে মার রাগ এবং হতাশার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষা করার প্রবণতাও ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা যে অনবরত আমাদের বলতেন, 'স্বাভাবিক হও, সাধারণ হও, অন্য লোকেদের মতো,' এর মধ্যেই মায়ের সাবধানতা আমি খুব বেশি বুঝতে পারতাম। মায়ের এই অনুরোধের মধ্যে ছিল প্রচলিত নৈতিকতা– নম্র ও বিনয়ী হওয়ার গুরুত্ব, তোমার সামান্য যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা, আমাদের সমগ্র সংস্কৃতির ওপর ছাপ ফেলা সুফি তপশ্চর্যা অভ্যাস করা– কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁকে বোঝাতে পারেনি যে একজন ছাত্র কেন হঠাৎ স্কুল ছেড়ে দেবে। আমার নিজের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলা, আমার নৈতিক এবং বৌদ্ধিক আবিষ্টতাকে গুরুত্ব দেওয়া, এগুলো আমার ভুল ছিল, বরং এই আবেগের বাড়াবাড়ি, সততা, নৈতিক উৎকর্ষ, অধ্যবসায় ইত্যাদি অভ্যাস করা এবং অন্য সকলের মতো হওয়া, তার জন্য সংরক্ষণ করাই উচিত ছিল– এই ছিল মার অভিমত। শিল্প, চিত্রকলা, সৃষ্টিশীলতা, এগুলো কেবল ইউরোপিয়ানদেরই আন্তরিকভাবে নেবার অধিকার আছে, আমার মা বলতে চাইতেন, আমরা নই, যারা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্তাম্বুলে বাস করি, এমন একটা সংস্কৃতির মধ্যে যা দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে পড়েছে, নিজের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, আর তার ইচ্ছাশক্তি, ক্ষুধাও। যদি আমি সব সময়েই মনে করি যে, 'এ রকম একটা স্থান থেকে ভালো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না', তাহলে অনুশোচনা করার জন্য বেঁচে থাকব না।

অন্য সময়ে নিজের অবস্থাকে মর্যাদা দেবার জন্য আমার মা আমাকে বলতেন যে, তিনি আমার নাম ওরহান রেখেছিলেন কারণ সমস্ত অটোমান সুলতানদের মধ্যে সুলতান ওরহানকেই মা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। সুলতান ওরহান কোনো বড় প্রকল্প নিয়ে মাতেননি, নিজের প্রতি অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করেননি, তার বদলে একটা সংযমী সাধারণ জীবন কাটিয়েছিলেন। যার জন্য ইতিহাস বই-এর পাতায় এই দ্বিতীয় অটোমান সুলতান সম্বন্ধে কদাচ, কিন্তু সম্মানের সঙ্গে, তার নাম লেখা হয়েছিল। যদিও মা আমাকে এসব কথা বলার সময় হাসতেন, কিন্তু এটা পরিষ্কার ছিল যে, মা এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ সৎ গুণ হিসেবে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

সেই সব সন্ধ্যায়, যখন মা বাবার জন্য অপেক্ষা করতেন এবং আমি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওঁর সঙ্গে তর্ক করতাম, আমি জানতাম যে, আমার কাজ হবে ইস্তাম্বুলের এই ভেঙে পড়া দীনহীন, বিষণ্ন জীবনের বিরোধিতা করা এবং তার সঙ্গে মা আমার জন্য যে আরামের সাধারণ জীবন চাইছেন, তারও বিরোধিতা করা। কখনো কখনো নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম, কেন আবার মার সঙ্গে তর্ক করার জন্য ও ঘরে যাচ্ছি? আর, কোনো বিশ্বাসযোগ্য উত্তর না পেয়ে আমি আমার ভেতরে একটা আলোড়নের আভাস পেতাম, যেটা আমি বুঝতে পারতাম না।

'তুমি আগেও, ছোটবেলাতেও ক্লাস ফাঁকি দিতে,' আমার মা দ্রুত তাস ওলটাতে ওলটাতে বলতেন, 'তুমি বলতে, 'আমার অসুখ করেছে, আমার পেট ব্যথা করছে, আমার জ্বর হয়েছে। যখন আমরা সিহাঙ্গির-এ থাকতাম, তখন তুমি এটা অভ্যাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণত করেছিলে। কাজেই একদিন সকালে যখন তুমি বললে, 'আমার অসুখ করেছে, আমি স্কুলে যাব না,' আমি তখন তোমার ওপর চিৎকার করে উঠেছিলাম, তোমার মনে আছে? আমি বলেছিলাম, 'তোমার অসুখ করুক, বা নাই করুক, তুমি এক্ষুনি বেরোবে আর সোজা স্কুলে যাবে। আমি তোমাকে বাড়িতে দেখতে চাই না।'

গল্পের এই অংশে এসে মা একটু থামতেন এবং আমি রেগে যাব জেনেই একটু হাসতেন। তারপর আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সিগারেটে একটা টান দিয়ে আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে কিন্তু গলায় মধু ঢেলে বলতেন, 'সেদিনের সেই সকাল বেলার পর থেকে আমি আর কখনো তেমাকে বলতে শুনিনি, 'আমার অসুখ করেছে, আমি স্কুলে যাব না।'

আমি উত্তেজিতভাবে বলতাম, 'ঠিক আছে, এখন বলছি! আমি আর কখনো স্থাপত্য বিভাগে যাব না।'

'তাহলে এখন কী করবে? তুমি কি আমার মতো বাড়িতে বসে থাকবে?'

আস্তে আস্তে ভেতরে একটা জেদ তৈরি হত, তর্কাতর্কিটাকে শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে, তারপর দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে বাইরে গিয়ে বিওগলুর পেছন দিকের রাস্তাগুলোতে আধা-মাতাল, আধা-পাগল অবস্থায় ক্রমাগত সিগারেট খেতে খেতে সব্বাইকে এবং সব কিছুকে ঘৃণা করে একটা লম্বা, একা একা হেঁটে যাওয়া চলত। ওই বছরগুলোতে আমি যে হাঁটা হেঁটেছিলাম, কখনো সেগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত, কখনো দীর্ঘ হাঁটা চলত দোকানের জানালা, রেস্তরাঁ, অর্ধ-আলোকিত কফির দোকান, সেতু, সিনেমার সামনে, বিজ্ঞাপনের সাইন বোর্ডের সামনে, নোংরায়, কাদায়, ফুটপাথে জমে থাকা কালো জলের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়া, নিওন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোর বাতি, গাড়ির আলো, কুকুরের দলের রাস্তার আবর্জনার টিনগুলো উল্টিয়ে ফেলা-এগুলো দেখতে দেখতে পথ চলে এবং তারপরই আমার ভেতর থেকে একটা তাগিদ আসত, বাড়ি ফিরে, এই যা কিছু দেখলাম, সেগুলো লিখে ফেলা, সঠিক শব্দচয়ন করে এই অন্ধকার আত্মাকে প্রকাশ করা, এই ক্লান্ত এবং রহস্যময় বিভ্রান্তি কে ভাষায় ফুটিয়ে তোলা। এই তাগিদটাও ছিল সেই পুরোনো, খুশিখুশি, জরুরি, ছবি আঁকার ইচ্ছাটার মতোই অপ্রতিরোধ্য, কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না, এটার অর্থ কী।

'ওটা কি লিফটের আওয়াজ?' মা জিজ্ঞেস করতেন।

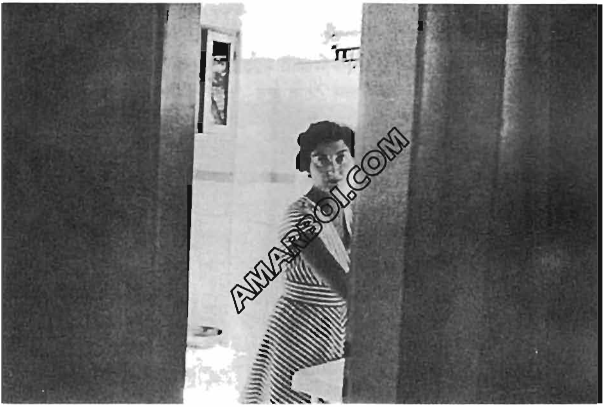

AMARBOI.COM

আমরা দুজনেই চুপ করে শুনতাম, কিন্তু লিফটের আওয়াজ শুনতে পেতাম না। বাবা ওপরে আসছেন না। মা আবার তাসে মনোনিবেশ করতেন, নতুন উদ্যমে তাস ওলটাতেন, আর আমি অবাক চোখে দেখতাম। মা একটা বিশেষভাবে নড়াচড়া করতেন, যেটা আমার ছোটবেলায় খুব মন ভালো করে দিত, কিন্তু যখন থেকে মার স্নেহ হারালাম, তখন থেকে মাকে ও রকম ভাবে নড়াচড়া করতে দেখলে মনে ব্যথা পেতাম। এখন নিশ্চিত নই, কীভাবে মাকে বুঝব। মাকে দারুণ ভালোবাসি অথচ মনের মধ্যে রাগ, এই দুইয়ের মাঝখানে আটকা পড়েছি। চার মাস আগে, লম্বা তদন্তের পর, মা মেসিডিয়েকোয়-তে একটা জায়গা খুঁজে বের করেছিলেন, যেখানে বাবা তাঁর রক্ষিতার সঙ্গে দেখা করতেন। গৃহরক্ষকের কাছ থেকে কায়দা করে চাবিটা জোগাড় করার পর মা ওই খালি অ্যাপার্টমেন্টটায় ঢুকে যা দেখেছিলেন, সেটা পরে একদিন ঠান্ডা মাথায় আমাকে বলেছিলেন। বাবা যে পাজামা বাড়িতে পরতেন, সেই পাজামা ওখানকার শোবার ঘরে, বালিশের ওপর পড়ে আছে আর বিছানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশে টেবিলে একগাদা ব্রিজ খেলার বই উঁচু হয়ে রয়েছে, যেমন বাড়িতেও বিছানায় বাবার দিকটায় একই রকম করা আছে।

অনেক দিন পর্যন্ত মা কিন্তু কাউকে বলেননি, তিনি কী দেখেছিলেন। মাস কয়েক পরে, একদিন এই রকম সন্ধ্যায় যখন উনি পেশেন্স খেলছিলেন, ধূমপান করছিলেন আর চোখের কোণ দিয়ে টেলিভিশনও দেখছিলেন, তখন আমি মার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার ঘর থেকে বের হয়ে এ ঘরে ঢুকতেই মা হঠাৎ ব্যাপারটা বলে ফেলেছিলেন। আর আমার করুণ অবস্থা দেখে, উনি সঙ্গে সঙ্গে বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপরে যতবারই আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি, আমার বাবা যে প্রতিদিন অন্য একটা বাড়িতে যান এটা ভাবতেই আমার গায়ে কাঁপুনি ধরত। আমি যা করতে পারিনি, বাবা যেন সেটাই করতে পেরেছিলেন। বাবা তাঁর দ্বিতীয়কে, তাঁর যমজকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাঁর কোনো প্রেমিকা নয়, এই দ্বিতীয়টির সঙ্গে দেখা করতেই বাবা রোজ ওই অন্য বাড়িটায় যেতেন।

'তোমাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করবার একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে,' মা তাস বাঁটতে বাঁটতে বলতেন, 'তুমি ছবি এঁকে নিজের অন্ন-সংস্থান করতে পারবে না, তোমাকে একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে। এখন তো আমরা আর আগের মতো বড়লোক নই।'

'এটা সত্যি কথা নয়,' আমি বললাম। অনেকদিন আগেই ভেবে নিয়েছিলাম যে, আমি যদি জীবনে কিছু না-ও করি, আমার বাবা-মা-ই আমাকে দেখবেন।

'তুমি কি বলতে চাইছ যে, ছবি এঁকে তুমি নিজেকে চালাতে পারবে?'

যেভাবে মা রাগের চোটে ছাইদানীতে সিগারেটটা ঘসে নিভিয়ে দিলেন, তাছাড়া মায়ের আধা ব্যাঙ্গাত্মক, আধা মিটমাট করার কণ্ঠস্বর থেকে এবং এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা বলার সময়ও যেমন অবহেলায় তাস খেলে যাচ্ছিলেন, তা থেকে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াচ্ছে।

'এটা প্যারিস নয়, এটা ইস্তাম্বুল', মা বললেন, গলার স্বর বেশ সুখী সুখী।

'যদি তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীও হও, কেউ তোমার প্রতি মনোযোগ দেবে না। তোমায় একা জীবন কাটাতে হবে। কেউ বুঝবে না, তুমি একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ফেলে দিয়ে ছবি আঁকতে গেলে কেন। যদি আমরা একটা ধনী সমাজ হতাম, যে সমাজ শিল্প এবং চিত্রকলার কদর করে, তাহলে অবশ্য কথা ছিল। কিন্তু ইউরোপেও সকলেই জানে যে, ভ্যান গগ এবং গগ্যাঁ, দুজনেই উন্মাদ ছিলেন।'

মা নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকে বাস্তবধর্মী সাহিত্যের, যা বাবা উনিশ শো পঞ্চাশের দশকে ভালোবাসতেন, সব গল্পগুলো শুনেছিলেন। আমাদের একটা এনসাইক্লোপিডিক অভিধান ছিল, পাতাগুলো হলদে হয়ে গেছে, মলাট ছেঁড়াখোঁড়া, যেটা মা প্রায়ই কোনো বিষয়ে সঠিক জানবার জন্যে খুলতেন,– মায়ের এই অভ্যাসটা আমাকে একটা ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য করার রসদ জুগিয়ে দিল :

'তাহলে তোমার পেটিট ল্যারাউসে বলছে যে, সব শিল্পীরাই উন্মাদ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার কোনো ধারণা নেই, খোকা। কোনো লোক যদি অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন এবং কঠোর পরিশ্রমী হয়, যদি সে ভাগ্যবান হয় তাহলে হয়তো সে ইউরোপে বিখ্যাত হতে পারে। কিন্তু তুরস্কে তুমি পাগল হয়ে যাবে। আমাকে ভুল বুঝো না; আমি তোমাকে এখন এসব বলছি, যাতে ভবিষ্যতে তোমার কষ্ট না হয়।'

কিন্তু আমার এখনই কষ্ট হচ্ছিল এবং আরো বেশি করে, কারণ মা পেশেন্স খেলতে খেলতে এবং তাস থেকে নিজের ভবিষ্যৎ পড়তে পড়তে আমাকে এই সব আঘাত-করা কথা বলতে পারছিলেন।

'তুমি আমাকে ঠিক কীভাবে আঘাত করতে চাইছ, বলতো?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই আশায় যে, মা হয়ত আমাকে আরো আঘাত করার জন্য কিছু বলবেন।

'আমি চাই না কেউ ভাবুক যে তোমার মানসিক গণ্ডগোল আছে,' মা বললেন, 'সেইজন্যে আমি আমার বন্ধুদের কাউকেই বলি না যে, তুমি ক্লাশ করছ না। ওরা সে ধরনের লোক নয় যে বুঝবে যে, তোমার মতো কোনো ছেলে কেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে শিল্পী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওরা বরং ভাববে যে, তোমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে, ওরা তোমার পেছনে এই সব গল্প করবে।'

'তুমি ওদের যা খুশি বলতে পার,' আমি বললাম, 'ওদের মতো মূর্খ না হবার জন্য আমি সব কিছু ছাড়তে রাজি আছি।'

'তুমি এসব কিছুই করবে না,' মা বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তুমি তাই করবে, যা তুমি যখন ছোট ছিলে, করেছ– ব্যাগ নিয়ে স্কুলে গেছ।'

'আমি স্থপতি হতে চাই না– এটা নিশ্চয় করে বলতে পারি।'

'আর দু'বছর পড়াশুনা কর খোকা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা ডিপ্লোমা নিয়ে নাও, তারপর তুমি ঠিক করবে, স্থপতি হবে না চিত্রশিল্পী হবে।'

'না।'

'তুমি স্থাপত্যবিদ্যার পড়াশুনো ছেড়ে দেবে শুনে নূরী চান কি বলেছে, শুনবে?' মা বললেন, এবং আমি জানি যে, মা তার একজন ফালতু বান্ধবীর মতামতের কথা বলে আমাকে আঘাত করতে চাইছেন। 'তুমি মনোকষ্টে ভুগছ এবং তুমি বিভ্রান্ত, কারণ আমার সঙ্গে তোমার বাবার লড়াই, কারণ তিনি সর্বদাই অন্য মেয়েছেলের পেছনে দৌড়চ্ছেন-নুরী চান অন্তত তাই ভাবে।'

'তোমার ওইসব বুদ্ধিহীন বান্ধবী সমাজ আমার সম্বন্ধে কী ভাবে, না ভাবে, তাতে আমার বয়েই গেল।' আমি চিৎকার করে উঠলাম। বুঝতে পারছিলাম যে মা আমাকে উসকে দিচ্ছেন, অথচ আমি কিন্তু সোজা তাঁর ফাঁদে গিয়ে পড়লাম, ইচ্ছা হচ্ছিল অভিনয়-করা রাগ দেখানোর বদলে সত্যিকারের রাগ হোক।

'তুমি বড্ড অহংকারী, খোকা,' মা বললেন। 'আমি তোমার এটা পছন্দ করি। কারণ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে অহংকার বা গর্ব, এই অর্থহীন শিল্প-টিল্প নয়। ইউরোপের অনেক মানুষই শিল্পী হয়েছেন, কারণ তাঁরা ছিলেন অহংকারী এবং সম্মানীয় ব্যক্তি। কারণ ওখানে লোকেরা শিল্পীকে, ব্যবসায়ী বা পকেটমার ভাবে না,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা শিল্পীদের বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মান্য করে। কিন্তু তুমি কি সত্যিই ভাবো যে, আমাদের এই দেশে তুমি শিল্পী হয়ে নিজের অহংকার অক্ষুন্ন রাখতে পারবে? এখানকার লোকেদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে, যে লোকেরা শিল্প সম্বন্ধে কিছু বোঝেই না, এখানকার লোকেদের দ্বারা তোমার শিল্প 'কেনাতে' হলে, তোমাকে রাজ্যের কাছে, ধনীদের কাছে এবং সবচেয়ে খারাপ, ওই অর্ধ-শিক্ষিত সাংবাদিকগুলোর কাছে মোসাহেবি করতে হবে। পারবে?'

রাগের চোটে আমার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, গায়ে যেন অস্বাভাবিক জোর এসে গেল, আমি নিজের ভেতর থেকে ধাক্কা মেরে বাইরে বেরিয়ে এলাম; একটা আশ্চর্য অনুভূতি হল, এত বিশাল যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম, মনে হল বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে রাস্তায় চলে আসি। কিন্তু আমি নিজেকে ধরে রাখলাম, কারণ আমি জানি যে, যদি আমি আরো কিছুক্ষণ এই ঘরে থেকে মায়ের সঙ্গে কথার লড়াই চালিয়ে যেতে পারি, যতখানি পারি কথা দিয়ে ধ্বংস করতে, আমার সর্বশক্তি দিয়ে বিদ্রোহ করতে, যন্ত্রণা দিতে এবং পরিবর্তে যন্ত্রণা নিতে, তাহলে আমাদের সব মন্দ কথা বের হয়ে যাবার পর তখনো আমি দরজা ঠেলে বাইরে অন্ধকারে, এই ম্লান সন্ধ্যায় পেছন দিকের রাস্তাগুলোয় বেরিয়ে যেতে পারব। আমার পা আমাকে নিয়ে যাবে অসমান ফুটপাথের ওপর দিয়ে সামনে—পেছনে, ম্লান-আলো-জ্বলা অথবা না-জ্বলা রাস্তার বাতির খুঁটিগুলোর পাশ দিয়ে, সরু পাথর-বসানো গলিগুলোর বিষণ্নতার মধ্যে এবং সেখানে আমি উপভোগ করব এই রকম একটা দু:খদায়ক, নোংরা, দারিদ্র্যপূর্ণ জায়গায় বাস করার একটা বিকৃত সুখ। সীমাহীন পথ চলা, ক্রোধের আগুনে জ্বলা, একটা নাটকের চরিত্রের মতো ধারণাগুলোর এবং ভাবমূর্তিগুলোর আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া, ভবিষ্যতে অসাধারণ কিছু করব, সেই স্বপ্ন দেখা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফ্লবার্টের কথা ভাবো, সারা জীবন মায়ের সঙ্গে একই বাড়িতে কাটিয়ে গেলেন!' আমার মা বলে চললেন, নিজের হাতের তাসগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে, খানিকটা সমবেদনার, খানিকটা মিটমাটের ভঙ্গীতে, 'কিন্তু আমি চাই না যে, তুমি তোমার সারাটা জীবন একই বাড়িতে আমার সঙ্গে কাটাও। সেটা ছিল ফ্রান্স। সেখানে ওরা যদি বলে যে, কেউ একজন মহান শিল্পী, তাহলে জলের স্রোতও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে এখানে একজন শিল্পী যদি স্কুল ছেড়ে দিয়ে তার সারাজীবন মায়ের পাশে কাটায়, তাহলে পরিণতিতে হয় সে মাতাল হয়, না হলে তার জায়গা হয় পাগলা গারদে।' এবং তারপরেই অন্য লাইনে, 'যদি তোমার কোনো পেশা থাকে, বিশ্বাস কর, তুমি তাহলে ছবি এঁকে আরো বেশি আনন্দ পাবে।'

এই রকম অসুখী, রাগ, আর দুর্দশার মুহূর্তে, নির্জন রাস্তা দিয়ে, কেবল আমার স্বপ্নকে সঙ্গী করে নৈশ পদযাত্রাগুলোতে, আমি কেন আনন্দ পেতাম? কেন ইস্তাম্বুলের সূর্যালোক-ধৌত পোস্টকার্ড দৃশ্যগুলো, যা পর্যটকদের দারুণ প্রিয়, তার চাইতে পেছনের রাস্তাগুলোর আবছায়া অন্ধকার, ম্লান বিষণ্ন সন্ধ্যা এবং ঠান্ডা শীতের রাত্রি, রাস্তার বাতিগুলোর ফ্যাকাশে আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া ভূতুড়ে লোকগুলো, পাথর-বসানো রাস্তার দৃশ্য এবং এই সবের একাকীত্বের নির্জনতা, আমার পছন্দ ছিল?

'যদি তুমি স্থপতি না হও বা অন্য কোনো ভাবে নিজের পেট চালাতে না পার, তাহলে তুমি একজন গরীব, পাগল, তুচ্ছ শিল্পী হবে, যার ধনী এবং ক্ষমতাশালী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকেদের দয়ার ওপর নির্ভর করে বাঁচা ছাড়া গতি নেই– বুঝেছ? নিশ্চয়ই বোঝ যে, এ দেশে স্রেফ ছবি এঁকে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। তুমি দুর্দশায় পড়বে, লোকে তোমার দিকে ঘেন্নার দৃষ্টিতে তাকাবে, তুমি আমৃত্যু মানসিক জটিলতা, দুশ্চিন্তা এবং অনুশোচনায় কাটাবে। তোমার মতো একটা চালাক চতুর, প্রিয়, প্রাণচঞ্চল ছেলে কি সত্যিই এই রকম জীবন চায়?'

আমি হাঁটতে হাঁটতে বেসিকটাস পর্যন্ত চলে যেতাম এবং ডোল্‌মাব্যাখ রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ধরে ধরে স্টেডিয়াম পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা, একেবারে ডোলমাস থামার স্টপ পর্যন্ত। রাত্রিবেলা এই উঁচু, চওড়া, পুরোনো শ্যাওলা ধরা রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ধরে ধরে হাঁটতে আমার ভালো লাগত। রাগের চোটে আমার কপালের রগগুলো দপদপ করত, প্রতি মুহূর্তে বেড়েও যেত, যতক্ষণ না আমি ডোলমাব্যাখে পৌঁছতাম এবং তারপরে একটা গলিপথ দিয়ে উঠে বারো মিনিটে টাকসিমে পৌঁছে যেতাম।

'যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন অবস্থা একেবারে শোচনীয় হলেও তুমি সর্বদাই হাসিখুশি, স্ফুর্তিবাজ, আশাবাদী ছিলে– ওঃ! তুমি কী মিষ্টি ছেলেই না ছিলে। তোমাকে যে কেউ দেখলেই হেসে উঠত। তার কারণ তুমি খুব মিষ্টি ছিলে বলে নয়, কারণ তুমি জানতেই না দুঃখ কাকে বলে। কারণ তুমি কখনো বিরক্ত হতে না, কারণ সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও তুমি একটা কিছু আবিষ্কার করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুশিতে খেলায় মেতে থাকতে, কারণ তুমি কত হাসি খুশি ছিলে। এই রকম একটা ছেলে যে একটা দুঃখী, দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পী হবে, যে কিনা সব সময় বড়লোকদের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকবে– আমি যদি তোমার মা না হতাম, তবুও

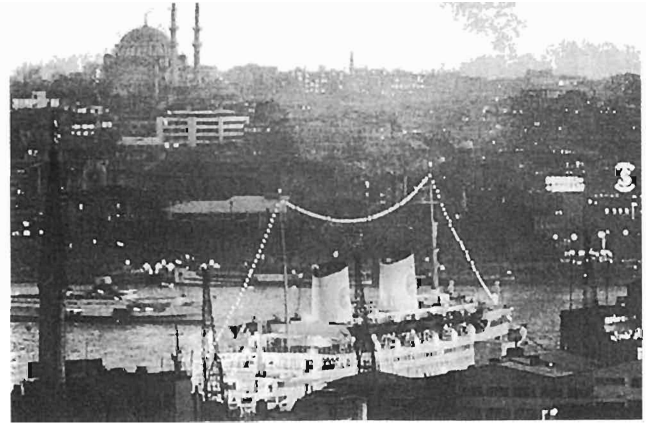

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সহ্য করতে পারতাম না। কাজেই আমি চাই না যে আমি যা বলছি, তাতে তুমি আঘাত পাও, তাই মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো।'

টাকসিম থেকে উঠে আসবার পথে আমি একমুহূর্তের জন্য থেমে আধো অন্ধকারে গালাতার আলোগুলোর দিকে তাকাতাম, তারপর বিওগলুর দিকে রওনা হতাম, ওখানে ইস্তিকলাল এভিনিউ-এর মুখে বই-এর দোকানগুলোতে বই দেখে কয়েক মিনিট কাটাতাম এবং তারপর কোনো একটা বিয়ার হল-এ, যেখানে টেলিভিশনের আওয়াজ ভীড়ের গণ্ডগোলের আওয়াজকে চাপা দিত, থেমে একটা বিয়ার আর ভদকা নিতাম, একটা সিগারেট খেতাম, যেমন অন্য সকলেই করত (আমার চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিতাম, কাছাকাছি কোনো বিখ্যাত কবি, লেখক বা শিল্পী বসে আছেন কিনা) এবং যখন বুঝতাম যে, সব গোঁফ-ওয়ালা লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি,– কারণ আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি, আমি একা, আর আমার মুখটা অল্পবয়েসি– তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতাম। এভিনিউ ধরে আরো খানিকটা হাঁটার পর, আমি বিওগলুর পেছনের রাস্তাগুলোর দিকে চলে যেতাম এবং যখন আমি চুকুরচুমা, গালাতা, সিহাঙ্গির-এ পৌঁছতাম, একটু থেমে রাস্তার বাতিগুলোর আলোর বৃত্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, কাছাকাছি কোনো টেলিভিশনের আলো ভিজে ফুটপাথে পড়ছে, কাঁপছে, দেখতাম এবং যখন একটা কাবাড়িওয়ালার দোকানের ভেতরে উঁকি মারতাম, একটা সাধারণ মুদি দোকানের জানালায় একটা রেফ্রিজারেটর সাজিয়ে রেখেছে, দেখতাম, একটা ওষুধের দোকানে একটা পুতুল-মূর্তি সাজানো আছে, দেখতাম, যেটা আমি ছোটবেলাতেও দেখেছি বলে মনে পড়ে, তখন আমি উপলব্ধি করতাম যে আমি কত সুখী ছিলাম। আমার মায়ের কথা শোনার পর যে অপার্থিব, কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করা, খাঁটি রাগ আমি অনুভব করছিলাম, সেটা, বিওগলু বা উসকুদার-এ অথবা ফতি-র পেছনের রাস্তাগুলোয় আমি ঘুরে বেড়ানোর ঘণ্টাখানেক পরে স্তিমিত হয়ে যেত- যেখানেই আমি যেতাম, ঠান্ডা থেকে ক্রমশ আরো ঠান্ডা হয়ে যেতাম, আবার আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর আগুনের উত্তাপে গরম হয়ে যেতাম। ততক্ষণে বিয়ার এবং দীর্ঘ পরিশ্রম, আমার মাথাকে হাল্কা করে দিত এবং শোকার্ত রাস্তাগুলো একটা পুরোনো ফিল্মে যেমন হয়, তেমনি চমকে চমকে উঠত, এমন একটা সময়, যখন আমি জমে যেতে চাইতাম, লুকোতে চাইতাম, -যেমন আমি মুখের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো দামী বীজ বা প্রিয় মার্বল পাথরটা লুকিয়ে রাখতাম- এবং সেই একই সময়ে আমি ঐসব ফাঁকা রাস্তা ছেড়ে বাড়িতে ফিরে এসে নিজের ডেস্কে একটা পেন্সিল ও কাগজ নিয়ে বসে যেতে চাইতাম কিছু লিখতে বা আঁকতে।

'দেওয়ালের ওই ছবিটা- নেরমিন ও আলি ওটা আমাদের বিয়েতে উপহার হিসেবে দিয়েছিল। যখন ওদের বিয়ে হল, আমরা তখন ওই বিখ্যাত শিল্পীর কাছে গেলাম যদি তার কাছ থেকে একটা ছবি কিনতে পারি ওদের বিয়েতে উপহার দেব বলে। যদি তুমি দেখতে, তুরস্কের সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন, কোনো লোক শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়ির দরজায় এসেছে তাঁর আঁকা ছবি কিনবে বলে, অথবা তিনি তাঁর আনন্দ ঢাকতে কী রকম হাস্যকর ব্যাপার-স্যাপার করছিলেন, অথবা তাঁর ছবিটা কিনে আমরা বেরোনোর সময় তিনি কীভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন করতে করতে ঘরের মেঝেটা প্রায় ঝাঁট দিয়ে ফেলেছিলেন, অথবা কেমন তোষামোদের ভাবে তিনি আমাদের বিদায় জানিয়েছিলেন, তাহলে খোকা, এ দেশে কেউ চিত্রকর হোক বা অন্য কোনো শিল্পী হোক, এ তুমি কিছুতেই চাইবে না। সেই জন্যই আমি কিন্তু কাউকে বলিনি যে, তুমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে শিল্পী হতে চাইছ। যে সব লোকদের এক্ষুণি তুমি বুদ্ধিহীন বলে অভিযোগ করলে, একদিন ওদের কাছেই তোমাকে ছবি বিক্রি করতে হবে। যখন তারা দেখবে যে, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ কলঙ্কিত করেছ, তোমার সারা জীবন- তোমার লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে- হ্যাঁ, তখন তারা তোমার কাছ থেকে একটা দুটো ছবি কিনবে, দয়া দেখাবার জন্য, আমাকে আর তোমার বাবাকে ছোট করার জন্যে, অথবা হয়তো তোমার অবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে তাদের দু:খ হবে। আর তোমাকে কিছু টাকা-পয়সা দিতে চাইবে। কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই ওদের ঘরের কোনো মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দেবে না। সেই যে মিষ্টি মেয়েটা, যার ছবি তুমি আঁকতে, তুমি কি জানো, ওর বাবা ওকে তড়িঘড়ি সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়ে দিল কেন? আমাদের দেশের মতো এই রকম একটা গরীব দেশে, এত এত দুর্বল, হেরে যাওয়া, অর্ধশিক্ষিত মানুষের মাঝখানে, যে রকম জীবন তোমার পাওনা, তা পেতে এবং পিষে না মরতে, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হলে, তোমাকে ধনী হতেই হবে। কাজেই স্থাপত্য বিদ্যা পড়া ছেড়ে দিও না খোকা। যদি ছেড়ে দাও, তাহলে কিন্তু তুমি প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। লে কর্বুশিয়ারকে দেখ, উনি চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পড়লেন স্থাপত্যবিদ্যা।'

বিওগলুর রাস্তাগুলো, তাদের অন্ধকার কোণা, আমার পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা, আমার অপরাধবোধ– এগুলো সব আমার মাথার মধ্যে নিওন আলোর মতো জ্বলতে নিভতে লাগল। আমি এখন জেনে গেলাম যে, আজ রাত্রে আমার মা আর আমার মধ্যে কোনো লড়াই হবে না। আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমি দরজা খুলে শহরের সান্ত্বনা-দাত্রী রাস্তাগুলোতে পালিয়ে যাব; এবং হেঁটে হেঁটে আদ্ধেক রাত্রি পার করে দেবার পর, আমি বাড়ি ফিরে আসব আর আমার টেবিলে বসে তাদের রসায়নকে কাগজে ধরে রাখব।

'আমি চিত্রশিল্পী হতে চাই না,' আমি বললাম, 'আমি লেখক হতে চলেছি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটোগ্রাফগুলো সম্পর্কে

এই বইয়ের ফটোগ্রাফগুলি বাছার সময়, এই বইটি লেখার সময়কার উত্তেজনা আর বিহ্বলতা আমি দ্বিতীয়বার উপভোগ করেছি। বেশির ভাগ ফটো তুলেছিলেন আরা গুলার; তাঁর বাড়ি-স্টুডিও-সংরক্ষণাগার-মিউজিয়ামে (বিওগলুতে যেখানে তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন) আমার সময় কালের ছবি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে আমি অনেক মূল্যবান, কিন্তু দীর্ঘকাল ভুলে যাওয়া (যেমন, পৃষ্ঠা: ২৮৩ গাধাবোট-এর ছবি, তার ফানেলটা গালাতা সেতুর নিচ দিয়ে পার হবার জন্য নিচু করা) আমার সাবালক দৃষ্টিতে যেমন মন-ভোলানো চেনা চেনা, তেমনি আবার অপরিচিত, ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। যখন আমি পৃষ্ঠা: ৩১৪ তে দেখানো বরফ ঢাকা গালাতা সেতুর ছবিটা দেখলাম, মনে হল যেন আমার নিজের স্মৃতি, পর্দায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই রকম আরো অনেক মুহূর্ত ছিল, যখন আমার স্বপ্নের ছবি সংরক্ষণ করা বা তার সম্বন্ধে লেখার জন্য আমি সাময়িক উন্মাদনার কবলে পড়েছিলাম। আরা গুলার-এর এই বিশাল, ধীরে অন্তহীন সংরক্ষণাগারটি প্রথমত তাঁর শিল্পের প্রতি সশ্রদ্ধ উপহার এবং তারপর ১৯৫০ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইস্তাম্বুল-জীবনের একটি অনবদ্য দলিল এবং এগুলি ঐসব বছরগুলিতে যারা এই শহরকে নিবিড়ভাবে জানত, তাদের স্মৃতির রসে মাতাল করে দেবে।

আরা গুলার-এর ফটোগ্রাফের সূচি : পৃষ্ঠা: ৩৬, ৩৮, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৫০, ৫১ নিচে, ৫৬, ৬০ উপরে ও নিচে ডানেও, ৯৬, ৯৭, ৯৮ উপরে, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৭, ১৪৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৩, ২০৩, ২২২, ২২৯, ২৩০, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮২, ২৮৩,

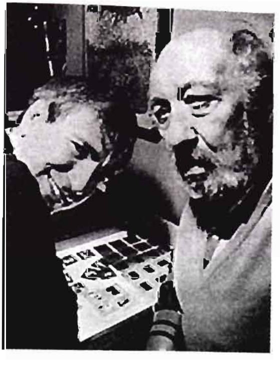

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯০, ৩০৩, ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৭, ৩৬১, ৩৬৩, ও ৩৬৭।

সেলাহাত্তিন গিজ (জন্ম ১৯১২)-এর সংরক্ষণাগারে তাঁর বিওগলুর রাস্তাগুলোর ফটোগ্রাফিক দলিলগুলো (যখন উনি গালাতাসরায়লিসেসি-তে ছাত্র ছিলেন তখন থেকে শুরু করে তাঁর কুমহুরিয়েত-এ থাকাকালীন বেয়াল্লিশ বছর ধরে তোলা) দেখা মানে, একটা ব্যক্তিগত মন্ত্রমুগ্ধতার জগতে প্রবেশ করা। বোধহয় এই জন্য যে, গিজ শহরের, ফাঁকা, নির্জন, বরফে ঢাকা রাস্তাগুলোকে আমার মতোই ভালবাসতেন : পৃষ্ঠা: ৩৫, ৪০, ৪১, ৪৭, ৪৮, ৫৫, ৫৯, ৬০ (বাম), ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৮৯, ৯৮ (নিচে), ১১৫, ১৩৪, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৭২, ১৭৩, ২১০, ২১২, ২৩৯, ২৪১, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৮, ২৫১, ২৭৭, ২৮৯, ৩০৪, ৩১২, ও ৩৬২।

আরেকজন ফটোগ্রাফার সাংবাদিক হিলমি সাহেক্ক এর সংগ্রহ থেকে ফটোগ্রাফগুলি অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেবার জন্য আমি ইস্তাম্বুল সিটি কাউন্সিল-কে ধন্যবাদ জানাতে চাই : পৃষ্ঠা: ৪৩, ৪৯, ৫১ (উপরে), ৫৩, ৬৭, ১০২, ১৪৫, ২০২, ২০৯, ২৩৯, ২৩৬, ২৮১, ৩০৫, ৩১৩, ৩৪২, ৩৪৭, ও ৩৪৮।

হাঘিয়া সোফিয়া-র পৃষ্ঠা: ২২৬ ফটোগ্রাফটি জেম্‌স্ রবার্টসন ১৮৫৩ সালে নিয়েছিলেন।

পৃষ্ঠা: ২২৫, ২২৭, এবং ২৩২-এর ফটোগ্রাফগুলো আব্দুল্লা ব্রাদার্স নিয়েছিলেন, যাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে ইস্তাম্বুলে ফটোগ্রাফিক এজেন্সি ছিল।

বইটা সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, পোস্টকার্ড শিল্পী ম্যাক্স ফ্রুকটারম্যানও আব্দুল্লা ব্রাদার্সের কিছু কিছু ফটোগ্রাফ ব্যবহার করেছিলেন। পৃষ্ঠা: ৫৪, ৫৭, ৬২, ৬৪, ২২৮, ২৩০, ২৪৪, ২৫৪ এবং ২৫৫-এর ছবিগুলো ম্যাক্স ফ্রুকটারম্যানের পোস্টকার্ড থেকে নেওয়া। যেমন শহরের বিস্তৃত পূর্ণ দৃশ্য দেখানো হয়েছে পৃষ্ঠা: ২৮৬–২৮৯ পৃষ্ঠাতে, সেই সময়কার ফ্যাশন অনুযায়ী পাঁচ পোস্টকার্ড ছবির স্টোন প্রিন্ট।

পৃষ্ঠা: ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৫৮, ২২০, ২৩৩, এবং ২৫২-এর পুরোনো ফটোগ্রাফগুলো আমার কাছে অন্য হাত ঘুরে এসেছে, এবং এই ছবিগুলো কার তোলা, তা আমি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও জানতে পারিনি।

পৃষ্ঠা: ৪৪-এর লে করবুসিয়ের-এর আঁকা ড্রইং-টির জন্য আমি ফাউন্ডেশন লে করবুসিয়ের-কে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

পৃষ্ঠা: ৫২-এর খোদাই চিত্রটি টমাস অ্যালোম-এর তৈরি, পৃষ্ঠা: ২৫৯-এর চিত্রটি হোকা আলি রিজা'র আঁকা এবং পৃষ্ঠা: ৩৩৪-এর ছবিটি হালিল পাশার আঁকা।

পৃষ্ঠা: ৬৮–৭৯-এর খোদাই চিত্রগুলি মেলিং-এর তৈরি।

পারিবারিক ফটোগুলি বেশির ভাগই বাবার তোলা, যদিও দু'একটা, মা বা চাচার তোলাও হতে পারে। আগের পাতার আমার ছবিটা মুরাত কার্তোগ্লু তুলেছেন।

২৮ নং পরিচ্ছেদে যেমন লিখেছি, পৃষ্ঠা: ২৬৭ থেকে ২৭১-এর মধ্যেকার বেসিকটাস ও সিহাঙ্গির-এর ছবিগুলো আমার তোলা; আমার পনেরো বছর বয়েসে তোলা সিহাঙ্গির থেকে দেখা পাথর-বাঁধানো গলির ছবিটি (পৃষ্ঠা: ৯০) আমি এখনো ভালোবাসি।

...

এজরা এক্কান ও এমরে আয়ভাজকে সযত্ন সম্পাদনা ও মতামতের জন্য ধন্যবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~